জুলভার্ন রচনাবলী

খন্ড — ৭

প্রথম প্রকাশ : আশ্বিন, ১৩৫৯

প্রকাশক : ময়ূখ বসু
বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
১৪, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০ ০৭৩

প্রচ্ছদ : প্রণবেশ মাইতি

মুদ্রক : অজয় বর্ধন
দীপ্তি প্রিন্টার্স
৪, রামনারায়ণ মতিলাল লেন
কলিকাতা-৭০০ ০১৪

সূচীপত্র

ঃ জুল ভের্ণ ঃ

জন্ম নানতেস-য়ে, ৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৮২৮। পড়লেন আইন, হলেন সাহিত্যিক। আমেরিকা গেলেন ১৮৬৭ সালে। মারা গেলেন আমিয়েন্সয়ে : ২৪শে মার্চ, ১৯০৫।
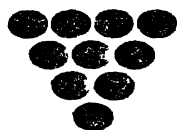
ইন টু দ্য নাইজার বেণ্ড

জুল ভের্ণ

ভূমিকা

জুল ভের্ণ বেশী নাম করেছেন আধুনিক সায়ান্স-ফিকশনের জনক হিসেবে। কিন্তু তাঁর সৃজনীশক্তি আর সাহিত্যিক প্রতিভা সাহিত্যের ঐ একটি ধারার মধ্যেই আবদ্ধ থাকে নি। এ তথ্য প্রকাশ পেয়েছে তাঁর মৃত্যুর পর প্রকাশিত L' E'tonnante A venture de la Misssion Bar Sac উপন্যাসে। বিষয় অনুসারে তাঁর রচনাশৈলী যে বহুবিচিত্র হয়ে উঠতে পারে এবং শুধু কল্পবিজ্ঞান নয়, অন্যান্য বহু বিষয়েও যে তাঁর আগ্রহ সমান মাত্রায় ছিল— অসাধারণ এই উপন্যাসটি তার প্রমাণ।

আশ্চর্য এই উপন্যাসের প্রথম লাইনটি পডলেই মনে পডবে স্যার আর্থার কনান ডয়ালকে : ভের্ণের জীবনী লিখতে বসে কেনেথ অ্যালট লিখেছিলেন— "যেন শার্লক হোমসের আর একটা কাহিনী লিখতে বসেছেন ডক্টর ওয়াটসন।" অধ্যায়ের বাকী অংশটুকু গোয়েন্দা লেখক এডগাব ওয়ালেসকেও টেক্কা মারতে পারে। তৃতীয় অধ্যায়টা বেরিয়েছে যেন উনবিংশ শতাব্দীব কোনো রোমান্টিক ঔপন্যাসিকের লেখনী থেকে। প্রথম খণ্ডের বাদবাকী স্মরণ করিয়ে দেয় রাইডার হ্যাগার্ডের অমর সাহিত্যকীর্তি—আফ্রিকার গহনজঙ্গলে দুরন্ত অ্যাডভেঞ্চার অথবা পিশাচ ওঝার ঝাডফুঁক—সবই তো সেই বনজঙ্গলে প্রাণ হাতে নিয়ে রোমাঞ্চ অভিযানের ব্যাপার, কল্পবিজ্ঞানের অপ্রতিদ্বন্দ্বী স্রষ্টা জুল ভের্ণ স্বমহিমায় ফিরে এসেছেন কেবল দ্বিতীয় খণ্ডে।

আর একটা বিরাট বৈষম্য প্রকট হয়েছে কাহিনীর মধ্যে। অসাধারণ বৈষম্যটা চোখে পডার পর স্বভাবতঃই একটা প্রশ্ন জাগে মনের মধ্যে। প্রথম খণ্ডে কাহিনী লেখা হয়েছে বেশ হাল্কা মনে। দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম কয়েকটা পরিচ্ছেদেও অ্যামিয়েন্স শহরেব বোগে পঙ্গু, শোকে ভগ্নহৃদয়, গুরুতর অসুস্থ প্রবীণ সাহিত্যিক জুল ভের্ণকে দেখা যায় না তার বদলে মনে দাগ কেটে যায় অসাধারণ ধীমান এক তরুণ সাহিত্যিকের

সাহিত্যকীর্তি, এ সেই সাহিত্যিক জুল ভের্ণ যিনি নৌচালনায় সুদক্ষ, যাঁর রচনা একদা মন্ত্রমুগ্ধ করেছিল গোটা প্যারিস শহরকে, অন্তহীন সাহিত্য পরম্পরা উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল যাঁর দূরদৃষ্টিতে। অথচ লেখার মধ্যেই এমন প্রমাণ পাওয়া গেছে যা থেকে স্পষ্টভাবে বোঝা গেছে যে দ্বিতীয় খণ্ডের প্রায় সবটুকু এবং প্রথম খণ্ডের বেশ কয়েকটি অংশ লেখক তাঁর শেষ জীবনে লিখেছেন এবং মৃত্যুর পর যাতে প্রকাশ পায়, এই অভিপ্রায় নিয়েই যেন ইচ্ছে করেই বইটির প্রকাশনা আটকে রেখেছিলেন জীবদ্দশায়।

ইচ্ছেটা যেন অনেকদিন ধরেই মনের মধ্যে পুষে রেখেছিলেন জুল ভের্ণ। উপন্যাসটা শুরু করেছিলেন প্রথম জীবনে, লিখেওছিলেন অনেকটা। তারপর বাড়িয়েছেন, কেটেছেন, পালটেছেন বারবার। মেজাজ আর দৃষ্টিভঙ্গী পালটেছে, সেইসঙ্গে পালটেছে পাণ্ডুলিপির চেহারা। শেষকালে হয়ত ঠিক করেছেন এই হোক তাঁর শেষ কাহিনী। শেষ সাহিত্যকীর্তি। তাঁর অন্তিম সংগীত। স্মৃতিস্তম্ভে উৎকীর্ণ ফলকের মতই প্রকাশ পাক নশ্বর দেহ কবরস্থ হওয়ার পর। ফলে তাঁর মৃত্যুর ৫৫ বছর পরে অনবদ্য এই উপন্যাস প্রকাশিত হয় বৃটেনে, অথচ বৃটেনে তাঁর অনুরাগী পাঠক পাঠিকার সংখ্যা নেহাৎ কম নয়। বাংলায় বেরোলো তাঁর মৃত্যুর ৭৮ বছর পরে।

আশ্চর্য। নয় কি? সুযোগ পেলেই যিনি ইংরেজদের বক্র সমালোচনা করেছেন, অথচ ইংল্যাণ্ডের ঘরে ঘরে যাঁর বইয়ের বিপুল সমাদর, তাঁরই লেখা অসামান্য এই উপন্যাসটির ইংরেজী অনুবাদ হতে লাগল ৫৫ বছর। বাংলায় ৭৪ বছর।

কারণ সম্ভবতঃ একটাই। বাণিজ্যিক ভাষায় বলা যেতে পারে, চাহিদার চেয়ে সরবরাহ বেড়ে যাওয়ায় দর পড়ে গিয়েছিল বাজারে। ভের্ণের রচনার উৎকর্ষতা কখনো কমেছে, কখনো বেড়েছে, গুণগত মানের ওঠানামা খুব বেশী লক্ষ্য করা গেছে শেষের লেখাগুলোয়, যখন তিনি নিয়ম করে ক্ষমতার অতিরিক্ত লিখে গেছেন। শেষকালে হয়ত এমন একটা পরিস্থিতি এসেছে যখন লেখার কদর আর আগের মত থাকেনি। ঠিক সেই সময়েই নতুন নতুন কিন্তু প্রতিভাবান কল্পবিজ্ঞান সাহিত্যিকরা নামতে থাকেন সাহিত্যের আসরে। এঁদের পুরোভাগে ছিলেন এইচ. জি. ওয়েলস্। এই কারণেই বোধ হয় শুধু 'বারজাক মিশন' কেন, ভের্ণের অন্যান্য অনেক রচনার প্রকাশক জোটেনি বৃটেনে।

প্রথম খণ্ডের প্রথম দিকেও চোখে পড়ে জরাকম্পিত জুল ভের্ণের

কলমের খোঁচা। অ্যামিয়েন্সের মিউনিসিপ্যাল গভর্নমেন্ট বিস্তর তিক্ত অভিজ্ঞতা সৃষ্টি করেছিল তাঁর মনে। এই অভিজ্ঞতাই ফুটে বেরিয়েছে দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের ফরাসী রাজনীতির শ্লেষাত্মক বর্ণনায়। এই বিদ্বেষ থেকেই হয়ত জন্ম নিয়েছে মঁসিয়ে পন্‌সিনের উদ্ভট চরিত্র, অর্থহীন কতকগুলো সংখ্যা নিয়ে যে স্রেফ হাত, সাফাইয়ের ভেল্‌কি দেখায়, বিজ্ঞানসাধক আর সাহিত্যসাধকের চোখে যে পরম বিদ্রুপের পাত্র। পক্ষান্তরে, আদর্শ ফরাসী অফিসার কি রকমটি হওয়া উচিত, কর্তব্যকঠিন হয়েও কিভাবে কৃষ্টিবান এবং মানব দরদী থাকা যায়, তা ভের্ন মনের সুখে ফুটিয়ে তুলেছেন ক্যাপ্টেন মার্সেনের চরিত্রে।

প্রথম পরিচ্ছেদের সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কে যা ঘটেছে, তার জের চলেছে কিন্তু কাহিনীর শেষ পর্যন্ত। বারজাক মিশন পদে পদে যে রহস্যময় শক্তির অস্তিত্ব টের পেয়েছে, তা ফাঁস হয়ে গিয়েছে শেষের দিকে। এমনি অনেক নিবিড় রহস্যের জট ছড়ানো হয়েছে ভের্নের তুলনাহীন এই উপন্যাসের দ্বিতীয় খণ্ডে। সেই সঙ্গে ব্যাখ্যা করা হয়েছে কেন প্রতিপদে বিচিত্র কাণ্ডকারখানার সম্মুখীন হতে হয়েছে বারজাক মিশনকে, কেন একটা ঘর ঘর ধ্বনি ভেসে এসেছে আকাশ থেকে, ইত্যাদি, ইত্যাদি। দ্বিতীয় খণ্ডটি পৃথক আকারে 'সিটি ইন দ্য সাহারা' এই নামে প্রকাশিত হচ্ছে এই সিরিজে। বাংলায় এই খণ্ডটির অনুবাদ সম্ভব হল শ্রী সত্যজিৎ রায়ের সহযোগিতায়। ইংরেজী বইটি তাঁর লাইব্রেরী থেকেই নেওয়া।

ইংরেজী থেকেই বাংলা অনুবাদ করা হল 'বারজাক মিশন' উপন্যাসের। ইংরেজদের সুবিধে হবে বলে ইংরেজ অনুবাদক ফরাসী থেকে ইংরেজীতে তর্জমার সময়ে একটু আধটু পরিবর্তন করেছিলেন। যেমন, মাপজোপগুলো মেট্রিক পদ্ধতিতে না দেখিয়ে বৃটিশ পদ্ধতিতে লেখা হয়েছে। বাংলাতেও তাই রইল, আর পালটানো হল না। ইংরেজ অনুবাদক আরও কিছু পরিবর্তন করেছিলেন। ভুল বোঝাবুঝি যাতে না হয় এবং যাতে আসল লোকদের আঁতে ঘা না লাগে, তাই কয়েকটি চরিত্রের নাম একেবারেই পালটে দিয়েছেন। ভের্নের সব অনুবাদকই যা করেছেন, বর্তমান অনুবাদকও তা করতে বাধ্য হয়েছেন, কিছু কিছু অংশ ছোট করতে হয়েছে বা বাদ দিতে হয়েছে কাহিনীর গতি বাড়ানোর জন্যে। অ. ব.

১ ॥ সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের বিচিত্র ব্যাপার

সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের দুঃসাহসিক ডাকাতির ঘটনা নিশ্চয় এখনো কেউ ভোলেন নি। 'সেন্ট্রালব্যাঙ্কের বিচিত্র ব্যাপার', এই শিরোনাম দিয়ে পিলে চমকানো খবরটা ছাপা হয়েছিল সবকটা দৈনিকের প্রথম পৃষ্ঠায়। ঘটনাটা ঘটেছিল এই শতাব্দীর প্রথম দিকে, কিন্তু শুনতে ভালো লাগে এখনো। এত বুকের পাটা, এত রহস্য বড একটা দেখা যায় না।

স্টক এক্সচেঞ্জের কাছে থ্রেডনীড্‌ল্ স্ট্রীটের কোণে সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের ডিকে ব্রাঞ্চ। ম্যানেজার ছিলেন লর্ড ব্লেজনের ছেলে, লুই রবার্ট ব্লেজন। ডাকাতি হয় এই ব্রাঞ্চেই।

ঘরটা বিরাট। ওক কাঠের কাউন্টার দিয়ে ভাগ করা। কাঁচের দরজা দিয়ে ঢুকেই বাঁদিকে মজবুত লোহার গরাদ দিয়ে ঘেরা স্ট্রংরুম। ম্যানেজারের ঘর পেছনে। তারপর একটা গলিপথ। পথের শেষ হয়েছে বড় হলঘরে, সেখান থেকে বেরিয়ে যাওয়া যায় থ্রেডনীড্‌ল্ স্ট্রীটে। মূল সিঁড়ির গোড়ায় আর একটা ডবল কাঁচের দরজা। এখান দিয়েও হলঘরে আসা যায়।

পাঁচটা বাজতে বিশ মিনিট বাকী। ব্রাঞ্চের পাঁচজন কর্মচারীর দুজন লিখছে, তিনজন মক্কেলদের কথা শুনছে। ক্যাশিয়ার টাকা গুনছে। মোট ৭২,০৭৯ পাউণ্ড ২ শিলিং ৪ পেন্স জমা পড়েছে ব্যাঙ্কে।

আর কুড়ি মিনিট পরেই ব্যাঙ্ক বন্ধ হয়ে যাবে। স্টীল শাটার নামানো হবে। কাঁচের দরজায় নভেম্বরের গোধূলির আভা দেখা যাচ্ছে, শোনা যাচ্ছে রাস্তা থেকে ভেসে আসা যানবাহনের শব্দ।

আচমকা খুলে গেল দরজা, ভেতরে এল একটি পুরুষ মূর্তি। চকিত চোখে চারদিক দেখে নিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে ডানহাত উপরে তুলল, তিন আঙুল তুলে সংকেত করল, 'তিন'। অর্থাৎ, কাউন্টারে হাজির রয়েছে তিনজন ক্লার্ক। ডান হাতটা আধখোলা দরজার পাল্লার আড়াল থাকায় ক্লার্করা কেউ দেখতে পেল না আঙুলের নিশানা। দেখতে পেলেও মানে বুঝতে পারত কিনা সন্দেহ।

হাত নামিয়ে নিয়ে দরজা বন্ধ করে মক্কেলদের পেছনে দাঁড়াল আগন্তুক। যেন সবার কথা শেষ হলে নিজের কথা বলবে।

অদ্ভুত দেখতে লোকটাকে। লম্বা, মজবুত গড়ন। সংকল্প কঠিন চোখ

মুখ। রোদে জ্বলা মুখে হাল্কা রঙের দাড়ি মানিয়েছে ভাল। সিল্কের লম্বা ডাস্টকোটে ঢাকা গলা থেকে পা পর্যন্ত।

সামনের মক্কেলকে বিদেয় করে আগন্তুকের পানে তাকায় ক্লার্ক। দরজা খুলে বেরিয়ে যায় মক্কেল। সঙ্গে সঙ্গে ঘরে ঢোকে আর একটি মূর্তি। প্রথম আগন্তুকের মতই দেখতে। গায়ে সিল্কের লম্বা ডাস্টকোট। তাম্র। কঠিন মুখের আধখানা ঢাকা দাড়িতে। সোজা গিয়ে দাঁড়াল একজন মক্কেলের পেছনে। সে বিদেয় হতেই কথা দিয়ে ব্যস্ত রাখল ক্লার্ককে। মক্কেল বেরিয়ে যেতেই ঢুকল আরেক জন লম্বা কোটধারী দাড়িওলা। এ লোকটা বেঁটে, রীতিমত গাঁট্টাগোট্টা, দাড়ির রঙ কালো।

কথা শেষ করে তৃতীয় মক্কেল বেরিয়ে যেতেই ঘরে ঢুকলো এবার দুজন পুরুষ। দুজনেরই গায়ে লম্বা আলস্টার অর্থাৎ লম্বা ধূসর ওভারকোট। অথচ বছরের এ সময়ে আলস্টার পরার কোনো মানে হয় না। দুজনেরই ব্রোঞ্জ-কঠিন মুখ দাড়ির জঙ্গলে ঢাকা।

অদ্ভুত কায়দায় ঘরে ঢুকলো এই দুজন। হারকিউলিসের মত লম্বা পালোয়ানের মত যার চেহারা, সে দাঁড়াতেই পেছনের লোকটি এমন ভান করল যেন হাতলে জামা আটকে গেছে বলে ছাড়িয়ে নিচ্ছে। মুহূর্তের জন্যে থমকে দাঁড়িয়ে জামা ছাড়িয়ে নেওয়ার অছিলায় যা করবার করে নিল। পরক্ষণেই বন্ধ হয়ে গেল পাল্লা। কিন্তু ঐটুকু সময়ের মধ্যেই হাওয়া হয়ে গেল দরজার বাইরের হাতল। অর্থাৎ, বাইরে থেকে আর ভেতরে আসা যাবে না। দরজায় কেউ টোকাও মারবে না, কেননা পাঁচটায় ব্যাঙ্ক বন্ধ হওয়ার বিজ্ঞপ্তি ঝুলছে পাল্লায়।

ছিন্ন হয়ে গেল বাইরের সঙ্গে সম্পর্ক। জানতেও পারল না ক্লার্করা। পারলেও মুচকি হাসত নিশ্চয়। শহরের বুকের ওপর বসে খামোকা ভয় পেতে যাবে কেন?

নবাগতদের সঙ্গে কথা বলে বিদেয় করার জন্যে এগিয়ে এল বাকী দুজন ক্লার্ক। কিন্তু লম্বা লোকটা দেখা করতে চাইল খোদ ম্যানেজারের সঙ্গে।

একজন ক্লার্ক ম্যানেজারকে জিজ্ঞেস করে এসে কাউন্টারের কাঠের ডালা তুলে ভেতরে ঢুকিয়ে নিল লম্বা আগন্তুককে, ফিরে গেল নিজের জায়গায়।

ব্রাঞ্চ-ম্যানেজারের সঙ্গে আগন্তুকের দেখা হওয়ার পর কি ঘটেছিল আজও তা রহস্য জনক। কেউ জানেনা। আঁচ করতেও পারেননি।

ঠিক দু'মিনিটের মাথায় দরজা খুলে লম্বা আগন্তুক বেরিয়ে এসে বলেছিল, "ক্যাশিয়ারকে ডাকছেন ম্যানেজার।"

একজন কেরাণী হেঁকে বলেছিল, "মিস্টার স্টোর চীফ ডাকছেন।"

"যাই।" বলে একটা ব্রীফকেস আর লেবেল লাগানো তিনটে প্যাকেটের মধ্যে সারাদিনের আদায় স্ট্রংরুমে ঢুকিয়ে রেখে ভারী পাল্লা বন্ধ করে গরাদঘরের বাইরে এল ক্যাশিয়ার। চৌকাঠে চুপ করে দাঁড়িয়েছিল আগন্তুক। পথ ছেড়ে দিল ক্যাশিয়ারকে, পেছন পেছন গেল ভেতরে।

ঘরে ঢুকে থ হয়ে দাঁড়িয়ে গেল স্টোর। ম্যানেজার কই? ঘর তো ফাঁকা। রহস্য নিয়ে ভাববার সময়ও আর পাওয়া গেল না। লোহার সাঁড়াশির মত আঙুল গলায় চেপে বসল পেছন থেকে। এতটুকু আওয়াজ বেরোলো না গলা থেকে। জ্ঞান হারালো ক্যাশিয়ার। মুখের মধ্যে ন্যাকড়ার দলা ঠেসে দিয়ে চক্ষের নিমেষে হাত-পা বেঁধে ফেলল লম্বা আগন্তুক।

বাইরের পাঁচজন ক্লার্ক জানতেও পারল না কি ঘটে গেল ম্যানেজারের ঘরে।

দরজা ফাঁক করে খুক-খুক করে কেশে নিশানা করল আগন্তুক, চার সঙ্গীকে জানাল, কাম ফতে। পরক্ষণেই সশব্দে দরজা খুলে বেরিয়ে এল বাইরে। এটাও একটা সংকেত। সঙ্গে সঙ্গে চার স্যাঙাত চার রকম কায়দায় ঝাঁপিয়ে পড়ল চারজন ক্লার্কের ওপর। তিরিশ সেকেণ্ডের মধ্যে জ্ঞান হারালো চারজন। মুখে তুলো ঠেসে ইস্পাতের সরু তার দিয়ে কষে বেঁধে ফেলা হল প্রত্যেককে।

ম্যানেজারের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে লম্বা আগন্তুক চুপ করে দাঁড়িয়ে দেখল সেই দৃশ্য। এবার বললে, "শাটার নামাও।"

তিনজনে দৌড়ে গিয়ে ঝন ঝনাৎ শব্দে শাটার নামাচ্ছে, এমন সময়ে বেজে উঠল টেলিফোন।

"থামো!" গলা তো নয়, যেন বজ্রনাদ।

শাটার আটকে রইল মাঝ পথে। এগিয়ে গিয়ে রিসিভার তুলল সর্দার।

"হ্যালো!"

"বলুন।"

"কে, ব্রেজন নাকি?"

"হ্যাঁ।"

"গলা চিনতে পারছি না কেন?"

"লাইনটা খারাপ আছে বলে।"

"এদিকে তো খারাপ নেই।"

"এদিকে আছে। আপনার গলাও তো চিনতে পারছি না।"

"আমি মিস্টার লিওনার্ড।"

"এবার চিনেছি।"

"ভ্যান পৌঁছেছে?"

"না।"

"এলেই 'এস' ব্রাঞ্চে পাঠিয়ে দিও। এইমাত্র ফোন করেছিল। একটা মোটা টাকা জমা পড়েছে।"

"কত?"

"বিশ হাজার পাউণ্ড।"

"ঠিক আছে, পাঠিয়ে দেব।"

"গুডনাইট. রেজন।"

"গুডনাইট।"

রিসিভার নামিয়ে রেখে নিথর দেহে কি যেন ভেবে নিল সর্দার। মনস্থির হয়ে গেল মুহূর্তের মধ্যে। নিজের ধড়াচূড়া খুলতে খুলতে স্যাঙাত-দের হুকুম দিলে. "নিয়ে এস ক্যাশিয়ারের জামাকাপড়।"

সেকেণ্ড কয়েকের মধ্যেই ক্যাশিয়ারের পোশাক পরে নিল সর্দার। একটু টাইট হলেও বেমানান হল না। পকেট থেকে চাবি বার করে খোলা হল ক্যাশিয়ারের গরাদঘর, তারপর স্ট্রংরুম। এক বাণ্ডিল হুণ্ডি, প্যাকেট তিনটে আর ব্রীফকেসটা টেনে আনা হল বাইরে।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ফুটপাত ঘেঁসে গাড়ী দাঁড়ানোর শব্দ শোনা গেল, নক্ করার আওয়াজ হল শাটার দিয়ে আধখানা ঢাকা দরজার কাঠের প্যানেলে।

চাপা গলায় সর্দার বললে. "ডাস্টকোট খুলে ফ্যালো। ওরা যেন ভেতরের পোশাকটাই ভাখে। যে ঢুকবে. তাকেই শুইয়ে দেবে, কেউ না ফসকায়।"

বলেই হুণ্ডি আর ব্রীফকেস নিয়ে দরজা খুলে বেরিয়ে গেল ডাকাত সর্দার। বাইরের যানবাহনের আওয়াজ আছড়ে পড়ল ঘরের মধ্যে। ঐটুকু সময়ের মধ্যেই অজ্ঞান ক্লার্ক তিনজনকে কাউন্টারের তলায় ঢুকিয়ে দিয়ে

তাদের জায়গায় এসে দাঁড়াল তিন ব্যাঙ্ক-ডাকাত। ডাস্ট-কোটও খুলে ফেলল গা থেকে। একজন ওৎ পেতে রইল দরজার পাশে।

ফুটপাত ঘেঁসে দাঁড়িয়ে ব্যাঙ্কের ডেলিভারী ভ্যান। অন্ধকারে টিমটিম করে বাতি জ্বলছে। কোচোয়ান নিজের সিটে বসে। রাস্তায় দাঁড়িয়ে বোধ হয় ব্যাঙ্কের ক্যাশিয়ার। একটু আগে টোকা মেরে গেছে দরজায়। এখন গল্প করছে কোচোয়ানের সঙ্গে।

চলমান জনপ্রবাহের ভেতর দিয়ে ধীরে সুস্থে গাড়ীর পাশে গিয়ে দাঁড়াল লম্বা লোকটা।

"গুড ইভনিং।"

"গুড ইভনিং," বলেই চমকে উঠল কোচোয়ান, "স্টোর কই ?"

"ছুটিতে আছে। টাকার থলিটা নিয়ে আসবে ?" শেষ কথাটা বলা হল ফুটপাতে দাঁড়িয়ে থাকা ক্যাশিয়ারকে।

"কিন্তু গাড়ী ছেড়ে যাওয়ার তো হুকুম নেই আমার ওপর।"

"কতক্ষণ আর লাগবে ? আমি দাঁড়াচ্ছি তোমার জায়গায়। এগুলো রাখছি। তুমি গিয়ে নিয়ে এস।"

কথা না বাড়িয়ে পা বাড়াল ক্যাশিয়ার। উধাও হল ব্যাঙ্কের ভেতর।

কোচোয়ানকে বললে লম্বা পুরুষ, "খোলো এবার।"

"হ্যাঁ ; খুলি।"

ডেলিভারী ভ্যানে ঢোকবার পথ থাকে কোচোয়ানের সিটের পেছনে, ভ্যানের পেছনে নয়, পাশে নয়। ধাতুর চাদর দিয়ে তৈরী কপাট। ডাকাতির সম্ভাবনা যদ্দুর সম্ভব কমিয়ে আনার ব্যবস্থা। কোচোয়ান যে জায়গায় বসে, সেই আসন কপাটের মত অর্ধেক তুলে তবে ভ্যানের ভেতরে ঢুকতে হয়, এমনিতে ঢোকা যায় না। কিন্তু সামান্য কয়েকটা প্যাকেট গাড়ীর গায়ের খুপরিতে রাখার জন্যে কষ্ট করে ভেতরে ঢুকতে গেল না কোচোয়ান। সিটে বসেই হেঁট হয়ে ইস্পাতের ডালাটা পাশে সরিয়ে দিয়ে ব্রীফকেসটা নিল হাতে। পা দুটো শুধু বাইরে রেখে কোমর থেকে বাকী শরীরটাকে বেঁকিয়ে ঢুকিয়ে দিল গাড়ীর গহ্বরে ব্রীফকেস রাখবার জন্যে। টুক করে কোচোয়ানের পাশে উঠে এল লম্বা পুরুষ। ভেতরের দৃশ্য দেখবার কৌতূহল নিয়েই যেন ঝুঁকে উঁকি দিল গাড়ীর গহ্বরে এবং পরমুহূর্তেই বলিষ্ঠ দুটো হাত পলকের জন্যে ছিটকে গেল ভেতর দিকে।

রাস্তার কেউ যদি তখন গাড়ীর দিকে পলকের জন্যে তাকাত, দেখতে

পেত কোচোয়ানের বেরিয়ে থাকা পা দুটো আচম্বিতে শক্ত কাঠ হয়ে গেল যেন, পরমুহূর্তেই নেতিয়ে পড়ল। কোমর থেকে ওপরের দেহাংশও একইভাবে নেতিয়ে পড়ল সিটের নিচে।

বেল্ট খামচে ধরল লম্বা পুরুষ। শিথিল দেহটা ঠেলে নামিয়ে দিল গাড়ীর গর্ভে, ব্যাগ আর প্যাকেটের পাশে।

মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যেই রাস্তার ওপরেই ঘটল এই কাণ্ড। পথচারী-দের চোখের সামনে। চোখ মেলে কেউ কিন্তু দেখল না।

দেখল শুধু লম্বা পুরুষ। গাড়ীর ভেতরকার অন্ধকারে চোখ সয়ে যাওয়ার পর দেখল সেই নৃশংস দৃশ্য। মেঝের ওপর মুখ থুবড়ে পড়ে কোচোয়ানের প্রাণহীণ দেহ। রক্তের বন্যা বইছে যেন। মাথার ঠিক নিচে গেঁথে আছে একটা ছোরা।

ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরুচ্ছে দেখে প্রমাদ গুণল ডাকাত সর্দার। রক্ত রাস্তায় পডতে পারে এখুনি। নেমে পডল গাড়ীর মধ্যে। কোচোয়ানের কোট খুলল। ক্ষতস্থানে চেপে ধরল। হাত মুছল। ছুরি মুছল। উঠে এল বাইরে। চারদিক দেখে নিয়ে রাস্তায় নামল। ব্যাঙ্কের দরজায় গিয়ে বিশেষ কায়দায় টোকা মারতেই খুলে গেল পাল্লা।

ভেতরে ঢুকে জিজ্ঞেস করল, "কোথায় ?"

কাউন্টারের দিকে দেখিয়ে বললে একজন, 'একসঙ্গে আছে।' মানে, সব্বাইকেই হাত পা বেঁধে ফেলে রাখা হয়েছে।

"ফাইন। জামা প্যান্ট খুলে নাও।"

বলতে বলতে স্টোরের পোশাক নিজের গা থেকে খুলে ফেলল ডাকাত সর্দার। পরল নতুন ক্যাশিয়ারের পোশাক। দুজন স্যাঙাতকে ভেতরে রেখে বাকী দুজনকে নিয়ে এল রাস্তায়। উঠল গাড়ীর ওপরে। নিজে ঢুকল গাডীর মধ্যে। হাতে হাতে চালান করে দিল যা কিছু ছিল ভেতরে। স্যাঙাত দুজন নিয়ে গেল ভেতরে। রাস্তার লোকজন শুধু দেখল ব্যাঙ্কের গাডী থেকে ব্যাঙ্কের ভেতরেই টাকার থলি যাচ্ছে। তাই কেউ মাথা ঘামাল না।

গাডী খালি হয়ে গেল। ব্যাঙ্কের ভেতরে একদিকে জমা হল দলিল দস্তাবেজের স্তূপ, আর একদিকে টাকা, সোনা, রুপো। সমান পাঁচ ভাগে টাকা ভাগ করা হল। পাঁচজন বেঁধে নিল বুকের সঙ্গে। দলিলে হাত দিল না।

লম্বা পুরুষ বলল, "কি করতে হবে, আগেই বলেছি। আবার বলছি। সোনারুপো গাড়ীতে তুলে দিয়ে ফিরে আসবে। প্রত্যেকটা শাটার বন্ধ করবে। পেছনের করিডর দিয়ে বেরোবে বড় হলঘরে। দরজায় ডবল তালা দেবে। চাবি ড্রেনে ফেলে দেবে। ম্যানেজারের কথাটা যেন মনে থাকে।"

"মনে আছে।"

"ও হ্যাঁ। ব্রাঞ্চ অফিসের ঠিকানাটা ?"

কাঁচের দরজার একদিকে সাঁটা হলদে কাগজে সব কটা ব্রাঞ্চের ঠিকানা লেখাছিল। একজন অনুচর দেখালো সর্দারকে। সর্দার 'এস' ব্রাঞ্চের ঠিকানাটা মুখস্ত করে নিল।

বলল, "ডাস্টকোটগুলো ফেলে যেও, সবার চোখে পড়ে যেন। নাও, হাত লাগাও।"

সোনা আর রুপো নিয়ে রাখা হল গাড়ীর মধ্যে, সেই সঙ্গে সর্দারের পোশাক। ফিরে গেল চার জনে ব্যাঙ্কের মধ্যে। বন্ধ হল পাল্লা। শোনা গেল শাটার টেনে নামানোর ঝন ঝনাৎ শব্দ।

লাগাম হাতে ছদ্মবেশী কোচোয়ান গাড়ী হাঁকিয়ে সোজা এল 'এস' ব্রাঞ্চের সামনে। বেপরোয়া ভাবে ঢুকল ভেতরে। দাঁড়াল টাকা যেখানে গোনা হচ্ছে, সেইখানে।

"দিন কি দেবেন।"

চোখ তুলেই চমকে উঠল ক্যাশিয়ার, "কিন্তু আপনি তো বড়ুক নন।"

"দেখতেই পাচ্ছেন।"

আপন মনে গজগজ করে ওঠে ক্যাশিয়ার, "মাথা খারাপ হয়েছে নাকি কর্তাদের ? যাদের চিনি না তাদের পাঠায় কেন ?"

"পাঠিয়েছেন দরকার হয়েছে বলে। আমি 'বি' ব্রাঞ্চ থেকে আসছি সেন্ট্রাল অফিস থেকে টেলিফোন পেলাম, মোটা টাকা জমা পড়েছে নিয়ে যেতে হবে।"

"টাকা জমা পড়েছে ঠিকই, কিন্তু আপনাকে যে চিনতে পারছিনা।"

"চেনাচেনির দরকারটা কি ?"

"আইডেনটিটি কার্ড আছে ?"

সনাক্তকরণের কাগজ দিতে হবে শুনলে ঘাবড়ে যায় সব ডাকাতই। থতমত খেল লম্বা পুরুষও। কিন্তু নির্বিকার রইল মুখচ্ছবি।

বলল, "আছে বইকি।" বসল বেঞ্চিতে। হাত দিল পকেটে। আসলে তখন ভাবছে কি ভাবে পরিত্রাণ পাওয়া যায় এই বিপদ থেকে। সনাক্তকরণের কাগজ কি রকম হবে, তা তার জানা নেই। কিন্তু একটুও বিচলিতভাব দেখালো না বাইরে। পকেটের সব কাগজ টেনে বার করল। একটা একটা করে দেখল। পাওয়া গেল একটা আইডেনটিটি কার্ড। বড্রুক নামধারী চীফ ক্যাশিয়ারকে টাকা লেনদেন করার ক্ষমতা দিয়েছে চীফ ক্যাশিয়ার। কিন্তু এ-কার্ড দেখালেই সর্বনাশ! বড্রুকের নাম রয়েছে কার্ডে। আড়চোখে দেখল অন্যদিকে তাকিয়ে রয়েছে ক্যাশিয়ার। ছিঁড়ে দু টুকরো করল কাগজখানা। যে টুকরোয় বড্রুকের নাম, সেটা রেখে অন্য টুকরোটা বাড়িয়ে দিল ক্যাশিয়ারের দিকে।

বলল বিষম বিরক্তির সুরে, "আরে গেল যা! এযে দেখছি আধখানা রয়েছে! বাকী আধখানা কোথায় যে ফেলেছি!"

"আধখানা!"

"পকেটে পকেটে ঘোরে তো। অন্য কাগজের সঙ্গে কখন জানিনা আধখানা উধাও হয়েছে। মহা মুস্কিলে পড়লাম দেখছি।" উঠে দাঁড়িয়ে "ঠিক আছে। চললাম। আপনি হেড অফিসের সঙ্গে বোঝাপড়া করে নেবেন। আমার কর্তব্য আমি করে গেলাম।"

এই এক চালেই বাজিমাৎ হয়ে গেল। পীড়াপীড়ির ধার দিয়েও গেল না ডাকাত সর্দার। পেছন থেকে ডাক দিল ক্যাশিয়ার, "কই, দেখি আইডেনটিটি।"

"এই তো।"

"চীফ সই করেছেন দেখছি। ঠিক আছে। নিন টাকা।" টাকার প্যাকেট বাড়িয়ে দিয়ে, "রসিদে সই দিয়ে যান।"

সন্দেহ করায় যেন মেজাজ খিঁচড়ে গেছে, এমন ভঙ্গিমায় এলোমেলো সই টেনে দিয়ে প্যাকেট নিয়ে হন হন করে বেরিয়ে গেল লম্বা পুরুষ। গাড়ী নিয়ে ছিপটি হাঁকিয়ে নক্ষত্রবেগে মিলিয়ে গেল রাতের অন্ধকারে।

সাঙ্গ হল দুঃসাহসিক ব্যাঙ্ক ডাকাতি। পরের দিন সাড়া পড়ে গেল সারা ইংল্যাণ্ডে। সবাই জানেন, একটা কেবল খুঁত রয়ে গিয়েছিল আশ্চর্য এই পরিকল্পনায়।

ডাকাতরা ধরে নিয়েছিল পরের দিন সকালে ঝাড়ুদার এসে হাত পা বাঁধা কেরাণীদের দেখতে পাবে এবং ব্যাঙ্ক ডাকাতির খবরটা তখনই জানাজানি হবে।

কিন্তু হয়েছিল তার আগেই। সেই রাতেই ঠিক সাড়ে সাতটায় হাইড পার্কের পাশের সরু গলিতে অন্ধকারে ব্যাঙ্কের গাড়ী দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে খটকা লাগে ব্যাংকেরই এক কর্মচারীর। ভেতরে দেখে কোচোয়ানের রক্তাক্ত দেহ।

পুলিশ এল। ডিকে ব্রাঞ্চের তালা ভেঙে ঢুকল। কেরাণীদের মুখে শুনল, আলস্টার আর ডাস্টকোট পরা দাড়িওলা পাঁচটা লোক এসেছিল পাঁচটা নাগাদ। একজন গেছিল ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করতে। তারপর ক্যাশিয়ার গিয়ে ম্যানেজারকে দেখতে পায়নি।

ম্যানেজার তাহলে গেলেন কোথায়? ডাকাতদের সঙ্গে সঙ্গেই কি তিনি উধাও হলেন?

কেয়ারটেকারকে জেরা করা হল। সে বললে, কত লোক যাতায়াত করে পেছনের সিঁড়ি দিয়ে, সবার চেহারা কি মনে রাখা যায়? পাঁচটার পর জনাচারেক লোক বেরিয়ে গিয়েছিল ঠিকই, কিন্তু তাদের ব্যাঙ্কের লোক বলেই মনে হয়েছে। তারও অনেক পরে, পুলিশ আসবার একটু আগে, সাড়ে সাতটা নাগাদ এক বস্তা কয়লা নিয়ে একটা কুলি এসেছিল। পাঁচতলায় গিয়ে ফের নেমে এসেছিল, ঠিকানা নাকি ভুল হয়েছিল। বস্তাভর্তি কয়লা নিয়েই ফের চলে গিয়েছিল বটে, কিন্তু সিঁড়ির গোড়ায় পরে একডাঁই কয়লা চোখে পড়েছিল কেয়ারটেকারের। পাঁচতলার এক বাসিন্দা বলেছিল, কয়লাওলা খালি হাতে এসেছিল একটা ভুল নাম নিয়ে তার কাছে। গজগজ করতে করতে নেমে যায় নিচে। বস্তা নিশ্চয় নিচে রেখে এসেছিল ঠিকানা যাচাই করবে বলে।

পুলিশ বেশ বুঝল, ম্যানেজারের আঁতাত আছে পাঁচ ডাকাতের সঙ্গে। তারা বাইরে থেকে এসেছে, কিন্তু ডাকাতি হয়ে যাওয়ার পর ম্যানেজারও উধাও হয়েছেন। ক্যাশিয়ার পর্যন্ত আর তাঁকে দেখেনি ডাকাতরা আসবার পর।

সুতরাং হুলিয়া বেরিয়ে গেল ম্যানেজারের নামে। সবকটা বন্দরে খবর চলে গেল। এত তাড়াতাড়ি নিশ্চয় ইংল্যাণ্ড ছেড়ে চম্পট দিতে পারেন নি ব্লেজন। ধরা তিনি পড়বেনই।

কাজ শেষ করে খুশী মনে ঘুমোতে গেল পুলিশ।

আর, সেই রাতেই দুটোর সময়ে লণ্ডন থেকে ট্রেনে করে সাদামটনে এসে নামল পাঁচটা লোক। কারও গাল কামানো, কারও নাকের নিচে মোটা গোঁফ। বেশ কিছু প্যাকেট আর একটা বেজায় ভারী ট্রাঙ্ক গার্ডের কামরা থেকে নামিয়ে তোলা হল স্টীমারে। সারাদিন ধরে মালপত্র তোলা হয়েছে এই স্টীমারে। যাবে দাহামের কোটানৌতে। তাই কারো সন্দেহ হয়নি। ভোর রাতে জোয়ার আসতেই স্টীমার ভেসে গেল বারদরিয়ায়।

ঠিক তখনি তদন্ত শেষ করে লণ্ডনের পুলিশ ঘুমোতে গেল সুখশয্যায়।

পরের দিন যখন নতুন উদ্যমে ডাকাত ধরার আয়োজন আরম্ভ হল, তখন স্টীমার চলে এসেছে ইংল্যাণ্ড থেকে অনেক দূরে। ভারী ট্রাঙ্কটা রাখা হয়েছে পাঁচজনের মধ্যে সবচেয়ে যে বেশী বলবান, তার কেবিনে।

পুলিশ কিন্তু হালে পায়নি। ব্লেজন ধরা পড়েন নি। ডাকাতরা যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেছিল। কয়লাওলার রহস্যও শেষ পর্যন্ত রহস্যই থেকে গিয়েছিল। অনেক রহস্যের শেষ পর্যন্ত কিনারা হয় না, এই রহস্যকেও তাই শেষ পর্যন্ত শিকেয় তুলে রাখল লণ্ডন পুলিশ।

আশ্চর্য এই প্রহেলিকার ওপর থেকে যবনিকা তোলা হচ্ছে পরের কাহিনীতে। দেখা যাক অসম্ভব, অদ্ভুত, অত্যাশ্চর্য আর কোনো কাহিনী সম্ভব কিনা তিমিরাবৃত এই রহস্যের পর।

২ ॥ তদন্ত অভিযান

কোনাক্রি অঞ্চলটা তখন নিতান্তই একটা গ্রাম, যদিও ফ্রেঞ্চগিনির রাজধানী আর গভর্ণর জেনারেলের থাকার জায়গা।

২৭শে নভেম্বর। উৎসবের জন্যে প্রস্তুত হয়েছে গ্রামটা। গভর্ণরের নির্বন্ধ এড়োতে না পেরে গাঁশুদ্ধ লোক গিয়েছে সমুদ্রের ধারে। জনাকয়েক দারুণ মান্যগণ্য পর্যটক নাকি সবে জাহাজ থেকে নেমেছেন সেখানে।

মান্যগণ্য তো বটেই। সংখ্যায় তাঁরা সাতজন। ফরাসী সুদানে নাইজার বেণ্ড বলে একটা জায়গা আছে। এইখানে তদন্ত অভিযানে বেরিয়েছেন এঁরা। পাঠিয়েছে ফ্রান্সের কেন্দ্রীয় প্রশাসন দপ্তর। তাদের

নির্দেশেই গঠিত এক্সট্রা-পার্লামেন্টারী কমিশনের উচ্চপদস্থ সদস্য অফিসার এঁরা। কাউন্সিল প্রেসিডেন্ট এবং কলোনী মিনিস্টার স্বইচ্ছায় এঁদের পাঠিয়েছেন বললে ভুল বলা হবে। অথবা বাগযুদ্ধ বন্ধ করার জন্যেই বিবাদ-নিষ্পত্তি সংস্থা থেকে জোর করা হয়েছে তাঁদের ওপর।

মাস কয়েক আগেই আফ্রিকার এই বিশেষ অংশে অভিযান পাঠানো নিয়ে দু'দলে ভাগ হয়ে যায় বিবাদনিষ্পত্তি সংস্থা। দু'দলের দুই চাঁইয়ের মধ্যে সমঝোতার কোনো সম্ভাবনাই ছিল না কোনোদিন। এঁদের একজন রাজাক, অপরজন বদ্রিয়ার্স।

প্রথমজন মোটাসোটা, গোলগাল, একগাল কালো চাপ দাড়ি। গালভরা কথা বলতে ভালবাসেন, জমিয়ে বক্তৃতা দিতে পারেন, দিলখোলা, হাসিখুশী মানুষ।

দ্বিতীয়জন ঠিক উল্টো। মুখ শীর্ণ, শরীরটাও রোগাটে। দাড়ি নেই। কিন্তু পাতলা ঠোঁট ঢেকে ল্যাজঝোলার মত ইয়াব্বড় গোঁফ আছে। বড় উদ্ধত, গায়ের জোরে নিজের মত জাহির করেন। পয়লানম্বর নৈরাশ্যবাদী। বারজাক উদারপ্রকৃতির মানুষ, নিজেকে মেলে ধরতে চান। বদ্রিয়ার্স নিজেকে গুটিয়ে আনতে চান, পাটে পাটে ভাঁজ করে মহা কিপটের মত লোহার সিন্দুকের মধ্যে ভরে রাখতে চান।

উপনিবেশ সম্পর্কে বিবিধ ব্যাপারে দুজনের মধ্যে মতের অমিল চিরকালের। কেউ কারও সঙ্গে একমত হবেন না কখনোই। বারজাক যা বলবেন, ঠিক তার উল্টোটা বলে বসবেন বদ্রিয়ার্স। বক্তৃতায় বক্তৃতায় কাটাকুটি হয়ে যাওয়ার পর বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই বিবাদের নিষ্পত্তি করতে হয়েছে ভোট গ্রহণের মারফৎ।

বর্তমান ব্যাপারেও দুজনেই কেউই নতি স্বীকার করতে রাজী নন। বিবাদের শুরু বারজাক প্রস্তাবিত একটা আইন প্রণয়ন নিয়ে। সেনেগাল, গামবিয়া, গিনির উর্দ্ধাংশ এবং নাইজারের পশ্চিমে অবস্থিত ফরাসী সুদানের কিছু অংশে ভোট ব্যবস্থা চালু করে কালা আদমীদেরও প্রতিনিধি নির্বাচনের সুযোগ দেওয়া হোক, প্রস্তাব করেছিলেন বারজাক। যথারীতি তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ করেছেন বদ্রিয়ার্স। এবং দুই প্রতিপক্ষই পরস্পরকে লক্ষ্য করে নিক্ষেপ করেছেন চোখা চোখা যুক্তি।

একটা যুক্তি হল, নিগ্রোরা এখন যথেষ্ট সভ্য। সুতরাং তাদের জোর করে গোলাম বানিয়ে রেখে লাভ নেই। শাসকের সমান অধিকার তাদের

দেওয়া হোক। পটাপট হাততালি দিয়ে স্বাগতম জানানো হয়েছে বারজাকের এই যুক্তিকে।

বদ্রিয়ার্স তেড়ে উঠেছেন তৎক্ষণাৎ। বলেছেন, নিগ্রোরা এখনো হিংস্র, বর্বর। এ অবস্থায় তাদেরকে ভোটাধিকার দেওয়া আর রুগ্ন শিশুর সঙ্গে ওষুধ নিয়ে পরামর্শ করা একই নির্বুদ্ধিতা। তার চাইতে বরং আরও বেশী সৈন্য পাঠানো হোক ঐ সব অঞ্চলে। এ ধরনের বিপজ্জনক 'এক্সপেরিমেন্টে' হতে দেওয়া কখনই উচিত নয় সরকারের। ফরাসী রক্ত যে দেশ জয় করেছে, সে দেশ চিরকালই ফরাসীদের থাকবে, দেশাত্মবোধের গরম বক্তৃতা শুনে উন্মত্ত করতালিতে আবার যেন ফেটে চৌচির হয়ে গিয়েছে হলঘর।

মহাফাঁপড়ে পড়লেন উপনিবেশ দপ্তরের মন্ত্রীমশায়! দু'পক্ষের কথাতেই যুক্তি আছে। নাইজার বেণ্ডের নিগ্রোরা সত্যিই ফরাসী শাসনে অভ্যস্ত হয়ে এসেছে, লেখাপড়াও শিখছে, প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাও সেখানে দৃঢ়তর হচ্ছে। তা সত্ত্বেও গোলমালের খবর আসছে। গ্রামের পর গ্রামে লুঠতরাজ আর হাঙ্গামা চলছে। বাসিন্দারা পালাচ্ছে গাঁ ছেড়ে। কোথায় যেন একটা পরিবর্তন ঘটে চলেছে। এমন গুজবও শোনা যাচ্ছে নাকি একটা নির্দলীয় শক্তি মাথাচাড়া দিচ্ছে, আফ্রিকার অজ্ঞাত কোনো অঞ্চলে তারা ঘাঁটি গেড়ে বসেছে।

মন্ত্রীর কথায় দুই পক্ষই উল্লসিত হলেন এবং ফের তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন। হট্টগোলের মধ্যে গলা চড়িয়ে তখন একজন প্রতিনিধি বলে উঠলেন, "দুজনের কেউই যখন একমত নন, তখন গিয়ে দেখে আসুন না কি ব্যাপার!"

মন্ত্রী বললেন, ও অঞ্চলে এতবার যাওয়া হয়েছে যে নতুন করে দেখবার মত কিছু নেই। তবে চেম্বার যদি সিদ্ধান্ত নেয় তদন্ত অভিযানের যাওয়া দরকার, তাহলে তাই হোক। অভিযানের নেতা কে হবেন, সেটা সদস্যরাই ঠিক করে দিক।

গৃহীত হল প্রস্তাবটা। ঠিক হল মন্ত্রীমশায় একটা মিশন গঠন করে দেবেন। নাইজার বেণ্ডে গিয়ে মিশন দেখে আসবে সেখানকার অবস্থা। রিপোর্ট দেওয়ার পর চেম্বার ঠিক করবে কি করা উচিত।

মিশনের নেতা কে হবেন, এই নিয়ে লাগল ঝগড়া। ভোটাভুটির পর দেখা গেল, সমান সমান ভোট পেয়েছেন বারজাক এবং বদ্রিয়ার্স।

কিন্তু বিষয়টার নিষ্পত্তি হওয়ার দরকার তো।

মজা মন্দ নয় দেখে তো একজন রসিক চীৎকার করে বললেন, "দুজনকেই নেতা করলে কেমন হয়!"

প্রস্তাবটা তৎক্ষণাৎ পছন্দ হয়ে গেল সব সদস্যের। তার কারণও আছে। দুজনকেই নেতা বানিয়ে আফ্রিকায় পাঠিয়ে দিলে বেশ কয়েক মাস উপনিবেশ সংক্রান্ত চেঁচামেচি থেকে রেহাই পাওয়া যাবে। বারজাক এবং বদ্রিয়ার্স দুজনেই নির্বাচিত হলেন। চূড়ান্ত ক্ষমতা কার থাকবে, এই সমস্যার সমাধানও হয়ে গেল বয়েসের বিচারে। যেহেতু বদ্রিয়ার্সের চাইতে বারজাক তিন দিনের বড়, কাজেই সর্বময় অধিকর্তা হবেন তিনিই। মনে মনে প্রচণ্ড চটে গেলেও মুখ বুঁজে সহ্য করে যেতে হল বদ্রিয়ার্সকে, বারজাকের অধীনস্থ কর্মচারী হওয়া ছাড়া আর পথ রইল না।

এই দুই প্রবল ব্যক্তিত্বের সঙ্গে যুক্ত হলেন আরও কয়েকজন সদস্য, জৌলুষ কম থাকলেও গুণের দিক দিয়ে দুজনকেই টেক্কামারার মতন প্রত্যেকেই।

এঁদের একজন হলেন ডক্টর চাতোন্নে। নামকরা ডাক্তার। হাসিহাসি মুখ। মাথায় পাঁচ ফুট আট ইঞ্চি। বয়স পঞ্চান্নও নয়, অথচ মাথা ভর্তি ধবধবে সাদা কোঁকড়া চুল, সজারুর কাঁটার মত গোঁফজোড়াও হাঁসের পালকের মত সাদা। খাসা ভদ্রলোক বলতে যা বোঝায়, ইনি তাই। বুদ্ধিমান, লঘুচিত্ত এবং অষ্টপ্রহর হাস্যমুখর, হাসেন অবশ্য সোঁ-সোঁ শব্দ, ঠিক যেন বাষ্প বেরিয়ে যাচ্ছে মুখ দিয়ে।

মঁসিয়ে ইসিদোর তাসিন ভদ্রলোককেও দেখবার মত। ভৌগোলিক সমিতির সংবাদদাতা ইনি। নিজের বিষয় নিয়েই সদা-ধ্যানস্থ। নীরস প্রকৃতির প্রভুত্বব্যঞ্জক আকৃতি। মিশনের অন্য সদস্য পাঁচজনের ভীড়ে হারিয়ে যাওয়ার মত। অন্যান্য মন্ত্রী, দপ্তরের প্রতিনিধি এঁরা। মঁসিয়ে পাঁসিঁ, মঁসিয়ে কুইরঅ, মঁসিয়ে হেইরঅ, কেউই নজর কাড়ার মত নন।

এই সাতজন হলেন গিয়ে অফিসারের দল। অষ্টমজন একজন দৈনিক খবরের কাগজের রিপোর্টার। নাম, তাম্বিদি ফ্লোরেন্স। কর্তব্য, লা এক্সপ্যানসন ফ্রাসেঁ-কে নিয়মিত খবর পাঠানো।

আটজনের এই দলটি জাহাজ থেকে নামতেই গভর্ণরের তরফ থেকে সাদর অভ্যর্থনা জানানো হল তাঁদের। গভর্ণর নিজেই এলেন সঙ্গে মুখ্য সচিবরা। কেতাদুরস্ত ভাবে এমন সব গালভরা অভ্যর্থনা বাণী শোনানো হল যেন ওঁরা সমুদ্র থেকে নয়, আকাশ থেকে নেমে এসেছেন।

মিশনের পুরোধা হিসাবে সুললিত ভাষায় ধন্যবাদ জানালেন বারজাক। গালভরা শব্দেভরা বক্তৃতা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গভর্ণবের ইসারায় একযোগে হাততালি দিয়ে উঠলেন উপস্থিত জনতা।

এবার এগিয়ে এলেন বদ্রিয়ার্স। সেই রকমই ঠিক হয়েছিল মন্ত্রী-দপ্তরে। নিছক সহকারী নয়, সহযোগী নেতা হিসাবে থাকবেন বদ্রিয়ার্স। কথার জাদু দিয়ে ভুলিয়ে ছাড়বেন সবাইকে! সেইসঙ্গে কেউ আর কারো ওপর খবরদারিও করতে পারবেন না।

বদ্রিয়ার্সের তেজালো বক্তৃতা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ফের পটাপট শব্দে হাততালি দিয়ে আকাশ ফাটিয়ে দিল জনতা। তারপর অতিথিদের নিয়ে খাওয়া হল গভর্ণবের বাড়ীতে। এইখানেই তিনদিন থেকে অভিযান সূচি ঠিক করবেন এঁরা।

পথ কি কম! প্রস্তাবিত আইন দিয়ে যে অঞ্চলকে ভোটাধিকার দিতে চাইছেন বারজাক, তা আয়তনে ফ্রান্সের তিনগুণ, দশলক্ষ বর্গ মাইল! বিরাট এই জায়গার সর্বত্র যাওয়া সম্ভব নয়। প্রোগ্রাম যা হয়েছে, তাতে দেখা যাচ্ছে কিছু সদস্যকে দেড় হাজার মাইল এবং বাকী সদস্যকে আড়াই হাজার মাইল হাঁটতে হবে।

দু'দলে ভাগ হয়ে যাবে মিশন। নইলে তদন্ত সম্পূর্ণ হবে না। কোনাক্রি থেকে প্রথমে কানকান, সেখান থেকে কেনেডোগের সবচেয়ে বড় শহর সিকাস্সোতে।

এইখানেই, মানে সমুদ্র তীর থেকে সাড়ে সাতাশ মাইল যাওয়ার পর, দু'দলে ভাগ হয়ে যাবে মিশন। বদ্রিয়ার্সের নেতৃত্বে আধখানা যাবে দক্ষিণ দিকে আইভরি কোস্ট পর্যন্ত। বাকী আধখানা বারজাকের নেতৃত্বে পূবদিক বরাবর এগিয়ে সেগু-তে নাইজার নদীর পাড়ে পৌঁছে সেখান থেকে নদীর তীর ধরে গিয়ে পৌঁছাবে দাহোমে উপকূলে। অগাষ্ট নাগাদ গ্র্যাণ্ড-বাসাম পৌঁছাবেন বদ্রিয়ার্স, অক্টোবর নাগাদ কোটোনৌ পৌঁছাবেন বারজাক।

এতখানি পথ জঙ্গল ঠেঙিয়ে যাওয়া কি সোজা কথা! মঁসিয়ে ইসিদোর তাসিন কিন্তু আনন্দে নাচছেন। বহু গুরুত্বপূর্ণ ভৌগোলিক সংবাদ সংগ্রহ করবার সুযোগ পাবেন, এতদিন যা কেউ জানেনি, তিনি তা জানবেন। যদিও নাইজার বেণ্ডকে নতুন করে আবিষ্কার আর আমেরিকাকে নতুন করে আবিষ্কারের মধ্যে কোনো ফারাক নেই। সবই তো জানাচেনা হয়ে গিয়েছে। এই ভূমণ্ডলটাকে চক্কর দিতে কেউ কি আর বাকী রেখেছে। মঁসিয়ে তাসিন কিন্তু খুব একটা লোভী মানুষ নন। অল্পেই সন্তুষ্ট। যা পাওয়া যায়। তাই বা মন্দ কি।

এককালে অবশ্য অনেক রহস্য থমথম করত দুর্গম এই নাইজার বেণ্ডে এখন আর এ অঞ্চলকে কেউ বন্য অঞ্চল বলে না। ফ্রান্সের শাসন ব্যবস্থার সুফল ক্রমশঃ ছড়িয়ে পড়ছে সেখানে। সেপাইশান্ত্রী যথেষ্ট সংখ্যায় মোতায়েন থাকার ফলে নির্বিঘ্নেই বেড়িয়ে আসা যাবে। ঘটনা বা দুর্ঘটনা, কোনোটাই ঘটবে না।

যাত্রা শুরু হবে পয়লা ডিসেম্বর।

আগের দিন রাত্রে গভর্নমেণ্ট ভোজসভায় আপ্যায়ন করবেন অভি-যাত্রীদের। জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া হবে, সেইসঙ্গে গণতন্ত্রের জয়গান।

সেদিন কোনাক্রির রোদ্দুরে টোঁ-টোঁ করে বেদম হয়ে সবে ঘরে ফিরেছেন বারজাক, গা থেকে কালো কোটটা খুলতে যাচ্ছেন, এমন সময়ে আর্দালী এসে বললে দুজন দেখা করতে এসেছেন।

"কারা?" বারজাকের প্রশ্ন।

"অদ্ভুত একটা লোক, সঙ্গে একজন মহিলা।"

"কলোনীর কেউ?"

"চেহারা দেখে তাই মনে হয় বটে। লোকটা ঢ্যাঙা, নুড়ির ওপর ঘেসো জমি চিহ্নমাত্র নেই।"

"নুড়ি?"

"টাক, মাথায় টাক আছে লোকটার! পাটের দড়ির মত রঙীন গালপাট্টা, চোখজোড়া বল-হাতলের মত গোলগোল।"

"তোমার কল্পনার দৌড় তো দেখছি সাংঘাতিক! ভদ্রমহিলাকে দেখতে কিরকম?"

"ভদ্রমহিলা?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, ভদ্রমহিলা। কি রকম দেখতে তাঁকে? বয়স কম?"

"মোটামুটি।"

"সুশ্রী?"

"হ্যাঁ ফিট্‌ফাট!"

অন্যমনস্কভাবে গোঁফে তা দিয়ে নিলেন বারজাক।

"পাঠিয়ে দাও।"

বলে, অজ্ঞাতসারে আয়নায় দেখে নিলেন নিজের থলথলে চেহারাটা। ঠিক সেই সময়ে ঘড়িতে ঢং ঢং করে ছটা বাজল, কানে ঢুকল না। মাঝের দ্রাঘিমার সময়টুকু বাদ দিলে কিন্তু ঠিক ঐ সময়েই লুঠ হয়ে গেল সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক।

ঘরে ঢুকলেন বছর চল্লিশ বয়েসের এক ভদ্রলোক, সঙ্গে কুড়ি পঁচিশ বছরের একটি মেয়ে।

লোকটা সত্যিই তালঢ্যাঙা। পা জোড়ার যেন শেষ নেই এত লম্বা। ধড়টা আঁটসাঁট সামান্য পোশাকে ঢাকা। চোখ জোড়া বল-হাতলের মত না হলেও ঠেলে বার করা, অস্থিময় ঘাড়খানা বিলক্ষণ লম্বা, সরু মাথাটাকে যেন কোনমতে ধরে রেখেছে। নাকখানা বিরাট ক্ষুরের মত নির্দয়ভাবে চেপে রেখে দিয়েছে নিচের গোঁফ জোড়াকে। দুই ঠোঁঠ রীতিমত পুরু।

অস্ট্রিয়ানদের মত গালপাট্টা আছে ঠিকই, তবে রঙটা পাটের দড়ির মত, আদা রঙের। মাথাজোড়া আশ্চর্য রকমের চকচকে টাক, খুলির নিচের দিকে কেবল কয়েকগুচ্ছ চুলের বেড়।

কদাকার হলেও লোকটাকে দেখলে ভাল লাগে। মুখখানায় অকপট সরলতা মাখানো, চোখজোড়ায় ভাল মানুষের হাসি যেন লেগেই রয়েছে।

পেছনেই দাঁড়িয়ে মেয়েটি। আর্দালী বাড়িয়ে বলেনি। সত্যিই সে সুশ্রী। দীর্ঘাঙ্গী, সুগঠনা, ছিপছিপে। বেঁটে লাল এবং নিখুঁত, নাকটিও যেমন হওয়া উচিত তেমনি, বড় বড় চোখদুটি ঘিরে ঢেউখেলানো চক্ষুপল্লবে, মেঘের মত রাশি রাশি চুল কালির মত কালো। সত্যিই সুন্দরী। খুঁত কোথাও নেই।

চেয়ার এগিয়ে দিলেন বারজাক। কথা শুরু করলেন ভদ্রলোক।

"মঁসিয়ে ডেপুটি, আপনার সঙ্গে আমাদের আলাপ করিয়ে দেবার কেউ নেই। তাই গায়ে পড়ে আলাপ করতে এলাম। সেই সঙ্গে একটা সাহায্যও চাইতে এসেছি। আমার নামটা উদ্ভট। লোকে আমাকে এজনর দ্য সেন্ট-বেরেন বলে ডাকে। রেনেজ শহরে বিষয় সম্পত্তি আছে, ব্যাচেলর।"

সামাজিক প্রতিষ্ঠা প্রাঞ্জল করার পর ক্ষণিক বিরতি দিলেন এজনর দ্য সেন্ট বেরেন এবং হাত -পা নেড়ে শেষ করলেন বাকী কথাটা :

"ইনি আমার মাসী, মিস্ জেন মোরনাম।"

"আপনার মাসী?" বারজাক তো হতভম্ব।

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমারই মাসী।আর পাঁচটা মাসীর মতই আসল মাসী," আশ্বস্ত করেন এজনর দ্য সেন্ট-বেরেন।

অল্প ঠোঁট ফাঁক করে মৃদু হাসল মেয়েটি।

বললে ভাঙা ভাঙা ইংরেজীতে "সুযোগ একবার পেলে হয়, আমার বোনপো হিসেবে নিজেকে জাহির করতে উঠে পড়ে লাগেন মঁসিয়ে দ্য সেন্ট-বেরেন।"

"তাতে নিজেকে খুব ছোকরা-ছোকরা মনে হয়।" বললেন বোনপোটি।

"আইনগত সম্পর্কটা জানিয়ে সবাইকে চমকে দেওয়ার পরেই কিন্তু সম্পর্কটা উল্টে নেন। তখন উনি আমার মামা হয়ে যান। জন্ম থেকে যা ছিলেন।"

"আমার বয়সের দিক দিয়ে কিন্তু সেইটাই মানানসই," বললেন মামা-বোনপো "এবার কাজের কথায় আসা যাক। আমরা দুজনেই অভিযাত্রী নতুন নতুন আবিষ্কারের অনুসন্ধানে বেরিয়েছি। আমার এই মাসী-ভাগ্নীটির প্রাণে ভয়-ডর একদম নেই, দেশে দেশে টোঁ-টোঁ করতে ভীষণ ভালোবাসে, দুনিয়ার সর্বত্র টেনে নিয়ে যায় এই মামা বোনপোটিকে। কোনাক্রিতে থাকবার ইচ্ছে আমাদের নেই, আরও ভেতরে যেতে চাই নতুন-নতুন অভিজ্ঞতার জন্যে। জিনিসপত্র সব বাঁধা-ছাঁদা হয়ে গেছে। রওনা হতে যাচ্ছি, এমন সময়ে শুনলাম আমরা যে পথে যাব বলে ঠিক করেছি, ঠিক সেই পথেই একটা মিশন রওনা হতে চলেছে। মিশনের কর্তা আপনি। মিস মোরনাসকে তখন বললাম, দেশটা যতই শান্তিপূর্ণ হোক না কেন, একটা মিশনের সঙ্গে থাকা সব দিক দিয়ে মঙ্গল। তাই এলাম মহাশয়ের কাছে। আপনাদের সঙ্গে আমাদের থাকতে অনুমতি দিন।"

বারজাক বললেন, "নীতিগতভাবে আপত্তি আমার নেই। কিন্তু কি জানেন, সহযোগীদের সঙ্গে একটু আলোচনা না করলেই নয়।"

"তা তো বটেই," সায় দিলেন সেন্ট বেরেন।

"মেয়েছেলে সঙ্গে থাকলে প্রোগ্রাম মত ঝটপট নাও এগোতে পারি।

হয়ত সেইদিক দিয়েই ওঁরা আপত্তি জানাতে পারেন।"

"দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই! মিস মোরনাস পুরুষ মানুষের মতই। মেয়েছেলে হিসেবে তাকে নাই বা দেখলেন।"

জেন বলে উঠলেন, "ঠিক কথা। মালপত্রের ব্যাপারেও আপনাদের ওপর উপদ্রব করব না জানবেন। ঘোড়া আর কুলি আমাদের সঙ্গেই আছে। দুজন গাইডও আছে, দোভাষীর কাজও করবে তারা।"

"তাহলে সহযোগীদের সঙ্গে একটু কথা বলে নেওয়া যাক", বললেন বারজাক। "ওঁরা রাজি হয়ে গেলেই আপনাদের জানিয়ে দেব। কখন জানাবো বলুন?"

"কালকে যখন রওনা হবেন। আমরাও তখন বেরুবো।"

বিদায় নিলেন দুই মূর্তি।

গভর্ণরের সঙ্গে ভোজসভায় বসে সহকর্মীদের ব্যাপারটা বললেন বারজাক। কারোরই অমত দেখা গেল না। সঙ্গে এমন একজন রূপসী থাকলে মন্দ কী। বারজাকও যেন জেনের রূপ গুণ নিয়ে একটু বাড়াবাড়িই করলেন। খুঁত খুঁত করতে লাগলেন কেবল বদ্রিয়ার্স। ফাঁদ পাতা হচ্ছে না তো? এরকম একটা অভিযানে কোনো মেয়েছেলে পা বাড়াতে চায়, এটা কি কল্পনাতেও আনা যায়? আসল মতলবটা লুকিয়ে যাচ্ছে না তো? মিনিস্ট্রি আর চেম্বার সম্পর্কে অনেক রকম গুজব কানে আসছে এর সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই তো?

সকৌতুকে সবাই অভয় দিলেন বদ্রিয়ার্সকে।

গভর্ণর বললেন, "এঁরা কে আমি জানি না। তবে দিন পনেরো ধরে ওঁরা কোনাক্রিতে আছেন লক্ষ্য করেছি।"

বারজাক বললেন, "দুজনের মধ্যে একজনকে লক্ষ্য না করে তো উপায় নেই।"

"তা ঠিক। মেয়েটি ডানাকাটা পরী বললেই চলে। সেনেগান থেকে স্টিমারে এখানে পৌঁছেছে এ খবরও পেয়েছি। স্রেফ বেড়ানোর জন্যেই যারা সঙ্গে যেতে চাইছে, তাদের সঙ্গে নিলে অসুবিধে হবে বলে তো মনে হয় না।"

এরপর আর কথা চলে না। ঠিক হল, জেন আর সেন্ট বেরেন সঙ্গে যাবেন।

কুলি আর গাইড বাদ দিয়ে দলে রইল তাহলে মোট দশ জন।

পরের দিন সকালবেলা থলথলে বপু নিয়ে হন্তদন্ত হয়ে বারজাক দৌড়ালেন মিস মোরনাসকে ঘোড়ায় তুলে দেওয়ার জন্যে। গিয়ে দেখলেন ক্যাপ্টেন পিয়েরে মারসিনে সে জায়গায় হাজির। অভিযাত্রীদের আগলে নিয়ে যাচ্ছেন ক্যাপ্টেন তাঁর সৈন্যসামন্ত নিয়ে। তার আগেই মিস মোরনাসকে তিনিই খাতির করে তুলে দিচ্ছেন ঘোড়ার পিঠে।

দেখে, সৈনিক-ধর্মের জয়গান গেয়ে উঠলেন বারজাক। মুখ দেখে কিন্তু বেশ বোঝা গেল মনে মনে খুশী হতে পারেন নি।

৩ ॥ গ্লেনর কাস্‌লের লর্ড ব্লেজন

এ কাহিনীর যখন শুরু, তখন গ্লেনর কাস্‌লের লর্ড ব্লেজন নিজের ঘরের দরজা জানলা পর্যন্ত আর খোলেন না—বন্ধ ঘরেই একলা থাকেন ভগ্ন হৃদয়ে। তাঁর সুনাম গেছে, মন ভেঙেছে, জীবন ধ্বংস হয়েছে।

ষাট বছর আগে এই লর্ড ব্লেজনই পূর্বপুরুষদের নাম যশ শৌর্য বীর্য অক্ষুণ্ণ রেখে নৌবাহিনীর উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত হয়ে ছিলেন। দেশের জন্যে যাঁরা এককালে রক্ত দিয়েছেন, তাঁদের উপযুক্ত বংশধর হতে পেরেছিলেন লর্ড এডোয়ার্ড অ্যালান ব্লেজন। ইংল্যাণ্ডের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা ব্লেজন পরিবারের নাম উজ্জ্বলতর করে তুলে ছিলেন।

বিয়ে করেছিলেন বাইশ বছর বয়সে। এক বছর পরে একটি মেয়ের বাবা হলেন। বিশ বছর পরে ভূমিষ্ঠ হল তাঁর প্রথম পুত্রসন্তান। তারও পাঁচ বছর পরে দ্বিতীয় ছেলে। প্রসবকালে মারা গেলেন স্ত্রী।

মন ভেঙে গেল লর্ড ব্লেজনের। যাই হোক, কালক্রমে শোক থিতিয়ে এলে নৌবাহিনীর এক সহকর্মীর বিধবা বউকে বিয়ে করে ঘরে তুললেন। কপর্দকহীন বিধবাটি বিয়ের যৌতুক হিসেবে সঙ্গে নিয়ে এল তার ষোল বছরের ছেলে উইলিয়ামকে।

বছর কয়েক পরে একটি মেয়ে হল লর্ড ব্লেজনের। নাম দিলেন জেন। এর পরেই ফের বিপত্নীক হলেন লর্ড ব্লেজন।

তখন তাঁর বয়স ষাট বছর। এ বয়সে নতুন করে জীবন শুরু করা যায় না। তাই মন দিলেন ছেলে মেয়েদের মানুষ করার কাজে। বড় মেয়ের

বিয়ে হয়ে গিয়েছিল। নিজের দুই ছেলে, এক মেয়ে আর সৎ ছেলে উইলিয়ামকে মানুষ করতে গিয়ে আঘাত পেলেন নতুন করে।

উইলিয়াম কিছুতেই খাপ খাইয়ে নিতে পারল না ব্লেজন পরিবারে। লর্ড ব্লেজন যথেষ্ট চেষ্টা করেছিলেন, নিজের ছেলের মতই স্নেহে যত্নে মানুষ করার চেষ্টা করেছিলেন উইলিয়ামকে, ঔরস জাত ছেলে মেয়েদের সঙ্গে কোনো তফাৎ রাখেন নি, কিন্তু উইলিয়ামই আলাদা করে রাখল নিজেকে। ভেতরে ভেতরে একটা চাপা বিদ্বেষ, একটা বৈরীভাব নিয়ে রইল গ্লেনর কাসলে। অসৎ সঙ্গ জুটল। জুয়ো খেলা শিখল। কিন্তু কোত্থেকে যে এত টাকা জুটত, সে রহস্য রহস্যই রয়ে গেল।

একদিন ফাঁস হয়ে গেল টাকার গোপন উৎস। বিপুল অঙ্কের একটা ড্রাফট হাজির করা হল লর্ড ব্লেজনের সামনে। ড্রাফটে নিখুঁতভাবে জাল করা হয়েছে লর্ড ব্লেজনের সই।

একটি কথাও না বলে টাকা মিটিয়ে দিলেন লর্ড। উইলিয়ামকে তাড়িয়ে দিলেন বাড়ী থেকে। ব্লেজন পরিবারের উপর উইলিয়ামের আক্রোশের প্রধান কারণ ছিল সম্পত্তিতে তার অধিকার না থাকা। উইলিয়াম জানতো পুঁচকে বোন জেনও সম্পত্তি পাবে—উইলিয়াম পাবে সামান্য ভিক্ষের দান, মাসোহারা।

শেষ পর্যন্ত হলও তাই, বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়েও লর্ড ব্লেজন তাকে কিছু টাকা দিতে চাইলেন। সে টাকা স্পর্শ না করে উধাও হয়ে গেল উইলিয়াম।

দুঃখের ভাঁড় তখনো পূর্ণ হয় নি। নিয়তিকে কেউ আটকাতে পারেনা।

বড় ছেলে জর্জ বাপের নাম রাখল। সৈন্যবাহিনীতে নাম লিখিয়ে নিজের ক্ষমতায় অনেক উঁচু পদে উঠল। চারদিকে তখন তার সুনাম, ঠিক তখনি খবর এল জর্জ বিদ্রোহী হয়ে গেছে। দলবল নিয়ে ডাকাতি লুঠতরাজ করে বেড়াচ্ছে। শেষ পর্যন্ত সে প্রাণ হারালো গোলার মুখে। বিদ্রোহ দমন করতে যে অফিসারকে পাঠানো হয়েছিল, জর্জের মৃত্যু হল তারই গোলায়, কিন্তু অফিসারটিও আর জীবিত ফিরে এল না।

লোক মুখে খবর এল ইংল্যাণ্ডে। টি-টি পড়ে গেল চারিদিকে। কেচ্ছা পেয়ে গরম গরম সম্পাদকীয় লিখে কাটতি বাড়িয়ে ফেলল খবরের কাগজগুলো। ধিক্কারে-মাথা কাটা গেল লর্ড ব্লেজনের। সেই থেকে ঘরবন্দী হলেন বেড়ানো পর্যন্ত ছেড়ে দিলেন। হাসতে ভুলে গেলেন, একসঙ্গে বয়ে

খেতে ভুলে গেলেন, লোকজনের সঙ্গে মেলামেশাও ছেড়ে দিলেন।

নির্দয় নিয়তি কিন্তু ছাড়লেন না। শেষ ঘা মারলেন ঠিক যেদিন যে সময়ে জেন ঘোড়ার পিঠে চাপল কোনাক্রিতে, সেইদিন, সেই সময়ে। চাকরের মুখে লর্ড ব্লেজন খবর পেলেন তাঁর দ্বিতীয় ছেলে সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কে ডাকাতি করে গা ঢাকা দিয়েছে। অথচ এই ছেলের সম্বন্ধে তাঁর বড় আশা ছিল। ব্যাঙ্কের কর্তারাও মনে মনে ঠিক করে রেখেছিল, একদিন তাকেও কর্তা করা হবে ব্যাঙ্কের।

খবরটা শুনেই ধড়াস করে পড়ে গেলেন লর্ড ব্লেজন। জ্ঞান যখন ফিরল। তখন তাঁর সর্বাঙ্গ অবশ হয়ে গেছে পক্ষাঘাতে পঙ্গু হয়ে গেছে পা থেকে মাথা পর্যন্ত। বোধশক্তি হারিয়েছেন। কথাবলার শক্তি হারিয়েছেন। আঙুল নাড়ানোর শক্তি হারিয়েছেন। কি আশ্চর্য, চিন্তা করবার শক্তি হারাননি।

আদরের ছোট মেয়ে জেন তার কিছুদিন আগেই বাবার কাছ বিদায় নিয়ে পাড়ি দিয়েছে আফ্রিকায়। কোথায় যাচ্ছে, কেন যাচ্ছে, কিছু বলেনি। জানলে চমকে উঠতেন লর্ড ব্লেজন।

জানত কেবল তাঁর বডমেয়ের ছেলে এজনর ছ্য সেন্ট বেরেন। মেয়ে জনের চাইতে পনেরো বছরের বড। মাছ ধরার ভয়ানক নেশা, দারুণ অন্যমনস্কতা আর মেয়েজাতির প্রতি প্রচণ্ড বিতৃষ্ণা। এই তিনটে গুণ নিয়েও দাদুর মন হরণ করেছিল এজনর। বিয়ে-থা করেনি। করবেও না। মেয়েদের একদম বিশ্বাস করত না। বলত, যে মেয়ে আমার কবরে চোখের জল ফেলবে তাকে বিয়ে করব। অর্থাৎ ইহজীবনে বিয়ে করব না। প্রত্যেকেই কিন্তু ভালবাসত তাকে তার মিষ্টি স্বভাবের জন্যে। জেনকে হাত ধরে সে হাঁটতে শিখিয়েছে, বড়, হলে সঙ্গে করে নিয়ে বেড়িয়েছে। পরে যখন মাসী সত্যিই বড় হয়েছে, এজনরকে ছাড়া তারও একদণ্ড চলেনি। যেহেতু বয়েসে বড়, তাই সম্পর্কটা উল্টো করে মামা বলে ডেকেছে।

সবসময়ে নয়। যখনি দাবড়ানি দেওয়ার দরকার হয়েছে, ঝট করে 'ভাগ্নী' রূপান্তরিত হয়েছে 'মাসী'তে। কেঁচোর মত কুঁচকে গিয়ে মাসীর সব কথাই মেনে নিয়েছে বোন-পো।

যেমন, একদিন মামাকে ঢেকে ভাগ্নী বললে "জর্জ সম্বন্ধে কিছু বলো তো শুনি।"

আঁৎকে উঠল এজনর   জর্জ !

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, জর্জ। আমার দাদা জর্জ।"

"এ বাড়ীতে তার নাম করতে নেই।"

"কেন, কি করেছে সে ?"

"আমাকে সে কথা বলতে হবে ?"

"হ্যাঁ, বলতে হবে ?"

ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যেতে যাচ্ছে এজনর, এমনসময়ে রণরঙ্গিনী মূর্তিতে পেছন থেকে ব্রহ্মাস্ত্র ছাড়ল জেন, "বোন-পো !"

"মাসী !"

"কি জানো বলো।"

সুড় সুড় করে ফিরে এসে জর্জের কীর্তি কাহিনী নতুন করে শোনালো এজনর।

পরের দিন জেন্ বললে, "মামা।"

"বল্।"

"জর্জ যে সত্যিই অন্যায় করেছে, জানছো কি করে ?"

"বলিস কি রে ! দেশশুদ্ধ লোক জানে, তোর বাবা জানে।"

"বোন-পো !"

"মাসী !"

"আমি বলছি সে কোনো অন্যায় করেনি। সব মিথ্যে রটনা। কেউ দেখেছে ?"

আমতা আমতা করে এজনর বললে, "তা ঠিক।"

"যে অফিসারের গোলায় দাদা মরেছে, সে বলেছে ?"

"না তো।"

"তাহলে দাদা নির্দোষ।"

"ঠিক বলেছিস। কিন্তু প্রমাণ ?"

"সেখানে গেলেই পাওয়া যাবে।"

"কোনখানে ?"

"যেখানে দাদাকে কবর দেওয়া হয়েছে, আফ্রিকায়।"

"অ্যাঁ !"

"আরে, হ্যাঁ। কবরের গায়ে নিশ্চয় সব বৃত্তান্ত লেখা আছে। লোকজনকে জিজ্ঞেস করলেও জানা যাবে !"

"কে যাবে?"

"তুমি।"

"আমি? হাজার মাইল পেরিয়ে আফ্রিকার জঙ্গলে আমি যাব।"

"হাজার মাইলেরও বেশী মামা।"

"অসম্ভব।"

"তাহলে আমিই যাবো।"

"তুই!"

আর কথা বলল না জেন। পরের দিনও এ প্রসঙ্গ নিয়ে টুঁ শব্দটি উচ্চরণ করল না মামা উত্থাপন করা সত্বেও। ফলে আস্তে আস্তে পুরো ব্যাপারটাকেই খুব সোজা মনে হল এজনরের। যে অভিযানকে প্রথমে মনে হয়েছিল অসম্ভব, দ্বিতীয় দিনে তা মনে হল বিপজ্জনক, তৃতীয় দিনে সম্ভবপর, চতুর্থ দিনে খুব সোজা।

দীর্ঘদিন ধরে আফ্রিকার ভূগোল নিয়ে পড়াশুনা করেছে জেন। যে অঞ্চলে গেলে দাদার কবরের হদিশ পাবে, সে অঞ্চলের পথঘাট পর্যন্ত মুখস্ত করে রেখেছে। এমন কি 'বামবারা' ভাষা পর্যন্ত শিখেছে। মামা এজনরকে তার নমুনা শুনিয়েছে এবং শিখতে বাধ্য করেছে। নইলে নাইজারের ইয়াব্বড় হাঙরের মাছ ধরতে বসে জংলীদের সঙ্গে কথা বলবে কি করে? আফ্রিকায় যেতে রাজী হওয়ার অন্যতম কারণ হল এই মাছ ধরার লোভ। জেন লোভ দেখিয়েছে, টোপ ফেলেছে। এজনর টুপ করে তা গিলেছে। 'বামবারা'ভাষা পর্যন্ত শিখছে।

জেন জানত, ও অঞ্চলের জংলীরা মনে করলে অভিযাত্রীদের না খাইয়ে মেরে ফেলতে পারে। অভিযান ভণ্ডুল করে দিতে পারে। তাই অস্ত্রশস্ত্রের ওপর খুব একটা ভরসা না রেখে সঙ্গে বিস্তর সস্তার চটকদার জিনিস নিয়েছে উপহার দিয়ে মন জয় করার জন্যে। যেমন পুঁতির মালা, রুমাল, ছুঁচ, ফিতে, বোতাম, পেন্সিল, পুরোনো বাজে বন্দুক ইত্যাদি। নিজেদের জন্যে নিয়েছে ওষুধপত্র, অস্ত্রশস্ত্র, টেলিস্কোপ, অভিধান, কম্পাস, তাঁবু, ম্যাপ, রান্নার বাসন, চা, খাবার দাবার ইত্যাদি। আর চকচকে নিকেল করা একটা চোঙাভর্তি শুধু ছিপ, সুতো আর আঁকশি, যা দিয়ে ছ'জন লোক মাছ ধরতে পারে।

কিন্তু যার জন্যে এত সরঞ্জাম, সে আদৌ মাছ ধরবে কিনা, সেটাও একটা প্রশ্ন। কেননা সব সময়ে অন্য মনে থাকার দরুন মাছে টোপ খেয়ে গেলে যার খেয়াল থাকে না অথবা ভুল করে কোনো মাছ বঁড়শিতে গেঁথে গেলে দয়া

পরবশ মাছকে ফের জলে ছেড়ে দেওয়া যার চিরকেলে অভ্যাস—সে নাইজারে আদৌ মাছ ধরতে পারবে কী ?

যাই হোক, সরঞ্জামাদি আগেই কোনাক্রিতে পাঠিয়ে দিয়ে বাবার কাছে বিদায় নিতে গেল জেন। নিস্তব্ধ নিথরভাবে মেয়ের আফ্রিকা যাওয়া শুনলেন লর্ড ব্লেজন। মুখে ভাবান্তর দেখা গেল না। মেয়ে কিন্তু জানত বাবার সঙ্গে এই দেখাই শেষ দেখা। আফ্রিকা থেকে আর ফেরা হবে না। ফিরলেও বাবাকে জীবিত দেখতে পাবে না। তাই চোখের জল চেপে দ্রুত বেরিয়ে গেল বাইরে।

মেয়ের দিকে হাত তুলে কেবল দেখালেন লর্ড ব্লেজন নাতি এজনর পাশেই ছিল। বলল, "আমি তো রইলাম।"

ফের বসে পড়লেন লর্ড ব্লেজন, আগের মতই দিগন্তের পানে অপলকে চেয়ে রইলেন। যেন পথ চেয়ে আছেন বড় ছেলের ফিরে আসার।

অভিভূত অবস্থায় বেরিয়ে এল এজনর। শোক উথলে উঠল কিন্তু স্টেশন যাওয়ার পথে। আচমকা চেঁচিয়ে উঠল হাঁউমাউ করে, "আমার ছিপ! আমার ছিপ!" ফের বাড়ী এসে নিয়ে গেল ছিপের চোঙা। স্টেশনে পৌঁছোতে না পৌঁছোতেই এসে গেল ট্রেন। বলল সগর্বে, "জীবনে এই দ্বিতীয় বার ঠিক টাইমে ট্রেন ধরলাম, বুঝলি জেন।"

জেন কেবল হাসল।

বড়দার বিশ্বাসঘাতক বদনাম ঘুচোতেই জীবনপণ করে বেরোলো বাড়ী থেকে। জানতেও পারল না দুদিন পরেই চোর বদনাম নিয়ে বুড়ো বাপকে পক্ষাঘাতগ্রস্ত করে গেল মেজদা!

৪ ॥ একটি প্রবন্ধ

পয়লা জানুয়ারী তারিখে নিচের ফ্যানট্যাসটিক প্রবন্ধটা ছাপা হল 'লা এক্সপ্যানসন্‌স্ ফ্রাসেঁ' পত্রিকায়। লিখেছেন পত্রিকার সংবাদদাতা মঁসিয়ে আমিদী ফ্লোরেন্স :

বারজাক মিশন

(বিশেষ সংবাদদাতার খবর)

জঙ্গলে, পয়লা ডিসেম্বর। আগেই জানিয়েছিলাম, আজ ভোর ছটায় অভিযান শুরু করবে বারজাক মিশন। আটজন সদস্য অভিযাত্রী ছাড়াও

আমাদের সঙ্গে রয়েছেন দুজন স্বেচ্ছা অভিযাত্রী। এদের একজন ইংল্যাণ্ডে শিক্ষিতা ফরাসী তরুণী শ্রীমতি জেন মোরনাস। অন্যজন তাঁর মামা। (সম্পর্কটা একটু গোলমেলে। কেবলই গুলিয়ে যায়)। এঁর নাম এজনর দ্য সেন্ট বেরেন। ভদ্রলোকের মাথায় ছিট আছে। আশা করা যাচ্ছে, ইনি আমাদের অনেক হাসির খোরাক জোটাতে পারবেন।

এঁরা দুজন নিগ্রো চাকর এনেছেন। গাইডের কাজ করানো যাবে। দোভাষীর কাজটা মামা ভাগ্নী ভালই করবেন। দুজনেই বামবারা ভাষা এবং স্থানীয় অনেক ভাষা ভাল বলতে পারেন। যেমন, সকালবেলা আমাদের দেখলেই গুডমর্ণি না বলে 'ইনিত্তি' বলেন শ্রীমতি মোরনাস। মঁসিয়ে বারজাক শুনে শুনে শিখেছেন। কিন্তু ওঁর মুখে সে-রকম মিষ্টি শোনায় না।

ভোর সাড়ে পাঁচটায় রেসিডেন্সির সামনের চত্বরে জড়ো হলাম আমরা।

মঁসিয়ে বারজাক আর শ্রীমতি মোরনাস দুজনেই দেখছি জংলীদের সৈন্য দেখিয়ে ভড়কে দেওয়ার পক্ষপাতি নন। দুজনেই চান শান্তির বাণী বয়ে নিয়ে যেতে—হাতে অলিভগুচ্ছ নিয়ে। কিন্তু উল্টো মত ধরেন মিশনের ডেপুটি চীফ বদ্রিয়ার্স। গভর্নরও তাঁর দলে। এঁরা চান সঙ্গে সৈন্য থাকুক, নইলে মান থাকে না সরকারী অভিযাত্রীদের। তাছাড়া বছর দশেক ধরে বিশেষ করে নাইজার অঞ্চলে রহস্যময় অভ্যুত্থানের খবর আসছে। গ্রামকে গ্রাম ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে, গ্রামের লোক নিপাত্তা হচ্ছে, অন্যান্য গ্রামকে পুড়িয়ে ছাই করে দেওয়া হচ্ছে, লুঠতরাজ খুনজখম চলছে। কাজেই সৈন্য থাকুক সঙ্গে।

তাই ক্যাপ্টেন মারসিনে দু'শ অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে পাহারা দেবেন আমাদের। গভর্ণরের এই ব্যবস্থায় বিষম খুশী হয়েছেন বদ্রিয়ার্স—যদিও হাসেননি—হাসতে তিনি জানেন না। মুখ গোমরা করেছেন বারজাক।

একজন নিগ্রো গাইড পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে আমাদের। লোকটা এককালে সেনাবাহিনীতে নেটিভ অফিসার ছিল। এখনো গায়ে শতছিন্ন ইউনিফর্মটা রেখে দিয়েছে, মাথায় পালকহীন সুতির হেলমেট। পা খালি, হাতে গদা, কুলি আর অশ্বতর চালকদের পিটিয়ে শায়েস্তা করার জন্যে।

ঠিক পেছনে শ্রীমতি মোরনাস। ক্যাপ্টেন মারসিনে আর মঁসিয়ে বারজাক দুজনেই এঁর পেছন পেছন ঘুরছেন। সুখ সুবিধের দিকে খর নজর রেখেছেন। দুজনের মধ্যে এই নিয়ে মন কষাকষি শুরু হল বলে। তরুণ পাঠক এবং তরুণী পাঠিকাদের সব খবরই যথাসময়ে পাঠাবো।

সুন্দরী সঙ্গিনীকে কিন্তু কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারছেন না মঁসিয়ে বড্রিয়ার্স। মুখখানা শক্ত করে ঘোড়ার চেপে বসে আছেন প্রথম দলের প্রথম দিকে। এঁর ঠিক পেছনেই ডক্টর চাতোন্নে আর ভৌগোলিক তুজন এথ্নগ্রাফি অর্থাৎ মানবজাতি সমূহের বিজ্ঞানসম্মত বিবরণ নিয়ে সোৎসাহে আলোচনা আরম্ভ করে দিয়েছেন এর মধ্যেই।

কনভয়টা রয়েছে এঁদের পেছনে। পঞ্চাশটা গাধা, পঁচিশজন অশ্বতর চালক এদের দশজনকে এনেছেন শ্রীমতি মোরনাস। ক্যাপ্টেন মারসিনের ঘোড় সওয়ার বাহিনী পাহারা দিচ্ছে দু'পাশে। আর এই অংশ দুলকি চালে টহল দিচ্ছে একপ্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত।

সবার পেছনে রয়েছে শ্রীমতি মোরনাসের দুই চাকর চৌমৌকি আর টোনগানে।

কাঁটায় কাঁটায় ছটার সময়ে যাত্রারম্ভের সংকেত এল। রেসিডেন্সির ছাদে তেরঙা পতাকার সাথে অন্যান্য পতাকাও উড়তে দেখা গেল। বিশেষ উপলক্ষ্য বলেই জঁাকানো পোশাক পরে বারান্দায় দাঁড়িয়ে বিদায় অভিনন্দন জানালেন গভর্ণর। আমার টুপি তুলে পাল্টা অভিনন্দন জানালাম। স্থানীয় সৈন্যবাহিনী বিউগল আর ড্রাম বাজিয়ে এমন একটা ভাব গম্ভীর পরিবেশ সৃষ্টি করল যে (হাসবেন না যেন) আমার চোখে জল এসে গেল।

ঠিক সেই সময়ে ঘটল একটা বাজে ব্যাপার।

সেন্ট বেরেন কোথায়? কোথায় তিনি? হাজার ডাকেও সাড়া দিলেন না ভদ্রলোক।

উদ্বেগে পড়লাম। কে জানে কি বিপদ ঘটিয়ে বসলেন ছিটগ্রস্ত মানুষটা।

কিন্তু উদ্বেগ দেখলাম না শুধু একজনের। শ্রীমতি মোরনাসের।

দেখলাম, সাংঘাতিক চটেছেন ভদ্রমহিলা। দাঁতে দাঁত পিষে শুধু বললেন, দেখছি আমি।

আমার পাশে এসে বললেন, মঁসিয়ে ফ্লোরেন্স একটু আসবেন?

আর বলতে হল না। ঘোড়া হাঁকিয়ে আমি গেলাম তাঁর সঙ্গে।

কোনাক্রি জায়গাটা একটা দ্বীপের ওপর। সমুদ্রের ধারে যেতেই কি দেখলাম কল্পনা করতে পারেন?

মঁসিয়ে দ্য সেন্ট বেরেন বেশ মৌজ করে বসে আছেন বালির ওপর। সরকারী অভিযানে তিনিও যে একজন অভিযাত্রী, দেখে বোঝার উপায়

নেই। সামনে দাঁড়িয়ে একজন নিগ্রো নতুন ধরনের এক মুঠো বঁড়শি দেখাচ্ছে সেন্ট বেরেনকে। গুলতানি চলেছে তাই নিয়ে। তারপর তড়াক করে লাফিয়ে উঠে নিগ্রোসঙ্গীসহ নৌকোর দিকে পা বাড়ালেন সেন্ট বেরেন। আমরা না থাকলে নৌকোয় উঠে চলেই যেতেন নাগালের বাইরে।

পেছন থেকে ভীষণ কড়া গলায় হাঁক দিলেন শ্রীমতি মোরনাস, বোন পো!

(সত্যিই তাহলে ভদ্রলোক ওঁর বোনপো)।

ডাক শুনেই পেছন ফিরে তাকিয়ে ছিলেন সেন্ট বেরেন। সম্পর্কে নিশ্চয় বোনপো, নইলে তাকাবেন কেন? মাসীকে দেখেই প্রথমটা অবাক, পরে চমকে উঠলেন। অর্থাৎ অভিযানের কথা মনে পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে দু'হাত মাথার ওপর ছুঁড়ে, অস্ফুট চেঁচিয়ে, মুঠোভর্তি বঁড়শি পকেটে ঢুকিয়ে, এক মুঠো পয়সা নিগ্রোটার দিকে ছুঁড়ে দিয়ে, পড়ি কি মরি করে অ্যায়সা দৌড় লাগালেন যে হি-হি করে হেসে ফেললেন মাসী এবং সেই প্রথম তাঁর শ্রীমুখে দেখলাম ভারী উজ্জ্বল ঝকঝকে সূর্যের মত দু'পাটি দাঁতের সারি।

সেন্ট বেরেন তখনো উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়োচ্ছেন আমাদের ঘোড়ার পাশে পাশে। মাসী বললেন—মামা, অত ছুটোনা, ঘেমে যাবে।

(যাচ্চলে। ভদ্রলোক তাহলে সম্পর্কে মামাও বটে!)

যাই হোক, এই অবস্থায় আমাদের দেখে মুখ টিপে হেসে উঠলেন অভিযানের প্রত্যেকেই। কিন্তু এসব ছোটখাটো ব্যাপার গ্রাহ্য করেন না সেন্ট বেরেন। নিরীহ মুখে শুধু বললেন—দেরী করে ফেললাম বুঝি?

এবার আর মুখ টিপে নয়, হো হো করে হেসে উঠল দলের প্রত্যেকে। এমন কি সেন্ট বেরেন নিজেও। সত্যিই ভদ্রলোককে ভাল না বেসে পারা যায় না।

ঘোড়ায় ওঠবার আগে পাকা ঘোড়সওয়ারের মতই হেঁট হয়ে জিনের পেটি ঠিকমত বাঁধা হয়েছে কিনা দেখতে গিয়ে আরেক ফ্যাসাদ বাঁধালেন। হাতে ধরা ছিপের চোঙার খোঁচা লাগল একটা গাধার পেটে। গাধা বেচারী আচমকা খোঁচা খেয়ে মারল লাথি টেনে। লাথি খেয়ে তিনটে ডিগবাজি খেয়ে ধুলোয় গড়িয়ে গেলেন সেন্ট বেরেন।

আমরা হৈ-হৈ করে দৌড়ে গিয়ে ধরে তোলার আগেই তিড়িং করে নিজেই লাফিয়ে উঠলেন সেন্ট বেরেন। টোনগানে বললে একগাল হেসে—কপাল

ভাল। বোলতা কামড়ালে বা গাধা লাথি মারলে যাত্রা শুভ হয়।

জবাব দিলেন না সেন্ট বেরেন। একটু দমে গেলেন মনে হল। ধূলি-ধূসরিত দেখে উঠে বসলেন ঘোড়ার পিঠে।

তখন সূর্য উঠেছে। রাস্তায় রোদ পড়েছে। পনেরো থেকে আঠারো ফুট চওড়া এই রাস্তা ধরে ২৫০ মাইল গেলে টিম্বো পৌঁছোবো। আব-হাওয়া ভাল। গরম খুব বেশী নয়। ছায়া অঞ্চলে মাত্র ৫০ ডিগ্রী। বৃষ্টির সম্ভাবনাও নেই—বর্ষা বিদেয় নিয়েছে।

শুরু হল পথচলা। দশটা নাগাদ একটা নদী পেরোলাম। আফ্রিকার এ অঞ্চলে প্রায় রোজই দু একটা নদী পথে পড়বে। সুতরাং বার বার নদী পেরোনার কথা আর বলব না।

কোনাক্রি থেকে সোজা সড়ক ধরে আসার পথে পাহাড়, ভুট্টাক্ষেত, কলাবাগান, তুলোর চাষের মাঝে মাঝে কয়েকটা গাঁ দেখে খুসীমত নামকরণ করে গেলেন মঁসিয়ে তাসিন।

মাইলবারো আসবার পর দশটা বাজতে না বাজতেই বেশ গরম হতে লাগল। ঠিক হল, দুপুরের খাওয়া খেয়ে একটু জিরিয়ে নিয়ে ফের বেরোনো হবে পাঁচটা নাগাদ। এই প্রোগ্রামই চলবে দিনের পর দিন। সুতরাং রোজ রোজ সময়ের হিসেব আর লিখব না। দু'চোখ ভরে অনেক কিছুই দেখছি, কিন্তু প্রয়োজন নাহলে সে সবের বর্ণনাও দেব না।

ছোটখাটো একটা বনের ধারে ছায়ায় দাঁড়ালাম জিরেন নেওয়ার জন্যে। মনোরম পরিবেশ। সৈন্যরা ছড়িয়ে পড়ল। আমি, শ্রী মতি মোরনাস, সেন্ট বেরেন আর ক্যাপ্টেন এলাম খোলা জায়গায়।

বসবার জন্যে মাটিতে একটা গদী পেতে দিলাম সুন্দরী সঙ্গিনীকে। কিন্তু আমার আগেই তাড়াতাড়ি দুটো টুল এনে হাজির করলেন ক্যাপ্টেন আর বারজাক, বসতে অনুরোধ করলেন শ্রী মতিকে। ফাঁপড়ে পড়লেন ভদ্রমহিলা। শেষকালে চুপ করে বসে পড়লেন আমার পাতা গদীতে। ফলে, কটমট করে তাকিয়ে আমাকে প্রায় ভস্ম করে ফেলার উপক্রম করলেন ক্যাপ্টেন আর বারজাক।

ঘাসের ওপর বসলেন মঁসিয়ে বদ্রিয়ার্স, মঁসিয়ে কুইরত্ত, মঁসিয়ে হেই-রত্ত আর মঁসিয়ে পঁসি। শেষের তিনব্যক্তি নির্দলীয়। এঁদের মধ্যে মঁসিয়ে পঁসি রওনা হওয়া ইস্তক সমানে খাতায় কি সব লিখে চলেছেন। ছাইভস্ম লিখছেন কি কাজের কথা লিখছেন, ঈশ্বর জানেন। তবে ঐ রকম

টিবির মত যাঁর কপাল, তিনি হয় দারুণ মেধাবী, নয় আকাট মূর্খ। দুইয়ের মাঝামাঝি কখনোই নন।

শুকসারী পক্ষীযুগলের মত সবসময়ে একসঙ্গে ঘুরছেন মঁসিয়ে চাতোনে আর মঁসিয়ে তাসিন, এখন বসলেন একটা ডুমুর গাছের ছায়ায়। বসেই ম্যাপ বিছোলেন। শেষ পর্যন্ত খাবারের বদলে ম্যাপ দেখেই দিন কাটল।

গাইড মোরিলিরে একটা টেবিল পেতে দিয়ে গেল আমার আর সেন্ট বেরেনের জন্যে, কিন্তু টিকি দেখা গেল না সেন্ট বেরেনের, ভদ্রলোক ফের যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেছেন।

মোরিলিরে আগুন জ্বালিয়ে রান্নাবান্নার আয়োজন করছে, হাত লাগিয়েছে চৌমৌকি আর টোনগানে, যদ্দিন পারা যাবে, এই ভাবে রেঁধে খাব। ইউরোপ থেকে আসা খাবার দাবারে হাত দেব না।

কোনাক্রি থেকে কিনে আনা মাংস এসে আমাকে দেখাল মোরিলিরে। একগাল হেসে বললে তোফা মাংস কিন্তু, একদম কচি। বাচ্চা খোকার মাংসের মত তুলতুলে।

শুনেই তো শিরদাঁড়া শিরশির করে উঠল আমার। বলে কি মোরিলিরে! এই কি একটা উপমা হল!

ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলাম—"কচিখোকার মাংস-টাংস খেয়েছো নাকি?"

অভয় দিল মোরিলিরে। নিজে খায়নি। বাবা খেয়েছে, তাদের মুখে শুনেছে।

যাই হোক জঙ্গলের খাদ্য সম্ভার মন্দ নয় দেখলাম। ক্যারাইট মাখন মাখানো ভেড়ার মাংসভাজা, ভুট্টার কেক, ডুমুর, কলা, নারকেল। সবশেষে নদীর জল অথবা তালের রস গাঁজানো মদ।

খাওয়া তৈরীর সময়ে একটা মজার ঘটনা ঘটল। ডক্টর চাতোনে হাতমুখ নেড়ে বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন ক্যারাইট মাখনটার আর এক নাম নাকি সি মাখন। কেন না যে গাছ থেকে এ মাখন তৈরী হয়, তার দুটো নাম; ক্যারাইট আর সি।

হেনকালে ছন্দপতন ঘটল বিকট চিৎকারে। দূর থেকে কে যেন 'বাঁচাও, বাঁচাও' করে তারস্বরে চেঁচাচ্ছে।

সুধী পাঠক পাঠিকাকে নিশ্চয় বলে দিতে হবে না কোন মূর্তিমান চেঁচাচ্ছে। আজ্ঞে হ্যাঁ, মঁসিয়ে এঞ্জনর দ্য সেন্ট বেরেনের গলাই বটে।

ছুট! ছুট! ছুট! আমি আগে, পেছনে ক্যাপ্টেন আর বারজাক। শব্দ লক্ষ্য করে পৌঁছোলাম একটা বাদার ধারে। কাদায় কোমর ডুবিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন সেন্ট বেরেন!

"ম্যারিগটে পড়লেন কি করে?" ম্যারিগট মানে জলা—এ অঞ্চলের ভাষায় জিজ্ঞেস করলাম কাদা থেকে শুকনো ডাঙায় টেনে তোলার পর।

"মাছ ধরছিলাম—পা হড়কে গেল!" কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে মুখভর্তি কাদা ফচাফচ ছিটকে গেল আমার সারা গায়ে।

"ছিপ নিয়ে?"

"দূর! হাত দিয়ে।"

বলে, জ্যাকেটের ভাঁজে হেলমেটটা দেখালেন।

পরক্ষণেই আমাকে প্রশ্ন করার সুযোগ না দিয়ে তড়বড় করে বললেন "দাঁড়ান! দাঁড়ান! জ্যাকেটটা খুলতে দিন। নইলে ব্যাটারা পালাবে।"

"কোন ব্যাটারা?"

"ব্যাঙ।"

ভাবুন কাণ্ডটা! বারো মাইল টিকিয়ে এসে আমরা যখন ঠ্যাং ছড়িয়ে জিরোচ্ছি, উনি তখন কাদায় পা ডুবিয়ে ব্যাঙ ধরছেন!

বারজাক বললেন—"ভালই করেছেন। ব্যাঙের মাংস খেতে ভাল, তবে ওরা যেরকম চেঁচাচ্ছে, খাদ্য হতে চায় না মনে হচ্ছে।"

ফিরে এলাম রান্নার জায়গায়। ব্যাঙের দাবনা ভাজা দেওয়া হল প্রত্যেকের পাতে। সত্যিই তোফা খানা! তুলনা নেই।

খাওয়ার পর পাঁচ কথার মাঝে শ্রীমতি মোরনাস আড়চোখে ক্যাপ্টেনের দিকে তাকিয়ে শুধু একটা কথা বললেন—"মনে রাখবেন, মামা আমাকে ছেলের মতই মানুষ করেছে। কাজেই আমার সঙ্গে ছেলের মতই মিশবেন।" বললেন বটে, কিন্তু আড়চোখে তাকানো দেখে হাড়ে হাড়ে বুঝলাম ছেলে সাজলেও মেয়েরা কটাক্ষ হানতে কখনো ভোলে না।

এরপর কফিপান। সবশেষে লম্বা ঘাসের ওপর লম্বমান হয়ে দিবানিদ্রা।

পাঁচটা বাজল। কিন্তু আরেক সমস্যা হাজির হল। কুলিদের হাতে পায়ে ধরেও রওনা করানো গেল না।

কেন? না চাঁদ ওঠেনি এখনো। চাঁদের মুখ না দেখে বেরোলে নাকি দারুণ অমঙ্গল হতে পারে।

মঁসিয়ে তাসিন সায় দিয়ে বললেন—"ঠিকই তো। আফ্রিকার সব অভি-

যাত্রীই তাঁদের অভিজ্ঞতা কাহিনীতে এই কথা লিখে গেছেন।"

"আইয়ু! আইয়ু!" বলে সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠল কুলি আর অশ্বতর চালকরা। মানে "হ্যাঁ! হ্যাঁ!"

পাক্কা দুটি ঘণ্টা নষ্ট হল মাথামোটাদের জন্যে। মেঘের আড়ালে চন্দ্রদেব উঁকি দিতেই হুল্লোড় করে মোট মাথায় তুলে নিল সবাই।

নটা নাগাদ একটা জঙ্গলের ধারে পৌঁছোলাম। পথের ধারে কি কারণে জানি না একটা কুঁড়েঘর খালি পড়ে থাকতে দেখে উদার হৃদয় ক্যাপ্টেন মারসিনে প্রস্তাব করলেন—শ্রীমতি মোরনাসের থাকার ব্যবস্থা হোক কুঁড়েতে।

রাজী হলেন শ্রীমতি। উধাও হলেন রাতের চটি অভিমুখে। কিন্তু দশ মিনিট যেতে না যেতেই শুনলাম তাঁর তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর—"বাঁচান! বাঁচান!"

কি হল রে বাবা! দৌড়োলাম সবাই কুঁড়ের দিকে, কাছে গিয়ে দেখলাম দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আঙুল তুলে ঘরের মেঝে দেখাচ্ছেন শ্রীমতি এবং কর্ণবিদারী কণ্ঠে জানতে চাইছেন 'এগুলো কী'!

'এগুলো' মানে হল অগুন্তি সাদা পোকা। মাটির গর্ত থেকে বেরিয়ে আসছে। মেঝেতে থুক থুক করছে।

শিউরে উঠে শ্রীমতি বললেন—"কি কাণ্ড দেখুন তো! অন্ধকারে হাত পায়ের ওপর দিয়ে ঠাণ্ডামত কি চলে ফিরে বেড়াচ্ছে দেখতে গিয়ে দেখি হারামজাদারা পকেটে পর্যন্ত ঢুকে বসে আছে। ম্যাগেঃ!"

টোনগানে বলল—"মারবেন না! মারবেন না!"

"কেন?"

"আমরা যে খাই! বড় ভাল খেতে!"

শুনে জিভে জল আসা দূরে থাকুক, শ্রীমতি বললেন, রাতটা তাঁবুতে কাটাবেন—এখানে আর নয়। গাইড মোরিলিরে তখন বললে,—"তাঁবুতে কেন? এক নিগ্রো চাষার ঝি তার কুঁড়েতে থাকতে দেবে আপনাকে। পয়সা পেলেই বর্তে যাবে।"

শ্রীমতি তাতেই রাজী। সদলবলে গেলাম মোরিলিরের সঙ্গে। বছর পনেরো বয়েসের নিগ্রো দাসীটি তখন কোমরে একটি মাত্র পাতা এঁটে লজ্জা নিবারণ করে কষ্টিপাথরে খোদাই করা মূর্তির মত দাঁড়িয়ে গাছ থেকে শুঁয়োপোকা জড়ো করছে।

দেখেই সুরুৎ করে জিভের জল টেনে নিয়ে ডক্টর চাতোয়ে বললেন—

"আচার হবে···আচার হবে···শুঁয়োপোকার আচার···দারুণ খেতে···এরা বলে সিটোম্বো !"

ধুয়ো ধরল মোরিলিরে—"যা বলছেন। দারুণ মুচমুচে !"

মেয়েটা ততক্ষণে আমাদের দেখতে পেয়েছে। কাছে এল। সবাইকে অবাক করে দিয়ে পরিষ্কার ফরাসী ভাষায় বললে "এক সাহেবের বাড়ীতে অনেকদিন ঝি গিরি করেছি···ফরাসী স্কুলে পড়েছি. বিছানা কি করে পাততে হয় ভাল করেই জানি। আসুন মা মণি···ভেতরে আসুন।" বলে পরম আদরে শ্রীমতির হাত ধরে নিয়ে গেল ভেতরে।

আমরা ফিরে এলাম। কিন্তু আধঘণ্টা যেতে না যেতেই আবার শুনলাম শ্রীমতির তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর—"কে কোথায় আছেন! এখুনি আসুন!"

গেলাম দৌড়োতে দৌড়োতে। গিয়ে দেখি ভয়ানক কাণ্ড। মেঝের ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে :কাতরাচ্ছে নিগ্রো মেয়েটা। পিঠ রক্তাক্ত—বেতের দাগ। পাশে দাঁড়িয়ে শূন্যে বেত আছড়াচ্ছে এক বিভীষণ মূর্তি রক্তচক্ষু নিগ্রো দানব। আড়াল করে দাঁড়িয়ে করাল মূর্তি শ্রীমতি মোরনাস—সত্যিই রেগেছেন—দেখলে বুক কাঁপে।

আমাদের দেখেই বললেন—"কি বিশ্রী ব্যাপার দেখুন তো। ঘুম এসেছে, মালিক—নিগ্রো মেয়েটার নাম—আমাকে বাতাস করছে, এমন সময়ে হুড়-মুড়িয়ে ঘরে ঢুকে এই লোকটা মালিককে টানতে টানতে নিয়ে গিয়ে বেত মারতে আরম্ভ করেছে। কুঁড়েতে সাদা আদমি ঢুকিয়েছে কেন—এই তার অপরাধ !"

মুখ বেঁকিয়ে বদ্রিয়ার্স বললেন—"এদের হাতে কিনা ভোট দেওয়ার অধি-দার দিতে চাইছেন আপনারা! ছি! ছি! ছি!"

সুবক্তা বদ্রিয়ার্স! সুযোগ পেয়েছেন কি কোণঠাসা করেছেন বার-জাককে!

বারজাকও কম যান না। মুখের ওপর ছুঁড়ে দিলেন পাল্টা জবাব—"আহারে! ফরাসী স্বামীরা যেন কখনো বউদের ঠ্যাঙায় না!"

বলেই বদ্রিয়ার্সকে তার মুখ খুলতে না দিয়ে দানব নিগ্রোকে বললেন—"মালিক আমাদের সঙ্গে যাবে। বুঝেছো?"

দাঁত কিড়মিড় করে নিগ্রো যা বললে, তার সাদা মানে—আস্বা আর কি? দস্তুর মত দাম দিয়ে কিনে বাঁদী বানান হয়েছে মালিককে। সাদা আদমীরাও বাঁদী রাখে—কালা আদমীরা রাখবে না কেন?

বারজাক শর্টকাট রাস্তা ধরলেন।

বললেন—"মালিককে কিনবো। কত চাও?"

"একটা গাধা, একটা বন্দুক, আর পাঁচদশটা ফ্রাঁ।"

"পঞ্চাশ ঘা বেত লাগাবো তোমাকে! হারামজাদা শয়তান কোথাকার!" হুংকার ছাড়লেন ক্যাপ্টেন।

যাই হোক, শেষ পর্যন্ত রফা হল একটা মান্ধাতার আমলের চকমকি বন্দুক, একটুকরো কাপড় আর বিশ ফ্রাঁ পেলেই মালিককে হাত বদল করবে নিগ্রো প্রভু!

ইতিমধ্যে মেয়েটাকে মেঝে থেকে তুলে পিঠে ক্যারাইট মাখন ঘসে সেবা করছিলেন শ্রীমতি মোরনাস। বাঁদী হাত বদল হতেই তাকে নিজের তাঁবুতে নিয়ে গেলেন। হাতে কয়েকটা টাকা দিয়ে বললেন—"যা তুই ছাড়া পেয়ে গেলি। জীবনে আর বাঁদীগিরি করতে হবে না।"

ভঁ্যা করে কেঁদে ফেলল মালিক। শ্রীমতির চরণে জীবন নিবেদন বরতে চায়—কোথাও যেতে চায় না।

নরম গলায় সেন্ট বেরেন বললেন—"মন্দ কি। অনেক সেবা করবে। রেখে দে।"

রাজী হলেন শ্রীমতি মোরনাস। কৃতজ্ঞতায় গদগদ হয়ে সেন্ট বেরেনের দুগালে অজস্র চুমু খেয়ে বসল মালিক। ভদ্রলোক তো মহা অপ্রস্তুত! পরের দিন আমাদের বলেছিলেন, জীবনে নাকি এমন গা ঘিনঘিনে অভিজ্ঞতা তাঁর হয়নি।

এইতো গেল প্রথম দিনের অভিজ্ঞতা।

এত খুঁটিয়ে কাল থেকে আর লিখব না—পুনরাবৃত্তি হবে। পাঠক-পাঠিকারা বুঝে নেবেন।

আমিদী ফ্লোরেন্স।

৫ ॥ দ্বিতীয় প্রবন্ধ

আমিদী ফ্লোরেন্সের দ্বিতীয় প্রবন্ধ 'লা এক্সপ্যানসন ফ্রাঁসে' পত্রিকায় ছাপা হল ১৮ই জানুয়ারী।

বারজাক মিশন

(লিখেছেন আমাদের বিশেষ প্রতিনিধি)

দাউহোরিকো, ১৬ই ডিসেম্বর। —গত রিপোর্টটা লিখেছিলাম লণ্ঠনের

আলোয়, ঝোপের মধ্যে। তারপর থেকে উল্লেখযোগ্য কিছু ঘটেনি।

দোসরা ডিসেম্বর ভোর পাঁচটায় তাঁবু গুটোলাম। একটা গাধার পিঠের বোঝা আমরা ভাগাভাগি করে নিলাম। মালিক কিছু বইতে লাগল। ও এখন খুব হাসছে। ফুর্তিতে আছে। রাস্তা ভাল। চারপাশে দারিদ্র্যের চিহ্ন চোখকে বড় পীড়া দিচ্ছে। দূরে দূরে দু'একটা টিলা পড়ছে। বেশীর ভাগ জমিই সমতল। ছোট গাছ, পাঁচমিশেলী আগাছা আর দু'তিন গজ লম্বা ঘাস জমিই বেশী। মাঝে মাঝে বন জঙ্গল পাতলা হয়ে গেছে গরম কালে দাবানলের দাপটে। এ ছাড়া দেখছি চাষ করা জমি—এদেশের ভাষায় বলে 'লোগান'।

গ্রামগুলোর নাম বড় অদ্ভুত। ফোনগৌমবি, মানফোরৌ, কাফো, ওসৌ ইত্যাদি। আমি তো হাল ছেড়ে দিয়েছি! সোজা নাম রাখলে কি হয়?

সবচেয়ে দীনহীন গ্রামগুলোয় হানা দিচ্ছেন অভিযানের দুই কর্তা। জিজ্ঞাসাবাদ করছেন। দুজনেই মনের মত খোরাক নিশ্চয় পাচ্ছেন। নইলে খুশীমনে ফিরবেন কেন?

পথে নদী পড়ছে প্রায় রোজই। বর্ণনা দেওয়ার মত নয়।

সন্ধ্যায় তাঁবু খাটালাম ঘাউলিয়া গ্রামে। শুতে গেছি, এমন সময়ে সেন্ট-বেরেন কে দেখলাম গেঞ্জী আর প্যান্ট গায়ে আমার কিটব্যাগ খুলে জিনিসপত্র ছড়িয়েছেন মেঝেতে। নিজের গায়ের বসনও ছড়ানো চারপাশে। মেজাজ তিরিক্ষে। আমাকে দেখেই ভীষণ সিরিয়াস হয়ে বললেন—"আনমনা লোক-দের আমি দুচক্ষে দেখতে পারি না।"

"হল কী?"

"আমার পাজামা কোথায়? নিশ্চয় চৌমৌকি ফেলে এসেছে। কাল রাত্রে যেখানে রাত কাটিয়েছি—সেখানেই পড়ে আছে।"

"সেন্ট বেরেন, আপনি কিন্তু আমার কিটব্যাগ হাঁটকাচ্ছেন। এ তাঁবুটা আমার—আপনার নয়।"

"অ্যাঁ!" বলে চোখ কপালে তুলে ফেললেন সেন্ট বেরেন। পরক্ষণেই ছড়ানো জামাকাপড় দুহাতে জড়ো করে বুকের কাছে ধরে তীরবেগে দৌড়ালেন নিজের তাঁবু খুঁজতে।

সত্যিই বড় ভাল লোক।

পরের দিন সাতুই ডিসেম্বর সকালবেলা পথচলা শেষ করে টেবিলে বসতে না বসতেই লক্ষ্য করলাম কয়েকজন নিগ্রো উঁকি মেরে দেখছে আমাদের।

ক্যাপ্টেন মারসেনে তুজন সৈন্য পাঠালেন। সরে পড়ল নিগ্রোরা। কিছুক্ষণ পরেই ফের উঁকি দিল অন্য দিক থেকে। শেষকালে গেল মোরিলিরে। ফিরে এসে বলল, সওদা করতে এসেছে নিগ্রো ব্যবসায়ীরা, কেউ এনেছে মাটির বাসনপত্র, কেউ ঝুড়ি, কেউ লোহা, আর কাঠের জিনিস, কেউ অস্ত্রশস্ত্র, কাপড়চোপড়, আর কোলা বাদাম।

কোলা বাদামের নাম শুনেই জিভে জল এসে গেল ডক্টর চাতোন্নের। দারুণ সুখাদ্য। ডাকা হল ব্যবসায়ীদের। সামান্য একটু নুনের বিনিময়ে দিয়ে গেল রাশি রাশি কোলা বাদাম। নুন এ জায়গায় পাওয়া যায় না। তাই ইউরোপ থেকে কয়েক জার ভর্তি কেবল নুন এনেছিলাম সঙ্গে।

এরপর নাচগান। তন্ত্রমন্ত্র জানা ডাকিনী-ডাক্তারদের ডাকলাম। ওরা খুশী হয়ে লাউয়ের খোলায় পাশাপাশি তিনটে কঞ্চির ওপর তাঁতের তার লাগানো গীটার আর লাউয়ের খোলায় লাগানো বাঁশের বাঁশি বাজিয়ে এমন জগঝম্প বাজনা আরম্ভ করে দিল যে কহতব্য নয়। সেই সঙ্গে একজন তিন ইঞ্চি চওড়া ন্যাকড়ার পট্টি পায়ে বেঁধে উদ্দাম নাচ নেচে গেল সমানে। গোল হয়ে বসে আর সবাই বিকট বেসুরো গলায় খুব সম্ভব ভজনা করে গেল চাঁদ, সূর্য, তারা আর শ্রীমতি মোরনাসের।

উদ্দাম নাচগানে গা ভাসালাম আমরাও। প্রথমে অশ্বতর চালকরা খাবারদাবার ফেলে এসে হাত ধরাধরি ব্যালে নাচ আরম্ভ করল। দেখে সসপ্যান, থালা, বাটি নিয়ে আমরা চামচে, হাতুড়ি, হাতা দিয়ে বাজাতে লাগলাম মনের আনন্দে। মাথায় তোয়ালে বেঁধে পাগড়ি বানিয়ে নাচের আসরে নেমে পড়লেন গন্যমান্য বারজাক। এমন কি গোমরা মুখো বদ্রিয়ার্স মুখে ঘোমটা দিয়ে শুরু করে দিলেন ধেই ধেই নৃত্য। হেসে কুটিপাটি হলেন শ্রীমতি মোরনাস। পরমানন্দে ডিস বাজাতে গিয়ে তুটুকরো করলেন সেন্ট বেরেন এবং ভাঙা তুটুকরো নিয়েই বাজিয়ে গেলেন তালকাটা ছন্দে।

যাই হোক, দম ফুরোলো এক সময়ে। থামল নাচ গান।

সন্ধ্যের পর ফের তাঁবু পড়ল। শুতে গিয়ে একটা অপকর্ম করলাম—সব সংবাদদাতাই যা করে।

আমার তাঁবু পড়েছিল শ্রীমতি মোরনাসের তাঁবুর পাশে। হঠাৎ কানে ভেসে এল টোনগানের সঙ্গে কথা বলছেন শ্রীমতি। কি তুর্মতি হল, চোখ বন্ধ না করে কান খাড়া করলাম।

শুনলাম শ্রীমতি বলছেন—"টোনগানে, তুমি নিজে আশান্তি হয়ে সেনে-

গানে থাকতে গেলে কেন? চাকরিতে ঢোকার সময়ে বলেছিলে সব—আবার বলবে?"

আরে সর্বনাশ! টোনগানে তাহলে বামবারা নয়!

টোনগানে বললে—"ক্যাপ্টেন ব্লেজনের জন্যে..."

ক্যাপ্টেন ব্লেজন! নামটা যেন শুনেছি মনে হচ্ছে?

"...ওঁর দলে আমিও ছিলাম। তারপরেই ইংরেজরা এসে গুলি করল আমাদের।"

"কেন গুলি করল?"

"ক্যাপ্টেন ব্লেজন বিদ্রোহ করেছিলেন বলে। খুনখারাপি লুঠতরাজ করে বেড়াচ্ছিলেন বলে।"

"সত্যি"

"একদম সত্যি। গ্রামের পর গ্রাম পোড়াচ্ছিলেন। গরীব দুঃখী নিগ্রোদের খুন করছিলেন। বাচ্চাকাচ্চা মেয়েরাও পার পায়নি।"

"ক্যাপ্টেন ব্লেজনের হুকুমে হচ্ছিল?"

"না। তাঁকে কখনো দেখিনি। আরেকজন সাদা মানুষ আসার পর থেকে উনি আর তাঁবু থেকেই বেরোননি। সেই লোকটাই হুকুম দিয়ে যাচ্ছিল ক্যাপ্টেন ব্লেজনের নাম করে।"

"কদ্দিন তোমাদের সঙ্গে ছিল এই লোকটা?"

"পাঁচ ছ মাস তো বটেই।"

"কোথায় প্রথম দেখা হয়েছিল?"

"জঙ্গলে।"

"ক্যাপ্টেন ব্লেজন তাকে খুব খাতির করেছিলেন?"

"কখনো ছাড়াছাড়ি হন নি—তাঁবু থেকে বেরোনো বন্ধ করার আগের দিন পর্যন্ত সব সময়ে একসঙ্গে থাকতেন।"

"সেই দিন থেকে খুনজখম লুঠতরাজ শুরু হয়?"

দ্বিধায় পড়ল টোনগানে—"ঠিক বলতে পারব না।"

"সাদা লোকটার নাম মনে আছে?"

ঠিক এই সময়ে বাইরে প্রচণ্ড আওয়াজ হওয়ায় টোনগানের জবাবটা শুনতে পেলাম না। তার জন্যে আপশোষও হল না। অতীত নিয়ে দরকার কি আমার?

শ্রীমতি মেরিনাস বললেন—"ইংরেজরা তোমাদের ওপর চড়াও হওয়ার

পর কি হল ?”

“ডাকারে যখন চাকরি দেন আমাকে, তখন তো একবার বলেছি।”

“আবার বল।”

“ভয়ের চোটে জঙ্গলে পালালাম। পরে এসে দেখলাম লড়াই থেমে গেছে, শুধু লাশ পড়ে আছে। বন্ধুদের কবর দিলাম। সেই সঙ্গে ক্যাপ্টেন ব্লেজনকে।”

অস্ফুট চিৎকার করলেন শ্রীমতি মোরনাস।

টোনগানে থামল না—“পাঁচ বছর নানা জায়গায় ঘুরে পৌঁছোলাম টিম-বাকটুতে। সেখাতে কাজ করলাম কিছুদিন। তারপর গেলাম সেনেগালে—দেখা হল আপনার সঙ্গে।”

“ক্যাপ্টেন ব্লেজন তাহলে মারা গেছেন ?”

“আজ্ঞে।”

ক্ষণেক নীরবতা। তারপর—

“কবরটা কোথায় জানো ?”

“নিশ্চয় ? চোখ বেঁধে ছেড়ে দিলেও খুঁজে দোব।”

আবার কিছুক্ষণ চুপচাপ। তারপর—

“গুড নাইট, টোনগানে।”

শ্রীমতির শয়নের শব্দ পেলাম। আমিও সেই উদ্যোগ করলাম। কিন্তু চোখ বোঁজবার আগেই বিদ্যুৎ চমকের মত মনে পড়ে গেল সব কথা।

ক্যাপ্টেন ব্লেজন ! বিদ্রোহী ক্যাপ্টেন ব্লেজন ! ডাকাত, খুনী, ক্যাপ্টেন ব্লেজন ! আমার সম্পাদককে পই পই করে তখন বলেছিলাম, জঙ্গলে গিয়ে ব্লেজনের কথাটা শুনে আসতে দিন। টাকা খরচের ভয়ে প্রথমটাই রাজী হন নি। রাজী যখন হলেন, ব্লেজন তখন মারা গেছেন।

সেই ক্যাপ্টেন ব্লেজনের গল্প রাতের অন্ধকারে টোনগানের মুখে শুনছিলেন শ্রীমতি মোরনাস !

এ আবার কি রহস্য ?

পরের দিন আটুই ডিসেম্বর সেন্ট বেরেন আবার হাসির খোরাক হলেন। তাঁবু তুলে দুঘন্টা যেতে না যেতেই ঘোড়ার পিঠে বসেই ‘ত্রাহি ত্রাহি’ রব এবং তুরুক তুরুক নাচ আরম্ভ করলেন ভদ্রলোক।

কি ব্যাপার ? কি ব্যাপার ? ব্যাপার শোনার পর হাসতে হাসতে পেট ফেটে যায় আর কি আমাদের !

পাঠক পাঠিকাদের নিশ্চয় মনে আছে, অভিযানের শুরুতে মাসীর (অথবা ভাগ্নীর) তাড়া খেয়ে একমুঠো বঁড়শি পকেটে চালান করেছিলেন সেন্ট বেরেন। তারপর তা ভুলে মেরে দিয়েছেন। এখন ঘোড়ার ঝাঁকুনিতে বিশেষ ধরনের সেই বঁড়শিরা শোধ তুলেছে। মাত্র তিনটি গেঁথে গেছে পশ্চাৎ প্রদেশে।

পশ্চাৎ প্রদেশ খামচে ধরে ভদ্রলোক অবতীর্ণ হলেন ঘোড়ার পৃষ্ঠদেশ থেকে—মুখের চেহারাখানা তখন দেখবার মত। ডক্টর চাতোন্নে ডাক্তারী ছুরি নিয়ে মাংস চিড়ে বার করে দিলেন বঁড়শি তিনটে।

প্রথম বঁড়শি টেনে তুলে বললেন—"যে দেখবে সেই বলবে বঁড়শিতে মাছ গেঁথেছে!"

"উফ!" জবাব দিলেন সেন্ট বেরেন।

দ্বিতীয় বঁড়শি টেনে তুলে বললেন—"ভাল মাছই বলতে হবে।"

"উফ!" ফের জবাব দিলেন সেন্ট বেরেন।

"এমন মাছ ধরার জন্যে বুক দশহাত হওয়া উচিত আপনার!" শেষ টিপ্পনী কাটলেন ডক্টর।

"উফ!" শেষ জবাব দিলেন সেন্ট বেরেন।

তার পর থেকে আর একটি কথাও বললেন না। ব্যাণ্ডেজ বেঁধে ধরে তুলে দেওয়া হল ঘোড়ার পিঠে। বৈরাগী বাবা'র মত বসে রইলেন আকাশের দিকে তাকিয়ে। পর-পর দুইদিন গেল এই ভাবে।

অতুলনীয় লোক বটে!

বারোই ডিসেম্বর বোরোনিয়া গ্রামে পৌছোলাম। ছোকরা মোড়ল খুব খাতির করল। একটু নুন, বারুদ আর দুটো ক্ষুর পেয়ে আনন্দে আটখানা হল। চাবুক হাঁকড়ে লোকজন দিয়ে গাঁয়ের বাইরে খড়ের কুঁড়ে বানিয়ে আমাদের রাত কাটানোর ব্যবস্থা করে দিল। ষাঁড়ের চামড়া দিয়ে মেঝেতে কার্পেট পাতা হচ্ছে কেন জিজ্ঞেস করায় লোকগুলো বুঝিয়ে দিলে, বড্ড পোকা বেরোয় কিনা মাটি ফুঁড়ে—তাই। একমুঠো কড়ি দিলাম এত যত্ন করার জন্যে। আনন্দে লাফিয়ে উঠে দীনহীন লোকগুলো থুক করে থুথু ছিটোলো কুঁড়ের দেওয়ালে এবং হাতের চেটো দিয়ে রগড়াতে লাগল সেই থুথু!

সেন্ট বেরেনের জায়গা করা হয়েছিল আমার কুঁড়েতে। উনি বললেন, নিগ্রোরা সম্মান জানিয়ে গেল এইভাবে।

ভাল!

তেরোই ডিসেম্বর সকালবেলা টিম্বো পৌঁছোলাম। মাটির দেওয়াল দিয়ে ঘেরা তিনটে গ্রাম। এদেশের ভাষায় এ দেওয়ালের নাম 'টাটা'। গ্রামের মাঝে মাঝে গরু ভেড়া মোষ চড়ার সবুজ মাঠ। প্রত্যেক গ্রামে রোজ হাট বসে। সপ্তাহে একদিন বড় হাট বসে। প্রতি চারটে কুঁড়ের মধ্যে একটায় শুধু জঞ্জাল জমা থাকে। জঞ্জাল দেখলাম রাস্তাঘাটে সর্বত্র। এরা শুধু নোংরা নয়। অত্যন্ত গরীব এবং বেজায় কুৎসিতও বটে। ছেলেপুলেদের চামড়া ফুটে হাড় বেরিয়ে আসছে যেন। তাসত্ত্বেও মেয়েগুলোর চালিয়াতির সীমা নেই। সাজগোজের কি বাহার!

টিম্বোর গুরুত্ব আছে। অভিযান শুরু করার পর এই প্রথম একটা গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় পৌঁছোলাম। শরীরও খুব ক্লান্ত। কুলি আর গাধারা তো একেবারে এলিয়ে পড়ছে। তাই দুদিন জিরেন নেওয়া হল টিম্বোতে।

যেদিন পৌঁছোলাম, তার পরের দিন সারাদিন গাইড মোরিলিরির টিকি দেখা গেল না! মহা ভাবনায় পড়লাম আমরা। তার পরের দিন, মানে পনেরো তারিখে ভোরবেলা মোরিলিরির হাঁক ডাকে ঘুম ভাঙল। কুলিদের তাড়া লাগাচ্ছে। জিজ্ঞেস করলাম—'কোথায় ডুব মেরেছিলে বাছাধন?' অবাক হয়ে বললে মোরিলিরে—'কোথাও যাইনি তো!' আর কথা বাড়ালাম না। টুপ করে ডুব মারা এমন কিছু অপরাধ নয়।

টিম্বোর পর থেকেই রাস্তা খারাপ হতে লাগল, চড়াই উৎরাই পড়ল। বুঝলাম, সত্যিকারের অভিযান আরম্ভ হল একবার। পাহাড় পেরোতে হল একবার। পৌঁছোলাম দাউহেরিকো গ্রামে। তখন সন্ধ্যে ছটা।

খুব খাতির করল গাঁয়ের মোড়ল। বারজাক খুশী হলেন। বললেন "আরে বাবা। লোকদের সঙ্গে না মিশলে মানুষ চেনা কি যায়?" বদ্রিয়ার্স মুখ টিপে রইলেন। সংশয় যায় নি এখনো।

গাঁয়ের সব চাইতে ভালো কুঁড়ে ঘরগুলোয় আমাদের থাকার ব্যবস্থা করে দিল মোড়ল। শ্রীমতি মোরনাসকে থাকতে বলল তার নিজের আস্তানায়। অভিভূত হলাম আমরা। মালিক বাদে। হন্তদন্ত হয়ে এসে শ্রীমতি মোরনাসকে বললে আস্তে আস্তে—'যাবেন না! গেলে মরবেন!'

বলে কি মেয়েটা! শ্রীমতি তো হতভম্ব, আমি এবং ক্যাপ্টেনও। দুজনেই শুনে ফেলেছিলাম মালিকের হুঁশিয়ারি।

পর মুহূর্তেই মনস্থির করে ফেললেন ক্যাপ্টেন। হুকুম দিলেন তাঁবু খাটানোর। গ্রামে নয়—রাত কাটানো হবে তাঁবুতে।

ক্যাপ্টেন নিগ্রোচরিত্র জানেন বলেই কি মোড়লের আতিথেয়তা বর্জন করলেন? মালিক কেন হুঁশিয়ার করল? বদ্রিয়ার্স ঠিক না, বারজাক ঠিক? মহা গোলমালে পড়লাম আমি। আমিদী ফ্লোরেন্স।

৬ ॥ তৃতীয় প্রবন্ধ

পাঁচুই ফেব্রুয়ারী 'লা এক্সপ্যানসন ফ্রাঁসে' পত্রিকায় বেরোলো আমিদী ফ্লোরেন্সের লেখা তৃতীয় প্রবন্ধ। এইটাই শেষ প্রবন্ধ—রিপোর্টার আর খবর পাঠান নি—কারণ রহস্যাবৃত।

বারজাক মিশন

(নিজস্ব সংবাদদাতার খবর)

ক্যানক্যান, ২৪শে ডিসেম্বর।—গতকাল সকালে এখানে পৌঁছেছি—রওনা হচ্ছি আগামীকাল—বড়দিনের প্রভাতে। মন কেমন করছে তুষার ছাওয়া দেশের মাটির জন্য। এমন দিনে না জানি সেখানে কি হুল্লোড়ের আয়োজন চলছে।

গত রিপোর্ট লিখেছিলাম, মালিক আমাদের কালা আদমীদের গ্রামে উঠতে বারণ করেছে। গেলেই মৃত্যু। ক্যাপ্টেন মারসিনে হুঁশিয়ার হয়ে গেছেন। গাঁয়ের লোকদের দূর-দূর করে তাড়িয়ে দিয়েছেন। তাঁবুর পাঁচশ গজের মধ্যে আসতে বারণ করেছেন। বদ্রিয়ার্স তাতে মহাখুশী। কিন্তু রেগে টং হলেন বারজাক। হন হন করে গেলেন ক্যাপ্টেনের সামনে। কড়া গলায় জানতে চাইলেন—"কার হুকুমে আপনি চলবেন?"

"আপনার।" বিনীত কিন্তু নিরুত্তাপ জবাব দিলেন ক্যাপ্টেন।

"তাহলে গাঁয়ের লোকদের আতিথেয়তা নেওয়া হল না কেন?"

"আপনারই নিরাপত্তার জন্যে। আমার কাজ তাই।'

তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলেন বারজাক—"নিরাপত্তা থাকবে না কি করে জানছেন?"

"একটা চক্রান্ত চলছে—খবর কানে এসেছে।"

"চক্রান্ত! টিম্বো থেকে মাত্র বিশ মাইল দূরে সজ্জন নিগ্রোরা চক্রান্ত করবে আমাদের বিরুদ্ধে? খবরটা কার কাছে শুনেছেন?"

"মালিকের কাছে।"

"মালিক !" হো হো করে হেসে উঠলেন বারজাক—'কয়েক পয়সা দামের একটা বাঁদীর কথায় নাচছেন আপনি ?"

ছুটো ভুল করলেন বারজাক। প্রথম, মালিক তার বাঁদী নেই। দ্বিতীয়, তার দাম কয়েক পয়সা নয়—অনেক বেশী। একটা পুরোনো বন্দুক, একটা কাপড় আর কড়কড়ে পঁচিশটা ফ্রাঁ।

বারজাক তখনো ফুঁস্‌ছেন—"একটা বাঁদীর কথায় ভয় পেলেন ?"

আর যায় কোথায় ? ভয় বলতেই ক্যাপ্টেন অগ্নিমূর্তি ধারণ করতে গিয়েও সামনে নিলেন নিজেকে।

বারজাক বললেন—"আমি যাচ্ছি গ্রামে—রাত কাটাবো ওদের সঙ্গে। দেখিয়ে দেবো কার সাহস বেশী।"

ক্যাপ্টেন শুধু বললেন—"আমার কাজ কিন্তু আমি করে যাবো—আপনি যেতে চাইলেও আপনার নিরাপত্তা আমি দেখব।"

"তার মানে ?"

"আপনাকে তাঁবুতে আটকে রাখব" বলে গটগট করে বেরিয়ে গেলেন ক্যাপ্টেন।

এ ঘটনা ঘটল শ্রীমতি মোরনাসের সামনে। তাই আরো ক্ষেপে গেলেন বারজাক। কিন্তু ঠাণ্ডা করলেন শ্রীমতি নিজেই।

বললেন—"মালিকের সঙ্গে এ নিয়ে আমার কথা হয়েছে। ডোঔং-কোনো কাকে বলে জানেন ?"

জবাবটা দিলেন ডক্টর চাতোন্নে—"আমি জানি। মারাত্মক বিষ। বিষ দেওয়ার পর আটদিনের মধ্যে বিষ ক্রিয়া ধরা পড়ে না। কি করে তৈরী হয় জানেন ?"

বারজাক তখন শুনছেন না—ফুঁসছেন।

শ্রীমতি মোরনাস বললেন—"কি করে ?"

"মড়ার পেটে জোয়ারের বোঁটা ঢুকিয়ে রাখা হয়। একুশদিন পরে টেনে বার করে গুঁড়িয়ে দুধ বা সরবতের সঙ্গে মিশিয়ে খাইয়ে দেওয়া হয়। স্বাদহীন বলে ধরা যায় না। কিন্তু আটদিনের মাথায় পেট ফুলতে থাকে। ওষুধপত্তরে কোনো কাজ হয় না। মৃত্যু হয় দুদিন পরে।" বলে অষ্টাদশ শতাব্দীতে লেখা রক্ত জমানো একটা রোমাঞ্চ কবিতার দুটো পংক্তি আবৃত্তি করে শোনালেন ডক্টর চাতোন্নে।

শ্রীমতি মোরনাস বললেন—"মালিক ঠিক এই চক্রান্তই শুনে ফেলেছে

গ্রামে গিয়ে। আজ রাতেই সরবতের সঙ্গে বিষটা খাওয়ানো হবে আমাদের প্রত্যেককে। কাল রওনা হব—ওরাও পেছন পেছন যাবে। সৈন্যসামন্ত, কুলি এবং আমরা পটল তুললে আমাদের ঘোড়া, গাধাবন্দুক, জিনিসপত্র লুঠ করবে।”

বারজাক হাঁ করে শুনলেন। সুযোগ পেয়ে বড্রিয়ার্স মুখ খুললেন—“কি ? বলিনি আপনাকে ? নরপিশাচদের সভ্য মানুষ বলে মাথায় তুলতে চাইছিলেন যে, এবার কি হয় ?”

বারজাক ফেটে পড়লেন এবার—“গ্রাম পুড়িয়ে ছাই করে দোব কাল সকালেই।”

আঁৎকে উঠলেন শ্রীমতি মোরনাস—“অনেক দূর যেতে হবে খেয়াল থাকে যেন। ও কাজটি করতে যাবেন না।”

ফোড়ন দিলেন বড্রিয়ার্স—“সে কি কথা! মঁসিয়ে বারজাক তো নাইজার বেণ্ডের এই অসভ্যদের হাতেই রাজনৈতিক ক্ষমতা তুলে দিতে চাইছেন!”

বারজাক পাল্টা জবাব দিতে যাচ্ছিল—আটকে দিলেন শ্রীমতি। বললেন —“এক গাঁয়ের লোক দেখে সব গাঁয়ের লোককে কি বিচার করা চলে ?”

বারজাককে আর আটকানো গেল না—“ভদ্রমহোদয়গণ, এ ছাড়াও আরেকটা দিক ভাবতে হবে। আমরা, সুসভ্য নাগরিকরা কি কোনো চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে ভয় পাই ? বিঘ্ন দেখে কি সরে আমি ? পূর্ববর্তী বক্তা এই মাত্র যা বললেন—”

পূর্ববর্তী বক্তা, মানে শ্রীমতি মোরনাস পটাপট হাততালি দিয়ে মাঝ পথে থামিয়ে দিলেন বারজাককে—“তাহলে তো হয়েই গেল। অভিযান চলবে —কিন্তু রক্তপাত এড়োতে হবে—ক্যাপ্টেন মারসিনের কথা মত নিরাপত্তা বজায় থাকবে।”

“ক্যাপ্টেনের কথা মত!” বাঁকা স্বরে বললেন বারজাক।

“অত বিদ্রূপ করবেন না, মঁসিয়ে বারজাক। ক্যাপ্টেনের কাছে গিয়ে আপনার ক্ষমা চাওয়া উচিত। যিনি জীবন বাঁচালেন, তাঁকেই আপনি দাবড়ানি দিয়েছেন একটু আগে।”

বারজাকের মাথা গরম হতে পারে, কিন্তু লোক ভাল। সঙ্গে সঙ্গে গেলেন ক্যাপ্টেনের কাছে। হাত বাড়িয়ে করমর্দন করলেন আন্তরিকভাবে—ক্ষমা চাইলেন। ক্যাপ্টেন তো অবাক।

“সে কী! আমি তো সব ভুলেই গেছি।”

বেশ বুঝলাম, দুজনের বন্ধুত্বে আর চিড় খাবে না।

একটা সমস্যা মিটতে না মিটতেই হাজির হল আর একটা সমস্যা। সেন্ট বেরেনকে খুঁজে পাওয়া গেল না কোনো তাঁবুতে!

টোনগানে চুপিচুপি এসে বললে—"সাহেব লুকিয়ে আছেন।"

"কোথায়?"

"আসুন দেখাচ্ছি।"

তাঁবুর পেছন দিকে একটা ঝিরঝিরে জলধারার পাশে ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে বসে থাকতে দেখলাম সেন্ট বেরেনকে। একটা ব্যাঙ ধরে দু মুখ ছুঁচোলো গুণছুঁচ ঢুকিয়ে দিচ্ছেন মুখের মধ্যে দিয়ে। আর ফোঁস ফোঁস দীর্ঘশ্বাস ফেলছেন—ব্যাঙের কষ্টে যেন বুক ফেটে যাচ্ছে।

"ঙটোরি দিয়ে মাছ ধরবেন," ফিসফিস করে বললে টোনগানে। 'ঙটোরি' মানে ব্যাঙ।

গুণছুঁচের এক মাথায় একটা সুতো বেঁধা ছিল। সুতো হাতে নিয়ে প্রায় জ্যান্ত ব্যাঙটাকে ঘাসে রেখে দিলেন সেন্ট বেরেন। বেশীক্ষণ বসতে হল না। জল থেকে উঠে এল গিরগিটির মত বিরাট বিদঘুটে একটা জীব।

"গুইলেটাপি," মানে, 'ইগুয়ানা', ফিসফিস করে বললে টোনগানে।

ব্যাঙটাকে মুখব্যাদান করে গিলেই মুস্কিলে পড়ল বেচারী ইগুয়ানা। ছুঁচ আটকে গেল গলায়। টান পড়ল সুতোয়। সেন্ট বেরেন তাকে টেনে আনলেন কাছে। কিন্তু হাতের লাঠি দিয়ে দমাস করে মারতে পারলেন না একবারও—আস্তে আস্তে বাড়ি মারতে লাগলেন আর ফোঁস ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলতে লাগলেন। ইগুয়ানার হাল দেখে বুক যেন ফেটে যাচ্ছে।

টোনগানে আর সইতে পারল না। তীরবেগে ছুটে গিয়ে লাঠিটা হাত থেকে কেড়ে নিয়ে দমাস করে এক ঘায়ে খতম করে দিল ইগুয়ানাকে। এবার যে লম্বা নিঃশ্বেসটা ফেললেন সেন্ট বেরেন—সেটা খুশী হওয়ার নিঃশ্বেস।

খাসা রান্না হবে কালকে, বললে টোনগানে।

পরেরদিন ১৬ই ডিসেম্বর সকালবেলা গ্রামটাকে বেড দিয়ে রওনা হলাম আমরা। ছোকরা মোড়লটাকে চোখে পড়ল। কটমট করে দেখছে আমাদের।

পথে একটা সত্যিকারের নদী পড়ল—জলহস্তী আর কুমীর কিলবিল করছে। এতদিন যেসব নদী পেরিয়েছি—তাতে গোড়ালি ডুবেছে। এবার ডুবল ঘোড়ার পা। আমরা পেরিয়ে এলাম বটে, কিন্তু ঘাড় বেঁকিয়ে মাটিতে পা ঢুকিয়ে রুখে দাঁড়াল গাধার দল। কেউ জলে নামবে না।

"দীক্ষা চাইছে", বললে একজন অশ্বতর চালক। নদীর জল নিয়ে ছিটিয়ে দিল গাধার মুখে। ছায়ার তাপমাত্রা তখন ৮৬ ডিগ্রী। তাই ঠাণ্ডা জলের ছোঁয়া পেয়ে আকৃষ্ট হয়েই যেন গাধার দল হোঁকর হোঁকর করে বার কয়েক ডেকে নিয়ে ঝাঁপ দিলে জলে—গড়াগড়ি দিতেই পিঠের বোঝা ভেসে যাওয়ার উপক্রম হল গভীর জলে।

তারস্বরে চেঁচাতে লাগলেন বারজাক। মুণ্ডপাত করতে লাগলেন কুলি আর অশ্বতর চালকদের। মোরিলিরে গিয়ে থামাল তাঁকে! বলল - "অত চেঁচাবেন না সাহেব। কুলিরা লোক ভাল। দেখুন না এখুনি সব ঠিক হয়ে যাবে।"

একঘেয়ে যাত্রাপথে চনমনে অ্যাডভেঞ্চারের কাহিনী বলতে পারছি না বলে নিজেই লজ্জা পাচ্ছি। নদীতে জলহস্তী আর কুমির ছাড়া আজ পর্যন্ত সেরকম কিছু চোখে পড়ল না।

দাউহেরিকো গ্রাম পেরিয়ে আসার পর পাহাড় টপকে টিনকিসো উপত্যকায় পৌঁছোলাম। এখানে দেখলাম চৌমৌকি টোনগানের সঙ্গ ছেড়ে খুব দোস্তি পাতিয়েছে মোরিলিরের সঙ্গে—একসাথে যাচ্ছে। সেই ফাঁকে টোনগানে মালিকের সঙ্গে খুব গুলতানি চালাচ্ছে—

পাড়াগেঁইয়া রোম্যান্স শুরু হল কিনা, কে জানে!

এরপরেই আবার জঙ্গল শুরু হল—তবে ফাঁকা ফাঁকা গাছ। শুকনো জমি। বৃষ্টি নেই বলেই যেন মাটি ফাটছে।

দাউহেরিকো ছেড়ে আসার তিনদিন পরে একটা ছোট্ট ঘটনা ঘটল। মজার ব্যাপার।

বন্দুক দেখে যাতে গাঁয়ের লোক আমাদের শত্রু ঠাউরে না বসে, তাই ক্যাপ্টেনের হুকুমে বন্দুক-টন্দুক সব ছালায় মুড়ে রাখা হয়েছিল। তা সত্ত্বেও একটা গাঁয়ের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময়ে তিনজন নিগ্রো উঁকি মেরে আমাদের দেখে যাওয়ার পরেই দমাদম ঢিল পড়তে লাগল সেন্ট বেরেনের পিঠে। সেই সঙ্গে শোনা গেল চীৎকার—"মারফা! মারফা!"

মানে, বন্দুক! বন্দুক!

কিন্তু বন্দুক কোথায়?

এমন সময়ে শোনা গেল রেগে কাঁই হয়ে চেঁচাচ্ছেন সেন্ট বেরেন—"হারামজাদারা আমার ছিপের চোঙায় ঢিল ছুঁড়ছে! তবে রে—"

বলে ঘোড়া থেকে নেমে নিগ্রোদের পেছনে তাড়া করলেন ভদ্রলোক।

অতি কষ্টে রুখলাম আমরা। ঢিল ছোঁড়ার কারণটা এবার বোঝা গেল। নিকেল করা চকচকে চোঙা দেখে বন্দুক মনে করেছে নিগ্রোরা।

ক্যাপ্টেন হুকুম দিলেন—চোঙা চালান যাক গাধার পিঠে। সেন্ট বেরেন বেঁকে বসলেন—"কখনোই না। থাকবে আমার পিঠে।"

শেষ পর্যন্ত তাই থাকল—কাপড় দিয়ে মুড়ে দেওয়া হল।

সত্যিই বড় আজব লোক এই সেন্ট বেরেন!

ক্যানক্যান পৌঁছোলাম বারো ঘন্টা দেরী করে—তেইশ তারিখে দেরীর কারণ মোরিলিরে। ২২ তারিখে লাঞ্চের পর বেরুতে যাচ্ছি এমন সময় দেখা গেল সে নেই। কাজেই অপেক্ষা করতে হল।

পরের দিন সকাল বেলা কাক ডাকার আগেই মোরিলিরেকে দেখা গেল তম্বি করছে কুলিদের ওপর। এবার আর অস্বীকার করতে পারল না। বললে, গিয়েছিল আগের তাঁবুতে। ভুল করে ক্যাপ্টেনের ম্যাপটা ফেলে এসেছিল সেখানে। ক্যাপ্টেন বেশ করে কড়কে দিলে মোরিলিরেকে। কিন্তু জের ফুরোলো না। সেন্ট বেরেন একটা অদ্ভুত খবর দিলেন। রাত্রে ভাল ঘুম হয় নি বলে ভোর রাতে উঠে পড়েছিলেন ভদ্রলোক। মোরিলিরেকে উনিই দেখেছেন। কিন্তু সে তো এসেছে পূর্বদিক থেকে—যেদিকে আমরা যাচ্ছি। ফেলে আসা তাঁবু পশ্চিম দিকে—সেদিক থেকে মোরিলিরে আসেনি।

অর্থাৎ সে মিথ্যুক!

সেন্ট বেরেন কি দেখতে কি দেখেছেন ঈশ্বর জানেন। পরের তাঁবুতে ঢুকে যে নিজের তাঁবু মনে করে তার কাছে উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিমের তফাৎ আছে নাকি? পাত্তা দিলাম না খবরটায়।

আর একটা ছোট্ট ঘটনা ঘটল ক্যানক্যান পৌঁছানোর পর। বেশ কিছুদিন ধরেই মোরিলিরে ঘ্যানঘ্যান করছিল ওদেশের ডাকিনী ডাক্তারের কাছে আমাদের নিয়ে যাবে—ভেল্কী দেখাবে—জাদুমন্ত্রের বুকনি শোনাবে।

ক্যানক্যানে এমনি একজন 'কেনিয়েলালা' আছে, তার আবার ভবিষ্যৎ দর্শনের তৃতীয় নয়ন আছে। সব যেন চোখের সামনে দেখতে পায়।

পাত্তা দিইনি মোরিলিরেকে। আফ্রিকা অভিযানে এসে দৈবজ্ঞ জোচ্চোরদের খপ্পরে পড়তে চাই না।

ক্যানক্যান পৌঁছে বেড়াতে বেরোলাম মোরিলিরেকে নিয়ে। আমি শ্রীমতি মোরনাস, সেন্ট বেরেন, বারজাক, চৌমৌকি আর মোরিলিরে।

হঠাৎ একটা কুঁড়ের সামনে দাঁড়িয়ে গেল মোরিলিরে। প্রথমটা অতটা বুঝিনি। তারপরেই খেয়াল হল, এই কি সেই ডাকিনী ডাক্তারের চেম্বার? যার দিব্যদৃষ্টি আছে, ভবিষ্যৎ প্রত্যক্ষ করতে পারে, কুঁড়েটাও আর পাঁচটা কুঁড়ের মত মামুলি নয়?

মোরিলিরে আবার ঘ্যানঘ্যান শুরু করেছে—সেই সঙ্গে চৌমৌকি। ব্যাপার কি? ডাক্তারের কাছে দালালি পায় নাকি?

ধুত্তোর! ঘ্যানঘ্যানানি কাঁহাতক শোনা যায়। কয়েকটা কড়ি দিয়ে যদি নিস্তার পাওয়া যায়, শুনেই আসা যাক না বুজরুকটা কি বলে।

ঢুকলাম কুঁড়ের মধ্যে। কি নোংরা! কি নোংরা! মাঝে দাঁড়িয়ে ততোধিক নোংরা 'কেনিয়েলালা'। মিনিট পাঁচেক শুধু উরু চাপড়ে 'ইনি-টিলি' বলে শুভেচ্ছা জানালে। তারপর গ্যাঁট হয়ে বসল একটা মাদুরে—আমাদেরকেও বসালো। ঝাঁটার বাতাস দিয়ে একরাশ বালি জড়ো করল নিজের সামনে। তারপর অর্ধেক সাদা অর্ধেক লাল রঙের এক ডজন কোলা বাদাম চেয়ে নিয়ে রাখল বালির ওপর। দ্রুতস্বরে উচ্চারণ করে গেল দুর্বোধ মন্ত্র। বালির ওপর চতুর্ভুজ, ত্রিভুজ, বৃত্ত, এঁকে রেখে বাদামগুলো রাখল তার ওপর। হাত নেড়ে যেন আশীর্বাদ করল বাদামদের। জড়ো করল একে একে, তার পর হাত পাতল সামনে—যেন দক্ষিণা চাইছে।

এবার আমাদের প্রশ্ন করার পালা। একে একে প্রশ্ন করলাম। জবাব এল একসঙ্গে।

আমাকে বললে—"তোমার খবর আর কেউ পাবে না।"

সেন্ট বেরেনকে বললে—"ঘায়ের জ্বালায় বসতে পারবে না।"

শ্রীমতিকে বললে—"মনে দাগা পাবে।"

একটু থেমে বললে বারজাককে—"সিকাসো পেরোলেই সাদা মানুষ। হয় গোলামি, নয় মরণ।"

বেরিয়ে এলাম বাইরে। নিশ্চয় মোরিলিরে আর চৌমৌকি আগে থেকে বলে রেখেছে চারজনের সবচেয়ে দুর্বল জায়গাগুলো কোথায়। নইলে আমি যে খবর পাঠাতেই এসেছি, ডাকিনী ডাক্তার জানবে কি করে? সেন্ট বেরেনের পাছায় বঁড়শির কামড় এইতো সেদিনের ঘটনা। শ্রীমতি মোরনাসের পেছনে ক্যাপ্টেন ঘুরঘুর করছেন এবং মনে দাগা পাওয়া বিচিত্র নয়—এতো স্বাভাবিক ব্যাপার। আর বারজাকের দিবারাত্রের স্বপ্ন যে এই অভিযানের সাফল্য, তা কে না জানে?

রাত্রে খেতে বসে খুব হাসাহাসি হল এই নিয়ে। রামগড়ুরের ছানা মঁসিয়ে বত্রিয়াস´ পর্যন্ত দাঁত বার করে হাসলেন। তারপর সব ভুলে গেলাম।

কিন্তু আজ রাতে আবার নতুন করে ঘটনাপরম্পরাগুলো মনে পড়ে গেল।

দুটো আধা ঘটনা আর দুটো পুরো ঘটনা মনের মধ্যে খচখচ করে বিঁধছে কাঁটার মত।

সমস্যাটা মেলে ধরা যাক।

দুটো আধা ঘটনা হল মড়ার পেটের বিষ মিশিয়ে আমাদের মারবার চক্রান্ত আর ডাকিনী ডাক্তারের করাল ভবিষ্যদবাণী।

দুটো পুরো ঘটনা হল এই :

প্রথম : নগণ্য একটা গ্রামের মোড়লের এত সাহস এল কোত্থেকে ? এ তল্লাটে ফরাসী বাহিনী টহল দিচ্ছে। মাত্র পঁচিশ মাইল দূরে টিম্বোতে সামরিক ছাউনি। তা সত্ত্বেও দুশ ঘোড়সওয়ার সৈন্যসমেত এতগুলো মানুষকে বিষ খাইয়ে মারবার মত বুকের পাটা হল কেন:মোড়লের ? তবে কি কারও উসকানি আছে এর পেছনে ?

দ্বিতীয় : বুজরুক ডাকিনী ডাক্তারের সত্যিই কি দিব্যদৃষ্টি আছে ? না কারও উসকানিতে শেখানো কথা বলে গেল ?

প্রথম প্রশ্নের জবাব যা, দ্বিতীয় ঘটনা অথবা প্রশ্নের জবাবও তাই। কেউ আমাদের ভয় দেখাচ্ছে। অভিযান ভণ্ডুল করে দিতে চাইছে।

কে ?

কেন ?

জবাব পেলাম না মনের মধ্যে। শুধু এইটুকু বুঝলাম, মোরিলিরে এই রহস্যময় শক্তির টাকা খেয়ে কাজ করে যাচ্ছে।

আমিদী ফ্লোরেন্স

জঙ্গল। ক্যানক্যান থেকে একদিনের পথ, ২৬শে ডিসেম্বর।—পুনশ্চ দিয়ে আর একটা অদ্ভুত ঘটনা লিখতে চাই। কালকের চিঠিটা চৌমৌকি আপনাদের কাছে পাঠিয়ে দেওয়ার ভার নিয়েছে।

কাল রাতের ঘটনার কোনো তুলনা নেই, ক্যানক্যান থেকে বেরিয়ে সারাদিনে বিশ মাইল পথ পেরিয়ে রাত্রে তাঁবু পাতলাম খোলা জায়গায়। এ জায়গায় জনবসতি খুব একটা নেই।

দিয়ানগানা গ্রামটা ফেলে এসেছি বারো মাইল পেছনে। তিরিশ মাইল সামনে গেলে পাবো সিকোরো গ্রাম।

মাঝরাতে একটা অদ্ভুত আওয়াজে জেগে উঠল তাঁবুর সবাই। যেন হাতির মত বিরাট পোকার দল গুনগুন করছে। অথবা যেন একটা অতিকায় স্টীম-ইঞ্জিন সোঁ সোঁ করছে। শব্দটা আসছে পশ্চিম দিক থেকে। প্রথমে খুব ক্ষীণ, একটু একটু করে শব্দ বাড়ছে। সব চেয়ে আশ্চর্য, শব্দটা আসছে মাথার ওপর দিয়ে।

এ কিসের শব্দ ?

চোখ পাকিয়ে তাকালাম বটে কিন্তু ঘন কালো মেঘে চাঁদ ঢাকা আকাশে কিছুই দেখতে পেলাম না।

অন্ধকারের দিকে চেয়ে চোখ ব্যথা করে ফেললাম। আওয়াজ পশ্চিম থেকে মাথার ওপর দিয়ে গিয়ে পূবে মিলিয়ে গেল। সে কী গর্জন! কানের পর্দা যেন ফেটে যাওয়ার উপক্রম হল।

আতংকে সিঁটিয়ে গেল তাঁবুর প্রত্যেকে। মাটিতে মুখ গুঁজড়ে শুয়ে পড়ল নিগ্রোর দল। ক্যাপ্টেনকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছি আমরা ইউরোপের মানুষরা। আমাদের মধ্যে চৌমৌকি আর টোনগানেকেও দেখছি—দেখছি না কেবল মোরিলিরিকে। বোধ হয় নিগ্রোদের দলে ভিড়েছে।

আবার সেই শব্দ শোনা গেল। পশ্চিম থেকে এসে বিকট শব্দে মাথার ওপর দিয়ে গিয়ে মিলিয়ে গেল পূবে।

নিশুতি রাতের নৈঃশব্দ্য খান খান হয়ে গেল সেই শব্দে। নিঝুম হওয়ার আগেই আবার জাগ্রত হল একই শব্দ। আবার। আবার।

পর পর পাঁচবার ভয়ংকর শব্দটা লক্ষ কীটের গজরানি শুনিয়ে মিলিয়ে গেল পশ্চিম থেকে পূবে। তারপর আর শব্দ নেই।

ভোর হল। নিগ্রোরা বেঁকে বসল। কেউ আর পূবে যাবে না—ভয়ংকর শব্দ যে ঐদিকেই গেছে।

ক্যাপ্টেন মারসিনে বোঝালেন। তিনঘন্টা গেল বোঝাতে। রওনা হলাম পূব অভিমুখে—রহস্যময় শব্দের গতিপথের দিকে।

মাইল দেড়েক এসে মাটির ওপর অদ্ভুত কতকগুলো দাগ দেখতে পেলেন ক্যাপ্টেন মারসিনে—উনিই যাচ্ছিলেন সবার আগে। গতরাতের অদ্ভুত অভিজ্ঞতা নিয়ে আলোচনা তখন সবে থেমেছে। এমন সময়ে চোখে পড়ল দাগগুলো।

পর-পর দশটা দাগ। অথবা পাঁচ জোড়া দাগ। মাটির ওপর যেন লাঙল টানা হয়েছে—ইঞ্চি চারেক মাটি খুবলে খুবলে উঠে এসেছে। চাকার খাত

বলাও চলে।

কিসের দাগ, তা কেউ হলফ করে বলতে না পারলেও আঁচ করতে পারল।

কালরাতে শুনেছিলাম পর-পর পাঁচবার আকাশ গজরানি।

আজ সকালে দেখছি পাঁচজোড়া চাকার খাত।

দুয়ের সঙ্গে কি সম্পর্ক আছে?

জবাব দেবে ভবিষ্যৎ।

আমিদী ফ্লোরেন্স

৭ ॥ সিকাসো

১২ই জানুয়ারী সমুদ্র উপকূল থেকে ৭০০ মাইল ভেতরে সিকাসো গ্রামে পৌঁছোলো বারজাক মিশন।

'লা এক্সপ্যানসন ফ্রাঁসে' পত্রিকায় আমিদী ফ্লোরেন্সের লেখা আর খবর পৌঁছোয় নি। ফ্লোরেন্স নিয়মিত রিপোর্ট লিখেছেন, চৌমৌকিকে দিয়েছেন পাঠিয়ে দেওয়ার জন্যে। কিন্তু কি কারণে জানা নেই, কোনো রিপোর্ট'ই পৌঁছোয় নি পত্রিকায়। ফ্লোরেন্স এ খবর জানেন না। বারজাক মিশনের অভিযান বিবরণ তাঁর লেখা নোটবই থেকে তুলে দেওয়া হচ্ছে পাঠক-পাঠিকাদের অবগতির জন্যে।

ক্যানক্যান থেকে সিকাসো পর্যন্ত যাত্রাপথে সেন্ট বেরেনকে নিয়ে হাসা-হাসি ছাড়া আর নতুন কিছু ঘটনা ঘটেনি। ভদ্রলোকের আনমনা অভ্যেস দলের সবাইকে বেশ হাসাচ্ছে। চৌমৌকি পুরোনো দোস্ত টোনগানের কাছ থেকে ক্রমশঃ দূরে সরে যাচ্ছে। দোস্তি নিবিড় হচ্ছে মোরিলিরের সঙ্গে। কারণ অজ্ঞাত।

কেনিয়েলালার চার চারটে ভবিষ্যদবাণীর কোনোটাই সত্যি হয় নি।

গত রিপোর্টে ফ্লোরেন্স লিখেছিলেন, নিশ্চয় কেউ তাঁদের ভয় দেখিয়ে নিরস্ত করতে চাইছে। এই সিদ্ধান্ত যে সত্যি, সে রকম কোনো প্রমাণও এখনো পাওয়া যায় নি।

সিকাসো জায়গাটা 'টাটা' দিয়ে ঘেরা খানকয়েক গ্রামের সমষ্টি। মাঝে মাঝে চাষ আবাদের জমি। ফরাসী বাহিনীর ছাউনি আছে এই 'টাটা'র মধ্যেই। প্রবাসী শ্বেতকায় সৈনিকেরা উল্লসিত হয়েছে দীর্ঘদিন পরে শ্বেতকায়

জাতভাইদের দেখে। সবচেয়ে বেশী খুশী হয়েছে জাতভাইদের মধ্যে একজন সুন্দরীকে দেখে। জেন মোরনাসের সঙ্গে আলাপ করার হিড়িক পড়েছে অফিসারদের মধ্যে। শ্রীমতি সবার সঙ্গে সমানভাবে মিশেছেন। বারজাক মিশনকে অ্যাপ্যায়ন করার জন্যে অনুষ্ঠিত উৎসবের পৌরোহিত্য করেছেন। হাসি গল্প দিয়ে আসর মাতিয়ে রেখেছেন।

তবে এত হাসি হুল্লোড়ের মধ্যে একটা জিনিস কিন্তু স্পষ্ট হয়ে আসছে। নতুন অফিসারদের চাইতেও ক্যাপ্টেন মারসিনের দিকে জেন মোরনাসের পক্ষপাতিত্ব যেন একটু বেশী। মোরনাস তাতে মনে মনে উল্লসিত। তবে কি বেড়ালের ভাগ্যে শিকে ছিঁড়বে?

সিকাসো থেকে অভিযান দু'ভাগ হয়ে যাবে। বারজাকের অধীনে একদল যাবে সিধে পূবদিকে। বদ্রিয়ার্সের অধীনে আর একদল যাবে দক্ষিণে। প্রথম দল নাইজারের দুর্গম অজ্ঞাত অঞ্চল ফুঁড়ে দাহোমে ফিরবে। দ্বিতীয় দল যাবে গ্র্যাণ্ড বাজাম।

কে কোন দলে যাবেন, তাও ঠিক হয়ে গেল। বদ্রিয়ার্সের সঙ্গে যাবেন হেইরঅ, কুইরঅ আর তাসিন। বারজাকের সঙ্গে যাবেন পঁসি, চাতোন্নে আর ফ্লোরেন্স। যেহেতু বারজাককে বেশী পথ যেতে হবে, লেখার বেশী উপাদান পাওয়া যাবে, তাই ফ্লোরেন্স যেতে চাইলেন এই দলের সঙ্গে।

সৈন্যদলও দুভাগ হবে। একশ সৈন্য দলেরই একজন লেফটেন্যান্টের অধীনে যাবে বদ্রিয়ার্সের সঙ্গে। বাকী একশকে ক্যাপ্টেন মারসিনে নিয়ে যাবেন বারজাকের সঙ্গে—পূর্ব ব্যবস্থা মত।

কিন্তু জেন মোরনাস কার সঙ্গে যাবেন?

বুক ধুকপুক করতে লাগল ক্যাপ্টেনের।

শ্রীমতি নিজেই চিন্তার অবসান ঘটালেন। বারজাকের দলেই তিনি থাকবেন সেন্ট বেরেনকে নিয়ে।

তারপরেই যা বললেন, শুনে মুখ শুকিয়ে গেল প্রত্যেকের।

বারজাকের সঙ্গে কিছুদূর যাওয়ার পর, হোমবোরি পেরিয়ে নাইজার বেণ্ডের গাও অঞ্চলে পৌঁছে শ্রীমতি উত্তরে চলে যাবেন সেন্ট বেরেনকে নিয়ে।

কারণ? কারণ আবার কি। তাঁর ইচ্ছে। ইউরোপ থেকে বেরিয়েছিলেন এই পথেই যাবেন বলে।

ভয় করবে না? দূর! জেন মোরনাস কাউকে ভয় পায় না।

কিন্তু ও অঞ্চলে ফরাসী সৈন্যও যে আজ পর্যন্ত পা দেয় নি। কেউ জানে না সেখানে কি আছে। এ ছাড়াও নাইজারের দু-পাড়ে আছে দুর্ধর্ষ তোয়ারেগ আউলিমিডেন উপজাতি।

পরোয়া করেন না জেন মোরনাস। তাঁর ইচ্ছে তিনি যাবেন।

এরপর আর কথা চলে না। অফিসাররা এক বাক্যে বললেন, নিশ্চয় তো। কোনো মহিলার ইচ্ছের ওপর আর কথা চলে না।

ঠিক হল. তাই হবে। নিজের ঘোড়া, গাধা, কুলি নিয়েই অজানার অভিযানে সেন্ট বেরেনকে নিয়ে চলে যাবেন শ্রীমতি। বাকী ঘোড়া, গাধা, কুলির বেশীর ভাগ যাবে বারজাকের সঙ্গে—কারণ তাঁর পথের দৈর্ঘ্য আর কষ্ট বেশী।

কিন্তু এই বারেই লাগল আসল গণ্ডগোল। গাইড মোরিলিরেকে দেওয়া হয়েছিল বারজাকের দলে—কারণ তাঁরই গাইডের দরকার বেশী। মোরিলিরের জন্মও এই তল্লাটে।

মোরিলিরের কানে কথাটা যেতেই সে বেঁকে বসল। বারজাকের সঙ্গে সে যাবে না—যাবে বদ্রিয়ার্সের সঙ্গে। ধনুর্ভঙ্গ পণ। কিছুতেই টলানো গেল না।

গোদের ওপর বিষ ফোড়ার মত বেঁকে বসল কুলিরাও। সর্ত ছিল সিকাসো পর্যন্ত আসবে। তাই এসেছে। আর এক পাও যাবে না।

কাকুতিমিনতি অনুরোধ উপরোধেও যখন ফল হল না, নতুন কুলি আর নতুন গাইডের সন্ধানে বেরোলেন ক্যাপ্টেন। ভাগ্য ভাল। মোরিলিরের মতই একজন পাকা গাইড পাওয়া গেল।

যেই পাওয়া গেল, অমনি মন ঘুরে গেল মোরিলিরের। বারজাকের কাছে এসে ঘ্যানঘ্যান করতে লাগল। তার অন্যায় হয়েছে। বারজাকের সঙ্গেই যাবে।

আরও আশ্চর্য, একই সঙ্গে সুর পালটালো কুলিরাও। তারাও যাবে।

বেশ বোঝা গেল, কুলিদের ধর্মঘট ঘটিয়েছিল এই মোরিলিরেই।

তাহলে কি তার মত লোককে সঙ্গে রাখা উচিত?

অনেক চিন্তা ভাবনা করে ঠিক হল, থাকুক। হাজার হোক পুরোনো লোক। নতুন গাইড যাক বদ্রিয়ার্সের সঙ্গে।

এই সব করতেই গেল বেশ কয়েকটা দিন। একুশে জানুয়ারী নতুন করে শুরু হল যাত্রা। স্থানীয় সৈন্যবাহিনী ব্যাণ্ড আর বিউগল বাজিয়ে, পতাকা

উড়িয়ে, কুচকাওয়াজ করে এগিয়ে দিল দুই দলকে—দুই দিকে।

বদ্রিয়ার্সের যাত্রাপথ নিষ্কণ্টক। বিঘ্নহীন। তাই এই অভিযানের মনোরম যাত্রা বিবরণ দোব না। তার বদলে এবার থেকে লিখব বারজাকের অভিযান বিবরণ।

কারণ, বারজাকের ভাগ্যেই সঞ্চিত ছিল অনেক কষ্ট, অনেক বিপদ, অনেক বিভীষিকা। তুলনাহীন সেই দিনগুলোর বর্ণনা পড়তে পড়তে গায়ে কাঁটা দেবে পাঠকপাঠিকাদের।

মনে রাখবেন, বারজাককে পথ দেখিয়ে আফ্রিকার দুর্গমতম অজ্ঞাত অঞ্চলে নিয়ে চলেছে মোরিলিরে।

৮ ॥ মোরিলিরে

(অ্যামিদি ফ্লোরেন্সের নোটবই থেকে উদ্ধৃত)

২২শে জানুয়ারী।—দুদিন হল বেরিয়েছি সিকাসো থেকে। কল্পনা কিনা জানি না, কিন্তু গণৎকার কেনিয়েলালার ভবিষ্যদবাণীই যেন সত্যি হতে চলেছে। এই দুদিনেই দেখছি কুলিরা একটুতেই নেতিয়ে পড়ছে, ঘন ঘন জিরেন চাইছে, গাধা তাড়িয়ে নিয়ে যেতে যেন পারছে না চালকরা, চাকরদের উদ্যম কর্পূরের মত উবে যাচ্ছে।

তার মানে এই নয় যে আমি উদ্বেগে ভুগেছি। এসেছি অ্যাডভেঞ্চারের সন্ধানে। যত আসুক তত চাই। কিন্তু তা সত্যিকাবের অ্যাডভেঞ্চার হওয়া চাই।

২৩শে জানুয়ারী।—ঠিক যেন কচ্ছপের কনভয় চলেছে জমির অবস্থাও সুবিধের নয়। কেবল ওঠা, আর নামা নিগ্রোদের মনও পাচ্ছি না।

২৪শে জানুয়ারী—আজ সন্ধ্যায় কাফেনে পৌঁছোলাম চারদিনে তিরিশ মাইল। দিনে আট মাইল!

৩১শে জানুয়ারী—আগের রেকর্ডও ভাঙলাম! ছদিনে তিরিশ মাইল পাড়ি দিয়েছি! দশ দিনে ষাট মাইল! দিনে ছ'মাইল! এসেছি কোকোরো বলে একটা গ্রামে। কি নোংরা! কি নোংরা!

তিনদিন আগে 'ঙগাগা' বলে একটা গ্রাম ছেড়ে এলাম। আহারে কি নাম! মাথায় আসেও বটে! তারপর পেরোতে হল একটা খাড়াই পাহাড়। ডাইনে বাঁয়ে, পেছনে কেবল পাহাড়—সামনে মানে পূবদিকে—সমতলভূমি।

কোকোরো গ্রাম থেকে বোবো-দের দেশ শুরু হল। অসম্ভব নোংরা আর সর্বভুক এরা। সব খায়। গলা পচা মাংস পেলে তো কথাই নেই। মনও সেই রকম।

তিরিশে জানুয়ারী কোকোরোতে যা ঘটেছে, তা লিখে রাখি। পৌঁছোলাম সন্ধ্যের পর। হৈ হৈ করে তেড়ে এল পালে পালে নিগ্রো। টর্চের আলোয় গুনলাম! প্রায় আটশ। হাতে অস্ত্রশস্ত্র। ভাবভঙ্গী সুবিধের নয়। স্বাগতম জানাতে কেউ নেই।

ক্যাপ্টেন মারসিনে দোটানায় পড়লেন। রাইফেল ছুঁড়বেন? এখনো পর্যন্ত গুলি চালানোর দরকার হয়নি। কিন্তু নিগ্রোদের তল্লাটে এসে একবার গুলিবর্ষণ শুরু হলে জল গড়াবে অনেকদূর। ভেবেচিন্তে ক্যাপ্টেন হুকুম দিলেন—কাপড়ে মোড়া রাইফেল সবাই হাতে নিক—বেগতিক না দেখলে বার করতে হবে না।

বিকট হৈ হল্লা চেঁচামেচিতে ভড়কে গিয়ে সেন্ট বেরেনের ঘোড়াই এই সময়ে একটা কাণ্ড করে বসল। আচমকা চার পা ফাঁক করে এমন ভাবে দাঁড়িয়ে গেল যে পিঠ থেকে ডবল ডিগবাজি খেয়ে ছিটকে গেলেন সেন্ট বেরেন—পড়লেন একেবারে জংলীর দলে মাঝে। সঙ্গে সঙ্গে কানফাটা হুংকার ছেড়ে জংলীর দল ঘিরে ধরল উদ্যত অস্ত্র হাতে…

…আর ঠিক তখনি ঘোড়ার পেটে বুটের খোঁচা মেরে উল্কাবেগে জংলীদের মধ্যে গিয়ে পড়লেন, শ্রীমতি মোরনাস। মারমুখো নিগ্রোদের মন সরে এল সেন্ট বেরেনের দিক থেকে। ঘিরে ধরল শ্রীমতিকে। একসঙ্গে বিশটা বর্শা উদ্যত হল তাঁর দিকে।

তীক্ষ্মকণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠলেন জেন মোরনাস—"মান্টো! ন্‌টে আ বি সোবা!" (সব চুপ! আমি ডাইনি!)

বলেই পকেট থেকে ইলেকট্রিক টর্চ বার করে ফেলতে লাগলেন নিগ্রোদের মুখের ওপর। হাতেনাতে দেখিয়ে দিলেন আকাশের বিদ্যুৎ তাঁর মুঠোয়—সেইসঙ্গে বজ্রও।

ভ্যাবাচাকা খেয়ে দাঁড়িয়ে গেল জংলী যোদ্ধারা। এগিয়ে এল দলের সর্দার পিনতিয়ে-বা। বক্তৃতা ঝাড়তে যাচ্ছে, হাতের ইঙ্গিতে নিরস্ত করলেন শ্রীমতি। সেন্ট বেরেনের অবস্থাটা আগে দেখা দরকার। ভদ্রলোক আর নড়ছেন না!

ধীরেসুস্থে ভীড় ঠেলে এগিয়ে এলেন ডক্টর চাতোন্নে যেন রুগী দেখাই তাঁর

কাজ—অন্য কোনো দিকে মন নেই। সেন্ট বেরেন সত্যিই জখম হয়েছেন। ডবল ডিগবাজির ঠেলায় ধরণী আশ্রয় করার সময়ে একটা চোখা পাথর কোমরের নিচে গভীর ভাবে গেঁথে গেছে। প্রচুর রক্ত বেরোচ্ছে।

সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গেল কেনিয়েলালার দ্বিতীয় ভবিষ্যদবাণী। সত্যি হল তাহলে। প্রথমটাও কি তাহলে সত্যি হয়েছে? আমার খবরগুলো যথাস্থানে পৌঁছেছে তো? শির শির করে উঠল শিরদাঁড়া—নামহীন ভয়ে।

নিগ্রোদের বিস্মিত দৃষ্টির সামনে চটপট হাত চালালেন ডক্টর। সেলাই করে দিলেন সেন্ট বেরেনের ক্ষতস্থান। তারপর ব্যাণ্ডেজ।

সেই ফাঁকে পিনতিয়ে-বা'কে বক্তৃতা দেওয়ার অনুমতি দিয়েছেন জেন মোরনাস। গরম গরম বামবারা ভাষায় সে জানতে চেয়েছে, কেন 'টোবার' (মানে, সেন্ট বেরেন) বন্দুক নিয়ে চড়াও হয়েছে তাদের ওপর। শ্রীমতি বললেন, কখনোই নয়। পিনতিয়ে-বা তখন দেখিয়ে দিল সেন্ট বেরেনের পিঠে বাঁধা ছিপভর্তি চকচকে চোঙাটা। শ্রীমতি চোঙা খুলে ভেতরের ছিপ দেখাল সর্দারকে। দেখেই লোভে চক চক করে উঠল দু'চোখ। বামবারা ভাষায় আবদার ধরল, জিনিসগুলো তার চাই।

কিন্তু বেঁকে বসলেন সেন্ট বেরেন। কত বোঝালেন শ্রীমতি কত, প্রশংসা করলেন সেন্ট বেরেনের। কিন্তু ভবি ভোলবার নয়। শেষকালে কড়াগলায় হেঁকে উঠলেন—"বোনপো!"

তৎক্ষণাৎ পিঠ থেকে চোঙা খুলে সুড় সুড় করে এগিয়ে দিলেন সেন্ট বেরেন। ছোঁ মেরে নিয়ে গিয়ে মহা উল্লাসে তাণ্ডব নাচ নাচতে নাচতে আমাদের নিজের গাঁয়ে নেমন্তন্ন করে বসল পিনতিয়ে-বা। পরের দিন নাকি আমাদের সম্মানে বিরাট নাচের আসরও বসবে।

বাধা দিলেন না ক্যাপ্টেন। বোবোদের ব্যবহার এখন ভাল। শত্রুভাব চলে গিয়েছে। তাই আজ আমরা এসেছি নতুন বন্ধুদের নেমন্তন্ন রাখতে—কুলিদের রেখেছি 'টাটা'র বাইরে।

গ্রামের ছিরি দেখে চোখ কপালে উঠল। যেমন চেহারা, তেমনি দুর্গন্ধ। টেঁকা দায়। বমি উঠে আসে। মাঝখানে জঞ্জালের পাহাড়। একটা উঠোন, গরু ছাগল চড়ছে সেখানে। চারপাশে পায়রার খুপরির মত ছোট ছোট ঘর। ঢোকা যায় না—এত দুর্গন্ধ। ইঁদুর ছুঁচো, টিকটিকির সঙ্গে এরা দিব্বি থাকে।

পিনতিয়ে-বা'য়ের প্রাসাদে গিয়ে প্রথমেই কিছু উপহার দিলাম।

অপদার্থ কয়েকটা জিনিস। যেমন, কয়েকটুকরো ন্যাকড়া, চাবিহীন তালা, ভাঙা চকমকি-পিস্তল, ছুঁচ, সুতো।

পেয়ে বর্তে গেল সর্দার। আনন্দে ডগমগ হল। হুকুম দিল শুরু হোক নাচ।

প্রথমে হরিণের শিং দিয়ে তৈরী 'বোদোতো' বাঁশি বাজিয়ের দল গ্রাম প্রদক্ষিণ করল। তবলা সঙ্গত করল কিছু বাজিয়ে, হাতির দাঁত দিয়ে তৈরী শিঙেও ফোঁকা হল। 'তবলা' বাজানো হল 'কলম' নামক গদা দিয়ে। ঠিক যেন 'তবলা-কলম' দিয়ে লেখা হল তবলার ওপর।

বিকট জগঝম্প বাজনা শুনে গাঁ থেকে পিলপিল করে বেরিয়ে এল বোবোরা। জড়ো হল পিনতিয়ে-বা'র সামনে।

উদ্ভট নাচ দিয়ে শুরু হল উৎসব। গরুর ল্যাজ, হাতে রাজ্যের লোহালক্কর ভর্তি থলি নিয়ে পাগলের মত নাচতে লাগল একজন বোবো। ঘুসি লাথি মেরে থলি ভর্তি লোহালক্কর বাজিয়ে গেল ঝমাঝম শব্দে। গরুর ল্যাজ বুলিয়ে গেল অনেকেরই মুখে। হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ল সবাই।

বন্যনৃত্য শেষ হতেই মাদুলি আর কড়ি ঝোলানো একটা ভাঙা ছাতা এনে ধরা হল পিনতিয়ে-বা'র মাথায়। হাজার হোক সে রাজা—ছত্রপতি না হলে চলবে কেন।

তারপর ঢাকের তালে তালে ছুটোছুটি করে নাচতে আরম্ভ করল ছেলে বুড়ো, মেয়েপুরুষ, এমন কি ডাকিনী ডাক্তাররাও। পিঠে পিঠ দিয়ে সে কি ঠ্যালাঠেলি! উন্মত্ত নৃত্য ঢের দেখেছি—এমনটি দেখিনি।

নাচের পর শোভাযাত্রা। তারপর খাওয়া। সে এক বীভৎস দৃশ্য!

চারটে গাছের গায়ে লতা বেঁধে চৌকো মত জায়গা আলাদা করা হল। মাঝখানে জ্বালানো হল কাঠের আগুন। লতার ওপর ঝুলিয়ে দেওয়া হল এক ডজন সদ্য বলি দেওয়া ভেড়ার মাংস। আগুনের আঁচে মাংস একটু তেতে উঠতেই সর্দারের হুকুমে সবাই দৌড়ে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল কাঁচা মাংসের ওপর। দুহাতে ধরে কামড়ে ছিঁড়ে গিলতে লাগল কোঁৎ কোৎ করে।

এ দৃশ্য দেখা যায় না। চলে এলাম তাঁবুতে। সারারাত বোবোদের হল্লাবাজি শুনলাম। একেই বলে নিশিভোর ফিস্ট।

২রা ফেব্রুয়ারী। —মামা-বোনপো ঘোড়ার পিঠে বসতে পারছেন না বলে দিনটা কোকোরোতেই কাটালাম।

৩রা ফেব্রুয়ারী। —আজও কোকোরোতে থেকে গেলাম।

৪ঠা ফেব্রুয়ারী। —ভোর ছটায় বেরোলাম। সন্ধ্যে বেলা ফিরে এলাম

একই জায়গায়। ব্যাপারটা এই :

বোবোদের কাছে বিদায় নিয়ে তো রওনা হলাম। ওরা পেছন পেছন এল গ্রামের সীমানা পর্যন্ত। তারপরেই শ্লথগতির খেলা শুরু করল কুলির দল। কোকোরো পৌঁছোনের আগে যে নষ্টামি করেছিল—তারও বেশী। মিনিটে মিনিটে থামছে একজন কুলি। গাধার পিঠ থেকে বোঝা খুলে পড়ে যাচ্ছে মাটিতে। এইভাবে দশটা নাগাদ পেরোলাম মোটে চার মাইল রাস্তা।

অদ্ভুত সহিষ্ণুতা দেখাচ্ছেন ক্যাপ্টেন। সব বুঝছেন—কিন্তু মুখে কিছু বলছেন না।

বৈকালিক অভিযান শুরু করে মোরিলিরে বললে—"যাচ্চলে। এযে ভুল পথে চলেছি!" সায় দিলে চৌমৌকিও। একা টৌনগানে বললে—"কক্ষনো না। আমরা ঠিক পথেই চলেছি। দ্বিধায় পড়লাম আমরা। শেষ কালে ভোটে জিতল মোরিলিরে। ফিরে এলাম যেখান থেকে রওনা হয়েছিলাম সেইখানেই। ফেরার পথে কিন্তু কুলিদের ক্লান্তি মিলিয়ে গেল। গাধাদের পিঠের বোঝাও আর খসে পড়ল না। চার ঘন্টার পথ মেরে দিলাম মাত্র এক ঘন্টায়!

৬ই ফেব্রুয়ারী। —গতকাল ভোরবেলা বেরোনোর সময়ে মোরিলিরে জিভ কেটে বললে—দারুণ ভুল করেছি সাহেব। কাল ঠিক পথেই যাচ্ছিলাম। এবারও চৌমৌকি সায় দিল দেখলাম। দুজনের মধ্যে নিশ্চয় গাঁটছড়া বাঁধা হয়েছে।

যাই হোক, নতুন করে এগোলাম। আবার কুলিদের গেঁতোমি চাগিয়ে উঠল; আবার গাধাদের পিঠের বোঝা খসে পড়তে লাগল। সব দেখেও চুপ করে রইলাম। এরই মধ্যে দুটো বড ঘটনা ঘটল। দুশ্চিন্তা হচ্ছে সেই কারণেই। সকালের দিকে একটা গাধা হঠাৎ পড়ল আর মরল। ব্যাপার কি? 'ডোঔং-কোনো' বিষ কি গাধার খাবারে কেউ মিশিয়েছে? ভয়ে শিরশির করে উঠল সর্বাঙ্গ।

বিকেলের দিকে নিখোঁজ হয়ে গেল একজন কুলি। অনেক খুঁজে টিকি দেখা গেল না।

তারপরেই সন্ধ্যে নাগাদ দেখা গেল, বেশ কয়েক জন কুলি মদ খেয়ে বেহুঁশ হয়েছে। এই জঙ্গলে এদের মদ ধরে দিল কে?

শাসন করাও যাচ্ছে না। অজানা জঙ্গলের মধ্যে যদি কুলিরা অবাধ্য বা নিপাত্তা হয় তবে আমাদের যে কি হাল হবে, ভাবতেও ভয় পাচ্ছি।

ক্যাপ্টেন গোঁফ কামড়ে কি ভাবলেন। তাঁবুতে মিটিং করলেন। বারজাক প্রমুখ সবাই এলেন মিটিংয়ে। ক্যাপ্টেন প্রস্তাব করলেন, মোরিলিরিকে ধরে জেরা করা হোক। আর প্রতি কুলিকে একজন সৈন্য খেদিয়ে নিয়ে চলুক।

বেঁকে বসলেন বারজাক। নিষ্ফল প্রস্তাব। মোরিলিরে অস্বীকার করল—কোন প্রমাণ তো নেই তার বিরুদ্ধে। বরং অসহযোগিতা আরো বাড়বে। কুলিদের পিটিয়ে কাজ করানো যাবে না। মাটি আঁকড়ে শুয়ে পড়লে ঠেলা সামলাবে কে?

নিরুপায়, সত্যিই নিরুপায় আমরা। কিন্তু এত বাধা সত্ত্বেও অভিযান চালিয়ে যাচ্ছি কেন বুঝলাম না। লাভ কি? যা দেখবার তা কি দেখা হয় নি? নাইজার বেণ্ডের এই অসভ্যদের হাতে অধিকার দেওয়া নিতান্তই বাতুলতা। সিকাগো পর্যন্ত তবুও বরদাস্ত করা যায়—কিন্তু তারপর? বোবোদের মত বর্বরদের হাতে ভোটের অধিকার কি দেওয়া যায়? অসম্ভব।

তবে কেন মূল অভিযাত্রীরা ফিরে যেতে চাইছেন না? দেখা যাক কার কি মনোগত অভিপ্রায়।

প্রথম। —ক্যাপ্টেন মারসিনে। হুকুম তামিল করেন—নিজের ইচ্ছেয় চলেন না। কিন্তু যদি নিজের ইচ্ছেয় চলতে বলা যায়, তাহলে যদ্দিন জেন মোরনাস অভিযান চালিয়ে যাবেন, তদ্দিন উনিও ফেরার নামটি করবেন না। দুজনের মধ্যে প্রীতির সম্পর্ক আরও গাঢ় হয়েছে। অভিযান শেষে দুজনের মধ্যে বিয়ে হলেও আশ্চর্য হব না। বারজাক পর্যন্ত দেখে শুনে হাল ছেড়ে দিয়েছেন।

দ্বিতীয়।—মঁসিয়ে পঁসি। ইনিও হুকুমের দাস। সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত দেদার লিখে চলেছেন—যা দেখছেন তাই নোট করছেন। অভিযানে রওনা হওয়ার পর থেকে আজ পর্যন্ত সবশুদ্ধ দশটা কথাও বলেছেন কিনা সন্দেহ। এঁকে বাদ দেওয়া যেতে পারে।

তৃতীয়। সেন্ট বেরেন। ইনি মাসী ভাগ্নীর চোখ দিয়ে দেখেন। তার জন্যেই যেন বেঁচে আছেন। তাছাড়া এত অন্যমনস্ক যে আফ্রিকায় আছেন সে খেয়াল বোধহয় নেই। ইনিও বাদ গেলেন।

চতুর্থ।—শ্রীমতি মোরনাস। ইনি কেন আফ্রিকায় এসেছেন, তা বলেছেন। আগেই বোঝা উচিত ছিল আমাদের।

পঞ্চম। আমি নিজে। অভিযান চালিয়ে যাওয়ার যুক্তিসঙ্গত কারণ দর্শানো সম্ভব কেবল আমার পক্ষেই। আমি চাই কি? লেখার মালমসলা। ঝামেলা

যত বাড়বে, লেখার মালমসলাও তত বেশী পাব। সুতরাং সৃষ্টি উল্টে গেলেও আমি ফিরছি না।

তাহলে বাকী রইলেন কেবল মঁসিয়ে বারজাক। ইনি কারও হুকুমের দাস নন। কারও মন রেখে চলেন না, প্রবন্ধ লেখার জন্যে উপাদানের পেছনেও ছোটেন না। তবে কেন হন্যে হয়ে চলেছেন? যা দেখবার, তাতো দেখা হয়ে গেছে?

জিজ্ঞেস করেছিলাম। জবাব দেন নি।

৭ই ফেব্রুয়ারী।— রাতে গোলমাল হওয়ায় ভোরে উঠতে দেরী হয়েছে। সকালের অভিযান তাই স্থগিত ছিল। বেরোলাম বৈকালিক অভিযানে।

কাল রাতে আমরা ঠিক করেছিলাম, মোরিলিরেকে রাত জেগে পাহারা দেব পালা করে। শ্রীমতি মোরনাস, বারজাক, ক্যাপ্টেন, আমি, সেন্ট বেরেন, পঁসি—এইভাবে পরপর রাত নটা থেকে ভোর পাঁচটা পর্যন্ত আমরা একে একে রাত জাগব।

আমাকে তুলে দিয়ে শুতে গেলেন ক্যাপ্টেন। বলে গেলেন, সব ঠিক আছে। মোরিলিরে এখনো ঘুমোচ্ছে। আমিও দেখলাম চাঁদের আলোয় কালো মুখ দেখা যাচ্ছে মোরিলিরের—সর্বাঙ্গ ঢাকা সাদা চাদরে। কিছুক্ষণ পরে আবার সেই রহস্যজনক গজরানি শুনলাম আকাশে। এবার খুব ক্ষীণ। এই শব্দই শুনেছিলাম ক্যানক্যানে। আওয়াজটা এল পূবদিক থেকে। তখন দেড়টা বাজে।

রাত সোয়া দুটোয় আমার পালা শেষ হলে সেন্ট বেরেনকে তুলে দিয়ে আমি শুতে গেলাম বটে, কিন্তু ঘুম না আসায় বেরোলাম নিশুত রাতের খোলা হাওয়া খেতে।

আর ঠিক সেই সময়ে আকাশ পথে আবার শুনলাম সেই অদ্ভুত গর্জন ধ্বনি। এবার আরও ক্ষীণ। যেন কানের ভুল—সত্য নয়। আওয়াজটা ফিসফিসানি শব্দের মত মিলিয়ে গেল পূবদিকে। গা ছমছমকরে উঠল আমার।

ছিটকে বেরিয়ে এলাম তাঁবুর বাইরে। মোরিলিরে তখনো কালো মুখ আলোয় ফিরিয়ে ঘুমোচ্ছে। ছুটে গেলাম সেন্ট বেরেনের তাঁবুতে। কিন্তু তিনি নেই!

আক্কেলের বলিহারি যাই। ভাগ্যিস এই ফাঁকে সটকান দেয়নি মোরিলিরে। কিন্তু সেন্ট বেরেনকে একটু কড়া কথা বলা দরকার। জানি কোথায় গেলে পাব ভদ্রলোককে। তাঁবুর পেছনেই একটা নদী আছে—

নিশ্চয় সেখানে।

সত্যিই আছেন সেখানে—কিন্তু নদীর পাড়ে নয়, মাঝখানে! একটা ভেলা ভাসিয়ে বসে আছেন চুপচাপ!

আজ সকালে শুনলাম কিভাবে বানিয়েছিলেন ভেলাটা। খুব সোজা। তিনটে কাঠ একসঙ্গে বেঁধে একটা লম্বা ডালকে লগি বানিয়ে ভেসে গেছেন মাঝ নদীতে, আধঘন্টার ব্যাপার।

কিন্তু করছেন কি মাঝ নদীতে?

আস্তে করে ডাকলাম—"সেন্ট বেরেন?"

জবাব দিন মাঝনদীর ছায়ামূর্তি—"এই তো!"

"ওখানে কি করছেন?"

"লুকিয়ে মাছ ধরছি।"

"লুকিয়ে?"

"রাত্রে জাল ফেলা বেআইনী যে।"

"মোরিলিরে কোথায়?"

বলতেই তিড়িং করে ভেলা ছেড়ে জলে ঝাঁপ দিলেন সেন্ট বেরেন। হাঁচড় পাঁচড় করে উঠে এলেন পাড়ে। ছুটলেন তাঁবুর দিকে। চাঁদের আলোয় মোরিলিরের ঘুমন্ত কালো মুখ দেখে হাঁফ ছেড়ে বললেন—"উফ! এমন ভয় পাইয়ে দিয়েছিলেন!"

আর ঠিক সেই সময়ে চিৎকারের পর চিৎকার ভেসে এল নদীর দিক থেকে, কে যেন আর্তনাদ করছে। জলে ডুবে যাচ্ছে।

দৌড়োলাম আমি আর সেন্ট বেরেন। নদীর পাড়ে পৌঁছে দেখলাম, ভাসমান ভেলার ওদিকে কালো মত কি যেন একটা জল তোলপাড় করছে।

"নিগ্রো," বললেন সেন্ট বেরেন। বলেই, জলে নামলেন। ভেলায় উঠলেন। নিগ্রোটাকে টেনে নিয়ে এলেন পাড়ে। আর চেঁচিয়ে চললেন সমানে—"রাস্কেল কোথাকার! জালটা তুলতে ভুলে গেছিলাম—সেই জালেই পড়েছিস—আবার পা ছুঁড়ছিস!"

ভুল তো করবেনই সেন্ট বেরেন, কিন্তু জালে পড়ল কে?

নিগ্রোটা তখনো খাবি খাচ্ছে। সেই অবস্থাতেই মুখের চেহারা দেখে চমকে উঠলাম—"এ যে মোরিলিরে।"

হ্যাঁ, মোরিলিরে! একদম উলংগ। জালে জড়িয়ে পড়ে নাকে মুখে জল ঢুকে প্রায় মরতে বসেছিল। বদমাস কোথাকার! নিশ্চয় চুপিসারে বেরিয়ে-

ছিল নৈশ বিহারে। ফেরবার সময়ে নদীর সাঁতরাতে গিয়ে সেণ্ট বেরেনের জালে পড়েছে। কিন্তু মোরিলিরিকে যে ঘুমন্ত অবস্থায় দেখে এলাম এইমাত্র! সে তাহলে কে?

ছুটলাম। ধাক্কা মারলাম ঘুমন্ত দেহটাকে। চাদর ছিটকে গেল। কালো মুখ বলে যে জিনিসটাকে চাঁদের আলোয় ভুল করেছিলাম, তা কাঠ। মাথায় পালক গোঁজা মোরিলিরের মার্কামারা টুপি।

হাতে নাতে এবার ধরা পড়ল বিশ্বাসঘাতক গাইড। সেণ্ট বেরেনকে গিয়ে সব বললাম। আর ঠিক সেই সময় মুমূর্ষু মোরিলিরে বিদ্যুতবেগে জমি ছেড়ে লাফিয়ে উঠে দৌড়োলো নদীর দিকে—পিঠটান দেওয়ার মতলবে।

সেণ্ট বেরেনের খেল দেখলাম এইবার। অবিশ্বাস্য ক্ষিপ্রবেগে দৌড়ে গিয়ে খপ করে কব্জি চেপে ধরলেন মোরিলিরের। আত্মভোলা লোকটার আঙুলে যে সাঁড়াশির শক্তি, তা না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। মোরিলিরের মত মরিয়া নিগ্রোও শত চেষ্টা করেও মুঠো আলগা করতে পারল না। বজ্র-মুষ্টির চাপে পড়ে অবশ হল মোরিলিরের হাত, শিথিল হল আঙুল, মুঠো থেকে খসে একটুকরো কাগজ। তুলে নিলাম আমি।

সঙ্গে সঙ্গে ছোঁ মেরে কাগজটা কেড়ে নিয়ে মুখে চালান করল মোরিলিরে। ইস্পাতের দাঁতের মত শক্ত দাঁত ফাঁক করে কিছুটা কাগজ টেনে বার করলাম বটে, বেশীর ভাগ চলে গেল পেটের মধ্যে।

সেণ্ট বেরেনকে বললাম—"ছাড়বেন না, ধরে রাখুন। আমি আসছি।"

থুথু মাখা ছেঁড়া কাগজটা নিয়ে এলাম ক্যাপ্টেনের তাঁবুতে। লণ্ঠনের আলোয় কাগজ দেখলেন ক্যাপ্টেন।

কাগজ পড়বার আগেই ক্যাপ্টেন আগে মোরিলিরেকে কষে বেঁধে ফেলে রাখলেন একটা তাঁবুতে। তারপর লণ্ঠনের আলোয় কাগজ দেখলেন। আরব হরফে হেঁয়ালির ছন্দে কি যেন লেখা। এত অস্পষ্ট যে পড়া যায় না।

ক্যাপ্টেন মারসিনে আরব ভাষা পড়তে পারেন। কিন্তু দিনের আলো ছাড়া মর্মোদ্ধার সম্ভব নয়। আপাততঃ জেরা করা যাক মোরিলিরেকে। রাতের অন্ধকারে সে কোত্থেকে এই চিঠি এনেছে আমাদের কি সর্বনাশ করার জন্যে, গুঁতো মেরে সে খবর বার করা যাক তারই পেট থেকে।

গেলাম তাঁবুতে। কাউকে দেখতে পেলাম না। যে দড়ি দিয়ে তাকে বাঁধা হয়েছিল, সেইগুলোই কেবল পড়ে মাটিতে।

মোরিলিরে উধাও হয়েছে!

৯ ॥ ওপরওলার হুকুমে

একই দিন। আধাখ্যাঁচড়া রিপোর্ট লিখে উঠে গেছিলাম ক্যাপ্টেনের ডাকে। আরবী ভাষায় লেখা চিঠিটার মানে করেছেন উনি। ডেকেছিলেন সেই জন্যেই।

তাঁবু শূন্য দেখে প্রথমেই রক্ষী চারজনকে তলব করেছিলেন ক্যাপ্টেন। শুধু দড়ি পড়ে আছে দেখে তারাও হতভম্ব হয়েছে। কাউকে পালাতে দেখেনি—অথচ মোরিলিরে নেই।

রহস্য উদ্ধার হল তাঁবুর ছাদের দিকে তাকিয়ে। পরিষ্কার ফুটো। আকাশ দেখা যাচ্ছে। মোরিলিরে নিজেই বাঁধন আলগা করে খুঁটি বেয়ে উঠে তাঁবুর ছাদ কেটে পালিয়েছে—জমিতে দাঁড়িয়ে রক্ষীরা তাই দেখতে পায় নি?

ক্যাপ্টেন ভীষণ রেগে গেলেন। রক্ষীদের শাস্তির ব্যবস্থা করলেন। সেই সঙ্গে হুকুম দিলেন, এ ব্যাপার যেন কাকপক্ষীও না জানতে পারে।

তারপর একঘন্টা পরে আমরা জড়ো হলাম বারজাকের তাঁবুতে। ক্যাপ্টেন বললেন—"আরব লেখা পড়তে হয় ডান দিক থেকে বাঁদিকে। যাই হোক, যেটুকু পেয়েছি, এই দেখুন।"

বলে, ল্যাটিন হরফে লেখা যা দেখালেন, তা এই:

মান্‌সা অমান গ্‌নিগনে টৌবাবো

মেমো নিমবে মানদো কাফা

বাটাকে মানেতা সোফা

আ ওকাতো। বাতাও

আই আ কা ঘোলো। মান্‌সা আ বে

এতো আর এক হেঁয়ালি। এর মানে আমি কি বুঝব?

হাতে হাতে চালান হল নতুন হেঁয়ালি লেখা কাগজ। জেন মোরনাস আর সেন্ট বেরেন কিছু মানে বুঝতে পারলেন মনে হল। বারজাক, পঁসিঁ আর আমি শুধু মাথা চুলকোলাম।

ক্যাপ্টেন বললেন—"প্রথম দুটো লাইন আর শেষের কথাগুলো অসম্পূর্ণ, ছিঁড়ে খেয়েছে মোরিলিরে। প্রথম শব্দটা নিশ্চয় 'টৌবাবোলেনগো'। মানে, ইউরোপীয়। আক্ষরিক অনুবাদ—লাল ইউরোপীয়। তারপরের অর্ধেক শব্দটা হল 'কাফামা'। মানে, এখনো। এবার পুরো তর্জমাটা শুনুন:

"মালিক (অথবা রাজা) ইউরোপীয়দের চায় না...যেহেতু ওরা এখনো আসছে...চিঠি দেখালেই সৈন্যরা আসবে...হুকুম সে দেবে। তামিল করবে... শুরু করেছো। মালিক (অথবা রাজা) এখন..."

মুখভঙ্গী করলাম—মাথামণ্ডু কিস্‌সু বুঝলাম না। কেউ না।

ক্যাপ্টেন বুঝিয়ে দিলেন—"প্রথম অংশটুকু সোজা। কোথাও এক 'মালিক' অথবা 'রাজা' আমাদের কিছু কিছু কাজ করতে দিতে চায় না। আমরা যেন তার কাছে একটা উৎপাত। কাগজেব যে টুকবোটা মোরিলিরে গিলে খেয়েছে তার মধ্যেই নিশ্চয় লেখা ছিল একটা ষড়যন্ত্র—কি ষড়যন্ত্র জানি না, জানবার উপায়ও নেই। শেষের দুটো লাইনও তেমন পরিষ্কার নয়। 'চিঠি দেখালেই সৈন্যরা আসবে'—বুঝলাম না কি বলা হচ্ছে। চতুর্থ কথাটা অর্ডার—হুকুম করা হচ্ছে মোরিলিরেকে। পরেব কথাটায় 'সে' 'হুকুম' দেবে। কে এই 'সে' ? কি 'হুকুম' দেবে ?"

মুখ চাওয়াচাওয়ি করলাম সবাই। বারজাক বললেন—"এ থেকে তিনটে সিদ্ধান্তে আসা যায়। এক, গাইড মোরিলিবে বিশ্বাসঘাতককতা করেছে। আমাদের গতিরোধ করতে চায় যে, তার চব হয়েছে। দুই, অজ্ঞাত এই ব্যক্তি প্রভাবশালী। তাই কোনাক্রিতেই নিজেব চব মোতায়েন করতে পেরেছে গাইডের ছদ্মবেশে। তিন, লোকটাব ক্ষমতাব জোব কম। তাই ছেলেমানুষের মত কাণ্ড করে চলেছে—সত্যিকারের বাধা সৃষ্টি করতে পারেনি।"

বাধা দিয়ে বললাম—"আমি প্রতিবাদ জানাচ্ছি। রহস্যময় এই ব্যক্তি হরেকরকমভাবে বিঘ্নসৃষ্টি করছে। যেমন—"

বলে, একে একে বললাম 'ডোঙিং-কোনো' বিষ আর 'কেনিয়ালালা' গণৎকাব সম্বন্ধে আমার দুশ্চিন্তা কাহিনী।

বারজাক বললেন—"তাতে আরো বেশী করে প্রমাণিত হয়ে যাচ্ছে আমার সিদ্ধান্ত। অজ্ঞাত এই ব্যক্তির শক্তির বহর কম। তাই ছেলেমানুষেব মত ভয় দেখিয়ে আমাদের গতিরোধ করতে চাইছে। সত্যিকারের বিপজ্জনক বাধা সৃষ্টি করতে একেবারেই অক্ষম। সুতরাং, এ প্রসঙ্গ নিয়ে অথবা দুশ্চিন্তা করবার কোনো প্রয়োজন নেই।"

সবাই একমত হলেন। কেন হলেন, আমি তা জানি। প্রত্যেকের মনের কোণে লুকোনো অভিপ্রায়ের খবর রাখি। অবাক হলাম শুধু বারজাকের গোঁয়ার্তুমি দেখে। এত সংশয় সত্ত্বেও অভিযান চালিয়ে যাওয়াব কোনো

মানে হয়।

যাই হোক, নতুন গাইড চাই। শ্রীমতি মোরনাসের দুজন গাইড কাজ চালিয়ে নিতে পারবে। তাদেরকে আনা হয়েছে সেই কারণেই।

কিন্তু চৌমৌকিকে মন থেকে মেনে নিতে পারলাম না। লোকটার হাবভাব সন্দেহজনক। চোখে চোখ রেখে কথা বলতে পারছে না। কেমন যেন ঘাবড়ে গেছে। পক্ষান্তরে, চোখে চোখ রেখে স্পষ্টস্বরে কথা বলে যাচ্ছে টৌনগানে। নিঃসঙ্কোচে।

চৌমৌকিকে বিশ্বাস করা যায় না—মোরিলিরের স্বগোত্র।

টৌনগানে কিন্তু সোজাসুজি বললে। কোনো ভয় নেই। কুলিদের সে বুঝিয়ে বলবে।

দুজনে গেল কুলিদের বুঝোতে। শুধু বলল না, মোরিলিরে পালিয়েছে। বলা হল, তাকে কুমিরে খেয়েছে। এখন থেকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে তারা দুজন। চুপচাপ শুনে গেল কুলিরা। • কোনো কথা বলল না।

৯ই ফেব্রুয়ারী।—মোরিলিরে আর নেই, কিন্তু সে থাকতে যেমন কচ্ছপ গতিতে এগিয়েছিলাম, এখনও তাই যাচ্ছি

সমানে কথাকাটাকাটি চলছে দুই গাইডের মধ্যে। চৌমৌকি যে পথে শেষ পর্যন্ত নিয়ে যাচ্ছে, দেখা যাচ্ছে তা ভুল। ফিরে আসতে হচ্ছে অনেক কষ্টে। তারপর টৌনগানের দেখানো পথে বোঝা যাচ্ছে, সেইটাই আসল পথ। পথের কষ্ট কম।

কখনো কখনো তর্ক করতে করতে এত বেলা করে ফেলছে দুজনে যে সকাল বেলার অভিযান বন্ধ রাখতে হচ্ছে।

ফলে, আড়াই দিনে এসেছি মোটে বিশ মাইল।

কোকোরো থেকে যে উপত্যকায় ঢুকেছিলাম, এখনো রয়েছি সেখানে। ডাইনে আর পাহাড় নেই। উপত্যকা ক্রমশঃ চওড়া হয়ে যাচ্ছে। রাস্তা সহজ হচ্ছে। নদী তেমন নেই।

১১ই ফেব্রুয়ারী।—সকালের দিকে চাষের জমি দেখে বুঝেছিলাম এবার একটা গাঁ আসছে। বিস্তর উইয়ের ঢিবি দেখলাম। মানুষ সমান উঁচু। শীতের শেষে পাখা মেলে গাঁয়ের দিকে উড়ে যায় উই বাহিনী পাখা গজানো পিঁপড়ের মত। জংলীরা ধুনি জ্বালিয়ে বসে থাকে। আগুনে ঝলসে মরে রাশি রাশি উড়ন্ত উই। ওরা তাই খায় সি মাখন দিয়ে মেখে। সবশেষে মদ।

আটটা নাগাদ দেখলাম গাঁ-টা। নাম, বামা। গাঁয়ে ঢোকার আগেই

একদল ভূত তাড়ানো রোজাদের মিছিল দেখলাম। শনের ঝালরে মুখ ঢেকে নাচতে নাচতে চলেছে। কপালে শকুনির চঞ্চুর মালা। লাল কাঠের বেড়। এরা শুধু ভূত তাড়ায় না—বৃষ্টিও নামায়। এদের নাম 'দৌ'।

একপাল ছেলে চলেছে এদের ঘিরে। মন্ত্রপূত লাঠি দিয়ে সমানে ছেলে-গুলোকে পিটছে 'দৌ'রা। পথে কুঁড়ে পড়লেই 'দোলো' মদ গিলছে। ঘন্টা খানেক পরেই দেখা গেল সব নেশায় বেহুঁশ।

'বামা' পৌঁছোলাম আধঘন্টা পরে। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হল চৌমৌকির আর এক নষ্টামি। ক্যাপ্টেনকে সে বললে, কুলিরা হেদিয়ে পড়েছে। বিশ্রাম চাই। আজ আর বেরোনো নয়—গাঁয়ে রাত কাটানো যাক।

চোখমুখ কথার ঢঙ দেখেই বুঝলাম, ন্যাকামি হচ্ছে। পেছন থেকে ইসারায় বারণ করল টৌনগানেও। চৌমৌকির কথায় যে সে অবাক হয়েছে এবং দোস্তের কথা যেন শোনা না হয়---আকারে ইঙ্গিতে পেছনে থেকে বলতে কসুর করল না। কিন্তু কি আশ্চর্য। ক্যাপ্টেন বলে বসলেন, এত বলাবলির কি আছে? উনি তো আগে থেকেই ঠিক করে রেখেছেন আজকে লম্বা বিশ্রাম নেবেন।

ফলে, চৌমৌকি একটু ভ্যাবাচাকা খেয়ে সরে পড়ল। খিঁচড়ে গেল টৌনগানের মেজাজ। ঝাল ঝাড়তে লাগল মালিকের ওপর।

এই সুযোগে 'বামা' গাঁটাকে দেখে নিলাম। মাটির ওপর হেঁটে নয়—ছাদ থেকে ছাদে গিয়ে। কারণ এ গাঁয়ে কুঁড়ের মধ্যে ঢুকতে হলে ছাদের দরজা দিয়ে ঢুকতে হয়। এই ভাবেই ছাদ থেকে ছাদের ওপর দিয়ে পৌঁছো-লাম মোড়লের ছাদে।

মোড়ল লোকটাকে দেখতে প্রাক্তন পদাতিকের মত। ইয়া গোঁফ। তামার পাইপে তামাক থেকে খেতে সাদরে অভ্যর্থনা জানাল আমাদের। এনে দিল দোলো মদ। আমরা দিলাম কিছু সস্তার সামগ্রী।

তারপর বেরোলাম গ্রামে টহল দিতে। এক জায়গায় দেখলাম একজন ভ্রাম্যমান নাপিত নখ কাটছে নিগ্রোদের। মাথাপিছু দক্ষিণা মাত্র চারটে কড়ি। নখগুলো কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মাটি খুঁড়ে পুঁতে ফেলছে নখের মালিকরা। কারণ, এ নখ অন্যে নিলে জাদু করে দিতে পারে, নখের মালিকের অনিষ্ট করতে পারে।

আরেক জায়গায় দেখলাম একটা লোক জ্বরে কাঁপছে। গোইয়া ডাক্তার তার চিকিৎসা করছে। লোকটাকে উপুড় করে শুইয়ে ফেলে একটা কাঠের

পুতুল (উপদেবতার মূর্তি) সামনে রেখেছে। রুগীর মুখে ছাই মাখিয়েছে—যেহেতু ছাইয়ের রঙ সাদা, সুতরাং তার মধ্যে জাদুর শক্তি নিহিত আছে। কাঠের মূর্তি ঘিরে তাথৈ তাথৈ নাচ নাচছে আর হুলুগুলু হুলুগুলু করে করে বিকট চেঁচিয়ে মন্ত্র পড়ছে। অবশেষে যেন রোগের জায়গা নিরূপণ করা গেছে, এমনি ভঙ্গিমায় রুগীর গায়ে বিশেষ এক জায়গায় হাত বুলিয়ে ফস করে হাত টেনে নিতেই দেখা গেল মুঠোয় একটা হাড়! যেন দেহের মধ্যে থেকেই টেনে বার করা হল! আসলে হাত সাফাই!

লোকটাও যেন রোগমুক্ত হয়েছে এমনি ভাবে তিড়িং করে লাফিয়ে উঠে চম্পট দিল চক্ষের নিমেষে।

পরে এই লোকটাই তাঁবুতে এসেছিল ডক্টর চাতোন্নের কাছে—লোক মুখে শুনেছে উনি নাকি বড় জাদুকর। চাতোন্নে রুগীর লক্ষণ শুনে শুধু এক পুরিয়া কুইনাইন দিলেন। ওষুধ নিশ্চয় মনে ধরেনি রুগীর—মুখভঙ্গী দেখেই বোঝা গেল।

১২ই ফেব্রুয়ারী—গাঁ ছেড়ে রওনা হওয়ার সময়ে সেই লোকটাই লাফাতে লাফাতে এসেছিল ডক্টরকে কৃতজ্ঞতা জানাতে। রোগ তার সেরে গেছে। চাতোন্নে তাকে আরো কয়েকটা পুরিয়া দিলেন।

পথে বৈচিত্র্য নেই। একঘেয়ে বর্ণনা লিখতেও ভাল লাগছে না। চৌমৌকির চালাকি অব্যাহত রয়েছে। কুলিরা যেই দুপুর বেলা জিরেন নিতে বসল, চৌমৌকি এসে ক্যাপ্টেনকে গতকালের মতই কি যেন বলল। ক্যাপ্টেন বেশ চেঁচিয়ে সব্বাইকে শুনিয়ে বললেন—চৌমৌকি ঠিক বলেছে। আজ বিকেলে বেরোনো হবে না—কালকে সকালেও না। লম্বা বিশ্রামের পর বৈকালিক অভিযান শুরু করে বারো মাইল পথ একটানা পাড়ি দেওয়া হবে—তার আগে তাঁবু পাতা হবে না—রাত হলেও না। কুলিরা মুখ চাওয়া চাওয়ি করে সরে পড়ল।

বিকেল ছটা নাগাদ আবার সেই অদ্ভুত আওয়াজটা শোনা গেল। ক্যান-ক্যানে যে আওয়াজ শুনেছিলাম, সেই আওয়াজ। তখন দিনের আলো রয়েছে। আচমকা পূবদিক থেকে ক্ষীণ শব্দটা কানে আছড়ে পড়তেই সচকিত হল তাঁবুর প্রত্যেকেই। ভয় পেয়েছে নিগ্রোরা। আওয়াজ ক্রমশঃ বাড়ছে, আকাশ কিন্তু পরিষ্কার—অথচ আওয়াজ আসছে পূবের আকাশ থেকে। পূর্বদিকে দৃষ্টিপথ আড়াল করে মাথা উঁচু করেছিল একটা উঁচু পাহাড়। আমি উঠতে লাগলাম পাহাড়ের গা বেয়ে। আওয়াজ তখনও বাড়ছে। হঠাৎ থেমে গেল। হাঁপাতে

হাঁপাতে চুড়োয় উঠলাম। চোখ পাকিয়ে চারদিকে তাকালাম। কিছুই দেখতে পেলাম না। রাতের অন্ধকার নামল একটু একটু করে। অন্ধকারের মধ্যে ফের জাগ্রত হল রহস্যময় আওয়াজটা। গর্জনধ্বনি একটু একটু করে সরে গেল পূবে। নিস্তব্ধ আকাশ। আর শব্দ নেই। আমি নেমে এলাম তাঁবুতে। এখন লিখছি এই নোট।

১৩ই ফেব্রুয়ারী। সকাল থেকে সবাই গা ঢেলে দিয়েছে, বিশ্রাম নিচ্ছে। কুলিরা ঘুমোচ্ছে। টোনগানে মালিকের কানে মন্ত্র দিচ্ছে। পাঁসি গাছতলায় বসে কি সব অংক কষছেন। বারজাক পাইচারী করছেন। সেন্ট বেরেন বোধহয় মাছের খোঁজে বেরিয়েছেন। ক্যাপ্টেন শ্রীমতির সঙ্গে খোশগল্প করছেন। আমি বসে বসে রিপোর্ট লিখেছি।

লেখবার পর চৌমৌকিকে খুঁজে পেলাম না। তার হাতেই দেব রিপোর্ট। কিন্তু কোনো তাঁবুতেই তার টিকি দেখা গেল না। অদৃশ্য হয়েছে। প্রবন্ধ পাঠানোর আশা ত্যাগ করছি।

১৪ই ফেব্রুয়ারী। —আজ একটা বিরাট ব্যাপার ঘটল।

সকাল আটটার সময়েও যখন চৌমৌকি ফিরে এল না, ঠিক হল তাকে ছাড়াই রওনা হব। ঠিক এই সময়ে দেখা গেল পশ্চিম দিক থেকে একদল সৈন্য আসছে আমাদের দিকে।

প্রথমে দেখেছিলেন ক্যাপ্টেন মারসিনে। দেখেই হুকুম দিলেন নিজের সৈন্যদের। হাতিয়ার বাগিয়ে তারা দাঁড়িয়ে গেল লড়াইয়ের ভঙ্গিমায়।

কিন্তু তার দরকার ছিল না। দূর থেকেই ফরাসী সামরিক ইউনিফর্ম চিনতে পারলাম। কাছে আসতে দেখলাম বিশজন নিগ্রো সৈন্যকে নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে আসছে তিনজন ইউরোপীয় অফিসার—তাদের একজনের পরনে লেফটেন্যান্টের পোশাক।

আমাদের সার্জেন্ট এগিয়ে গিয়ে কথা বলল আগুয়ান সৈন্যদের সঙ্গে, সদলে আমাদের তাঁবু প্রাঙ্গণে ঢুকল লেফটেনান্ট। সটান এল ক্যাপ্টেন মারসিনের সামনে।

"ক্যাপ্টেন মারসিনে ?"

"ইয়েস লেফটেন্যান্ট…"

"আমি লেফটেন্যান্ট ল্যাকোর। সোদানিজ ভলান্টিয়ারদের ঘোড়সওয়ার বাহিনীর বাহাত্তরতম কলোনিয়ান ইনফ্যানট্রির চার্জে আছি। আসছি বামাকো থেকে, সিকাগোতে আপনাকে কয়েকদিনের জন্যে ধরতে পারিনি। সেই থেকে

পেছনে পেছনে আসছি।"

"কি জন্যে ?"

'এই চিঠিটা পড়লেই বুঝবেন।'

হাত বাড়িয়ে চিঠি নিলেন ক্যাপ্টেন। পড়লেন, মুখের ভাব পাল্টে গেল। প্রথমে বিস্ময়, তারপর নৈরাশ্য।

"ঠিক আছে। মঁসিয়ে বারজাককে আগে চিঠি দেখাই, তারপর যা বলবেন তাই করব।"

আমাদের কাছে চিঠি নিয়ে এলেন ক্যাপ্টেন।

বললেন--"আশ্চর্য খবর এনেছি। আপনাদের ছেড়ে যেতে হচ্ছে।"

"ছেড়ে যাবেন।" চমকে উঠলেন শ্রীমতি মোরনাস। মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেছে; ঠোঁট কামড়াচ্ছেন। চরিত্র অত্যন্ত দৃঢ় বলেই কেঁদে ফেললেন না।

আমরা প্রত্যেকেই তখন বিমূঢ়—বারজাক ছাড়া।

বললেন—"কি বলতে চান ?"

"টিম্বাকটুতে যাওয়ার হুকুম এসেছে।"

"হতেই পারে না!"

"পড়ুন।"

পড়লেন বারজাক। পড়তে দিলেন আমাদের। সেই ফাঁকে চিঠির বয়ানটা দ্রুত নোট করে নিলাম আমার খাতায় :

ফ্রান্স গণতন্ত্র

গভর্ণমেন্ট জেনারেল দ্য সেনেগাল

সার্কল দ্য বামাকো

ক্যাপ্টেন পিয়েরি মারসিনে অবিলম্বে সিগো-সিকোরোতে রিপোর্ট করুন। বাহিনীর ঘোড়া সেখানকার ছাউনিতে রেখে নাইজারের টিম্বাকটুতে যাবেন। রিপোর্ট করবেন ডিসট্রিক্ট কম্যাণ্ডারের কাছে।

বাহাত্তরতম কলোনিয়াল ইনফ্যানট্রির বিশজন সুদানিজ ভলাণ্টিয়ার নিয়ে লেফটেন্যান্ট ল্যাকোর ক্যাপ্টেন পিয়েরী মারসিনের কাজ বুঝে নেবেন এবং নাইজার বেণ্ডের এক্সট্রা-পার্লামেন্টোরি মিশন চীফ মঁসিয়ে বারজাকের হুকুম মত চলবেন।

কর্ণেল কম্যাণ্ডিং লা সার্কল দ্য বামাকো সেন্ট অবান।

আমি দ্রুত হাতে চিঠিখানা যখন কপি করছি তখন তেলে বেগুনে জ্বলে

উঠলেন বারজাক—"একি ফাজলামি হচ্ছে? একশজন সৈন্যর জায়গায় মাত্র বিশজন!...প্যারিসে একবার যাই, তারপর বুঝিয়ে দেব কত ধানে কত চাল। চেম্বারের মেম্বারের সঙ্গে এমনি ব্যাভ্যার!"

শুকনো মুখে ক্যাপ্টেন বললেন—"আপাততঃ হুকুম তামিল করতে হবে।"

ক্যাপ্টেনকে একটু তফাতে নিয়ে গিয়ে বারজাক যা বললেন—আমার রিপোর্টারের কান বলেই তা শুনতে পেলাম।

"ক্যাপ্টেন, অর্ডারটা জাল হতেও পারে।"

চমকে উঠলেন ক্যাপ্টেন—"জাল! অসম্ভব। চিঠির সীলমোহর ঠিক আছে। তাছাড়া কর্ণেল সেন্ট্ অবানের অধীনে আমি কাজ করেছি—ও সই আমি চিনি।"

চুপ মেরে গেলেন বারজাক।

বারজাকের সঙ্গে লেফটেন্যান্টের আলাপ করিয়ে দিলেন ক্যাপ্টেন।

বারজাক জিজ্ঞেস করলেন—"হঠাৎ এই হুকুমের কারণটা জানেন?"

"তৌয়ারেগ আউলিমেদেনরা মাথা চাড়া দিয়েছে। আক্রমণ শুরু করেছে। তাই টিম্বাকটুতে বেশী সৈন্য দরকার। যেখান থেকে যা পাচ্ছেন, জড়ো করছেন কর্ণেল।"

"কুড়িজন সৈন্য নিয়ে আমাদের কি চলবে?"

হাসল লেফটেন্যান্ট ল্যাকোর—"ভয় নেই, এ অঞ্চল সম্পূর্ণ শান্ত।"

"তাই কি? কলোনী মিনিস্টার নিজে কিন্তু চেম্বারে রিপোর্ট পাঠিয়েছেন নাইজারে অনেক চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটছে। কোনাক্রি রেসিডেন্টও সমর্থন করেছেন এই রিপোর্ট। নাইজার মোটেই শান্ত নয়।"

"ও খবর এখন পুরোনো হয়ে গেছে," হাসতে হাসতে বলল লেফটেন্যান্ট ল্যাকোর। "এখন সব শান্ত।"

মানতে চাইলেন না বারজাক। আসবার পথে আমাদের অ্যাডভেঞ্চারের কাহিনী শোনালেন।

ল্যাকোর বিচলিত হল না। বললে—"তুচ্ছ ব্যাপার। কোথাকার কে একজন আপনাদের ভয় দেখাতে চাইছে—কিন্তু এমন শক্তি নেই যে আপনাদের পথ আটকায়। খামোকা ভয় পাচ্ছেন।"

বারজাকের মুখে জবাব এল না।

ক্যাপ্টেন এগিয়ে এলেন—"মঁসিয়ে বারজাক আমাকে তাহলে হুকুম দিন। এখুনি রওনা হতে হবে।"

"হোন...তাই হোন।" গজ গজ করে করমর্দন করলেন বারজাক।

"ধন্যবাদ।" ক্যাপ্টেন যে কতখানি বিচলিত হয়েছেন, ঐ একটি কথার মধ্যেই তা প্রকাশ পেল।

একে একে সবার কাছেই বিদায় নিলেন ক্যাপ্টেন। কিন্তু শ্রীমতির কাছে বিদায় নিলেন সংক্ষিপ্ততম কথায়—যা বলবার বলা হয়ে গেল ঐ একটি কথার মধ্যেই।

"আসি," বললেন ক্যাপ্টেন।

"আসুন," বললেন শ্রীমতি।

বেশ বুঝলাম, আবার দেখা হবে দুজনে। এক কথাতেই সবার সামনেই তা বলা হয়ে গেল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই একশ ঘোড়সওয়ার নিয়ে বনের মধ্যে মিলিয়ে গেলেন ক্যাপ্টেন। নির্নিমেষে চেয়ে রইলাম সেইদিকে। একঘণ্টা আগেও ভাবিনি উনি এইভাবে চলে যাবেন।

ফিরে তাকালাম বিশজন নবাগত সৈন্যর পানে। গা শিবশির করে উঠল। হঠাৎ কেন জানি মনে হল জঙ্গলে এদের সঙ্গে থাকা নিরাপদ নয়।

১০ ॥ নবাগত সশস্ত্র প্রহরী

(অ্যামিদী ফ্লোরেন্সের নোটবই থেকে)

একই দিন, সন্ধ্যা।—সত্যিই নিরাপদ নয়। এদের সঙ্গে নিয়ে গভীর জঙ্গলে যাওয়া যায় না! আমার মন চাইছে না। তবুও যেতে হচ্ছে। বুঝছি বিপদের মধ্যে পা বাড়াচ্ছি, কিন্তু বুঝতে পারছি না বিপদটা কি ধরনের। চমৎকার পরিস্থিতি বটে। চোখ কান হুঁশিয়ার রয়েছে বিপদের মোকাবিলা করবার জন্যে—কিন্তু ধরতে পারছি না কোনদিক থেকে আসবে সেই বিপদ। গা শিরশির করছে সেই জন্যেই। এ হেন শিহরণ প্যারিসে বসে কফির কাপে চুমুক দিতে দিতে মানায়—অরণ্যের মধ্যে নয়।

কাদের সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি আমি? সশস্ত্র প্রহরী রূপে যারা এসেছে আমাদের বিপদ আপদ থেকে আগলানোর জন্যে, তারা কারা? মন বলছে লুঠেরা ডাকাত বদমাস। রজ্জুতে সর্পভ্রম হচ্ছে না তো? রহস্যময় চিঠিখানা কিন্তু খোদ কর্ণেল সেন্ট অবানের লেখা। তবে ভয় পাচ্ছি কেন?

জানি না কেন। মন কিন্তু শংকিত হচ্ছে বিশজন নতুন প্রহরী আর

তাদের কম্যাণ্ডারকে দেখে।

এরা কি আদৌ মিলিটারী? নিগ্রোদের চেহারা দেখে অবশ্য কিছু ধরা যায় না। কিন্তু অফিসারদের দেখে তো আঁচ করা যায়। এন. সি. ও সার্জেন্ট দুজন মিলিটারী নিঃসন্দেহে। কিন্তু নিগ্রোবাহিনীর খুলির গড়ন ও-রকম কেন? এজন্যে ফ্রেনলজি (মাথার খুলি পরীক্ষা করে চরিত্র জানবার বিজ্ঞান) অথবা ফিজিয়নমিতে (মুখ, হাবভাব ইত্যাদি চরিত্র নির্ণয় করবার বিদ্যা) পণ্ডিত হওয়ার দরকার হয় না। মুখ দেখলেই মনে হয় যেন ফাঁদে পড়া নিষ্ঠুর পশু। অসহায় অস্বস্তি, নির্মম উল্লাস আর স্থূল আনন্দ যেন মুখের প্রতিটি রেখায় ফুটে উঠেছে।

খটকা লাগল আরও একটা অদ্ভুত ব্যাপার দেখে। পনেরো দিন ধরে যারা আমাদের পেছন পেছন ছুটে আসছে, তাদের সর্বাঙ্গ ধূলিধূসরিত হবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু তাদের লীডারের ধড়াচূড়া অমন ধূলিশূন্য কেন? পাটভাঙা জামাকাপড় পরা ফিটফাট বাবু! এ আবার কি রহস্য!

শুধু কি জামাকাপড়, চোখমুখের মধ্যেও কোথাও ক্লান্তির ছাপ নেই। ইস্ত্রিকরা ধোপাখানার পোশাক, চকচকে পালিশ করা জুতো। মোম মাখানো গোঁফ—যেন এই মাত্র বেরিয়ে এল ব্যাণ্ড-বক্স থেকে।

পা থেকে মাথা পর্যন্ত চাকচিক্য—পোশাকের দিক দিয়ে খাঁটি অফিসার সাজার আপ্রাণ প্রয়াস। এমন চকচকে পোশাক, যে দেখেই সন্দেহ হয়। যেন কখনো পরা হয়নি—আনকোরা নতুন!

বেশী বাড়াবাড়ি করতে গিয়েই ধরা পড়ে যাচ্ছে লেফটেন্যান্ট। সাঙ্গপাঙ্গরা যেখানে ধূলি ধূসরিত, নিজে সেখানে ফিটফাট বাবু থাকা কি সম্ভব? একই পথ মাড়িয়ে কি আসতে হয়নি তাকেও?

সার্জেন্ট দুজনের পোশাক দেখেও সন্দেহ হয়। মিলিটারী পোশাক ঠিকই—কিন্তু শতচ্ছিন্ন। লেফটেন্যান্টের ঠিক উল্টো। তার চাইতেও সন্দেহজনক হল—দুজন সার্জেন্টের ইউনিফর্মেই রেজিমেন্টের নাম্বার কি চিহ্ন—কিস্‌সু নেই, শুধু অজস্র তালি।

ফরাসী সৈন্যদের এরকম হাল হতে পারে—বিশ্বাস করা মুস্কিল। আমার মনে কিন্তু অন্য সন্দেহ আসছে। পোশাকগুলো যেন জোর করে পরানো হয়েছে এদের—ঢলঢলে বেমানান সেই কারণেই। অনভ্যস্ত, বলেই অস্বস্তিটা এত প্রকট।

আমার ভুল হতে পারে, কিন্তু যা মনে হল তাই লিখলাম। এদের আমি

বিশ্বাস করতে পারছিনা—অবিশ্বাসের কারণ দর্শাতেও পারছি না।

তবে হ্যাঁ, নিয়মানুবর্তিতা মেনে চলে এরা। ঘড়ির কাঁটার মত। এতটা ভুলচুক, গা ঢালা ভাব নেই। একজন সেন্ট্রি যাচ্ছে তো আরেক জন আসছে। নিখুঁত ব্যবস্থা!

সশস্ত্র বাহিনী তিনদলে বিভক্ত। প্রথম দলে আছে বিশজন নিগ্রো ভলান্টিয়ার। এরা কেউ কারও সঙ্গে কথা বলে না। নীরবে খানা পাকায়, ঘুমোয়। খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার। নিগ্রোদের স্বভাব তো তা নয়। প্রত্যেকেই কথার ধোকড়।

বোবা হলেও যমের মত ভয় করে সার্জেন্ট দুজনকে। চোখের ইঙ্গিত তামিল করে সভয়ে, চক্ষের নিমেষে। দেখে মনে হয় এরা অসুখী এবং সব সময়ে আতংকে কাঠ হয়ে রয়েছে। বিশজনেই।

দ্বিতীয় দলে রয়েছে এন. সি. ও. সার্জেন্ট দুজন। এরা কথা বলে কেবল নিজেদের মধ্যে—তাও চাপা গলায়। আমার রিপোর্টারের সজাগ কানেও ওদের ফিসফিসানি ধরা পড়ে না।

তৃতীয় এবং শেষ দলে আছে লেফটেন্যান্ট ল্যাকোর স্বয়ং। খর্বকায় পুরুষ। ভদ্রলোক হিসেবে খুব একটা আকর্ষণীয় নয়। হাল্কা নীল রঙের চোখ —যেন ইস্পাতের চোখ। কথা বলে না। মিশুকে নয়। সারা বিকেলে তাঁবু থেকে বেরোতে দেখেছি মাত্র দুবার—তাও সাঙ্গপাঙ্গদের হুকুম দিতে। বিশজন নিগ্রো প্রতিবারেই তড়াক করে লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠছে কাঠের পুতুলের মত। শক্ত মুখে প্রত্যেকের পা থেকে মাথা পর্যন্ত চোখ বুলিয়ে নিয়েছে লেফটেন্যান্ট। একটা কথাও বলেনি। বলার দরকার হয় নি। জবরদস্ত পুরুষ বটে। তবে অরণ্যের সঙ্গী হিসেবে এমন লোককে আমি অন্ততঃ সংগে রাখতে চাই না।

সারাদিনে শ্রীমতি মোরনাসকে দেখা যায় নি।

দেখা যায়নি চৌমৌকিকেও। তার মানে, আর একটা প্রবন্ধ আমার পকেটেই পড়ে রইল।

২৫ই ফেব্রুয়ারী। —সকালে বেরোই নি। টোঙ্গানে-কে জিজ্ঞেস করলাম। ও বললে, আজ সারাদিন বিশ্রাম নেওয়া হবে। গতকাল সারাদিন বিশ্রাম নিয়েছি। আবার আজ? ব্যাপার রহস্যময়!

বাঁশের মত সিধে ফিটফাট লেফটেন্যান্টের সংগে দৈবাৎ মুখোমুখি হয়েছিলাম। জিজ্ঞেস করেছিলাম আবার কেন জিরেন নেওয়া হচ্ছে।

"মঁসিয়ে বারজাকের হুকুম," মাত্র তিনটে শব্দে জবাব দিয়ে স্যালুট ঠুকে সরে পড়ল লেফটেন্যান্ট। মিশুকে একদম নয়।

সশস্ত্র প্রহরীর সংখ্যা এক পঞ্চমাংশ হয়েছে বলেই কি অভিযান বন্ধ রেখেছেন বারজাক? চিন্তায় পড়লাম। আমার প্রবন্ধ লেখাও তো তাহলে শিকেয় উঠল।

পাকড়াও করলাম ভদ্রলোককে। উনি তখন তাঁবুর বাইরে পায়চারী করছেন। হাত পেছনে, চোখ মাটির দিকে, চিন্তাচ্ছন্ন।

আমার প্রশ্ন শুনলেন, কিছুক্ষণ মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলেন। তারপর বললেন—"এই নিয়ে দুবার একই প্রশ্ন করলেন। কিন্তু জবাব তো আমি জানি না।"

"তাহলে কি সিদ্ধান্ত নিতে পারেন নি?"

"তলিয়ে ভাবছি। আসুন না, আপনার সংগেই আলোচনা করা যাক!"

"বেশ তো।"

"অভিযান চালিয়ে গেলে কি লাভ, তা আমার জানা হয়ে গেছে। নতুন কিছুই আর পাওয়া যাবে না। তাই না?"

"ঠিক।"

"এদিকে তো সশস্ত্র প্রহররীর সংখ্যা পাঁচভাগের একভাগে এসে ঠেকেছে। এত কম সৈন্য নিয়ে এই জঙ্গলে যাওয়া কি সমীচীন?"

"এর চাইতেও কমলোক নিয়ে, এমন কি কোনো সৈন্য না নিয়েই অনেক অভিযাত্রী জঙ্গল পাড়ি দিয়েছেন। তবে কি জানেন—"

"জানি কি বলবেন। কোথাকার কে একটা লোক বারবার ভয় দেখাচ্ছে আমাদের। কিন্তু তার দৌড় যখন বোঝা গেছে, তখন তা নিয়ে আর কথা বলতে চাই না।"

দেখলাম এই সুযোগ। নতুন সৈন্য আর অফিসারদের নিয়ে আমার দুশ্চিন্তা আর পর্যবেক্ষণ এবার হাজির করা যাক বারজাকের সামনে।

বললাম। সমস্ত। শুনে হাসতে লাগলেন বারজাক।

বললেন—"ওসব থিয়েটারে মানায়, মঁসিয়ে ফ্লোরেন্স। আপনার কল্পনা-শক্তির তারিফ না করে পারছি না। প্রথমেই ধরুন, কর্ণেল অবানের সইটা জাল নয়। ক্যাপ্টেন মারসিনে দেখেই চিনেছেন।"

"চিঠিটা চুরী করে আনা হতে পারে।"

"আবার কল্পনা করছেন! কর্ণেল অবানের পাঠানো সৈন্যবাহিনীর হাত

থেকে এ চিঠি ছিনিয়ে নিতে গেলে লড়াই হতই। হলে এখানে যারা এসেছে, তারাও নিশ্চয় জখম হত। লড়াইয়ের সেরকম চিহ্ন এদের গায়ে দেখছেন? নেই। তাছাড়াও দেখুন জঙ্গলের খবর ছোটে টেলিগ্রাফের স্পীডে—লোক-মুখে। এতবড় একটা ছিনতাইয়ের আর লড়াইয়ের খবর কর্ণেল অবানের কানেও নিশ্চয় পৌঁছে যেত অ্যাদ্দিনে। সবচেয়ে বড় কথা, সুদানিজ ভলা-ণ্টিয়ার ঠিক যেরকমটি হওয়া উচিত—এরাও তাই। তাকিয়ে দেখুন।" দেখ-লাম বারজাক ঠিকই বলেছেন। তফাৎ তো নেই। আমারই ভুল হয়েছে।

সুযোগ পেয়ে বারজাক আরও জোর দিয়ে বললেন—"সার্জেন্ট দুজন ছেঁড়া খোঁড়া নোংরা ইউনিফর্ম পরেছে বলছেন। সে তো ক্যাপ্টেন মারসিনের সার্জেন্টরাও পরত। জংগলে হাঁটলে পোশাক আস্ত থাকে?"

"তাহলে লেফটেন্যান্টের পোশাক আনকোরা নতুন কেন?"

"উনি ফিটফাট থাকতে ভালবাসেন বলে। বিশেষ করে আমাদের সামনে আসছেন বলে নতুন পোশাক সংগে এনেছিলেন কিটব্যাগে করে। ধুলোমাখা ইউনিফর্ম খুলে নতুন ইউনিফর্ম পরে নিয়েছেন। ল্যাকোরের সংগে আমার কথা হয়েছে। ভদ্রলোক শিক্ষিত, বিনীত, ভদ্র। মানী লোকের মান রাখতে জানেন।"

শেষের কথাটা বলার সময়ে বুক ফুলে উঠল বারজাকের।

বললেন—"চমৎকার মানুষ। কথা শোনেন।"

"এ অবস্থায় অভিযান চালিয়ে যাওয়া সম্পর্কে কি বলেন? অসুবিধে বোধ করছেন কি?"

"একদম না।"

"তা সত্ত্বেও দ্বিধায় রয়েছেন।"

"কালকেই রওনা হব।"

"গিয়ে আর কোনো লাভ নেই জেনেও?"

খোঁচাটা ঠিক জায়গা লাগল। সতেজে বললেন—"অভিযান এখন অপরিহার্য।"

"অপরিহার্য।"

আমার হাত ধরে গলা নামিয়ে বারজাক তখন বললেন—"ভায়া, আমি বুঝেছি এই বর্বরদের ভোটার বানানো যায় না। কথাটা খালি আপনাকেই বললাম—চেম্বারে কিন্তু বলব না। অভিযান শেষ করার পর কি হবে জানেন? চেম্বারে আমি রিপোর্ট দোব. বড্রিয়ার্স দেবেন ঠিক তার উল্টো। কমিশন

খতিয়ে দেখবে ছটো রিপোর্ট। ফলে, হয় আমার মুখ রেখে কিছু নেটিভকে ভোটার করা হবে—অথবা আদৌ কিছুই হবে না। দিন সাতেক পরে সবাই ব্যাপারটা ভুলে যাবে। একদিন কলোনীর পোর্টফোলিও পেয়ে যাব। কিন্তু অভিযান মাঝপথে বন্ধ করে দিয়ে যদি ফিরে যাই, শত্রুরা আমার মুণ্ডপাত করবে। হেরে যাবো। রাজনীতিতে একটা জিনিস সব সময় মনে রাখতে হয়। ভুল করলে তা স্বীকার করতে নেই।"

কথাটা মনে ধরল। বারজাকের মনোগত অভিপ্রায়ও জানা গেল। আর কথা বাড়ালাম না।

ফিরে আসার পথে একটা ফোল্ডিং চেয়ারে পঁসিঁর নোটবইটা পড়ে থাকতে দেখলাম। অমনি মাথা চাড়া দিল সাংবাদদাতার স্বভাবজাত কৌতূহল। ভদ্রলোক একদম কথা বলেন না—কিন্তু দিনরাত কি অত লেখেন—দেখতেই হবে।

চক্ষু চড়ক গাছ হল নোটবই খুলে। দুর্বোধ্য কতকগুলো সংখ্যা এলো-পাতাড়ি ভাবে লেখা : 'পি. জে. ০,০০৯,' পি. কে. সি. ১৩৫,০৮,' ম. ৭৬১৮,' ইত্যাদি।

এ আবার কি রহস্য? মিতবাক পঁসিঁ এসব হেঁয়ালি লিখেছেন কেন নোট বইয়ের পাতায় পাতায়? কি মতলবে? অর্থটা বার করা দরকার অবসর মত। ঝটপট হাত চালিয়ে সাংকেতিক সংখ্যাগুলো কপি করে নিলাম। নোটবই চেয়ারে রেখে লম্বা দিলাম।

বিকেলের দিকে টোনগানকে নিয়ে একটু চক্কর দিতে বেরোলাম। আমি নিলাম আমার ঘোড়া—টোনগানে নিল চৌমৌকিব। কিছুদূর গিয়ে গিয়ে মুখ চুলবুলিয়ে উঠল টোনগানের।

বললে—"বিশ্বাসঘাতক! বদমাস!"

আমি ন্যাকা সেজে বললাম—"মোরিলিরের কথা বলছো?"

"মোরিলিরে বদমাস। চৌমৌকিও। কুলিদের সোনার টাকা দিত। মদ দিত, বলত, বেশী হাঁটিস নি"

মোরিলিরে আর চৌমৌকির হাতে সোনার টাকা! বলে কি। বললাম —"কড়ি দিত বল।"

"কড়ি না—সোনা! ইংলিশ সোনার টাকা।"

"ইংলিশ সোনার টাকা চেনো?"

"চিনবো না? আমি যে আশান্তি। পাউণ্ডস্টার্লিং চিনি।"

পাউণ্ডস্টার্লিংয়ের সন্ধি-বিচ্ছেদ করলে দাঁড়ায় পাউণ্ড আর স্টার্লিং। টোন গানের মুখে শব্দটা বেশ লাগল শুনতে। হাসিও পেল। মোরিলিরে আর চৌমৌকি পাউণ্ডস্টার্লিং পাবে কোথায়?

হাসিমুখেই বললাম—"টোনগানে, তুমি কিন্তু লোক ভাল, এই নাও একটা ফরাসী সোনার টাকা।

সে কি উল্লাস টোনগানের। মোহরটা লুফে নিয়ে গুঁজে রাখল জিনে লাগানো ব্যাগে। সঙ্গে সঙ্গে বিস্ময় ফুটে উঠল চোখে মুখে। ব্যাগ থেকে টেনে বার করল রোল পাকানো এক গাদা কাগজ। নিগ্রোদের ব্যাগে এ কাগজ তো থাকে না!

চমকে উঠলাম আমি। চেঁচিয়ে উঠলাম সবিস্ময়ে। এ যে আমার প্রবন্ধ। চৌমৌকিকে দিয়েছিলাম—কোনোটাই পাঠায় নি—রেখে দিয়েছে ব্যাগে! চতুর্থ প্রবন্ধ থেকে শুরু করে সব কটা!

মনটা খারাপ হয়ে গেল। 'লা এক্সপ্যানসন ফ্রাঁসে' পত্রিকায় আমার সুনাম আর রইল না।

দুলকি চালে চলেছি। পথের শেষে থমকে দাঁড়ালাম, সামনেই একটা খোলা জমি। ছ'সাত গজ চওড়া, প্রায় পঞ্চাশ গজ লম্বা। ঘাস পর্যন্ত কেটে ফেলা হয়েছে যেন দানবিক কাস্তে দিয়ে। জঙ্গলের মাঝে পরিষ্কার একটুকরো জমি।

পরক্ষণেই গা ছমছম করে উঠল মাটির দিকে তাকিয়ে।

সেই দাগ! ক্যানক্যানে গভীর রাতে আকাশে অদ্ভুত গজরানি শুনে যে সমান্তরাল খাত দেখেছিলাম মাটিতে, এই সেদিন সন্ধ্যায় আকাশ-গজরানি শোনার পর সামনে চত্বরে দেখলাম সেই খাত। এবার দু'জোড়া। মাটি কেটে ইঞ্চি খানেক বসে গেছে পূবের দিকে!

আওয়াজটার সঙ্গে অদ্ভুত এই খাতের কি তাহলে কোনো সম্পর্ক আছে? এ কোন্ রহস্যের জালে আস্তে আস্তে জড়িয়ে পড়ছি? কেন আকাশ গজরায়? কেন মাটি কেটে বসে যায় সমান্তরাল রেখায়?

ভয় আমার রক্তে নেই। কিন্তু ভাবনা গেল না। আকাশ পাতাল ভাবতে ভাবতে ফিরলাম ক্যাম্পে। কাছাকাছি আসতেই হঠাৎ একটা কথা বলল টোনগানে:

"লেফটেন্যান্ট লোকটা ভাল নয়! বাঁদরের মত মাথা!"

"যা বলেছো!" সায় দিয়ে ফেললাম অতশত না ভেবেই।

১৭ই ফেব্রুয়ারী।—চৌমৌকি আর ফিরে আসেনি। কিন্তু এই দুদিনে পথ চলেছি তিরিশ মাইল। মন্দ নয়। কুলিরা এখন দিব্যি হাঁটছে। বিশজন সশস্ত্র প্রহরী দুপাশ আগলে চলেছে—সার্জেন্ট দুজন পেছনে। নিগ্রোরা নিজেদের মধ্যেও ঠাট্টাইয়ার্কি করে—ক্যাপ্টেনের নিগ্রো সৈন্যরা করত নিগ্রো কুলিদের সঙ্গে। কিন্তু এই নিগ্রো সৈন্যরা কুলিদের সঙ্গে কথা বলে না।

লেফটেন্যান্ট চলেছে সামনে—বারজাকের পাশে। শ্রীমতি মোরনাস পেছিয়ে এসেছেন পঁসিঁ তার চাতান্নোরও পেছনে—হাঁটছেন সেন্ট বেরেনের পাশে। লেফটেন্যান্টের সঙ্গ ওঁর পছন্দ নয়।

লোকটার কিন্তু দাপট আছে। মুখ থেকে কথা খসতে না খসতে তামিল করছে সাঙ্গপাঙ্গরা।

সেদিক দিয়ে বলার কিছু নেই। তবুও মন আমার মানতে চাইছে না। সবকিছুর মধ্যেই যেন একটা বিশ্বাসঘাতকতা দেখতে পাচ্ছি।

আজ সকালে নটা নাগাদ একটা গ্রামের মধ্যে ঢুকে দেখলাম গ্রাম খাঁ খাঁ করছে। কেউ কোথাও নেই। একটা কুঁড়ের মধ্যে গোঁ গোঁ কাতরানি শুনে ঢুকলাম। একজন জখম বুড়ো নিগ্রো পড়ে রয়েছে দুজন মরা নিগ্রোর পাশে। পুরুষ আর মেয়ে। দুজনেরই সমস্ত দেহ বীভৎসভাবে ফালাফালা করা।

জখম নিগ্রোর কাঁধের হাড় একদম গুঁড়িয়ে গেছে। ক্ষতস্থানের দিকে তাকানো যায় না। কলার-বোন ঠেলে বেরিয়ে এসেছে। এরকম আঘাত কোন্ হাতিয়ারে সম্ভব হতে পারে, মাথায় এল না।

ডক্টর চাতোন্নে শুশ্রূষা আরম্ভ করে দিলেন তৎক্ষণাৎ। ঘরের মধ্যে অন্ধকারে ভাল দেখা যাচ্ছিল না। তাই দুজন নিগ্রো সৈন্যকে বললেন, বুড়োকে ধরাধরি করে বাইরে নিয়ে আসতে।

ক্ষতস্থান পরিষ্কার করে দিলেন। অসংখ্য সিসের টুকরো বার করলেন। তারপর ব্যাণ্ডেজ করতে বসলেন। লেফটেন্যান্ট ল্যাকোর পাশে দাঁড়িয়ে সরঞ্জাম এগিয়ে দিলে। বুড়োটা সমানে হৃদয়বিদারক চিৎকার করে গেল। ব্যাণ্ডেজ শেষ হওয়ার পর যন্ত্রণাটা কমেছে মনে হল।

ডক্টরের উদ্বেগ কিন্তু কমেছে বলে মনে হল না। কুঁড়ের ভেতরে আবার ঢুকলেন। মড়া দুটোকে পরীক্ষা করলেন। বেরিয়ে এলেন আরো উদ্বিগ্ন হয়ে। গেলেন বুড়োর পাশে। টোনগানেকে দিয়ে জেরা করতে লাগলেন।

বুড়ো যা বললে, তা এই :

ছদিন আগে, মানে, আমাদের প্রহরীবদল হওয়ার ঠিক তিনদিন আগে—

এগারো তারিখে—তুজন সাদা মানুষের নেতৃত্বে একদল নিগ্রো সৈন্য হানা দেয় ছোট্ট এই গ্রামটায়। তুজন গ্রামবাসী মারা যায় সঙ্গে সঙ্গে—এদেরই মৃতদেহ পড়ে রয়েছে কুঁড়ের মধ্যে। বাকী সবাই পালায় বনের মধ্যে। বুড়ো নিজেও ছিল তাদের মধ্যে। কিন্তু ছুটে পালানোর সময়ে একটা গুলি এসে ভেঙে দেয় কাঁধের হাড়। তা সত্ত্বেও কোনোমতে লুকিয়ে পড়ে জঙ্গলের মধ্যে। হানাদাররা চলে যাওয়ার পর গাঁয়ের সবাই ওকে ধরাধরি করে নিয়ে ফিরে আসে গাঁয়ে। আজকে যখন দেখা গেল আবার একদল সৈন্য আসছে ঠিক সেই দিক থেকেই যেদিকে ছদিন আগে গিয়েছে হানাদার সৈন্যরা—তখন গাঁয়ের লোকজন ওকে ফেলেই আশ্রয় নিয়েছে জঙ্গলের মধ্যে।

অদ্ভুত ব্যাপার তো? বড় অস্বস্তিতে পড়লাম। নামহীন ভয় পেঁচিয়ে ধরল মনকে। বনের মধ্যে কারা এমন খুন জখন চালিয়ে বেড়াচ্ছে? কি ভাগ্যিস আসবার পথে তাদের সঙ্গে টক্কর লাগেনি আমাদের।

ডক্টর চাতোন্নেকে কৃতজ্ঞতা জানাতে জানাতে হঠাৎ বোবা হয়ে গেল বুড়ো। নিঃসীম আতংক ফুটে উঠল চোখে মুখে। ফ্যাল ফ্যাল করে শুধু তাকিয়ে রইল আমাদের পেছন দিকে।

তাকালাম পেছনে। দেখলাম, তুজন সার্জেন্টের একজন দাঁড়িয়ে আছে। একে দেখেই ভয়ে বোবা হয়ে গেছে বুড়ো।

সার্জেন্ট বিচলিত হয় নি। হ'ল লেফটেন্যান্ট ল্যাকোরের জ্বলন্ত দৃষ্টি দেখে। সে দৃষ্টির মধ্যে কি ছিল, তা বলবার ভাষা আমার নেই। সার্জেন্ট কেবল কপালে হাত দিয়ে এমন ভান করল যে বিকারে প্রলাপ বকছে বুড়ো। তারপর লম্বা লম্বা পা ফেলে সরে গেল দূরে।

বুড়োর দিকে ফিরলাম। ভয়াচ্ছন্ন ভাবটা কাটিয়ে উঠেছে দেখলাম, কিন্তু মুখ দিয়ে আর একটা কথাও বার করা গেল না। ডক্টর চাতোন্নে তাকে কুঁড়ের ভেতরে রেখে দিলেন। বললেন, ঘা এবার সেরে উঠবে। আর নেই।

আমার মনটা কিন্তু খচখচ করতে লাগল। রহস্য, আবার রহস্য! লেফ-টেন্যান্টকে দেখে নির্বিকার থেকেছে বুড়ো, কিন্তু সার্জেন্টকে দেখেই ভয়ে কাঠ হয়ে গেল কেন?

সমাধান করতে পারলাম না নতুন এই প্রহেলিকার। অন্যান্য ধাঁধার সঙ্গে জমা হয়ে রইল এটাও।

সন্ধ্যে নাগাদ ছোট্ট একটা গাঁয়ে পৌঁছোলাম। নাম, কাদো। তাঁবু

খাটানো হল। মন ভার প্রত্যেকেরই। এখান থেকেই ছাড়াছাড়ি হবে শ্রীমতি মোরনাস আর সেন্ট বেরেনের সঙ্গে। ওঁরা যাবেন উত্তরে—আমরা সিধে।

অনেক বোঝালাম—কিন্তু শ্রীমতি মোরনাসের সংকল্প টলাতে পারলাম না। ক্যাপ্টেন মারসিনের ভাবী বধূর মাথায় কিছু একটা ঢুকলে সহজে আর তা বেরোয় না। ভারী জেদী। ক্যাপ্টেনকে ভুগতে হবে!

লেফটেন্যান্টকে বললাম, সে যেন একটু বুঝিয়ে বলে শ্রীমতিকে। কিন্তু লেফটেন্যান্ট কিচ্ছু বলল না। শুধু একটু নিগূঢ় হাসি হাসল। হাসির মর্ম বুঝতে পারলাম না।

রাত্রে তাঁবুতে শুতে যাচ্ছি, পেছন থেকে ডেকে ডক্টর চাতোন্নে বললেন—"একটা কথা আপনাকে জানিয়ে রাখতে চাই, মঁসিয়ে ফ্লোরেন্স। বুড়োর কাঁধে যে বুলেট ঢুকেছিল—যেটা বিস্ফোরক বুলেট।" বলেই আর কোনো কথা না বলে হন হন করে চলে গেলেন নিজের তাঁবুর দিকে।

বিস্ফোরক বুলেট! এ যে আরেক রহস্য! এ অঞ্চলে এমন হাতিয়ার এল কোথেকে? কাদের হাতে?

রহস্যের পর রহস্য জমছে আমার থলিতে। জানি না সমাধান আদৌ হবে কিনা!

১৮ই ফেব্রুয়ারী।—একদম টাটকা খবর। সশস্ত্র প্রহরীর দল উধাও হয়েছে। একজনও নেই। সব। বেমালুম অদৃশ্য।

অবিশ্বাস, কিন্তু সত্যি। কেউ আর নেই। সরে পড়েছে। তিন চার ঘণ্টা আগে ঘুম ভাঙার পর দেখলাম, ধোঁয়ার মতই রাতারাতি যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে: সশস্ত্র প্রহরী বাহিনী—সেই সঙ্গে উধাও হয়েছে কুলি আর গর্দভ চালকরা।

লেফটেন্যান্ট ল্যাকোর, দুই সার্জেন্ট, বিশজন সৈন্য—সমস্ত উধাও। বেমালুম উধাও। সন্দেহাতীতভাবে উধাও।

কী! পরিস্কার হয়েছে তো?

নিজেদের ঘোড়া, ব্যক্তিগত অস্ত্রশস্ত্র, ছত্রিশটা গাধা, পাঁচদিনের খাবার দাবার আর টোনগানকে নিয়ে জঙ্গলের মধ্যে আমরা নিঃসঙ্গ।

অ্যাডভেঞ্চার চেয়েছিলাম তো, তাই······

১১ ॥ কি করা যায় এখন ?

কিছুক্ষণ স্থানুর মত বসে রইলেন বারজাক মিশনের সদস্যরা। খবরটা এনেছিলেন অ্যামিদী ফ্লোরেন্স। তিনিই বললেন, আসুন, এখন কি করা যায় ভাবা যাক।

ঠিক এই সময়ে একটা একটা গোঙানি শোনা গেল একটা ঝোপের মধ্যে। দৌড়েলেন সবাই। গিয়ে দেখলেন, হাত-পা-মুখ বাঁধা অবস্থায় পড়ে টোনগানে। পাঁজরায় ক্ষত চিহ্ন—রক্ত ঝরছে।

বন্ধন মুক্ত হওয়ার পর টোনগানে বললে, ভোররাতে অপ্রত্যাশিত গোলমালে ঘুম ভেঙে যায় তার। উঁকি মেরে দেখে ঘোড়ায় চড়ে নিগ্রো সৈন্যরা চলে যাচ্ছে। লেফটেন্যান্ট ল্যাকোর আর সার্জেন্ট দুজনের হুকুমে গর্দভ চালক আর কুলিরা কি যেন করছে—দূর থেকে দেখা যাচ্ছে না। সাদা মনে টোনগানে গিয়েছিল কি হচ্ছে দেখতে—সাত পাঁচ ভাবেনি—মনে কোনো সন্দেহ আসেনি।

কিন্তু কয়েক পা যেতে না যেতেই আক্রান্ত হয়েছিল। দুজন তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। হঠাৎ গলা টিপে ধরায় চেঁচাতেও পারেনি। সঙ্গে সঙ্গে বেঁধে ঝোপের মধ্যে ফেলে দিয়েছিল। সেই অবস্থাতেই টোনগানে দেখেছিল, গর্দভ-চালক আর কুলিরা নিজেরাই পিঠে করে বিস্তর বোঝা তুলে নিচ্ছে।

টোনগানকে বেঁধে ফেলে রাখতেই লেফটেন্যান্ট জিজ্ঞেস করেছিল—

"পথ সাফ ?"

"আজ্ঞে।" জবাব দিয়েছে একজন সার্জেন্ট।

হেঁট হয়ে টোনগানের পা থেকে মাথা পর্যন্ত হাত বুলিয়ে লেফটেন্যান্ট বলেছিল—"বোকা কোথাকার। এ রাস্কেলকে জ্যান্ত কখনো ফেলে যায় ? অনেক কিছু দেখে ফেলেছে। রবার্ট, বেয়োনেট ঢুকিয়ে দাও বুকে।"

তৎক্ষণাৎ হুকুম তামিল করেছিল রবার্ট। বেয়োনেট নেমে এসেছিল টোনগানের বুক লক্ষ্য করে। কিন্তু সেই মুহূর্তে একটু কাৎ হয়েছিল টোনগানে। বেয়োনেট পাঁজরা ঘেঁসে চামড়া কেটে বেরিয়ে গিয়েছিল! যেন বেয়োনেট বিঁধছে, এমনিভাবে গুঙিয়ে উঠেছিল টোনগানে!

ঝোপের অন্ধকারে রবার্ট মনে করেছে বুকেই লেগেছে বেয়োনেট। ফলায়

হাত বুলিয়ে রক্ত পেয়েছে। নিঃসাড়ে পড়ে থেকেছে টোনগানে। কিছুক্ষণ পরে মুখের বাঁধন আর রক্ত ক্ষরণের জন্যে জ্ঞান হারিয়েছে।

স্তম্ভিতের মত বসে রইলেন অভিযাত্রীরা। বেশ বুঝলেন, দলবল নিয়ে ল্যাকোর একেবারেই পালিয়েছে—দুদিনের জন্যে নয়।

এখন পরিস্থিতির মোকাবিলা করা দরকার। প্রথমেই হিসেব নেওয়া হল ফেলে-যাওয়া জিনিসপত্রের। দেখা গেল সাতটা রাইফেল, দশটা রিভলবার, প্রচুর কার্তুজ, সাতটা ঘোড়া, ছত্রিশটা গাধা, প্রায় হাজার পাউণ্ড সওদাগরী মাল এবং চারদিনের মত খাবারদাবার আছে। সুতরাং অতটা ভেঙে পড়ার কারণ নেই। বনেজঙ্গলে শিকার মিলবে—গ্রামে গেলেও খাবার মিলবে। অভিযান বন্ধ থাকবে না।

সবার আগে গাধাগুলোর একটা ব্যবস্থা করা দরকার। এত গাধা চালিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়।

জেন মোরসান আর সেন্ট বেরেন কাদো গাঁয়ের লোকজনের সঙ্গে তৎক্ষণাৎ কথা বলে এলেন। তৎক্ষণাৎ বিক্রী হয়ে গেল ছত্রিশটা গাধা। রোজগার হল সাড়ে তিনলক্ষ কড়ি। এই কড়ি ফেলে পেটের খাবার জুটবে অন্যান্য গ্রামে।

গাধাদের পিঠের মাল বয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে নিগ্রোকুলিও পাওয়া গেল। কড়ি দিয়ে তাদের মাইনেও দেওয়া যাবে।

এই সব ব্যবস্থা করতে গেল বেশ কয়েকটা দিন। টোনগানেও বিশ্রাম পেল—সেরে এল পাজরার ঘা।

তেইশ তারিখে সকাল বেলা ছটা ক্যাম্প চেয়ার গোল করে সাজিয়ে মাঝখানে ম্যাপ বিছিয়ে মিটিংয়ে বসলেন অভিযাত্রীরা। শ্রোতা হিসেবে হাজির রইল টোনগানে আর মালিক। চেয়ারম্যান হলেন বারজাক।

ঠিক যেন চেম্বারের মিটিং শুরু হচ্ছে, এমনি ভাবে যন্ত্রবৎ বলে গেলেন বারজাক—"অধিবেশন শুরু হচ্ছে। কে আগে বলতে চান?"

মুখ টিপে হেসে উঠলেন সবাই। ফ্লোরেন্স বাদে। এ ধরনের ব্যঙ্গকৌতুক ওঁর গা সওয়া।

বললেন—'মঁসিয়ে প্রেসিডেন্ট, আপনি আগে বলুন।"

"যথা অভিরুচি," প্রেসিডেন্ট সম্বোধনে বিন্দুমাত্র অবাক না হয়ে বললেন বারজাক। "প্রথমেই কোথায় আছি দেখা যাক। সমুদ্র উপকূল থেকে বহুদূরে সুদানের মাঝখানে আমাদের ফেলে পালিয়েছে কুলি আর সৈন্যরা।"

ঠিক এই সময়ে পকেট থেকে নোটবই বার করে .প্যাসনে চশমা নাকে এঁটে এই প্রথম কথা বললেন পঁসিঁ—"৮৮০ মাইল ৯৩৮ গজ ১ ফুট পৌনে পাঁচ ইঞ্চি দূরে—আমার তাঁবুর মাঝের খুঁটি থেকে।"

"অত চুলচেরা হিসেবের দরকার নেই মঁসিয়ে পঁসিঁ," বললেন বারজাক। "সংক্ষেপে কোনাক্রি থেকে প্রায় ন'শ মাইল দূরে রয়েছি আমরা। আমাদের উচিত এখন কাছাকাছি কোনো ফরাসী ঘাঁটিতে পৌঁছোনো।"

সবাই একমত হলেন এই প্রস্তাবে।

বারজাক বললেন—"সায়ে' গেলে কেমন হয়? জায়গাটা নাইজারের মধ্যেই পড়ছে।"

দুম করে ফেটে পড়লেন পঁসিঁ—"তাতে অনেক অসুবিধে।" বলতে বলতে নোট বইয়ের পাতা উল্টে গেলেন ঝড়ের বেগে—"সায়ে' এখান থেকে পাঁচশ মাইল। আমাদের পদক্ষেপ গড়ে পঁচিশ ইঞ্চি। পাঁচশ মাইল যেতে পা ফেলতে হবে ১,০১১,১১১ বার।"

তেড়ে উঠলেন অ্যামিদী ফ্লোরেন্স—"আরে গেল যা! অত অংক না শুনিয়ে ছোট করে বললেই তো হয় যে দিনে দশ মাইল গেলে লাগবে তিপান্ন দিন, আর দিনে সাড়ে বারো মাইল গেলে লাগবে চল্লিশ দিন।"

নোটবই মুড়ে পঁসিঁ বললেন—"হিসেবটা বলছি অন্য কারণে। সায়ে' না 'জেনে' চলুন। অর্ধেক পথ কমে যাবে। পাঁচশ মাইলের বদলে মোটে আড়াইশ মাইল।"

ফ্লোরেন্স বললেন—"তার চাইতে ভাল হবে সিগৌ-সিকোরো গেলে—এখান থেকে মোটে একশ মাইল।"

ডক্টর চাতোন্নে বললেন—"তার চাইতেও ভাল হয় যদি সিকোসোতে ফিরে যাই—এখান থেকে একশ কুড়ি মাইল বটে—কিন্তু পুরোনো লোকজনের সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে। তারপর মঁসিয়ে ফ্লোরেন্স যা বললেন—তা করা যেতে পারে।"

সঙ্গে সঙ্গে সায় দিলেন ফ্লোরেন্স—"ঠিকই বলেছেন ডক্টর। মঁসিয়ে ফ্লোরেন্সও মন্দ বলেন নি। কিন্তু সিকাসো ফিরে গেলে লোকে বলবে অভিযান ভণ্ডুল হয়েছে। ভদ্রমহোদয়গণ, কর্তব্য সবার আগে—"

ফ্লোরেন্স বুঝলেন আলোচনা কোন দিকে মোড় নিতে যাচ্ছে। তাই সাত তাড়াতাড়ি বললেন—"কিন্তু কর্তব্যের চাইতে বড় হল বিচক্ষণতা।"

"কিন্তু সত্যিই কি সামনে কোনো বিপদ আছে? মঁসিয়ে ফ্লোরেন্স

বলেছিলেন, এক অদৃশ্য শত্রু বারবার আমাদের ভয় দেখাতে চেয়েছে। কিন্তু তার বেশী নয়। ইচ্ছে করলে আমাদের সে মেরেও ফেলতে পারত। তার বদলে ঘোড়া, অস্ত্র, খাবারদাবার রেখে গেছে।"

ডক্টর চাতোন্নে বললেন—"টোনগানেকে মারতে চেয়েছিল।"

"টোনগানের আবার প্রাণের দাম কি, সে তো নিগ্রো"—বললেন বারজাক।

ফ্লোরেন্স বললেন—"এই পর্যন্ত অদৃশ্য শত্রু শুধু ভয় দেখিয়ে ফেরাতেই চেয়েছে—এর বেশী গেলে অন্য দাওয়াই ছাড়তে পারে।"

"ঠিক কথা," সায় দিলেন ডক্টর।

মিনিট কয়েক কেউ আর কথা বললেন না। ভুরু কুঁচকে ভাবতে লাগলেন বারজাক।

বললেন—"ঠিক আছে। আপনাদের দুজনের প্রস্তাবেই ভোট দিচ্ছি আমি। সিকাসাতে ফিরে যাবো—কিন্তু মূল লক্ষ্য থাকবে সিগৌ-সিকোরো যাওয়া। যদি কেউ বলে অভিযান শেষ না করে ফিরে এলাম কেন—বলব গভর্ণমেন্ট শেষ পর্যন্ত সশস্ত্র প্রহরীর ব্যবস্থা রাখতে পারেন নি বলে। দোষটা সরকারের—আমাদের নয়।"

ঠিক এই সময়ে ফ্লোরেন্সের নজর পড়ল সেন্ট বেরেন আর শ্রীমতি মোরনাসের ওপর। নির্লিপ্তভাবে বসে আছেন দুজনেই।

তাই বারজাকের কথা মাঝখানে থামিয়ে দিয়ে বললেন—"এঁদের মতামত জিজ্ঞেস না করে সিদ্ধান্ত নেওয়াটা কি ঠিক হচ্ছে?"

"নিশ্চয়, নিশ্চয়।" বারজাক যেন লাফিয়ে উঠলেন।

শ্রীমতি মোরনাস শান্তস্বরে বললেন—"আমাদের মতামত প্রকাশ করতে চাই না—কারণ আমরা যেখানে যাব বলে বেরিয়েছি। সেইখানেই যাবো।"

"সেকী। সৈন্য সামন্ত না নিয়েই?"

"সৈন্য সামন্ত পাব, এই আশা নিয়ে তো বেরোইনি।"

"কুলি?"

"পথে নিয়ে নেব।"

"অদৃশ্য শত্রুর হামলা?"

"অদৃশ্য শত্রুর রাগ তো আপনাদের ওপর—আমাদের ওপর নয়।"

বারজাক এবার রেগে গেলেন—"তাহলে গায়ের জোরে আপনাকে আটকাবো। খেয়াল চরিতার্থ করতে গিয়ে প্রাণ বিপন্ন করতে দেবো না।"

"একে খেয়াল বলে না।"

"তবে কী?"

"কর্তব্য।"

"কর্তব্য!" বিমূঢ়ভাবে মুখ চাওয়া চাওয়ি করলেন অভিযাত্রীরা।

একটু দ্বিধা করলেন শ্রীমতি মোরনাস। তারপর বললেন গম্ভীর স্বরে—"ভদ্রমহোদয়গণ আপনাদের সঙ্গে ছলনা করেছি। মাপ চাইছি সে জন্যে।"

"ছলনা করেছেন!" বারজাকের বিস্ময় যেন আর বাগ মানতে চাইছে না।

"হ্যাঁ, ছলনাই করেছি। আপনাদের ঠকিয়েছি। মঁসিয়ে সেন্ট বেরেন সত্যিই জাত ফরাসী। ওঁর নামটাও আসল। কিন্তু আমি ইংরেজের মেয়ে—আমার আসল নাম জেন ব্লেজন। আমার বাবার নাম লর্ড ব্লেজন। দাদার নাম ক্যাপ্টেন ব্লেজন। কৌবোর কাছে শেষ শয্যায় শুয়ে আছেন আমার এই ভাগ্যহীন দাদাটি। তাই কৌবো পর্যন্ত আমাকে যেতেই হবে কর্তব্য করতে।"

বলে, আফ্রিকা অভিযানের আসল উদ্দেশ্য ভাঙলেন জেন ব্লেজন—এখন থেকে তাঁকে জেন ব্লেজনই বলা হবে। বললেন, নিন্দা আর ধিক্কারে মাথা নুয়ে পড়েছে তাঁর বাবার। মন ভেঙে গেছে—প্রিয় ছেলের কুকীর্তিতে নিজেই নিজেকে এক ঘরে করেছেন. গ্লেনর কাসলের একটি মাত্র ঘরে দিবারাত্র বন্দী থেকে মৃত্যুর দিন গুনছেন। বোন বেরিয়েছে দাদার দুর্নাম ঘোচাতে—সমস্তই যে মিথ্যে রটনা, তা প্রমাণ করতে।

আবেগে গলা কাঁপতে লাগল জেন ব্লেজনের। শ্রোতারা বসে রইলেন মন্ত্রমুগ্ধের মত। এ-তো সামান্য মেয়ে নয়। জীবন বিপন্ন করেও বেরিয়েছে বংশের মুখোজ্জ্বল করতে।

এর পরেই ঘটনা একটা অপ্রত্যাশিত কাণ্ড। জেন ব্লেজন স্তব্ধ হতেই ভীষণ রাগে বোমার মত ফেটে পড়লেন অ্যামিদী ফ্লোরেন্স।

"মিস ব্লেজন, আমার একটা নালিশ আছে—আপনার বিরুদ্ধে।"

হকচকিয়ে গেলেন জেন। এরকম প্রতিক্রিয়া তিনি আশা করেন নি।

"নালিশ? আমার বিরুদ্ধে?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, নালিশ। আপনি ভুলে গেছেন জাতে আমি ফরাসী।"

"কি-কি বলতে চাইছেন বলুন তো?" জিভে কথা জড়িয়ে গেল জেনের।

"ছিঃ ছিঃ ছিঃ! আপনি ভাবতে পারলেন কি করে যে অ্যামিদী ফ্লোরেন্স

আপনাকে একলা যেতে দেবে বিপদসঙ্কুল এই জঙ্গলের মধ্যে।"

"মঁসিয়ে ফ্লোরেন্স!" অভিভূত হলেন জেন।

"অন্যায়! অন্যায়! অত্যন্ত স্বার্থপর আপনি—"

"বুঝেছি কি বলতে চান," হাসি ফুটল জেনের ঠোঁটে।

"আমাকে কথা বলতে দিন। আরও একটা জিনিস আপনি ভুলে গেছেন। পেশায় আমি সাংবাদিক। সম্পাদক মশায় প্যারিসে বসে রয়েছেন তরতাজা খবরের জন্যে। উনি যখন শুনবেন ব্লেজন কেসের মত চাঞ্চল্যকর ব্যাপার আমার নাকের ডগা দিয়ে পালিয়েছে—উনি কি আমায় চাকরীতে রাখবেন? অ্যাডভেঞ্চার কি একা আপনিই করবেন? আমি যাব আপনার সঙ্গে।"

"মঁসিয়ে ফ্লোরেন্স!"

"বাধা দিতে চেষ্টা করবেন না, মিস ব্লেজন। খামোকা সময় নষ্ট করবেন না।"

ফ্লোরেন্সের দু'হাত জড়িয়ে ধরলেন জেন। চলছল করে উঠল দু'চোখ।

"আমার সৌভাগ্য।"

"আর আমি?" গুরুগম্ভীর কণ্ঠে জানতে চাইলেন ডক্টর চাতোন্নে "আমাকে নেবেন না?"

"আপনি?"

"আলবৎ আমি। এরকম একটা অভিযানে ডাক্তারের থাকাটা একান্তই দরকার। ধরুন জংলীরা আপনাকে কেটে দু'টুকরো করল—সেলাই করবার জন্যে আমার থাকা দরকার।"

"ডক্টর! ডক্টর!" ফুঁপিয়ে উঠলেন জেন।

রেগে টং হয়ে গেলেন বারজাক—"ব্যাপারটা কি? আমার মতামত নেওয়ার প্রয়োজন আছে বলে কেউ মনে করছেন না দেখছি?"

সত্যিই রেগেছেন বারজাক। উনি দেখলেন সুবর্ণ সুযোগ। এক ঢিলে দু'পাখী মারা যাবে! অভিযান চালিয়ে যাওয়া যাবে—মনস্কামনা পূর্ণ হবে। সেইসঙ্গে সাহসিনী এই তরুণীকে সাহায্যও করা যাবে।

তাই রাগে কাঁপতে কাঁপতে বললেন—"ডক্টর চাতোন্নে, আপনি এই মিশনের সদস্য। আমি লীডার। আমার হুকুম না নিয়ে কথা দিচ্ছেন কি হিসেবে?"

"আমি···আমি···," আমতা আমতা করতে লাগলেন চাতোন্নে।

"না···না···এ হতে পারে না···আমাকে জিজ্ঞেস না করে আপনি সিদ্ধান্ত

নিতে পারেন না।”

“আমি···আমি··· ।”

উঠে দাঁড়ালেন বারজাক—“যেহেতু একমাত্র গাইড মিস ব্লেজনের, যেহেতু জংলীদের সঙ্গে মোকাবিলা করতে হলে মিস ব্লেজনের এবং মঁসিয়ে সেন্ট বেরেনের থাকা দরকার, তাই আমি বলছি—” কণ্ঠস্বর হঠাৎ খাদে নামিয়ে এনে—“আমরা সবাই কৌবো যাব নাইজারের মধ্যে দিয়ে।”

“মঁসিয়ে বারজাক!” এবার কেঁদে ফেললেন মিস ব্লেজন।

চোখ ছলছল করে উঠল সকলেরই। তার পরেই শুরু হয়ে গেল অর্থহীন বকবকানি।

ফ্লোরেন্স বললেন—“ভারী তো রাস্তা! খাবারের অভাবও হবে না।”

চাতোন্নে বললেন—“পাঁচদিনের খাবার তো রয়েছেই।” এমন ভাবে বললেন যেন তাতে ছ'মাস চলে যাবে।

বারজাক শুধরে দিলেন, “চারদিনের আছে। কিন্তু রাস্তায় কিনে নেব।”

“শিকারও করব” চাতোন্নে বললেন।

“মাছও ধরব,” বললেন সেন্ট বেরেন।

“সেই সঙ্গে ফল পাড়ব”, বললেন চাতোন্নে।

“গাছ আমি চিনি,” টোনগানের উচ্ছাস।

“আমি বানাব সি মাখন,” মালিকের আনন্দ দেখে কে।

“হিপ, হিপ, হিপ, হুররে!” ফ্লোরেন্স প্রায় নাচতে লাগলেন।

“কাল সকালেই রওনা হব, আর সময় নষ্ট নয়।” বারজাক শেষ রায় দিলেন।

পঁসি এতক্ষণ একটা কথাও বলেননি। নোটবই খুলে রাশিরাশি অংক করছিলেন। এবার বললেন—“তার মানে সিগৌ-সিকোরোর চাইতে আরও আড়াইশ মাইল বেশী যেতে হবে। প্রতিবার পা ফেলে আমরা প্রত্যেকে যদি পঁচিশ ইঞ্চি যাই তাহলে—”

কেউ কর্ণপাত করলেন না।

১২ ॥ অরণ্য সমাধি

গাঁয়ের মোড়লের কৃপায় জোগাড় করা ছ'জন কুলির পিঠে মালপত্র চাপিয়ে ২৪ ফেব্রুয়ারী সকালবেলা যাত্রা শুরু করল বারজাক মিশন। মনে ফুর্তি প্রত্যেকের—পঁসিই কেবল কথা বলছেন না। ভদ্রলোককে বোঝা ভার।

টোনগানে তুলে নিল মালিককে নিজের ঘোড়ায়। অবাধ্য গাধারা সঙ্গে নেই।

আজেবাজে চটকদার জিনিসগুলোও দান করা হয়েছে ঘোড়লকে। জেলের জন্যে একটা তাঁবু রেখে বাকীগুলো ফেলে গেলেন অভিযাত্রীরা। বোঝা কম। কাজেই শ তিনেক মাইল সহজেই পাড়ি দেওয়া যাবে। পনেরো থেকে বিশ দিনের মধ্যেই পৌঁছোনো যাবে কৌবো—দশই অথবা পনেরোই মার্চ নাগাদ।

পাঁচ দিনে নব্বই মাইল পেরিয়ে আসা গেল। খাবার পাওয়া গেল 'সানাবো' গ্রামে। রাতে খোলা জায়গায় শুলেন অভিযাত্রীরা। জমানো খাবারে হাত পড়ল না।

দোসরা মার্চ সেন্ট বেরেনের পাশে ঘোড়া চালিয়ে যাচ্ছেন ফ্লোরেন্স। সকাল থেকেই ওঁর ঘোড়া হোঁচট খাচ্ছিল। আচমকা পড়ল মুখ থুবড়ে। পিঠ থেকে ছিটকে গেলেন ফ্লোরেন্স। ছুটে এলেন সবাই। কিন্তু এক ঘন্টার মধ্যে শেষ নিঃশ্বাস ফেলল ক্লান্ত বাহন।

টোনগানে নিজের ঘোড়া দিল ফ্লোরেন্সকে। মালিককে তুলে নিলেন শ্রীমতি মোরনাস।

রাত্রে রাস্তার পাশে একটা কুঞ্জে ঠাঁই নিলেন অভিযাত্রীরা। জায়গাটা একটু উঁচু। চারপাশে অনেকদূর পর্যন্ত দেখা যায়। দিন কয়েক আগে আরও একটা দল নিশ্চয় এখানে ঠাঁই নিয়েছিল। ঘোড়া ছিল তাদের সঙ্গে। সংখ্যায় বেশ কয়েকজন। নুয়ে পড়া ঘাসগুলো একটু একটু করে ফের সিধে হচ্ছে। দেখে মনে হল, দিন দশেক আগে আগের অভিযাত্রীদল জিরেন নিয়ে গেছে জায়গাটায়।

তারা কারা? নিগ্রো, না, শ্বেতকায়? শেষেরটাই সম্ভব। কেননা, নিগ্রোরা ঘোড়ায় চড়ে কম। তাছাড়া তুচ্ছ একটা জিনিস মাটি থেকে কুড়িয়ে পাওয়ার পর সন্দেহটা দৃঢ়তর হল।

জিনিসটা একটা বোতাম। সভ্য জগতের সৃষ্টি।

বারজাক মিশন উত্তর পূবে চলেছে। আগের অভিযাত্রীরাও গিয়েছে একই দিকে—পায়ের ছাপে সে প্রমাণ রয়েছে।

চৌঠা মার্চ আচমকা মুখ থুবড়ে পড়ে অক্কা পেল বারজাকের ঘোড়া।

একী অশুভ লক্ষণ?

ডক্টর চাতোন্নে মৃত ঘোড়াটাকে খুঁটিয়ে দেখলেন। ফ্লোরেন্সকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে বললেন—"হুঁশিয়ার।"

"কেন।"

"দুটো ঘোড়াই মরেছে বিষ খেয়ে।"

"অসম্ভব! কুলিদের আনা হয়েছে কাদো থেকে। বিষ মেশাবে কখন?"

"দোষ কাউকে দিচ্ছি না। কিন্তু যা ঘটনা, তা বলছি। আপনার ঘোড়া-টাকেও দেখে সন্দেহ হয়েছিল—কিছু বলিনি। এবার বলছি। লক্ষণ দেখে বোঝা যায়।"

"কি করি বলুন তো?"

"মিস ব্রেজনকে ছাড়া সবাইকে জানিয়ে রাখুন। উনি ভয় পেতে পারেন।

"বিষাক্ত আগাছা খায়নি তো?"

"সম্ভব নয়। কেউ মিশিয়ে দিয়েছে নিশ্চয়। এর বেশী আর বলতে পারব না।"

বাকী পাঁচটা ঘোড়াকে চোখে চোখে রাখা হল। পরের দুদিন কিছু ঘটল না। পথ চলতি গ্রামে খাবার জুটে গেল। ভাঁড়ারের খাবারে হাত পড়ল না।

পাঁচ তারিখে আর ছ' তারিখে সারাদিন কোনো গ্রাম চোখে পড়ল না। ভাঁড়ারে খাবারের হাত পড়ল অ্যাদ্দিনে।

ছ'তারিখে বেলার দিকে দূর থেকে একটা নগর চোখে পড়ল। 'টাটা' দিয়ে ঘিরে সুরক্ষিত। কিন্তু কাছে যাওয়া গেল না। ফ্লিন্ট বন্দুকের দমা-দম আওয়াজ আর রণহুংকার ভেসে এল। সেইসঙ্গে দেখা গেল দলে দলে নিগ্রো জড়ো হচ্ছে। মারমুখো মূর্তি।

সাদা নিশান উড়িয়েও লাভ হল না। পতাকাধারী অল্পের জন্য বেঁচে গেল গুলির হাত থেকে। টোনগানে দুজন কুলিকে নিয়েও কাছে যেতে পারল না। বেশ বোঝা গেল, গ্রামবাসীরা জামাই আদর করতে রাজী নয়—গুলি দিয়ে অভ্যর্থনা করতে চায়।

দরকার কি ঝামেলায়? খাবারের আশা ত্যাগ করে গ্রামটা পাশ কাটিয়ে গেলেন অভিযাত্রীরা। জংলীর দল 'টাটা'র মধ্যেই রইল—বাইরে এল না।

কিন্তু কেন? কেন এমন বিরূপ অভ্যর্থনা?

'কোকোরা'তে মারদাঙ্গা মূর্তি নিয়ে এসেছিল জংলীরা—কিন্তু মন জয় করা গিয়েছিল তাদের। তারপর এই প্রথম 'ইয়াহো' নগরে দেখা গেল যুদ্ধ সাজে সেজে এল নিগ্রোরা। অভিযাত্রীদের অপরাধ?

৭ই মার্চ ফের রওনা হলেন অভিযাত্রীরা। শ'দুই মাইল আসা গেছে

'কাদৌ' থেকে—প্রায় অর্ধেক রাস্তা এখনো বাকী। আশা করা যায় পথে অন্য গ্রামে খাবার পাওয়া যাবে।

সারাদিনেও কিন্তু আশা পূরণ হল না। উল্টে আর একটা ঘোড়া মারা গেল আগের দুটো ঘোড়ার মত।

ফ্লোরেন্স বললেন—"এত নজর রেখেও কি করে বিষ খাওয়ানো হচ্ছে বুঝি না।"

চাতোন্নে বললেন—"নতুন করে কি খাওয়ানো হচ্ছে? আমার তো মনে হয় বিষ দেওয়া হয়েছে কাদৌ ছেড়ে আসার আগেই। সব ঘোড়ার সহ্য করার ক্ষমতা সমান নয়। তাই মরছে আগে পিছে।"

৮ই মার্চ দেখা গেল আর মাত্র একদিনের খাবার আছে। বিকেল নাগাদ নতুন কোনো গ্রামে খাবার না পাওয়া গেলে উপবাস অনিবার্য।

রওনা হওয়ার ঘন্টা খানেকের মধ্যেই দূর দিগন্তে দেখা গেল একটা গ্রাম। কিন্তু যেন খাঁ-খাঁ করছে। নিথর। নিস্তব্ধ।

কাছাকছি গিয়েও শশ্মান নৈঃশব্দ্য ভঙ্গ হল না। ঘন ঘাসের পুরু কার্পেটের মাঝে সোজা রাস্তা গিয়েছে গাঁয়ের দিকে। রাস্তার ওপর কালো কালো দাগ।

একটু দ্বিধা করলেন বারজাক। তারপর এগোলেন। একটু পরেই বিকট দুর্গন্ধ ভেসে এল নাকে। তারপরেই দেখা গেল দূর থেকে যা কালচে ছোপ মনে হয়েছিল, আসলে তা নিগ্রোদের মড়া। পচা, গলা. মোট দশজন।

একটা মৃতদেহ পরীক্ষা করলেন চাতোন্নে। ফ্লোরেন্সকে ডেকে বললেন —"পিঠ ফুঁড়ে গুলি বেরিয়ে গেছে। ঢুকেছে বুকে—ছোট্ট গর্ত। বেরিয়েছে পিঠ দিয়ে—বিরাট গর্ত। কিন্তু যেখানে বেরোনোর পথে হাড়গোড় পড়েছে —ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে। এরই নাম বিস্ফোরক বুলেট।"

"আবার!" শিউরে উঠলেন ফ্লোরেন্স।

"হ্যাঁ, আবার।"

"নতুন সৈন্য নিয়ে রওনা হয়ে গুলির চিহ্ন একজন নিগ্রোর কাঁধে দেখে ছিলাম। একই বুলেট?"

"হ্যাঁ একই বুলেট।"

বোবা হয়ে গেলেন দুজনেই। গ্রামের মধ্যে দেখা গেল আরও ভয়ানক দৃশ্য। তুমুল লড়াইয়ের চিহ্ন চারিদিকে। গ্রামবাসীরা প্রাণপণে লড়েছে। ঘরে ঘরে তাদের মৃতদেহ। যুদ্ধে জিতে সারা গ্রাম পুড়িয়ে দিয়েছে নিষ্ঠুর হানাদাররা।

ডক্টর চাতোন্নে বললেন—"প্রত্যেকে মরেছে বিস্ফোরক বুলেটে—দশদিন আগে।"

"কিন্তু তারা কারা?" সেন্ট বেরেনের প্রশ্ন।

"দিন কয়েক আগে যাদের পায়ের ছাপ দেখেছিলাম কুঞ্জে।" বললেন ফ্লোরেন্স। "এরাই 'টাটা' আক্রমণ করেছিল। তাই 'ইয়াহো' টাউনে আমাদের ঢুকতে দেওয়া হয়নি। এখন বুঝেছেন? 'টাটা' ছিল বলেই বেঁচে গেছে টাউনটা—নইলে এই দশাই হত।"

"কিন্তু ওদের এত কাছে থাকা কি নিরাপদ?" শুধোলেন জেন ব্লেজন।

"বিপদটাই বা কিসের?" আশ্বস্ত করলেন ফ্লোরেন্স। "ঘোড়ায় চেপে যারা দশদিনের পথ এগিয়ে আছে, তাদের নাগাল আমরা পাব না। ভয় নেই।"

গাঁয়ের মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে অভিযাত্রীরা দেখলেন, খাবার-দাবারের চিহ্নমাত্র কোথাও নেই। সব নষ্ট করে ফেলা হয়েছে, ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

রাতটা কাটাতে হল খোলা জায়গায় আধাপেটে। খাবার যা আছে, তাতে একবেলাই খাওয়া চলে। তাই অর্ধেক খেয়ে বাকী অর্ধেক রেখে দেওয়া হল পরে খাওয়ার জন্যে।

৯ই মার্চ পথে দুটো গ্রাম পড়ল। প্রথমটা ছোট 'টাটা' দিয়ে ঘেরা। এখানকার বাসিন্দারাও অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তেড়ে এল ইয়াহো টাউনের লোকজনের মত। তারপরের গ্রামটায় 'টাটা' নেই—গ্রামও ছারখার। মড়ার স্তূপ চারিদিকে। খাবার দাবার নষ্ট করে ফেলা হয়েছে। পুড়িয়ে তছনছ করা হয়েছে।

মুষড়ে গেলেন বারজাক—"দেখে মনে হচ্ছে, ইচ্ছে করেই আমাদের চলার পথে মরুভূমি সৃষ্টি করে যাওয়া হয়েছে।"

জোর করে উল্লাস দেখিয়ে ফ্লোরেন্স বললেন—"আর তো মোটে একশ মাইল বাকী। কশাই আর মুদী ধর্মঘট করেছে তো বয়ে গেল—শিকার করে খাবার জুটিয়ে নেব।"

পঁসি ছাড়া সবাই বন্দুক ছুঁড়তে পারতেন। কিন্তু লম্বা ঘাসের দরুন বেশীদূর দেখতে না পাওয়ায়, আর জায়গাটাও পশুপক্ষী বিরল হওয়ায় সারাদিনে পাওয়া গেল মোটে একটা বাস্টার্ড, দুটো গিনিফাউল, আর দুটো তিতির পাখী; চোদ্দটা পেট এ খাবারে ভরানো যায় না।

বৈকালিক অভিযান সাঙ্গ হওয়ার পর ফ্লোরেন্স আর চাতোন্নে জমির চেহারা দেখে বুঝলেন, পূর্ববর্তী অভিযাত্রীরা এখানেও রাত কাটিয়ে গেছে এবং

খুব অল্প দিন আগেই। যেন দু'দলের মধ্যে ব্যবধান তত বেশী আর নেই।

ঠিক এই সময়ে ডাক দিল টোনগানে। ব্যাপার গুরুতর। চারটে ঘোড়ার দুটো এইমাত্র মাটিতে পড়ে ধুঁকছে। একঘন্টার মধ্যে মারা গেল দুটোই।

দশই মার্চ মারা গেল বাকী দুটো ঘোড়া।

ঘোড়া মরছে পটাপট, খাবার নেই। এই ভয়েই কি রাতারাতি ভাগলবা হয়ে গেল কুলি ছ'জন? এগারো তারিখে ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে মালিক, টোনগানে এবং ছজন ইউরোপবাসী দেখলেন, সর্বনাশ হয়েছে! ঘোড়া মরেছে, খাবার ফুরিয়েছে, এখন কুলিরাও পালিয়েছে!

এবার কিন্তু মন ভেঙে গেল প্রত্যেকেরই। সবচেয়ে অবস্থা কাহিল হল জেন ব্লেজনের। তাঁর জেদের জন্যেই এতগুলি মানুষের আজ এই অবস্থা। বুঝিয়ে সুঝিয়ে তাঁকে যদিও বা সামলানো গেল—পেট তো মানে না! ক্ষিদের জ্বালায় শরীর দুর্বল হচ্ছে—সেইসঙ্গে মন দুর্বল হলে চলে কি?

কুলি যখন নেই, থাক মালপত্র পড়ে। কি হবে বোঝা বয়ে? সঙ্গে মোহর তো আছে। অবস্থা বুঝলে মোহর ভাঙিয়ে দরকারী জিনিষ কেনা যাবে।

১২ই মার্চ আরও একটা গ্রাম পেরিয়ে এলেন অভিযাত্রীরা। এ গ্রামেও রাশিরাশি নিগ্রোর মড়া। চিহ্ন দেখে মনে হল, খুন জখম অগ্নিসংযোগ হয়েছে মাত্র দিন দুয়েক আগে।

সর্বনাশ! এত কাছে থাকলে তো বিপদ! পথে যদি দেখা হয়ে যায়?

তাই বলে কি ফিরে যাওয়া হবে? কখনোই নয়। উত্তরেই চলবেন অভিযাত্রীরা—যা থাকে কপালে। নাইজার না পৌঁছোলে সাহায্য তো মিলবে না।

পথের অভিজ্ঞতাও পালটাল না। গ্রামে ঢোকা যায় তো দেখা যায় হত্যার হাহাকার—আগুনে পোড়া কুঁড়ে আর বিস্ফোরক বুলেটে গতায়ু নিগ্রো। যে গ্রামে ঢোকা যায় না—তা 'টাটা' দিয়ে সুরক্ষিত এবং গ্রামবাসীরা মার-মুখো। কুয়ো পাওয়া গেলে দেখা যায় তা পাথর মাটি দিয়ে ভরাট করা—যাতে তেষ্টার জল পর্যন্ত না পায় বারজাক মিশন। নদীনালাও এ অঞ্চলে কম। ফলে পানীয় তো দূরের কথা—মাছ পর্যন্ত না পেয়ে কপাল চাপড়াতে লাগলেন সেন্ট বেরেন।

কিন্তু কেউ টললেন না। কারও মনোবলে চিড় ধরল না। সারাদিনের

সাংঘাতিক, রোদে তেতে পুড়ে, তেষ্টায় টা-টা করে, ক্ষিদের আগুন মুখ বুঁজে সহ্য করে উত্তরমুখো অভিযান চালিয়ে গেলেন অভিযাত্রীরা একটু একটু করে।

মালিক আর টোনগানের সহ্যশক্তি ছাড়িয়ে গেল সবাইকে। একদিন একটা কন্দ পেয়ে টোনগানে দিল মালিককে—তার নাকি ক্ষিদে নেই। মালিক নীরবে তুলে দিল শ্রীমতি ব্লেজনের হাতে।

ক্ষিদের জ্বালায় রেগে আগুন হয়ে রইলেন বারজাক। মুণ্ডপাত করতে লাগলেন সরকারের। মনে মনে তৈরী করে রাখলেন চেম্বারে গিয়ে কি ধরনের বক্তৃতা দিয়ে পিণ্ডি চটকাবেন ফরাসী গভর্ণমেন্টের।

ডক্টর চাতোন্নে কিন্তু সোঁ-সোঁ হাসি হেসে হাসিয়ে গেলেন সবাইকে। মজা করে গেলেন সমানে। ফ্লোরেন্সের চুটকি শুনে বাষ্প বেরিয়ে যাওয়ার মত সোঁ-সোঁ শব্দে হেসে জবাব দিতেন। ফ্লোরেন্সও তক্ষুনি বলতেন—"কি কপাল আপনার। সব গ্যাসই বেরিয়ে গেল ফুটো দিয়ে!" চাতোন্নে আরও একটা মস্ত উপকার করতেন। কোন গাছের ফলমূল খাওয়া যায়, চিনে বার করে দিতেন।

একজন কেবল হাসতেন না, কথা বলতেন না, মাছ ধরতেন না, শিকার করতেন না, ফল খুঁজতেন না, উপোসী থেকেও গজগজ করতেন না—কেবল রহস্যময় নোটবই খুলে যখন তখন অংক কষে যেতেন। ইনি পঁসিঁ।

আর একজনের তো খেয়ালই ছিল না কোথায় আছেন, অথবা আদৌ ক্ষিদে পেয়েছে কিনা। ইনি সেন্ট বেরেন।

গুম হয়ে গিয়েছিলেন কেবল মিস ব্লেজন। একে তো মনে মনে রাশি রাশি দুঃখ, বন্ধুদের নাহক বিপদের মধ্যে টেনে আনার জন্যে অনুশোচনা—তার ওপরে ক্ষিদের জ্বালা। শরীর দিনকে দিন দুর্বল হয়ে পড়েছে, তবুও কাহিল দেহযন্ত্রকে স্রেফ অদম্য মনোবল দিয়ে টেনে নিয়ে চলেছেন কৌবো অভিমুখে—জানেন না কি দেখবেন সেখানে শেষ পর্যন্ত। যে জন্যে যাওয়া, তা কি সফল হবে? দাদা যে নির্দোষ, নিষ্কলঙ্ক—তা কি প্রমাণ করা যাবে? না কি খালি হাতে ফিরতে হবে? উৎকণ্ঠায়, উদ্বেগে তিল তিল করে ভেতরে ভেতরে নিঃশেষ হয়ে এলেও বাইরে তা প্রকাশ করতে পারছিলেন না মুহূর্তের জন্যেও।

ফ্লোরেন্স কিন্তু আঁচ করতে পেরেছিলেন সুন্দরী সঙ্গিনীর মনের অবস্থা। সেই সঙ্গে অনুমান করেছিলেন আরও একটা ভয়ংকর সম্ভাবনা। কেউ বা কারা তাঁদের পেছন নিয়েছে। সর্বদা চোখে চোখে রেখেছে। যে মুহূর্তে

বারজাক মিশন এত কষ্টের ফল হাতে নিতে যাবে, সেই মুহূর্তেই সব চেষ্টা বানচাল করে দেওয়ার জন্যে তারা শেষ অস্ত্র ছাড়বে।

অস্বস্তিকর সন্দেহটা দৃঢ় বিশ্বাস হয়ে দাঁড়াল ১২ই মার্চ একটা গ্রাম পেরিয়ে আসার পর। যেন মাত্র চব্বিশঘণ্টা আগে মানুষ খুন করা হয়েছে, কুঁড়ে জ্বালানো হয়েছে। সেখানে সজাগ হয়ে গেলেন ফ্লোরেন্স। চোখ কান খোলা রাখলেন। তাই অন্যের চোখে ধরা না পড়লেও তিনি দেখতে পেলেন সদ্য তাঁবু উঠিয়ে নিয়ে যাওয়ার চিহ্ন, কানে ভেসে এল দূরাগত অশ্বখুরধ্বনি, রাত্রে দেখতে পেলেন অন্ধকারে ছায়া সরে যাওয়া, শুনতে পেলেন কারা যেন ফিসফিস করা কথা বলছে, সড সড শব্দে ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে পড়ছে।

প্রতীতি আর উদ্বেগ এমন পর্যায়ে পৌঁছোলো যে থাকতে না পেরে টোনগানেকে সব বললেন ফ্লোরেন্স। সায় দিল সে-ও। তারও কানে ফিসফাস আওয়াজ এসেছে, ছায়া মূর্তি দেখেছে। ফ্লোরেন্স ঠিক করলেন, আরও কিছুদিন পরে সঙ্গীদের বলবেন সন্দেহের কথা।

এ অবস্থায় দ্রুত পথ চলা যায় না। তেইশে মার্চ কৌবো থেকে পাঁচ মাইল দূরে এসে থামলেন অভিযাত্রীরা। এখান থেকে মাইল খানেক গেলেই পাওয়া যাবে ক্যাপ্টেন ব্লেজনের সমাধি—টোনগানে চেনে।

পরের দিন সকালে সেই সমাধি দেখা হবে। তারপর যাওয়া হবে কৌবো গ্রামে। খাবারদাবার নিশ্চয় পাওয়া যাবে সেখানে। দিন কয়েক বিশ্রাম নিয়ে তারপর রওনা হওয়া যাবে গাও, টিমবাকটু অথবা জেনি অভিমুখে।

ফ্লোরেন্স দেখলেন, এবার সময় হয়েছে। সঙ্গীদের জানানো যাক সন্দেহের কথা। শুকনো ঘাস জ্বালিয়ে মালিক তখন খুদকুঁড়ো রাঁধছে, অভিযাত্রীরা হাত-পা ছড়িয়ে জিরোচ্ছেন সারাদিন পথ চলার পর—ফ্লোরেন্স সামনে এসে আস্তে আস্তে ভাঙলেন এতদিনের সন্দেহ-বৃত্তান্ত। অদৃশ্য শত্রুরা তাঁদের প্রতিটি পদক্ষেপ নজরে রেখেছে—চড়াও হতে পারে যে কোনো মুহূর্তে।

বললেন—"এই সঙ্গে আরও একটা কথা বলে রাখি। যারা আমাদের এইভাবে পেছন নিয়েছে, তাদের আমরা হয়তো চিনি। আমাদের লক্ষ্য কি তারা জানে। তাই আমরা যেদিকে যাচ্ছি, তারাও ঠিক সেই দিকে চলেছে। বুঝতেই পারছেন কাদের কথা বলছি। লেফটেন্যান্ট ল্যাকোর আর তার দুই শ্বেতকায় সার্জেন্ট বিশজন নিগ্রো সৈন্যর মতই হুবহু একটা দল রয়েছে এর মূলে।"

"এ সন্দেহের কারণ ?" বারজাকের প্রশ্ন।

"কারণ অতি স্পষ্ট। নতুন সৈন্যসামন্ত এসে পৌঁছোনোর পর প্রথমে যে গ্রামে গিয়ে মানুষ মারার ধরন দেখেছিলাম—সেই একই ধরন দেখেছি পর-পর সমস্ত গ্রামে। সুতরাং একই দল খুনজখম লুঠতরাজ চালিয়ে যাচ্ছে গ্রামের পর গ্রামে। সুতরাং লেফটেন্যান্ট ল্যাকোর এসে পৌঁছোনোর আগেই এই খুনীর দল আমাদের খুব কাছেই হাজির ছিল বলা যায়।"

বারজাক বললেন—"বলেছেন ঠিকই। কিন্তু এই খুনীর দল লেফটেন্যান্ট ল্যাকোরের দল কি মামুলি ডাকাতের দল—তা জেনেও আমাদের অবস্থার কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না।"

"সেজন্যে এত কথা আমি বলছিও না। এতদিন বলিনি আপনাদের উদ্বেগ বাড়াতে চাইনি বলে। এখন বলছি ঘাটে এসে তরী না ডোবানোর জন্যে। কালকে ওরা আমাদের রাস্তা আটকালেও আটকাতে পারে। আমি চাই ওদের চোখে ধুলো দিতে।"

"উদ্দেশ্য ?" বারজাক জানতে চাইলেন।

"মিস ব্লেজনের কাজ হাসিল করার জন্যে। কোথায় যাচ্ছি, অদৃশ্য শত্রুর দল যেন টের না পায়।"

সায় দিলেন জেন ব্লেজন—"মঁসিয়ে ফ্লোরেন্স খাঁটি কথা বলেছেন। ঘাটে এসে তরী ডুবুক—এটা আমি চাই না। স্পাইদের চোখে ধুলো দিয়ে কাজটা হাসিল করে নিতে চাই। কিন্তু কিভাবে তা সম্ভব মাথায় আসছে না।"

"এখনও পর্যন্ত ওরা সামনে আসেনি—সুতরাং আজ রাতেই যে চড়াও হবে—তার কোনো মানে নেই। রাত্রে জিরেন নেব—এই জেনেই ওরা কাল পর্যন্ত নিশ্চয় অপেক্ষা করবে। সেই ফাঁকে আজ রাতেই একদম শব্দ না করে আমরা একে একে সরে পড়ব।"

প্রস্তাব মনে ধরল প্রত্যেকের। ঠিক হল, একে একে সবাই যাবে পূব দিকে বিশেষ একটা গাছের জটলার দিকে। দিনের আলোয় গাছগুলো দেখা গিয়েছিল—রাতের অন্ধকারে এখন দেখা না গেলেও দিকটা মনে আছে। দিগন্তের একটা জ্বলজ্বলে তারার সাহায্য দিক নির্ণয় করে অনায়াসে অন্ধকারে গা ঢেকে সবাই পৌঁছে যাবেন গাছের জটলায়। প্রথমে টোনগানে, পেছনে শ্রীমতি ব্লেজন, তাঁর পেছনে মালিক—সবার পেছনে ফ্লোরেন্স।

নির্বিঘ্নে অভিযাত্রীরা চম্পট দিলেন বিশ্রাম নেওয়ার জায়গা ছেড়ে।

দুঘন্টা পরে এসে পেঁছোলেন গাছের জটলায়। আরও আধঘন্টা পরে আন্দা-জমত ক্যাপ্টেন ব্লেজনের সমাধিস্থলে পেঁছোলেন টোনগানের নেতৃত্বে। কিন্তু অন্ধকারে জায়গাটা ঠিক কোথায়, ঠাহর করা গেল না। দিনের আলো পর্যন্ত অপেক্ষা করতেই হবে।

সারারাত ঘুমোতে পারলেন না মিস ব্লেজন। সকাল বেলা কি আবিষ্কার করবেন ঈশ্বর জানেন। দাদা সত্যিই নিহত না এখনো জীবিত বোঝা যাচ্ছে না। এতদিন বাদে প্রমাণ কি পাওয়া যাবে? রোদে জলে নষ্ট হয়ে যায়নি তো?

ভোর ছটায় সবাই তৈরী হলেন। প্রত্যেকেই চাপা আবেগে কি রকম যেন হয়ে গেছেন। একদৃষ্টে চেয়ে আছেন টোনগানের দিকে!

টোনগানে তখন একমনে মাটির চেহারা দেখছে। দেখতে দেখতে এক জায়গায় গিয়ে বললে—"এই তো! এইখানে!"

কিন্তু কবরের চিহ্ন তো সেখানে নেই। শুধু একটা গাছ দাঁড়িয়ে। টোন-গানের মনে কিন্তু দ্বিধা নেই। কাজেই ছুরি দিয়ে পাগলের মত মাটি খুঁড়তে আরম্ভ করলেন সকলে। একটু পরেই কয়েকটা হাড় চোখে পড়ল ফ্লোরেন্সের। আবেগে বিহ্বল হয়ে ডাক্তারের হাতে ভর দিয়ে ঝুঁকে পড়লেন মিস ব্লেজন, আস্তে আস্তে মাটির তলা থেকে বেরিয়ে এল একটা নর-কংকাল। সম্পূর্ণ অটুট।

বাহুর জায়গায় সোনালি সুতোর কাজ করা ন্যাকড়া—অফিসারের চিহ্ন।

বুকের হাড়ের ওপর একটা মানিব্যাগ—প্রায় খসে পড়ছে। ভেতরে একটাই কেবল চিঠি—ছোট বোন লিখছে জর্জ ব্লেজনকে।

ঝর ঝর করে কেঁদে ফেললেন মিস জেন ব্লেজন। ঠোঁটের কাছে কাগজটা তুলে ধরতেই গুঁড়িয়ে ধুলো হয়ে ঝরে পড়ল মাটিতে।

আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন চাতোন্নেকে—"ডক্টর, দাদার কংকালটা পরীক্ষা করবেন দয়া করে?"

"নিশ্চয়।" বলে হাড়ের মধ্যে হাত গলালেন চাতোন্নে। পুলিশ সার্জ-নের মত খুঁটিয়ে সব কিছু দেখলেন। উঠে যখন দাঁড়ালেন, চোখ মুখ গম্ভীর হয়ে গেছে।

বললেন আবেগঘন কণ্ঠে নৈঃশব্দ্য ভঙ্গ করে—"আমি, প্যারিস ইউনি-ভার্সিটির ডক্টর অফ মেডিসিন লরেন্ট চাতোন্নে, এই সার্টিফিকেট দিচ্ছি যে এই নরকংকালের কোথাও বন্দুকের গুলির চিহ্ন নেই, মানুষটাকে খুন করা হয়েছে পেছন থেকে ছোরা মেরে—ছোরার ফলা বাঁ দিকের কাঁধের হাড়ের

পাশ দিয়ে হার্টের ওপরে ঢুকেছে এবং ছোরাটা হাড়ের মধ্যে এখনো ঢুকে রয়েছে। মিস জেন ব্লেজনের বিশ্বাস অনুসারে ইনিই যদি তাঁর দাদা ক্যাপ্টেন জর্জ ব্লেজন হন, তাহলে তাঁকে—"

"খুন করা হয়েছে!" ফিস ফিস করে বললেন মিস ব্লেজন।

"হ্যাঁ, খুন!" ফের বললেন চাতোন্নে।

"পেছন থেকে!"

"হ্যাঁ, পেছন থেকে।"

"দাদা তাহলে নিরপরাধ!" ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন জেন ব্লেজন।

"নিরপরাধ কিনা, সেটা বলার অধিকার আমার নেই। তবে উনি মারা গেছেন ছোরার মারে—মিলিটারী বন্দুকের গুলিতে নয়। মিলিটারীতে কেউ ছোরা ব্যবহার করে না।"

"যা দেখলেন, দয়া করে তা লিখে সই করে দেবেন?"

"একশবার।"

পঁসিঁ নোটবইয়ের পাতা ছিঁড়ে দিলেন। চাতোন্নে তাতে সার্টিফিকেট লিখলেন। উপস্থিত সকলে তাতে সাক্ষী হিসেবে সই দিলেন। ডক্টর চাতোন্নে সেই সার্টিফিকেট আর ছোরাটা জেন ব্লেজনের হাতে তুলে দিলেন। কাঁপতে কাঁপতে ছোরাটা হাত পেতে নিলেন শ্রীমতি। মাটি ঢাকা এবং হয়তো রক্তমাখা আবলুষ কাঠের হাতলে কিছু একটা খোদাই করা ছিল—এখন তা ভাল পড়া যাচ্ছে না।

"খুনীর নাম না?" বললেন মিস ব্লেজন।

"হ্যাঁ", খুঁটিয়ে দেখলেন ফ্লোরেন্স। "দুটো অক্ষর কেবল পড়া যাচ্ছে।...i আর l...ব্যাস, আর সব উঠে গেছে।"

"তাতে কি কিছু হবে?" সংশয় প্রকাশ করলেন বারজাক।

"এতেই হবে! গুপ্তঘাতকের মুখোশ এতেই খোলা যাবে।" গম্ভীর গলায় বললেন জেন ব্লেজন।

টোনগানে মাটি চাপা দিল কংকালের ওপর। নীরবে সকলে রওনা হলেন কৌবোর দিকে। কিন্তু দু'তিন ঘন্টা পরেই ক্ষিদের জ্বালা আর আবেগের ধকল সইতে না পেরে এলিয়ে পড়লেন জেন ব্লেজন। সেন্ট্ বেরেন বেরিয়ে পড়লেন বন্দুক নিয়ে শিকারের খোঁজে—সঙ্গে ফ্লোরেন্স। সারাদিন টোঁ-টোঁ করার পর পেলেন দুটো বাসটার্ড আর তিতির পাখী। অনেক দিন পর ভালোমন্দ খেয়ে পেট ঠাণ্ডা করে অভিযাত্রীরা ঠিক করলেন রাতটা খোলা জায়গায়

কাটিয়ে পরের দিন যাবেন কৌবো।

একে তো ক্লান্তিতে শরীর ভেঙ্গে পড়েছে, তার ওপর মনটাও উদ্বেগমুক্ত হয়েছে পেছনের শত্রুদের চোখে ধুলো দিতে পারায়—তাই অন্যান্য দিনের মত রাত্রে আর সতর্ক ছিলেন না কেউ। অকাতরে ঘুমোলেন। ফলে অদ্ভুত দৃশ্যটা কারো চোখে পড়ল না। দেখতে পেলেন রহস্যময় কতকগুলো আলো মিট-মিট করে জ্বলছে আর নিভছে পশ্চিমের প্রান্তরে। তার চাইতেও জ্বলজ্বলে আলো সাড়া দিচ্ছে পূবের মাঠে আর জঙ্গলে। এ অঞ্চলে পাহাড় নেই। তা সত্ত্বেও আলোগুলো জ্বলছে আর নিভছে জমি থেকে অনেক উঁচুতে। একটু একটু করে পশ্চিমের মিটমিটে আলো আর পূবের জ্বলজ্বলে আলো এগিয়ে এল কাছাকাছি। পশ্চিমের আলো এল ধীর গতিতে, পূবের আলো এল দ্রুত গতিতে। ঘুমন্ত অভিযাত্রীদের ঘিরে ধরল আলোর মালা।

আচম্বিতে ঘুম ভেঙ্গে গেল অদ্ভুত সেই আকাশ গজরানিতে—ক্যানক্যানে যে-শব্দ শুনে গা ছমছম করে উঠেছিল—সেই আওয়াজ। শব্দ এখন আরো কাছে— আরও তীব্র। চোখ খুলতে না খুলতে আচমকা চোখ ধাঁধিয়ে গেল পূবদিক থেকে দশটা সার্চলাইটের মত দারুণ জোরালো আলোক বন্যায়—মাত্র শখানেক গজ দূরে দশ জায়গায় জ্বলছে যেন আশ্চর্য দশ দশটা সার্চ-লাইট। ব্যাপার কি বুঝে ওঠার আগেই অন্ধকারের মধ্যে থেকে কতকগুলো লোক আলোর সীমানায় ঢুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল বিমূঢ় অভিযাত্রীদের ওপর—তুলে আছাড় মারলে মাটিতে।

অন্ধকারের মধ্যে থেকে ফরাসী ভাষায় পাশবিক কণ্ঠে কে যেন জিজ্ঞেস করলে —"সবাই হাজির তো?"

ক্ষণিক নীরবতার পর: "বেচাল দেখলেই গুলি মেরে খুলি উড়িয়ে দেব। আসুন। উঠে পড়ুন, যাওয়া যাক!"

সিটি ইন দ্য সাহারা

[অ্যাসটনিসিং অ্যাডভেঞ্চার্স অফ বারজাক মিশন ঃ ২য় খণ্ড]

ভূমিকা

বারজাক মিশন ভণ্ডুল হয়ে গেল কি ভাবে, তা প্রথম খণ্ডে বর্ণিত হয়েছে। অদৃশ্য শত্রু সহস্র বাধা সৃষ্টি করেও অভিযাত্রীদের অগ্রগতি রোধ করতে পারে নি— কিন্তু কৌবো গ্রামের অনতিদূরে এসে তারা আক্রান্ত হলেন নিশুতি রাত্রে—আকাশে শোনা গেল রহস্যময় সেই গর্জন। আচম্বিতে জ্বলে উঠল দশ দশটা সার্চলাইটের তীব্র আলো, অভিযাত্রীদের তুলে আছাড় মারা হল মাটিতে।

তারপর ?

তারপরের আরও আশ্চর্য কাহিনী নিয়ে "সিটি ইন দ্য সাহারা"। প্রথম খণ্ডে যে সব অব্যাখ্যাত রহস্য পাকে পাকে বেঁধেছে পাঠককে, দ্বিতীয় খণ্ডে তা পাটে পাটে উন্মোচিত হয়েছে অতুলনীয় মুন্সিয়ানায়। জুল ভের্ণ—সায়ান্স ফিকশ্যনের জনক এবং সম্রাট—স্বকীয় মহিমায় উপস্থিত হয়েছেন এই খণ্ডে। প্রথম খণ্ডে যে রহস্যের সুতো দিয়ে ব্যাঙ্ক ডাকাতি থেকে আরম্ভ করে জঙ্গল অভিযানকে গেঁথেছেন—সেই একই রহস্যের সুতো দিয়ে কল্পজগতে পাঠককে টেনে নিয়ে গেছেন পাতায় পাতায়—এক অধ্যায় থেকে আর এক অধ্যায়—শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এক নিঃশ্বাসে পড়া অপরূপ কাহিনী লিখেছেন—কিন্তু জীবদ্দশায় তা প্রকাশ করেন নি।

কেন ? সম্ভবতঃ যে ভবিষ্যদর্শন নিয়ে অত্যাশ্চর্য এই কল্পবিজ্ঞান কাহিনী কল্পনা করেছিলেন জুল ভের্ণ—তৎকালীন সুশাসিত বিশ্বে হয়তো তা উদ্ভট রূপেই পরিগণিত হত—হাস্যাস্পদ হতেন জুল ভের্ণ। অপরাধী শাসিত অতিবৈজ্ঞানিক সম্পদসমৃদ্ধ সমাজ সে সময়ে কল্পনার বাইরে ছিল। কিন্তু পরে কি

তা সত্যি হয়নি? ভের্ণের মৃত্যুর পর শুধু সমাজ কেন গোটা জাতকে শাসনের শেকল পরিয়ে রাখার ইতিহাস রচনা করেনি অপরাধীর জোট? সে তুলনায় 'সিটি ইন দ্য সাহারা' কিছুই নয়।

তরল বায়ুই ভবিষ্যতে শক্তির মূল উৎস হবে, ভের্ণ তা কল্পনা করেও বোধ হয় হাস্যাস্পদ হবার ভয়ে জীবদ্দশায় প্রকাশ করতে চান নি। মৃত্যুর পর কিন্তু এ ভবিষ্যদর্শনও সত্য হয়েছে। সত্য হয়েছে লম্বালম্বি শূন্যে-উড়ে-যাওয়া আকাশ-যানের স্বপ্ন, রকেটচালিত ক্ষেপণাস্ত্রের কল্পনা, কৃত্রিম বৃষ্টি-সৃষ্টির দূর কল্পনা, বেতার ইত্যাদি ইত্যাদি। সাহারার বুকে ফসল ফলানোর অনেক স্বপ্নই বৈজ্ঞানিকরা এখন দেখছেন—স্বপ্ন সফলের আয়োজনও চলছে কিন্তু বোধ করি :জুল ভের্ণই এ স্বপ্ন সর্বপ্রথম দেখেছিলেন বিজ্ঞানীর চোখে—নিজে বিজ্ঞানী না হয়েও। শাশ্বত সাহিত্য একেই বলে। জুল ভের্ণ সাহিত্যও কালজয়ী এই কারণে—মৃত্যুর ৭৩ বছর পরেও।

অনবদ্য এই উপন্যাস ইংরেজীতে অনূদিত হয় তাঁর মৃত্যুর ৫০ বছর পরে। ইংরেজী অনুবাদে কয়েকটি চরিত্রের নাম পালটে দেওয়া হয় প্রকৃত ব্যক্তিদের সঙ্গে সংঘাত এড়োনোর জন্যে। সেই নামই রইল বর্তমান অনুবাদে—কেননা বাংলায় এই গ্রন্থের প্রথম অনুবাদ হচ্ছে ইংরেজী অনুবাদ থেকে।

১ ॥ ব্ল্যাকল্যাণ্ড

সাহারা মরুভূমি ভূপৃষ্ঠের তিনলক্ষ বর্গমাইল জায়গা জুড়ে রয়েছে। শতাব্দীর শুরুতে যে কোনো নিখুঁত এবং আধুনিক ম্যাপেও বিরাট এই ভূখণ্ডকে দেখানো হত ফাঁকা জায়গা হিসেবে। বারজাক মিশন যে সময়ে অসীম কষ্ট সয়ে সাহারার দিকে এগোচ্ছিল, সে সময়ে বিশাল এই মরুভূমিতে কেউ পা দেয়নি—এপার ওপার ও হয়নি। সাহারা তখন একটা অজ্ঞাত অঞ্চল। কেউ জানত না সেখানে কি আছে।

তখন থেকেই কিন্তু অদ্ভুত আশ্চর্য সব কিংবদন্তী শোনা যেত অজ্ঞাত এই অঞ্চলকে কেন্দ্র করে। স্থানীয় বাসিন্দারা বলত নাকি ডানাওলা অতিকায় কালো পাখী আগুন-চোখে লকলকে শিখা রষ্টি করে উড়ে যেত অনুর্বর সাহারার দিকে—প্রবেশ করত মরুর বুকে। কখনো শোনা যেত নাকি চির রহস্যে ঘেরা বিচিত্র এই ভূখণ্ড থেকে দামাল ঘোড়ায় চেপে টগ্‌বগিয়ে ধেয়ে আসে লাল শয়তানের দল—আগুন ছুটত ঘোড়ার নিঃশ্বাসে—শহরের

পর শহর লুঠ করে, জালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দিয়ে ফিরে যেত সাহারার বুকে—ঘোড়ার পিঠে নিয়ে যেত অসহায় নর, নারী এবং শিশুদের।

কেউ জানত না তারা কারা। কেন গ্রামের পর গ্রাম পোড়ায়, কুঁড়ে লুঠ করে, গরীব নিগ্রোদের সর্বস্ব কেড়ে নেয়, ধ্বংস-মৃত্যু-হাহাকারের শ্মশান সৃষ্টি করে ফিরে যায় ধূ-ধূ মরুভূমির বুকে। জানবার চেষ্টাও কেউ করেনি।

অলৌকিক ক্ষমতা সম্পন্ন লুঠেরাদের পেছন নিয়ে মরুভূমির ভয়ংকর অধিদেবতাদের পীঠস্থানে হানা দেওয়ার সাহস ও কারো হয়নি।

কিন্তু গুজবের মুখ বন্ধ করা যায় নি। সারা নাইজার এবং তীরভূমি থেকে একশ মাইল পর্যন্ত অসহায় মানুষ সভয়ে শুনেছে সেই গুজব—ভয়ে কাঁটা হয়ে থেকেছে দিনের পর দিন।

কিন্তু সেরকম দুঃসাহসী যদি কেউ থাকত, যার সাহস নিগ্রোদের চেয়ে বেশী এবং সাহারার মধ্যে দেড়শ মাইল ভেতরে ঢুকে যাওয়ার বুকের পাটা যার আছে, তাহলে এত দুঃসাহসের পুরস্কার পেয়ে যেত হাতে হাতে। দেখতে পেত এমন একটা জিনিস যা কখনো কোনো অভিযাত্রী বা ক্যারাভ্যান দেখেনি—একটা আস্ত শহর।

হ্যাঁ, সত্যিকারের শহর। ম্যাপে তার উল্লেখ নেই। যে শহরের অস্তিত্ব কেউ কল্পনাও করতে পারে নি—এমনি জমজমাট শহর। যদিও সে শহরের জনসংখ্যা (বাচ্চাকাচ্চা বাদ দিয়ে) মোট ৬,৮০৮।

দুঃসাহসী সেই পর্যটক যদি আরও একটু সাহস করে শহরটার নাম জিজ্ঞেস করে এবং নাগরিকদের ইচ্ছে হয় প্রশ্নের জবাব দেওয়ার, তাহলে শুনবে শহরের নাম ব্ল্যাকল্যাণ্ড।

বারজাক মিশন যখন নাকের জলে চোখের জলে হচ্ছে আফ্রিকার জঙ্গলে, তখন অজ্ঞাত এই শহরে থাকতে ৫,৭৭৮জন আর ১০৩০জন শ্বেতকায়। ছত্রিশ জাতের মানুষ তারা। কিন্তু এক ব্যাপারে মিল ছিল অধিকাংশ লোকের মধ্যে। বেশীর ভাগ মানুষই জাহাজ পালানো বা জেল পালানো দাগী আসামী—ন্যায় ছাড়া যা কিছু অন্যায় কাজে অত্যন্ত পটু। যেহেতু তারা এসেছে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে, কথাও বলত নানান দেশের ভাষায়। কিন্তু বেশী ছিল ইংরেজ। তাই ইংরিজির দাপট ছিল বেশী। ছোট্ট শহরের ছোট্ট গভর্ণমেন্টের যা কিছু হুকুমনামা বেরোতো ইংরিজিতে—সরকারী কাগজটাও ছাপা হত ইংরিজিতে। কাগজটার নাম "ব্ল্যাকল্যাণ্ড থানডার বোল্ট"—"কালো দেশের বজ্র।"

অত্যাশ্চর্য কাগজটা যে কি ধরনের, তা কয়েক সংখ্যা থেকে সংগৃহীত নিচের উদ্ধৃতিগুলো পডলেই হাডে হাডে বোঝা যাবে :

"লাঞ্চ খাওয়ার পর তামাক খাওয়ার পাইপ আনতে ভুলে গিয়েছিল নিগ্রো কোরোমোকো। তাই তাকে আজ ফাঁসি দিয়েছে জন অ্যানড্রু।"

"আগামীকাল সন্ধ্যে ছটার সময়ে কর্ণেল হিবাম হাবার্ট দশজন মেরী ফেলোকে নিয়ে হেলিপ্লেনে করে কৌরকৌসৌ আর বিডি যাবেন। তিন বছর এ দুটো গ্রামে হানা দেওয়া হয় নি। খুন জখম লুঠপাট করে সেই রাতেই ফিরবেন।"

"খবর এসেছে, বারজাক নামে এক ডেপুটির নেতৃত্বে একটা ফরাসী অভিযান শীগগিরই রওনা হবে কোনাক্রি থেকে। সিকাসো আর ঔঘাদৌগৌ হয়ে মিশন পৌঁছোবে নাইজারে। আমরাও হুঁশিয়ার। কুডিজন ব্ল্যাক গার্ড আর দুজন মেরী ফেলো মিশনের সঙ্গে যোগাযোগ রাখবে দিনরাত। সুযোগমত দলে যোগ দেবেন ক্যাপ্টেন এডোয়ার্ড রুফুজ। রুফুজ পদাতিক সৈন্যবাহিনী থেকে পলাতক সৈনিক। লেফটেন্যানট ল্যাকোর ছদ্মনামে তিনি ছলে বলে কৌশলে বারজাক মিশনের দলে ঢুকে পডবেন এবং নাইজারে যাতে মিশন পৌঁছোতে না পারে, সে চেষ্টা চালিয়ে যাবেন।"

"আলোচনা শেষ হওয়ার পরে কাউন্সিলর এহ্‌ল উইলিস আজ দেখলে মেরী ফেলো কন্সটানটিন বার্নার্ডের খুলির মধ্যে কয়েকটা বুলেট ঢুকিয়ে দেওয়া দরকার। একে তো বার্নার্ডের খুলির ওজন বেয়াডা রকমের বেশী, তার ওপর অতগুলো সিসের বুলেট ভেতরে ঢোকায় ওজন এত বেডে গেল যে টুপ করে লাশ তলিয়ে গেল বেচ বিভাবে। বার্নার্ডের বদলে নতুন মেরী ফেলো নেওয়া হয়েছে। এ সম্মান পেয়েছে গিলম্যান ইলি—ফ্রান্স, ইংল্যাণ্ড আর জার্মানীর আদালত থেকে সতেরো দফা অপরাধের শাস্তি পেয়ে সবশুদ্ধ ২৯ বছর জেলে আর ৩৫ বছর জাহাজের খোলে থাকবার কথা যার। সিভিল বডি থেকে এই গিলম্যানকে নিয়ে আসা হল মেরী ফেলোর কোয়ার্টারে। শুভেচ্ছা রইল।"

ব্ল্যাকল্যাণ্ডের রীতি, এ দেশে শুধু চীফ আর মুষ্টিমেয় কয়েকজন ছাডা (তাদের কথা পরে আসছে) কাউকেই পদবী ধরে ডাকা হবে না। পদবী জানবে কেবল চীফ। খবরগুলোতেও তাই শুধু পদের নাম আর ডাক নাম দেওয়া হয়েছে।

চীফেরও একটা ডাক নাম আছে। নামটা ভয়ংকর। শুনলেই গায়ে

কাঁটা দেয়। হ্যারি কীলার। খুনে হ্যারি।

প্রথম খণ্ডে বর্ণিত বারজাক মিশনের ব্যর্থতার দশ বছর আগে হ্যারি কীলার এসেছিল এখানে। কোত্থেকে তার আগমন, কেউ জানে না। এখন যেখানে ব্ল্যাকল্যাণ্ড, সেইখানে তাঁবুর খুঁটি পুঁতে বলেছিল—"শহর হোক এইখানে।" তারপর যেন ম্যাজিকের মত বালির মধ্যে জেগে উঠেছিল আশ্চর্য নগরী ব্ল্যাকল্যাণ্ড।

আশ্চর্য নগরীই বটে। তাফাসেট আউদ তখন একটা শুকনো খাত। হ্যারি কীলারের ইচ্ছায় শুকনো খাত জলে ভরে উঠল—নদী হয়ে গেল। নদীর বাঁদিকের সমতল ভূমিতে ঠিক আধখানা চাঁদের আকারে গড়ে উঠল শহর। নদীর সঙ্গে সমান্তরাল অবস্থায় উত্তর-পূর্ব থেকে দক্ষিণ-পশ্চিম পর্যন্ত ১২০০ গজ, উত্তর-পশ্চিম থেকে দক্ষিণ-পূর্ব পর্যন্ত ৬০০ গজ। মোট ক্ষেত্রফল তিনশ বিঘেরও বেশী। আধখানা চাঁদের আকারে তিরিশ ফুট উঁচু আর তিরিশ ফুট পুরু জমাট কাদার পাঁচিল দিয়ে ঠিক তিন ভাগে ভাগ করা।

নদীর নতুন নামকরণ করল হ্যারি কীলার—রেড রিভার। নদীর পাড়েই শহরের যে অংশ, তার ব্যাসার্ধ আড়াইশ গজ। একশ গজ চওড়া একটা প্রশস্ত বীথিকা নদীর পাড় বরাবর প্রথম অংশের সঙ্গে দ্বিতীয় আর তৃতীয় অংশকে জুড়ে রেখে দিয়েছে। ফলে প্রথম অংশের সঙ্গে ক্ষেত্রফল বেড়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছে একশ বিঘের মত।

প্রথম অংশে থাকে কৃষ্ণদেশের খানদানী ব্যক্তিরা। তাদের নাম যা হওয়া উচিত, ঠিক তার উল্টো—মেরী ফেলো। এদের মধ্যে কয়েকজন হ্যারি কীলারের আদি স্যাঙাৎ—যাদের ভাগ্যতারা আরও উচ্চে ওঠার সম্ভাবনা রাখে। এরাই মেরী ফেলোদের কেন্দ্রীয় গোষ্ঠী। দেখতে দেখতে এদের চারধারে এসে জড়ো হয়েছে জাহাজ পালানো জেল পলাতক খুনে ডাকাতের দল। হ্যারি কীলার সবাইকে আশ্বাস দিয়েছে, মনের সুখে নারকীয় প্রবৃত্তি চরিতার্থের সুযোগ প্রত্যেককেই দেওয়া হবে। মেরী ফেলোদের সংখ্যা এখন ৫৮৬। সংখ্যা আর বাড়ানো হবে না।

হরেকরকম কাজ এদের করতে হয়। এরাই ব্ল্যাকল্যাণ্ডের সৈন্যবাহিনী—যুদ্ধে বেরোতে হয় এদেরকেই। সামরিক পদ্ধতিতে সংগঠিত মেরী ফেলোদের মধ্যে আছে একজন কর্নেল, পাঁচজন ক্যাপ্টেন, দশজন লেফটেন্যান্ট্ আর পঞ্চাশজন সার্জেন্ট্ যথাক্রমে পাঁচশ, একশ, পঞ্চাশ আর দশজনের নেতৃত্বে। যুদ্ধ মানে লুঠপাট, খুনজখম, গ্রামের পর গ্রাম পুড়িয়ে মাঠ করে দেওয়া;

নিগ্রোদের ধরে এনে গোলাম বানিয়ে রাখা। পুলিশের কাজও করতে হয় মেরী ফেলোদের। মুগুর হাঁকিয়ে শায়েস্তা রাখে বান্দা আর বাঁদীদের--পান থেকে চুন খসলেই নির্বিচারে চালায় রিভলভার। শহরের যাবতীয় কাজ আর চাষ আবাদ করায় গোলামদের দিয়ে। এছাড়াও এরা চীফের বডিগার্ড — অঙ্গের মত।

শহরের তৃতীয় অংশটা কেন্দ্র থেকে সবচেয়ে দূরে। আধখানা চাঁদের আকারে একটা বৃত্তচাপ। লম্বায় ৬০০ গজ, চওড়ায় ৫০ গজ। দুইপ্রান্ত প্রথম অংশ আর রেড রিভার ছুঁয়ে শহরের বাইরের পাঁচিল আর দ্বিতীয় অংশের পাঁচিলের মধ্যে বিস্তৃত। গোলামরা থাকে দ্বিতীয় অংশে।

তৃতীয় অংশে থাকে সিভিল বডি—শ্বেতকায়, কিন্তু প্রথম অংশে থাকার অনুমতি নেই। প্রথম অংশে প্রমোশনের অপেক্ষায় থাকতে হয় তাদের। বেশী দেরী হয় না। কৃষ্ণদেশের করাল শাসনের ফলে মেরী ফেলোদের যখন তখন জবাই করে ফেলে দেওয়া হয় রেড রিভারে—শূন্য পদে তখন ডাক পড়ে সিভিল বডির। সংক্ষেপে বলা যায়, সিভিলবডি হল নরক—মেরী ফেলো স্বর্গ।

শুধু মেরী ফেলোদের খাওয়া-পরার দায়িত্ব চীফের—সিভিল বডির নয়। তাদের অনেক ধান্দায় থাকতে হয়—ব্যবসা-বাণিজ্য করে পয়সা রোজগার করতে হয়। তৃতীয় অংশে তাই গড়ে উঠেছে বাজার হাট। নবাবী আমলে থাকার সব জিনিস পাওয়া যায় এখানে। কিনে নিয়ে যায় মেরী ফেলোরা। এ সব জিনিস চীফের কাছ থেকে কেনে ব্যবসাদাররা। চীফ পায় লুঠপাট করে। ইউরোপীয় সামগ্রীগুলো অবশ্য কি করে আসে চীফের কাছে—তা জানে শুধু চীফ আর তার ঘনিষ্ঠ সহযোগীরা।

তৃতীয় অংশে থাকে ২৪৬ জন। এদের মধ্যে ৪৫ জন মেয়েছেলে। পুরুষ নাগরিকদের মত তারাও কুখ্যাত বিবিধ কুকর্ম করে।

প্রথম আর তৃতীয় অংশের মধ্যে দ্বিতীয় অংশের ক্ষেত্রফল প্রায় ১৯০বিঘে। ৫,৭৭৮জন গোলাম থাকে এই অংশে। এর মধ্যে ৪,১৯৬জন পুরুষ, ১,৫৮২জন স্ত্রীলোক। থাকে কুঁড়ে ঘরে অবর্ণনীয় দুর্দশার মধ্যে।

প্রতিদিন সকালে খুলে যায় পাঁচিলের চারটে দরজা। শহরের কাজে মোতায়েন নয় যে সব নিগ্রো, তারা বেরিয়ে আসে মুগুড় আর বন্দুকধারী মেরী ফেলোদের তাড়া খেয়ে—যায় মাঠে চাষবাস করতে। সন্ধ্যের সময়ে কুকুর-ক্লান্ত হয়ে ফেরে কুঁড়ে ঘরে—বন্ধ হয়ে যায় পাঁচিলের দরজা—খোলে পরের দিন সকালে। বাইরের দুনিয়ায় পালানোর কোনো পথ নেই। একদিক

আগলায় মেরী ফেলো—আর একদিক সিভিল বডি। দুদলই সমান নির,-
রক্তলোলুপ, নরপিশাচ।

হতভাগ্য গোলামদের অনেকেই মারা যায় কষ্ট সহ্য করতে না পেরে—গরু ছাগলের মত থাকতে না পেরে—তারও বেশী মরে মেরী ফেলোদের মুগুড আর গুলিতে। শূন্যস্থান পূর্ণ করা হয় গ্রাম থেকে নতুন গোলাম ধরে এনে। বিনা মাইনের চাকরের অভাব কখনো হয় না।

এই হল গিয়ে রেড রিভারের ডান পাড়ের ব্যাপার। ব্ল্যাকল্যাণ্ড বলতে শুধু এইটুকুই নয়—আরো আছে। বাঁপাড়ের জমি আচমকা খাড়া হতে হতে একটা দেড়শ ফুট উঁচু পাহাড় হয়ে গেছে। নদী বরাবর ১২০০ গজ আর নদী থেকে ৩০০ গজ দূর পর্যন্ত উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা আয়তাকার দ্বিতীয় নগরীটা আয়তনের দিক দিয়ে প্রথম নগরীর থেকে খুব একটা ছোট নয়। ক্ষেত্রফল প্রায় ৭১০ বিঘে। লম্বালম্বি পাঁচিল দিয়ে ঠিক দুভাগে ভাগ করা।

দুটো ভাগের একটা ভাগ পাহাড়ের ঢালের ওপর পড়েছে—উত্তর-পূর্ব দিকে! এখানে রয়েছে ফোর্ট্রেস গার্ডেন—পাবলিক পার্ক। উত্তর প্রান্তের গার্ডেন ব্রীজ দিয়ে মেরী ফেলো আর সিভিল বডিদের আস্তানায় যাওয়া যায় এই পার্ক থেকে।

আর একটা ভাগ রয়েছে পাহাড়ের চূড়ায়। শহরের হৃদপিণ্ড এইখানে।

পাবলিক গার্ডেনের ঠিক পাশে উত্তর কোণে রয়েছে একটা প্রকাণ্ড চতুষ্কোনী ইমারত—পাঁচিল দিয়ে চারদিক ঘেরা। ইমারতের উত্তর পশ্চিমে রেড রিভার—ইমারত এখানে নব্বই ফুট পাহাড়ের ওপর অবস্থিত। এই হল গিয়ে প্যালেস—হ্যারি কীলার আর তার নবরত্নের রাজ প্রাসাদ। নবরত্নটি সত্যিই নটি গুণধর রত্ন—প্রমোশন দিয়ে কাউন্সিলর পদে তোলা হয়েছে। চীফ যত রকম কুকর্ম করে, বিচিত্র এই কাউন্সিলর ন'জন তার প্রতিটিতে হাত লাগায়—সাহায্য করে। চীফকে কেউ দেখতে পায় না—তার কাছে কেউ যেতে পারে না—তার রায়ের বিরুদ্ধে আপীল করেও কোনো লাভ হয় না। নবরত্ন এই কাউন্সিলর ক'জন চীফের হুকুম মুখ থেকে খসতে না খসতে তামিল করে চক্ষের নিমেষে এই হল তাদের মূল কাজ এবং এইজন্যেই তাদের এত উঁচু পদে এনে রাখা হয়েছে। বিচিত্র কাউন্সিলর, সন্দেহ নেই।

গার্ডেন ব্রীজ যেমন ফোর্ট্রেস গার্ডেনকে জুড়ে রেখেছে একদিক দিয়ে প্রথম শহরের সঙ্গে, ঠিক তেমনি আর একটা ব্রীজ আছে ব্ল্যাকল্যাণ্ডের প্রাণ-কেন্দ্র থেকে ডানপাড় পর্যন্ত। এর নাম কাস্‌ল্‌ ব্রীজ। রাত্রে নিরেট লোহার

গ্রীল দিয়ে কাস্‌ল্‌ ব্রীজ বন্ধ থাকে।

প্যালেসের লাগোয়া দুটো ব্যারাক আছে। একটায় থাকে একজন গোলাম—চাকর হিসেবে! আর পঞ্চাশ জন বাছাই করা নিগ্রো—সহজাত প্রবৃত্তি যাদের অতিশয় তীক্ষ্ণ। এরাই হল ব্ল্যাক গার্ড। অন্য ব্যারাকে থাকে চল্লিশ জন শ্বেতকায়। এদেরকেও বাছাই করা হয়েছে একই পদ্ধতিতে। পঞ্চাশজন ব্ল্যাকগার্ডের মত এরাও এক-একটা নরপিশাচ বললেই চলে। উড়ুক্কু মেশিন চালানোর ভার আছে এদের ওপর। ব্ল্যাকল্যাণ্ডে আশ্চর্য এই উড়ুক্কু মেশিনকেই বলা হয় হেলিপ্লেন অথবা প্লেনার।

হেলিপ্লেন একটা অদ্ভুত আবিষ্কার। একটা বিস্ময়। বিরাট এক ব্রেনের বিচিত্র সৃষ্টি। একবার মাত্র জ্বালানি নিয়ে একনাগাড়ে তিন হাজার মাইল উড়ে যেতে পারে ঘন্টায় গড়পরতা আড়াইশ মাইল বেগে। ব্ল্যাকল্যাণ্ডের বোম্বেটেদের সর্বত্র উপস্থিতি এবং হীনতম কুকর্ম অন্তে পলকের মধ্যে অন্তর্ধান সম্ভব হয়েছে কেবল এই হেলিপ্লেনের দৌলতেই। বিস্ময়কর এই উড়ুক্কু যন্ত্রের জন্যেই হ্যারি কীলার এত স্বেচ্ছাচারী—তার সমস্ত ক্ষমতাই নির্ভর করছে হেলিপ্লেনের ওপর।

অজ্ঞাত এই অঞ্চলের রাজধানী হল ব্ল্যাকল্যাণ্ড। স্রেফ সন্ত্রাস সৃষ্টি করে রাজত্ব চালিয়ে যাচ্ছে হ্যারি কীলার বিস্তীর্ণ এই ভূখণ্ডে—প্রাণে আতংক জাগিয়ে কায়েমী করে নিয়েছে নিজের প্রভুত্ব। কিন্তু বিদ্রোহের সম্ভাবনা মন থেকে উড়িয়ে দিতে পারে নি। সাদা বা কালো স্যাঙাৎরা যে কোনো মুহূর্তে রুখে দাঁড়াতে পারে—তা ভেবেই উঁচু জায়গায় প্যালেস বানিয়েছে। গার্ডেন, ব্যারাক আর টাউনের দিকে ফেরানো রয়েছে বড় বড় কামানের নল। হ্যারি কীলার অতি বিচক্ষণ খুনে—দূরদর্শিতা তার শিরা উপশিরায়। বিদ্রোহের ফুলকি দেখা গেলেই রক্তগঙ্গা বইয়ে ছাড়বে—কেউ নিষ্কৃতি পাবে না। মরুভূমি পেরিয়ে পালানো কোন মতেই সম্ভব নয়। ডাকাতেরা ডেরায় একবার যে ঢুকেছে, প্রাণ নিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার আশা সে ত্যাগ করেছে।

এ ছাড়া ব্ল্যাকল্যাণ্ডের সব কিছুই অতিশয় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। ঘরে ঘরে সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের অঢেল আয়োজন। টেলিফোন বিনা ঘর নেই মেরীফেলো বা সিভিল বডিদের। হেন রাস্তা, বাড়ী কুঁড়ে নেই যেখানে মেন পাইপের জল বা ইলেকট্রিসিটির আলো পৌঁছোয়নি। গোলামদের দীনহীন কুঁড়ে ঘরেও দেখা যাবে বিদ্যুৎবাতি জ্বলছে, কল থেকে জল পড়ছে।

বিস্ময় শুধু শহরের মধ্যে নেই—বাইরেও আছে। বালির সমুদ্র শুরু

হয়েছে শহর সীমানা থেকে অনেক দূরে—দিগন্তের ও পারে। দশ বছর আগে ব্ল্যাকল্যাণ্ড প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল কিন্তু বালির সমুদ্রেই। হ্যারি কীলার তার জাদুদণ্ড বুলিয়ে মরুভূমিকে হটিয়ে দিয়েছে অনেক দূরে—শহর সীমানায় দাঁড়িয়ে দেখা যায় না। শুধু দেখা যায় শাকসব্জীর ক্ষেতের পর ক্ষেত—ইউরোপ আর আফ্রিকার সব রকম সব্জীর সেখানে ফলন হচ্ছে—তাকলাগানো বিচিত্র পন্থায়।

এই হল গিয়ে হ্যারি কীলারের সবচেয়ে বড কীর্তি। কুকর্মের বনেদ না থাকলে তারিফ করা যেত এই কীর্তির। প্রশংসায় পঞ্চমুখ হওয়া যেত। কিন্তু এ কাণ্ড সম্ভব হল কি করে? শুষ্ক অনুর্বর এই প্রান্তরে এমন সব্জীর ক্ষেত সে বানাল কি করে? জল ছাড়া জীবন নেই। জল ছাড়া ধরিত্রী বন্ধ্যা। কিন্তু যে অঞ্চলে সারা বছরেও এক ফোঁটা বৃষ্টি পড়ে না—সেখানে কোন মন্ত্রবলে এমন আশ্চর্য ম্যাজিক দেখাতে পারল হ্যারি কীলার? নিছক জাদু-বিদ্যা, না, আর কিছু?

না, না, না,। হ্যারি কীলার মন্ত্রসিদ্ধ পুরুষ নয়, জাদুকর নয়,। কোনো রকম অলৌকিক ক্ষমতা তার নেই। যে ক্ষমতায় সে ক্ষমতাবান, সে ক্ষমতা দিয়ে এমন আশ্চর্য কাণ্ড করা যায় না। তবে এটাও ঠিক যে, হ্যারি কীলার একা নয়। তার একার ক্ষমতায় যা কস্মিনকালেও সম্ভব ছিল না—তা সম্ভব হয়েছে এমন একজনের ব্রেনের ম্যাজিকে—যার কথাতেই আসছি এবার।

প্রথমেই বলি, পাহাড়ের ওপর প্যালেসটাই ব্ল্যাকল্যাণ্ডের পুরোপুরি প্রাণ-কেন্দ্র নয়। প্যালেস, ব্যারাক, হেলিপ্লেন শেড ব্ল্যাকল্যাণ্ডের এই অংশের খুব কম অংশই জুড়ে রয়েছে। বিরাট খোলা জায়গায় দেখা যাচ্ছে আরও অনেক ইমারত, অনেক বাড়ী অনেক টাওয়ার। প্রথম শহরের মধ্যেই যেন গজিয়ে উঠেছে আরও একটা শহর। সেখানেও বাগান আছে—শহরের মধ্যে যা যা থাকা দরকার, সব আছে। কিন্তু গড়ন আর ধরন একেবারেই আলাদা। প্রায় ষাট বিঘে জমি জুড়ে প্যালেসের সামনেই দাঁড়িয়ে আছে—ফ্যাক্টরী।

অকৃপণ হস্তে এই ফ্যাক্টরীর পেছনে টাকা ঢালে হ্যারি-কীলার। ফ্যাক্টরী তো নয়—একটা স্বয়ংশাসিত স্বনির্ভর শহর। হ্যারি কীলার মুখে স্বীকার করে না—কিন্তু মনে মনে ভয় পায় এই শহরকে—সমীহ করে। হ্যারি কীলার টাউন বানিয়েছে ঠিকই—কিন্তু নক্সা এঁকেছে এই ফ্যাক্টরী। এবং এই ফ্যাক্টরী মধ্যেই পাওয়া যাবে দামী দামী আধুনিকতম যন্ত্রপাতি—ইউরোপ এখনো যে সব আবিষ্কার কল্পনাও করতে পারে না—বহু বছরেও ইউরোপের পণ্ডিতরা যে সব

আবিষ্কার সম্ভব করতে পারবে কিনা সন্দেহ—তা সবই সম্ভব হয়েছে এই ফ্যাক্টরীর মধ্যে। সব কটা আবিষ্কারই পিলে চমকানো, বিস্ময়কর, চিত্তচাঞ্চল্যকর।

অভিনব এই ফ্যাক্টরীরও আত্মা আছে, দেহ আছে। আত্মা হল একজন ডিরেক্টর। দেহটা শ'খানেক কর্মী নিয়ে—ফ্রান্স আর ইংল্যাণ্ডের সেরা ব্রেনদের সোনায় ওজন করে তুলে আনা হয়েছে, রাজসিক পরিবেশে রাখা হয়েছে। নানান দেশের মানুষ তারা—কিন্তু সোনার জুতোয় বশ মেনেছে, মেনে নিয়েছে ব্ল্যাকল্যাণ্ডের কড়া শাসন।

একশ জনের মধ্যে বেশীর ভাগই দক্ষ মেক্যানিক। অনেকেই বিবাহিত। ফলে মেয়েদের সংখ্যা সাতাশ। বাচ্চাকাচ্চাও আছে বেশ কিছু।

এরা প্রত্যেকেই সজ্জন—ব্ল্যাকল্যাণ্ডের অন্যান্য অধিবাসীদের ঠিক উল্টো। ফ্যাক্টরীর চৌহদ্দি থেকে বেরোনোর অধিকার কারো নেই। ইচ্ছে করলেও বেরোতে পারে না। মেরী ফেলো আর ব্ল্যাক গার্ডরা চব্বিশ ঘণ্টা পাহারা দিচ্ছে। চাকরীতে ঢোকার সময়ে প্রত্যেকেই তা জেনেছে—নিয়ম ভাঙতেও চায় না। মোটা বেতনের বিনিময়ে বহির্জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন ব্ল্যাকল্যাণ্ডে থাকতে রাজী হয়েছে। বাইরের দুনিয়ার কাউকে চিঠি পর্যন্ত লিখতে পারে না—বাইরের চিঠিও এখানে আসে না।

যাদের মন চায় না এহেন কঠোর নিয়মকানুনের গণ্ডীর মধ্যে বন্দী থাকতে, তাদের বেতন আরো বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। টোপ গিলে চুপ মেরে গিয়েছে তাদের প্রত্যেকেই। দরকার কী অসন্তোষ দেখিয়ে? এত টাকা দেশে তো কেউ দেয়নি? তখন তো জিভ বেরিয়ে গেছে দু'বেলার রুটি জোগাড় করতে। ফ্যাক্টরী ছেড়ে না বেরোতে চাইলে যদি এত টাকা পাওয়া যায় তো ক্ষতি কি? বাইরে কি আছে, তা জানতে চাওয়ার চাইতে সামান্য একটু অ্যাডভেঞ্চারের ঝুঁকি নিয়ে টাকার পাহাড় জমানো কি বুদ্ধিমানের কাজ নয়?

ফলে, নির্দ্বিধায় সই দিয়েছে চুক্তিপত্রে। সঙ্গে সঙ্গে চেপে বসেছে নির্দিষ্ট জাহাজে। জাহাজ গেছে পর্তুগীজ গিনি উপকূল থেকে একটু দূরে বিশাগো আইল্যাণ্ডস দ্বীপপুঞ্জের একটি জনহীন দ্বীপে। সেখানে তার চোখ বাঁধা হয়েছে। দ্বীপে লুকোনো শেডে রাখা একটা হেলিপ্লেনে তোলা হয়েছে। ছ'ঘণ্টারও কম সময়ে চোদ্দশ মাইল উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে পৌঁছে দিয়েছে ব্ল্যাকল্যাণ্ডের এসপ্ল্যানেডে, প্যালেস আর ফ্যাক্টরীর মাঝের খোলা জায়গায় চোখের বাঁধন খুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ফ্যাক্টরীর মধ্যে—চুক্তির মেয়াদ শেষ না হওয়া

পর্যন্ত থেকেছে সেই খানেই—তারপর ফিরে গেছে স্বদেশে।

চুক্তিতে সে সর্ত আছে বই কি। ফ্যাক্টরীর জীবন ভাল না লাগলে, নিশ্চয় তাকে স্বদেশে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে চুক্তির মেয়াদ ফুরোনের আগেই। এসপ্ল্যানেড থেকে হেলিপ্লেন তাকে পৌঁছে দেবে বিশাগো আইল্যাণ্ডসে—সেখান থেকে জাহাজে ইউরোপের মাটিতে।

দেশের জন্যে মন কেমন করলে এই আশ্বাস দিয়েই তাদের হেলিপ্লেনে তোলা হয়। তারপর তাদের কি হয়, তা জানতে পারে না ফ্যাক্টরীর কমরেডরা। জানতেও পারে না তাদের হাড় রোদ্দুরে জ্বলছে সাহারার বালিতে, জানতেও পারে না এত খাটুনির মাইনের টাকা ফের ফিরে এসেছে খুনেদের হাতে। ব্ল্যাকল্যাণ্ডের গুপ্তরহস্য প্রকাশ পায় না বহির্জগতে—হ্যারি কীলারের সাম্রাজ্য অজ্ঞাত থেকে যায় শেষ পর্যন্ত।

কিন্তু খুব একটা কেউ যেত না। ব্ল্যাকল্যাণ্ডের নরপিশাচরা কি ধরনের অপকর্ম করে মরু সাম্রাজ্য চালাচ্ছে, তা কেউ জানতে পারত না। তাই কালে ভদ্রে দু'একজন বাড়ী যেতে চাইত—তার বেশী না। শ্রমিক কর্মচারীদের সঙ্গে একই রকম বন্দী জীবন যাপন করত নজন নিগ্রো গোলাম মেয়ে-পুরুষ—সাহায্য করত ঘর সংসারের কাজে। মনের মত কাজ পেয়ে শ্রমিক কর্মচারীদের অন্য দিকে হুঁশ থাকত না—রাত পর্যন্ত কাজের নেশায় বুঁদ হয়ে থাকত। সব মিলিয়ে দেশে থাকার চেয়ে অনেক ভালোভাবে, অনেক সুখে স্বচ্ছন্দে থাকত ফ্যাক্টরীর চৌহদ্দীতে।

এদের ডিরেক্টরের নাম মারসেল ক্যামারেট জাতে ফরাসী। শ্রমিক কর্মচারীদের চোখে দেবতা স্বরূপ।

একমাত্র ইনিই ব্ল্যাকল্যাণ্ডের সবত্র যেতে পারতেন। পথেঘাটে ঘুরতে পারতেন। ফ্যাক্টরীর আর কারো এ অধিকার ছিল না। ইনি পথ হাঁটতেন মাথা হেঁট করে, নিজের চিন্তায় বিভোর হয়ে। স্বাধীনতা উপভোগ করতেন ঠিকই—কিন্তু ব্ল্যাকল্যাণ্ডের নরপিশাচদের সম্বন্ধে কোনো খবর রাখতেন না—জানবার কৌতূহল ছিল না।

একজন শ্রমিক কর্মচারী একদিন জানতে চেয়েছিল। ঘাড় হেঁট করে কপাল কুঁচকে ভেবেছিলেন ক্যামারেট।

বলেছিলেন—"জানি না তো।"

সেই প্রথম আর সেই শেষ। ব্ল্যাকল্যাণ্ড নিয়ে আর মাথা ঘামান নি ক্যাম্যারেট।

বয়স তাঁর চল্লিশের ধারে কাছে। উচ্চতা মাঝামাঝি। সিধে কাঁধ। চ্যাটালো বুক। চুল ফ্যাকাশে সোনালী এবং সংখ্যায় কম। দেখে মনে হয় শরীরে বল কম। কথা বলেন আস্তে—শান্ত স্বরে—রেগে গলা চড়াতে একদম জানেন না। হাত-পাও ছোঁড়েন না। অসহিষ্ণু কখনো হন না। কণ্ঠস্বর ছেলেমানুষের মত—ভীতু ভীতু। সব সময়ে মাথাটা বাঁ কাঁধের ওপর হেলিয়ে রাখেন। যেন, মাথার ভার বওয়া একটা ঝকমারি। মুখ নিষ্প্রভ এবং ফ্যাকাশে—বড্ড কাহিল আর অপলকা। সৌন্দর্য কেবল এক জায়গায়—দুই চোখে। অদ্ভুত সুন্দর নীল চোখ জোড়ার দিকে তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে যায়। উচ্চ চিন্তার অভিব্যক্তি দেখা যায় নীল আকাশের মত সুনীল দুই চোখের আয়নায়।

একটু খুঁটিয়ে, একটু গভীর চোখে আশ্চর্য সুন্দর চোখ জোড়ার দিকে তাকালে আরও কিছু দেখা যাবে। মাঝে মাঝে একটা আবছা ঘোলাটে দীপ্তি ভেসে যায় চোখের আয়নার ওপর দিয়ে ধূসর কুয়াশার মত। তারপরেই ক্ষণেকের জন্য শূন্য হয়ে যায় চাহনি। অনভিজ্ঞ ব্যক্তি বিচিত্র সেই চাহনি দেখে বিস্মিত হবেন; অভিজ্ঞ ব্যক্তি দেখেই আঁচ করতে পারবেন আসল ব্যাপার। মারসেল ক্যাম্যারেটের মাথায় গোলমাল আছে। ধীশক্তি জিনিসটা চিরকালই স্বাভাবিকতার গণ্ডীর বাইরে। অতিমানবিক মেধা আর মস্তিষ্ক বিকৃতির মধ্যে দূরত্ব তো বেশী নয়—অতি সামান্য। মারসেল ক্যামারেট তার ব্যতিক্রম নন।

মারসেল ক্যাম্যারেট, ভীতু, দুর্বল, নরম—কিন্তু এনার্জি শূন্য নন। সীমাহীন প্রাণ শক্তিতে ভরপুর। বহির্জীবনে দৃষ্টি নেই। আশপাশের অনিশ্চয়তা, বিপদ, নিষ্ঠুরতা তাঁকে স্পর্শ করে না। অন্তর্জীবনে যিনি প্রবিষ্ট, দিবানিশি যিনি চিন্তা নিয়ে ব্যোমভোলা—তাঁকে বাইরের জগতের সহস্র বিপর্যয়ও বিচলিত করতে পারে না। কল্পনার ফ্যানট্যাসটিক দুনিয়ায় তাঁর অধিবাস, সেইখানে তাঁর বিচরণ, সেই তাঁর ধ্যানধারণা। দিবানিশি তিনি এই নিয়েই চিন্তা করছেন, সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন, সমস্যার সমাধান করছেন। চলমান চিন্তা-যন্ত্র তিনি; চিন্তা ছাড়া তাঁর অবয়বে আর কিছুই নেই। চিন্তা সর্বস্য একটা দুর্জয়, ভয়ংকর কিন্তু নিরীহ মেশিন। আনমনা এই মানুষটিকে দেখলে সেন্ট বেরেনও লজ্জা পেতেন। ব্রীজ পেরোচ্ছেন ভেবে কতবার যে রেড রিভারে পড়ে গেছেন, তার ইয়ত্তা নেই। যখন খুশী খেতেন—ক্ষিদে পেলে খেতেন—নইলে নয়। এবং ক্ষিদেটা পেত কখনো রাত দুপুরে—কখনো দিন দুপুরে। ঘুমোতেনও সেইভাবে। বানর সদৃশ এ হেন চাল-চলন দেখে

চাকররা তাঁর নাম দিয়ে ছিল—জ্যাকো।

দশ বছর আগে বিচিত্র এই চিন্তা-মেশিনের মগজে নকল বৃষ্টি ঝরানোর আজব পরিকল্পনা গজিয়েছিল। সরল মনে যাকে সামনে পেতেন, তাকেই উদ্ভট পরিকল্পনাটা শোনাতেন। সবাই হাসত। আমোল দিত না। একজন কেবল দিয়েছিল। হ্যারি কীলার। তার মাথাতেও তখন বিরাট এক পরিকল্পনা মাথা চাড়া দিয়েছে। ক্যাম্যারেটের বৃষ্টি-ঝরানোর .পরিকল্পনা হ্যারি কীলারের সব পরিকল্পনার ভিত হয়ে দাঁড়াল।

হ্যারি কীলার খুনে ডাকাত। কিন্তু দূরদৃষ্টি ছিল। অনেক দূরের স্বপ্ন দেখতে পারত। ক্যাম্যারেটকে সে কব্জায় আনল। স্বপ্ন সম্ভব হলে কি হতে পারে, আকাশ কুসুম সেই কল্পনায় বৈজ্ঞানিকের চোখ ধাঁধিয়ে দিল। ভাবী ব্ল্যাকল্যাণ্ডের জন্যে চিহ্নিত মরু মাঝে এনে ফেলল। বললে—"ঝরান বৃষ্টি এখানে!" এবং সত্যিই বৃষ্টি ঝরল সেখানে।

সেই হল শুরু। সেই থেকে নিরন্তর যেন বিকার গ্রস্তের মত একটার পর একটা অবিশ্বাস্য আবিষ্কার করে গেলেন ক্যাম্যারেট। শ'খানেক এমনি আবিষ্কারের প্রতিটি থেকে উপকৃত হলো হ্যারি কীলার—কাজে লাগাল নিজের পৈশাচিক উদ্দেশ্য সাধনে। ক্যাম্যারেট কিন্তু জানতেও চাইলেন না কি কাজে লাগছে যুগান্তকারী আবিষ্কারগুলো।

আবিষ্কারকে অপকার্যে লাগালে তার জন্যে সরাসরি দায়ী করা যায় না আবিষ্কারককে। যদিও রিভলবার যিনি আবিষ্কার করেছিলেন, তিনি রিভল-বারকে শেষ পর্যন্ত কি কাজে লাগানো হবে জেনেই আবিষ্কারটা করেছিলেন। কিন্তু মারসেল ক্যাম্যারেটের ক্ষেত্রে এ কথা খাটে না। তাঁকে যদি বলা যায় গতানুগতিক কামানের চাইতে একটা বড় কামান তৈরী করে দেওয়া হোক—এমন কামান যার গোলার ওজন হবে পৃথিবীর যে কোনো কামানের গোলার চেয়ে বেশী—ছুটবে অনেক বেশী—তৎক্ষণাৎ তিনি বিষম উৎসাহে নক্সা এঁকে ফেলবেন কামানের, অংক কষে ওজন বার করে দেবেন গোলার, হিসেব করে বলে দেবেন কত বিস্ফোরক কামানে ঠাসলে কতদূর ছুটে যাবে পেল্লায় গোলাটা। তারপর যদি সেই গোলার ব্যাপক ধ্বংস ক্রিয়ার খবর তাঁর কানে আসে, চোখ কপালে তুলে ছেলেমানুষের মত বলবেন—"সে আবার কী! আমি তো জানতাম না!"

আসলে উনি কামান তৈরী করবেন কামান শিল্পে অদম্য কৌতূহল নিয়ে—প্রয়োগ নিয়ে তিলমাত্র চিন্তার অবকাশ না রেখে।

হ্যারি কীলার বৃষ্টি চেয়েছিল. বৃষ্টি ঝরিয়েছেন ক্যাম্যারেট ; হ্যারি কীলার কৃষি-যন্ত্র চেয়েছিল, ক্যাম্যারেট তাকে দিয়েছে একটি মাত্র মোটর চালিত এমন একটা মেশিন যা দিয়ে একাধারে জমিতে লাঙ্গল দেওয়া যায়, বীজ বপন করা যায়, আগাছা সাফ করা যায়, শস্য কাটা যায়, আছড়ে শস্য বার করা যায় ; হ্যারি কীলার উড়ক্কু যন্ত্র চেয়েছিল, ক্যাম্যারেট তাকে দিয়েছেন হেলিপ্লেন—উল্কাবেগে এক নাগাড়ে তিন হাজার মাইল উড়ে যাওয়ার জন্যে।

একটার পর একটা আবিষ্কার করে গেছেন ক্যাম্যারেট। জানতেও চান নি কি কাজে লাগছে আবিষ্কারগুলো। চিন্তা-সর্বস্ব প্রাণী তিনি। নিরন্তর সমস্যার যোগান দেন মস্তিষ্ককে—সমাধান করেন চিন্তার ফসল ফলিয়ে। তাতেই তাঁর তৃপ্তি, হৃষ্টি, সন্তুষ্টি। কি কাজে লাগল আবিষ্কার অথবা জিনিসটা বানানোর মালপত্র এল কোত্থেকে—তা নিয়ে বিন্দুমাত্র মাথা ব্যথা তাঁর নেই। ব্ল্যাকল্যাণ্ড তাঁর চোখের সামনেই দাঁড়িয়েছে মরুভূমির ওপর—কিন্তু প্রথম যন্ত্রটি এল কিভাবে এবং তারপর পরের পর হাজারো যন্ত্র তৈরী করতে গিয়ে লাখো জিনিসপত্র, ফ্যাক্টরী বানিয়ে কলকব্জা, যন্ত্রপাতি এল কোন যাদুমন্ত্র-বলে—তা তিনি জানতে চাননি, জানবার কথাও মনে হয় নি।

মারসেল ক্যাম্যারেট প্রথমে বললেন একটা ফ্যাক্টরী বানাতে হবে। এমন সহজভাবে বললেন যেন এর চাইতে সহজ কাজ আর হতে পারে না। অমনি কয়েকশ নিগ্রো এল, ফ্যাক্টরী বানিয়ে দিলে। তারপর চাইলেন এটা-সেটা ; চাইলেন যন্ত্রপাতি, ডায়নামো, স্টীম ইঞ্জিন। কোনোটা এল তক্ষুনি, কোনোটা মাস কয়েক পরে। কিন্তু এল সবই—মায় স্টীম ইঞ্জিন আর ডায়নামো পর্যন্ত। মরুভূমি ফুঁড়ে যেন ম্যাজিকের মত বেরিয়ে এল একটার পর একটা জিনিস।

শ্রমিক-কর্মচারী চাইলেন মারসেল ক্যাম্যারেট। দেখতে দেখতে এক জনের পর একজন শ্রমিক-কর্মচারী এসে গেল ফ্যাক্টরীর মধ্যে। যেন দৈবের খেলা। মারসেল ক্যাম্যারেট কিন্তু কোনোদিনও জানতে চাইলেন না কিভাবে আসছে এত লোক। যা চেয়েছিলেন, তা পেয়েছেন। ব্যস, এতো সোজা ব্যাপার।

স্বপ্ন সম্ভব করতে পাহাড় প্রমাণ টাকাই বা আসছে কোত্থেকে, সহজতম এই প্রশ্নটা করার খেয়ালও তাঁর কখনো হয়নি।

আশ্চর্য এই কাহিনীর প্রারম্ভে ব্ল্যাকল্যাণ্ডের কাজকর্ম চলছে রুটিন মাফিক। ফ্যাক্টরীতে ব্যস্ত শ্রমিক-কর্মচারীরা ; চাষের মাঠে বিনা মাইনের গোলাম ঠ্যাঙাচ্ছে মেরী ফেলোরা ; বেআইনী কারবার চালিয়ে যাচ্ছে সিভিল

বডিরা ; অন্য সবাই মশগুল ক্রূর কুটিল, স্থূল আনন্দে।

বেলা এগারোটা। প্রাইভেট রুমে একলা বসে হ্যারি কীলার। গভীর চিন্তায় মগ্ন। মুখ দেখে মনে হচ্ছে চিন্তাটা সুখকর নয়।

টেলিফোন বেজে উঠল।

রিসিভার ধরে হ্যারি কীলার বলল—"শুনছি!"

"পশ্চিমে, সতেরো ডিগ্রী দক্ষিণে, দশটা হেলিপ্লেনকে দেখা যাচ্ছে।"

"আসছি!" রিসিভার নামিয়ে রাখল হ্যারি কীলার।

কয়েক সেকেণ্ড লাগল প্যালেসের ছাদে যেতে। তারপর তিরিশ ফুট একটা টাওয়ারের চূড়ায়। প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে একজন মেরী ফেলো। এইমাত্র টেলিফোন করেছিল।

টেলিস্কোপ ঘুরিয়ে হেলিপ্লেন দেখল হ্যারি কীলার।

বলল—"কাউন্সিলরদের খবর দাও। আমি নিচে যাচ্ছি।"

ফ্যাক্টরী আর প্যালেসের মাঝখানে এসপ্ল্যানেড। হ্যারি কীলার তরতর করে নেমে গেল সেখানে। মেরী ফেলোর টেলিফোন পেয়ে নবরত্ন কাউন্সিল মেম্বাররাও এল একে একে। আকাশের দিকে চেয়ে রইল সবাই।

একটু একটু করে বড় হয়ে উঠল হেলিপ্লেনগুলো। মিনিট কয়েক পরেই নেমে পড়ল এসপ্ল্যানেডে। খুব আস্তে—মোলায়েম ভঙ্গিমায়।

দু চোখ জ্বলে উঠল হ্যারি কীলারের। চারটে হেলিপ্লেনে কেবল পাইলট। বাকী ছটার প্রতিটিতে পাইলট ছাড়াও দুজন করে আরোহী: একজন ব্ল্যাকগার্ড, আর একজন বন্দী—মুণ্ড ঢাকা কাপড়ে, হাত পা বাঁধা দড়িতে। বাঁধন খুলে দেওয়া হল বন্দীদের। বিমূঢ় বিস্ময়ে তাঁরা চেয়ে রইলেন সামনের সুবিশাল প্রাসাদ, প্রাসাদের ওপরকার টাওয়ার, চারপাশের দুর্লঙ্ঘ্য পাঁচিল এবং দশ দশটা অতীব বিচিত্র উড়ুক্কু যন্ত্রের দিকে—এই বাহনে চেপেই হেথায় তাঁরা এসেছেন।

তিরিশ জন ব্ল্যাকগার্ড অনিমেষে চেয়ে রইল হতবাক ছজনের দিকে।

বিস্ময়ে চরমে উঠল একশ গজ পেছনে আড়াইশ গজ লম্বা জানলা দরজাহীন পাঁচিলের ওপারে সুউচ্চ ফ্যাক্টরী চিমনী আর একটা আকাশ-ছোঁয়া পাইলন, মানে, ইস্পাতের কাঠামো দেখে। এত উঁচু পাইলনের প্রয়োজন কি জন্যে, কেউ ভেবে বার করতে পারলেন না। কোথায় দাঁড়িয়ে আছেন, তাও বুঝতে পারলেন না। সামনের ঐ পেল্লায় কেল্লাবাড়ীটাই বা কোন্ মহাপ্রভুর, তা আঁচ করতে পারলেন না। আফ্রিকার ম্যাপ তাঁরা তন্নতন্ন করে দেখেছেন।

কিন্তু এমন এলাহি কাণ্ডকারখানার চিহ্ন মাত্র তো দেখেননি।

ইসারা করল হ্যারি কীলার। ঘাড় ধরে ছজনকে ঢুকিয়ে দেওয়া হল প্যালেসে। বন্ধ হয়ে গেল দরজা।

অজ্ঞাত সাম্রাজ্যের রাজধানী ব্ল্যাকল্যাণ্ডের নিরঙ্কুশ ক্ষমতা সম্পন্ন ডিক্-টেটর হ্যারি কীলারের খপ্পরে পড়লেন জেন ব্লেজন, সেন্ট বেরেন, বাবজাক, অ্যামিদী ফ্লোরেন্স ডক্টর চাতোন্নে এবং মঁসিয়ে পঁসি।

২ ॥ ডানা মেলে

(অ্যামিদী ফ্লোরেন্সের নোটবই থেকে)

২৫ শে মার্চ।—চব্বিশ ঘন্টা হল এসেছি এখানে···কিন্তু কোথায়? কোন চুলোয়? চাঁদে এসেছি, যদি বলে কেউ, মোটেই অবাক হব না। যাত্রাপথের যে স্বাদ পেলাম···সত্যি কথা বলতে কি, একদম বুঝতে পারছি না, জায়গাটা কোথায়।

মোট কথা, চব্বিশ ঘন্টা হয়ে গেল বন্দী হওয়ার পর। রাতটা মোটামুটি শান্তিতে কেটেছে। আজ সকালে তাই গায়ে একটু বল পেয়েছি। নোটবই নিয়ে বসেছি।

আকাশ-অশ্বারোহণে বাধ্য হয়েছিলাম। তা সত্ত্বেও সবার শরীর ভাল—সেন্ট বেরেনের ছাড়া। ভদ্রলোক কুপোকাৎ হয়েছেন সাংঘাতিক কোমরের বাতে। বেচারা। যেভাবে আনা হয়েছে, আমরা যে এখনো সিধে দাঁড়িয়ে, এইটাই তাজ্জব ব্যাপার। সেন্ট বেরেনের বয়স হয়েছে। চ্যালাকাঠের মত শক্ত হয়ে শুয়ে আছেন। বাচ্চা ছেলেকে যেমন খাওয়ায় আমরাও তাকে খাইয়ে দিচ্ছি সেইভাবে।

পরশু রাতে তো মড়ার মত শুলাম! ভোররাতে বিকট আওয়াজে ধড়-মড়িয়ে উঠে বসলাম। সেই আওয়াজ—তিন তিনবার যা শুনেছি। এবার আরও প্রচণ্ড—কানের পর্দা যেন ফেটে যাচ্ছে। চোখ মেলতে গিয়ে চোখ ধাঁধিয়ে গেল! মনে হল যেন মাথার ওপরে কোথা থেকে অত্যুগ্র আলোক বর্ষণে অন্ধ হয়ে যাচ্ছি।

আওয়াজ আর দীপ্তির ধাঁধা কাটিয়ে ওঠার আগেই কারা যেন ঝাঁপিয়ে পড়ল আমাদের ওপর, সবলে মাথার ওপর তুলে আছাড় মারল মাটিতে। চক্ষের নিমেষে থলির মধ্যে মাথা ঢুকিয়ে হাত আর পা বাঁধল পিছমোড়া করে,

মুখে ঠুসে দিল ন্যাকড়া—যেন আমি মানুষ নই—জান্ত সসেজ! লিখতে যত সময় গেল, তার চাইতেও কম সময়ে সাঙ্গ হল এতগুলো পর্ব! সত্যিই বাহাদুর বটে!

দড়ি কেটে বসল চামড়ার ওপর। জ্বালার চোটে যখন অস্থির, তখন শুনলাম লেফটেন্যান্ট ল্যাকোরের কর্কশ কণ্ঠস্বর :

"সবাই হাজির তো?"

জবাব শোনার অপেক্ষা করল না গুণধর লেফটেন্যান্ট। রুক্ষতা আর এক ধাপ চড়িয়ে হুংকার ছাড়ল পরের সেকেণ্ডেই :

"বেচাল দেখলেই গুলি মেরে খুলি উড়িয়ে দোব। আসুন, উঠে পড়ুন, যাওয়া যাক!"

দ্বিতীয় হুমকিটা যে আমাদের উদ্দেশে, তা বোঝাবার জন্যে সাহিত্যে পাণ্ডিত্যের দরকার হল না। 'উঠে পড়ুন' হুকুম করলেই উঠতে হবে? তাছাড়া ওঠবার অবস্থা রেখেছো বাছাধন? তুমি না আমাদের লেফটেন্যান্ট?

ঠিক এই সময়ে হেঁড়ে গলায় দূর থেকে কে যেন চিৎকার করে বললেন জার্মান ভাষায়—"বড্ড গাছ ওখানে—নামতে পারব না।"

জার্মান ভাষা আমি জানি না। ডক্টর চাতোন্নে জানেন। উনি পরে মানেটা বলেছিলেন।

মানে তখন না বুঝলেও হকচকিয়ে গিয়েছিলাম শূন্য থেকে কণ্ঠস্বর ভেসে আসায়। এ আবার কি রহস্য।

জার্মান বুকনি থামতে না থামতেই বিরামবিহীন বিকট আওয়াজের মধ্যে ধ্বনিত হল দ্বিতীয় গলাবাজি :

"গাছপালার বাইরে বন্দীদের নিয়ে আসুন।"

এবার কিন্তু বুঝলাম কথাটা। ইংরিজিতে বলা হল যে! সেক্সপীয়ারের ভাষা বলেই বুঝতে পারলাম।

সঙ্গে সঙ্গে শোনা গেল লেফটেন্যান্ট ল্যাকোরের প্রশ্ন :

"কোন দিকে?"

"কৌরবৌসৌ-র দিকে।"

"কত দূর?"

"কুড়ি কিলোমিটার," জবাব দিল তৃতীয় কণ্ঠস্বর—ইটালিয়ান ভাষায়।

ব্যাপারটা কী? ভাষাবিদদের রাজ্যে এসে পড়লাম নাকি?

"তাহলে ভোরবেলা রওনা হব," বলল লেফটেন্যান্ট ল্যাকোর।

সঙ্গে সঙ্গে দ্বিগুণ বেড়ে গেল আকাশ-গর্জন। তারপর অবশ্য কমে গেল আস্তে আস্তে। কিছুক্ষণ পরে আর শোনাও গেল না।

বুঝতে পারলাম না অদ্ভুত গর্জনটা কিসের। মুখে কাপড় গোঁজা থাকায় সঙ্গীদেরও জিজ্ঞেস করতে পারলাম না।

ঘন্টাখানেক পরে দুজন আমাকে চাংদোলা করে তুলল, দুলিয়ে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলল ঘোড়ার পিঠে—যেন আলুর বস্তা। ঘ্যাচাং করে জিনের সামনের দিকটা বিঁধল পিঠে। লাফ মেরে ঘোড়া ছুটল সামনে।

'মাজেপ্পাস রাইড' কবিতায় পড়েছিলাম, মাজেপ্পা বেচারাকে বুনো ঘোড়ার পিঠে বেঁধে ছেড়ে দিয়েছিল এক জমিদার। ঘোড়া ছুটল প্রান্তর পেরিয়ে। কসাকরা বাঁচায় তাকে। শেষ পর্যন্ত কসাকদের মিলিটারী কম্যাণ্ডার হয়েছিল মাজেপ্পা। স্বপ্নেও ভাবিনি শেষ পর্যন্ত মাজেপ্পার হাল হবে আমারও।

মদে ভিজোনো হেঁড়ে গলায় ইংরেজিতে কে যেন বললে—"সাবধান ব্যাঙের বাচ্চা। নড়লেই রিভলবারের গুলি ঢুকিয়ে দোব মগজের মধ্যে।"

কী গলা! গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল আমার!

ঘোড়া ছুটছে। আশপাশে গোঙানি শুনছি আমার মত। খুব কষ্ট হচ্ছিল। মাথা ঠুকছে ঘোড়ার একপাশে—পা আর একপাশে।

ঘন্টাখানেক এইভাবে উন্মত্ত দৌড়ের পর ঘোড়া থামল। আমাকে আলুর বস্তার মত ছুঁড়ে ফেলা হল মাটিতে। হাড়গোড় যেন গুঁড়িয়ে গেল। শরীর অসাড়। মনও তাই। সেই অবস্থায় শুনলাম:

"মেয়েটা অক্কা পেয়েছে!" অশুদ্ধ ইংরিজি।

"না, অজ্ঞান হয়ে গেছে।" বিশুদ্ধ ইটালিয়ান।

"বাঁধন খোলো—ডাক্তারেরও।" এবার ফরাসী—ল্যাকোরের গলা।

ঝটপট থলি সরে গেল আমার মুখ থেকে। ভুল করেছে। আমাকে ডাক্তার চাতোন্নে মনে করেছে। ভুল ধরা পড়ল তক্ষণাৎ। আমার মুখ দেখেই হুংকার ছাড়ল লেফটেন্যান্ট, "ও নয়…ও নয়…।"

রাস্কেল কোথাকার। ল্যাকোরের মুখ দেখেই ভেতর পর্যন্ত বিষিয়ে গেল আমার। গোড়া থেকেই সন্দেহ হয়েছিল। শয়তানের মুখোশ যদি তখন খুলে দিতাম, আজ আমার এ হাল হত না। এখনো যদি একবার বাগে পাই…

ঠিক এই সময়ে একজন এসে নাম ধরে ডাকল ল্যাকোরকে। আসল নামটা জানতে পারলাম। ক্যাপ্টেন এডোয়ার্ড রুফুজ। ক্যাপ্টেন। বেল্লিক বদমাস কোথাকার! তোর তো জেনারেল হওয়া উচিত রে! যে ভাবে লেফটেন্যান্ট

সেজে ধোঁকা দিয়ে এলি...

লোকটার সঙ্গে কথা বলতে বলতে আমার দিকে চেয়েছিল জাল লেফ-টেন্যান্ট—মানে, ক্যাপ্টেন রুফুজ। আমি তখন বুক ভরে নিঃশ্বেস নিচ্ছি। থলির মধ্যে থেকে নীল হয়ে গিয়েছিলাম বাতাসের অভাবে।

বিজাতীয় ভাষায় একটা হুকুম ছাড়ল ক্যাপ্টেন।

সঙ্গে সঙ্গে দেহতল্লাস হয়ে গেল আমার। টাকা পয়সা, অস্ত্রশস্ত্র সব কেড়ে নিল। রেখে দিল কিন্তু আমার নাম সই করা পাতায় পাতায় রিপোর্ট লেখা নোট বইটা। অজ মূর্খদের দলে পড়েছি মনে হচ্ছে। সই করা নোট বইয়ের মাহাত্ম্য বোঝে না!

খুলে দেওয়া হল হাত আর পায়ের বাঁধন। আঃ! বাঁচলাম! সঙ্গে সঙ্গে কাজে লাগালাম স্বাধীনতাকে। ঘাড় বেঁকিয়ে দেখে নিলাম চারপাশের দৃশ্য।

কিন্তু একী দেখছি আমি? মাথামুণ্ডু কিছুই তো বুঝছি না!

স্লেজগাড়ীর তলায় যে রকম লোহার পাত থাকে—যাকে বলে স্কেট—সেই রকম বিরাট দুটো স্কেটের ওপর একটা পেল্লায় প্ল্যাটফর্ম। স্কেটের সামনের ডগা নাগড়া জুতোর শুঁড়ের মত ওপর দিকে বাঁকানো। প্ল্যাটফর্মের ওপর জাফরি দিয়ে তৈরী একটা পাইলন—ইস্পাতের কাঠামো—বারো থেকে পনেরো ফুট উঁচু। পাইলনের মাঝামাঝি জায়গায় প্রপেলারের দুটো ব্লেড। পাইলনের মাথায় দুটো (এইরে! আবার গুলিয়ে যাচ্ছে। ঠিক শব্দ মাথায় আসছে না!) দুটো...হাত, দুটো...সমতলপৃষ্ঠ জিনিস, না, না, ঠিক শব্দটা এসেছে এবার মাথায়, জিনিসটাকে দেখতে একটা বকের মত...অতিকায় বক...যেন একপায়ে দাঁড়িয়ে মস্ত ডানা মেলে দিয়েছে দু'পাশে—হ্যাঁ, হ্যাঁ, যুৎসই উপমাটা এবার দিতে পেরেছি...দুটো ডানা ...চকচকে ধাতুর তৈরী দুটো ডানা...প্রায় আঠারো ফুট—মানে, এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তের দৈর্ঘ্য কমসেকম আঠারো ফুট।

চোখের সামনে দেখলাম এই রকম দশটা কলকব্জা। লড়াইয়ের ভঙ্গিমায় যেন শ্রেণীবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে পর-পর। বুঝলাম না এদের দিয়ে কি হবে।

লোকজনের সংখ্যাও দেখলাম নেহাৎ কম নয়। সদ্য ক্যাপ্টেন পদে উন্নীত লেফটেন্যান্ট ল্যাকোর, তার সেই মুখে-চাবি-আঁটা দুই শ্বেতকায় সার্জেন্ট, বিশজন নিগ্রো সৈন্য—এদের আমি চিনি। চিনতে পারলাম না কেবল দশজন নতুন শ্বেতকায়কে। আহারে, কি ছিরি এক একজনের চেহারার! দেখেই ফাঁসীর আসামী মনে হয়!

এদের ঠিক মাঝখানে মাটিতে পড়ে আমার সঙ্গীরা। মিস ব্লেজন কাগজের মত সাদা হয়ে গিয়েছেন। চিৎ হয়ে পড়ে আছেন। চোখ বন্ধ। একদম নড়ছেন না। পাশে ডাক্তার চাতোন্নে আর মালিক। মালিক খুব কাঁদছে। মিস ব্লেজনের গায়ে মাথায় হাত বুলোচ্চে। সেন্ট্ বেরেনের অবস্থা খুবই শোচনীয়। মাটিতে বসে অতি কষ্টে নিঃশ্বেস নিচ্ছেন। ইঁটের মত লাল হয়ে গেছে টাক। বড বড চোখ দুটো কোটর থেকে যেন ঠেলে বেরিয়ে আসছে। বেচারা।

বারজাক আর পঁসি'র অবস্থা অনেক ভাল। সিধে হয়ে দাঁড়িয়ে ব্যায়াম করছেন—হাত পায়ের সন্ধির আড়ষ্টতা ভাঙছেন। আমারও তাই করা উচিত।

কিন্তু টোনগানকে তো দেখতে পাচ্ছি না? ঝটাপটির সময়ে মারা পডেনি তো? আহারে! মালিক অত কাঁদছে বোধহয় সেই কারণেই। মনটা খারাপ হয়ে গেল। বড বিশ্বাসী ছিল লোকটা। তেমনি সাহসী।

উঠে দাঁড়ালাম। খোঁড়াতে খোঁড়াতে মিস ব্লেজনের কাছে গেলাম। কেউ পথ আটকালো না। ক্যাপ্টেন রুফুজ গেল আমার আগে।

ডক্টর চাতোন্নেকে জিজ্ঞেস করল—"মাদামোয়াজেল মোরনাস আছেন কিরকম?"

ও হরি। শ্রীমতি ব্লেজনের সঠিক নামটা তাহলে এখনো জানা নেই ক্যাপ্টেন রুফুজের—ছদ্মনামেই চিনে রেখেছে। ভাল। ভাল।

"এখন একটু ভাল। এই তো, চোখ মেলেছেন," বললেন ডাক্তার।

"রওনা হওয়া যাবে?" ক্যাপ্টেনের প্রশ্ন।

"একঘন্ট্টার আগে তো নয়ই। তারপরেও ঐ রকম বর্বর জানোয়ারের মত নিয়ে যাওয়ায় চেষ্টা আর করবেন না। কেউ আর বাঁচব না," দৃঢ়কণ্ঠে বললেন ডাক্তার।

জবাব না দিয়ে সরে গেল ক্যাপ্টেন। দেখলাম, সত্যিই চোখ মেলেছেন শ্রীমতি। পাশে হাঁটু গেড়ে বসে সেবা করছেন ডাক্তার। একটু পরেই উঠে বসলেন মিস ব্লেজন। পাশে এসে দাঁড়ালেন বারজাক আর পঁসি। ফের এক হলাম দুজনে।

"বন্ধুগণ", আচমকা ঝরঝর করে কাঁদতে কাঁদতে বললেন শ্রীমতি—"আমার জেদের জন্যেই আজ আপনাদের এই অবস্থা ....."

বুঝিয়ে কাজ হল না। হবে না জানতাম। তাই কথার মোড ঘুরিয়ে দিলাম।

বললাম, মিস ব্লেজনকে এই রাস্কেলরা যখন শ্রীমতি মোরনাস নামেই চেনে—আসল নাম জানে না—তখন শ্রীমতি মোরনাস নামেই চিনুক। আসল নাম জানানোর দরকার নেই। ওঁর দাদার চেনাজানা কোনো বিশ্বাসঘাতক সৈন্য এই রাস্কেলদের মধ্যে থাকলেও থাকতে পারে। আসল নাম ফাঁস হয়ে গেলে শ্রীমতির প্রাণহানিও ঘটতে পারে। সুতরাং চেপে যান। সবাই এক মত হলেন। প্রথম থেকে তাঁকে শ্রীমতি মোরনাস নামেই ডাকা হবে।

ভাগ্যিস শলাপরামর্শ করে নিয়েছিলাম। কেননা, কথা শেষ হতে না হতেই ক্যাপ্টেন রুক্‌জের কাটছাঁট অর্ডার তামিল করল শয়তানরা—তিন শয়তান তিনদিক থেকে সাঁড়াশি হাতে চেপে ধরল ঘাড়, বাঁধল হাত আর পা। তার আগে দেখে নিলাম একই হাল হচ্ছে সকলেরই—মিস ব্লেজন, থুড়ি, শ্রীমতি মোরনাসও বাদ যাচ্ছে না। সর্বনাশ, মাজেপ্পার মত ঘোড়ায় ফেলে ফের দৌড় করাবে নাকি?

কিন্তু না। উপুড় করে আমাকে ফেলা হল একটা শক্ত সমতল বস্তুর ওপর। ঘোড়ার পিঠে নয়। অশ্বপৃষ্ঠ ওরকম হয় না। মিনিট কয়েক পরে শুনলাম হাওয়া ঝাপটানোর প্রচণ্ড শব্দ—সেই সঙ্গে এপাশ ওপাশ দুলতে লাগল সমতল বস্তুটা—যার ওপর আমি মুখ থুবড়ে শুয়ে। এক মুহূর্ত পরেই শুনলাম সেই শব্দ—ক্যানক্যানে যা শুনেছিলাম সর্বপ্রথম—ভয়াল গর্জন—কিন্তু এবার তা কানে তালা ধরানো—বিখ্যাত সেই গজরানি এবার যেন কানের পর্দা ফাটিয়ে চৌচির করে দিতে চাইছে—বাড়ছে···সেকেণ্ডে সেকেণ্ডে বেড়ে চলেছে গর্জন-ধ্বনি···দ্বিগুণ···ত্রিগুণ···চৌগুণ···দশগুণ···একশগুণ······সঙ্গে সঙ্গে ভীমবেগে হাওয়া ঝাপটে পড়ছে চোখমুখে···সেকেণ্ডে সেকেণ্ডে বাড়ছে দমকা বাতাসের বেগ! আরও একটা জিনিস টের পাচ্ছি···কি করে বোঝাই ভেবে পাচ্ছি না··· আমি যেন··যেন লিফটে করে উঠে যাচ্ছি···নকল পাহাড়ের উপর দিয়ে খেলন ট্রেনের তীব্রবেগে ওঠানামা করার সময়ে যেমন একটা দম আটকানো অনুভূতি ···একটা হৃৎপিণ্ড খাঁকড়ে ধরা অনুভূতি জাগে···ঠিক সেইরকম শ্বাসরোধী অনুভূতি প্রতিটি অণুপরমাণুতে জাগ্রত হচ্ছে। আমি···আমি কোথায়? কেন এমন হচ্ছে?

মিনিট পাঁচেক চলল শরীর আর মন, কান আর কোষের ওপর এই অত্যাচার। তারপর সয়ে এল। ভারসাম্য ফিরে পেল শরীর। থলির মধ্যে দম আটকানো তমিস্রাময় অন্ধকূপে মুণ্ডু ঢুকিয়ে অজ্ঞানের মত মুখ থুবড়ে পড়ে রইলাম। একটানা কানের পর্দা ফাটানো শব্দটার একঘেয়েমিতে তন্দ্রাচ্ছন্নও

হয়ে পড়েছিলাম।

আচমকা সম্বিৎ ফিরে পেলাম একটা বিস্ময় বোধে। আমার হাতের বাঁধন আলগা। বাঁধন শক্ত নয় বলে হাত নাড়তে পারছি। অর্ধ অচেতন অবস্থায় নড়তে গিয়ে হাত খুলে এনেছি।

হুঁশিয়ার হয়ে গেলাম। কারণ, আমি একা নই। দুজন চোয়াড়ের গলা-বাজি কানে আসছে একজন নিঃসন্দেহে ইংরেজ। সুরাশক্ত ভয়াল কণ্ঠস্বর। অপরজন নিগ্রো। বামবারা ভাষার মিশেল দিয়ে ভেজাল ইংরিজি চালাচ্ছে। গত চারমাস অপূর্ব এইদেশে এই ধরনের আজব ভাষা শুনে শুনে কান পচে গেছে। কাজেই হুঁশিয়ার হলাম। হাতের বাঁধন সরে গেছে যেন টের না পায়।

খুব আস্তে দড়ির ফাঁস থেকে দুটো হাতই বার করে আনলাম। খুব আস্তে পকেট থেকে পেন্সিলকাটা ছুরিটা বার করে খুলে ফেললাম। ছোট্ট ছুরি বলেই ওদের চোখ এড়িয়ে গেছে—অস্ত্র তো নয়। পনেরো মিনিট লাগল শুধু ছুরি খুলতে।

তারপর খোলা ছুরি শরীরের তলা দিয়ে একটু একটু করে টেনে নিয়ে এলাম মুণ্ডুর কাছে। একটা ফুটো করলাম চোখের সামনে।

কি দেখলাম?

অবিশ্বাস্য এক দৃশ্য।

আর একটু হলেই ভয়ে বিস্ময়ে চেঁচিয়ে উঠতাম। মেঝের ফাঁক দিয়ে আমি যা দেখেছি—তা রয়েছে পাঁচশ গজ নিচে। পৃথিবী পৃষ্ঠ রয়েছে পাঁচশো গজ নিচে।

বুঝলাম। চক্ষের নিমেষে অবিশ্বাস্য সত্যটা ঝলসে উঠল মস্তিষ্ক দিগন্তে। উড়ুক্কু যন্ত্রে রয়েছি আমি। এক্সপ্রেস ট্রেন কি তারও বেশী গতিবেগে শূন্য দিয়ে উড়ে চলেছে মেশিনটা!

শিউরে উঠলাম। চোখ খুলেই মুদে ফেললাম। আতংকে অবশ হয়ে গেলাম। এ কাদের পাল্লায় পড়লাম আমি?

ভয় সয়ে গেল একটু একটু করে। ফের চোখ খুললাম। ফাঁক দিয়ে দেখলাম ভীষণ বেগে পৃথিবীপৃষ্ঠ সরে যাচ্ছে পেছনে। কতবেগে উড়ছি আমরা? মাথা ঘুরছে গতিবেগে। ঘন্টায় একশ না দু'শ? তারও বেশী মনে হচ্ছে। পাঁচশ গজ নীচে জমির চেহারা দেখছি মরুভূমির মন। নুড়ি মিশোনো বালি। মাঝে মাঝে বেশ কিছু তাল জাতীয় শাখাহীন বামন বৃক্ষ। উষর ভূমি। বন্ধ্যা।

কিন্তু মরুভূমি কি সুজলা শস্য শ্যামলা হয়? গাছগুলোর রঙ এমন উজ্জ্বল সবুজ কেন? কেন নুড়ির ফাঁকে ফাঁকে সবুজ ঘাসের এমন সমারোহ? বৃষ্টি হয় না কি এখানকার মরুভূমিতে?

তাকিয়ে থাকতে থাকতে দেখলাম একই রকম উড়ুক্কু মেশিন পায়ের নীচে। আওয়াজ শুনে বুঝলাম মাথার ওপরেও উড়ছে উড়ুক্কু মেশিন। উড়ন্ত কল বানিয়েছে এরা। কব্জায় এনেছে বিচিত্র ভয়ংকর উড়ন্ত কলের পাখী তৈরীর মন্ত্রগুপ্তি। এককালে যা উপকথা ছিল—সুপ্রাচীন ইকারাসের সেই কিংবদন্তীকে আশ্চর্য কৌশলে সত্য করে তুলেছে—বাহন করেছে কলের পাখীকে।

ছোট্ট ফাঁক খুব বেশী দেখা যাচ্ছে না। ধাতুর চাদরের ফাঁকে একটি মাত্র চোখের দৃষ্টি দিয়ে তা সত্ত্বেও বহুদূর পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছি কেবলমাত্র পাঁচ শ' গজ উচ্চতার দরুন।

ঘণ্টাখানেক পর মরুদ্যানের পর মরুদ্যান চোখে পড়ল। আকারে ছোট—কিন্তু সংখ্যায় অগণন, যেন টর্নেডো ঝড়ের মত দৃষ্টিপথে এসেই মিলিয়ে যেতে লাগল একে একে। প্রথম সারি। দ্বিতীয় সারি। তৃতীয় সারি।

প্রত্যেকটা মরুদ্যানের মধ্যে একটা বাড়ী। উড়ুক্কু মেশিনের বিকট আওয়াজ শুনে প্রতিটি বাড়ী থেকে বেরিয়ে আসছে এক একজন লোক। মুঠো নাড়ছে আমাদের দিকে—যেন পেলে ছিঁড়ে খায়। কেন? কি করেছি আমরা? তাছাড়া প্রতিটা বাড়ীতে শুধু একজন লোকই থাকে? বেশী না?

আরও একটা ব্যাপার দেখে প্রথমে খটকা লেগেছিল, তাজ্জব বনে গেলাম। প্রথম মরুদ্যানের পর থেকেই সারি সারি খুঁটি চোখে পড়েছিল। তার পাতা রয়েছে সারি সারি খুঁটির ওপর। এই খুঁটির লাইন ধরেই উড়ে চলেছে আমাদের মেশিন। ব্যাপার কি? স্বপ্ন দেখছি নাকি? টেলিগ্রাফ, না, টেলিফোন? সাহারা মরুভূমিতে?

তৃতীয় মরুদ্যান সারি পেরিয়ে আসবার পর বিস্ময়ে চরমে উঠল। এবার আর শুধু তাল জাতীয় পাম-ট্রি নয়, বাবলা, বাওবাব, ক্যারাইট গাছ দেখছি পায়ের তলায়। সেই সঙ্গে দেখছি চাষের মাঠ। সবুজ ক্ষেতে লাঙল দিচ্ছে নিগ্রোরা। তারপর দিগন্তে চোখে পড়ল বিরাট উঁচু পাঁচিল। ধেয়ে চলেছি ঐ পাঁচিলের দিকেই। অজানা একটা শহর। বিশাল দানব পাখীর মত আমাদের উড়ুক্কু যান নামবে নিশ্চয় ঐ শহরেই। আধখানা চাঁদের মত সাজানো শহর। নিখুঁত নক্সায় নির্মিত অত্যদ্ভুদ শহর। রাস্তাগুলো সব অর্ধবৃত্তের ঠিক কেন্দ্রে ছুটে গিয়েছে। মাঝের অংশে লোকজন নেই বললেই

চলে। সবে তো সকাল—অথচ মাত্র কয়েকজন নিগ্রোকে দেখা যাচ্ছে। মাথা তুলে উড়ুক্কু যান দেখেই বিষম ভয়ে কুঁড়ের মধ্যে লুকিয়ে পড়েছে। বাইরের অংশে লোকজন অনেক। বেশীর ভাগ শ্বেতকায়। এরাও ওপর দিকে তাকিয়ে মুঠো নাড়ছে। এত আক্রোশ কেন আমাদের ওপর? কার পাকা ধানে মই দিয়েছি?

উড়ুক্কু যান এবার নামছে—দ্রুতবেগে নামছে। একটা নদী পেরিয়ে এলাম। পর মুহূর্তেই যেন পাথরের মত টুপ করে খসে পড়ল কলের পাখী। চক্রাকারে নামছি—তাই মাথা ঘুরছে—হৃদ্‌পিণ্ডটা পাল্টি খেয়ে গলার কাছে এসে ঠেকেছে—চোখ বন্ধ করলাম।...

প্রপেলারের গর্জন থেমেছে। মাটি ছুঁয়েছে উড়ুক্কু মেশিন। মাটির ওপর দিয়ে ঘসটে গেল কয়েক গজ। দাঁড়াল তারপর।

এক ঝটকায় মুণ্ড থেকে থলি সরিয়ে নিল একজন। তার আগেই হাত সরিয়ে নিয়েছিলাম। দড়ির বাঁধনে হাত ঢুকিয়ে দিয়েছিলাম।

কিন্তু বাঁধন খুলতে এসে দড়ি আলগা দেখেই ইংরিজিতে হুঙ্কার ছাড়ল এক রাস্কেল—"কে বেঁধেছে এত আলগা করে?"

পড়ে রইলাম মটকা মেরে।

হাতের পর খোলা হল পায়ের বাঁধন। নাড়িয়ে বাঁচলাম পা জোড়া।

"উঠে দাঁড়ান!"

হুকুম যে দিল, তার মুখশ্রী দেখতে পেলাম না। উঠে দাঁড়াতে গিয়েও টলে পড়ে গেলাম। পায়ে রক্ত চলাচল হতে এখনো সময় লাগবে।

কোনমতে দাঁড়ালাম সিধে হয়ে। দৃষ্টি সঞ্চালন করলাম সামনে। বিরাট উঁচু পাঁচিল। পেছনেও তাই। জানলা দরজা, ফুটোফাটা, ছেঁদা বা ঘুলঘুলির বালাই নেই। বাঁদিকেও সেই একই নিরন্ধ্র প্রাচীর। তার ওপাশে একটা মস্ত টাওয়ার আর চিমনি। ফ্যাক্টরী নাকি? আকাশ ছোঁয়া একটা পাইলনও দেখেছি—কি বিরাট উঁচু—যেন মেঘের কোলে গিয়ে পৌঁছেছে! টাওয়ারের ওপরেও একশ গজ উঁচু তো বটেই। এরকম আখাম্বা পাইলনেরও বা কি দরকার, মাথায় আসছে না।

ডান দিকের দৃশ্য অন্যরকম—খুব একটা আকর্ষণীয় নয়। চিত্ত চঞ্চল হওয়ার মত নয়। দুটো প্রকাণ্ড ইমারত। দুটোর সামনে একটা পাহাড়ের মত কেল্লা বাড়ী।

টোনগানে আর মালিক ছাড়া সঙ্গীরা সবাই হাজির। মালিক গেল

কোথায়? সকালেও তো দেখেছি।

সঙ্গীদের চোখ ধাঁধিয়ে গেছে হঠাৎ আলোয় চোখ মেলায়। আমি তো লুকিয়ে সব দেখেছি। ওঁরা সে সুযোগ পান নি।

ওঁদের চোখ রগড়ানো শেষ হওয়ার আগেই রদ্দা পড়ল ঘাড়ে। কেউ বাদ গেল না। মিনিট খানেক পরেই বন্দী হলাম কারাগারে।

কিন্তু এরা কারা? আমরা কোথায়? কি করতে চায় এরা আমাদের নিয়ে?

৩ ॥ অত্যাচারী স্বেচ্ছাচারী সেই লোকটা

(অ্যামিদী ফ্লোরেন্সের নোটবই থেকে)

২৬শে মার্চ।—জেলখানায় বসে লিখছি। মাজেপ্পার ভূমিকা অভিনয় করার পর এখন সিলভিও পেলিকোর ভূমিকা অভিনয় করছি—সেই সিলভিও, গুপ্ত সমিতির কারবোনারির সঙ্গে জড়িত থাকার অপরাধে যার দশ বছর জেল হয়েছিল এবং যার কাহিনী নিয়ে নাটক লিখেছিলেন লর্ড বায়রনের এক ইটালিয়ান নাট্যকার ও কবি বন্ধু।

পরশুর আগের দিন দুপুরের একটু আগে জেলখানায় ঢুকেছি। তিনজন মুলাটো, মানে, শ্বেতকায় আর নিগ্রোর সংসর্গজাত দোআঁসলা—ঘাড় ধরে আসুরিক বলে আমাদের টেনে এনেছে এখানে। একদম খাতির করে নি। অনেক সিঁড়ি, অনেক অন্ধকার গলিপথ পেরিয়ে এসেছি একটা লম্বা গ্যালারীতে। গ্যালারীর দুপাশে সারি সারি কারাকক্ষ। একটিতে ঠাঁই হয়েছে আমার। পালানো সহজ নয়। গ্যালারীর দুপ্রান্তে বন্দুকধারী শান্ত্রী পাহারা দিচ্ছে।

ঘরে একটাই জানলা। বারো ফুট উঁচুতে। গরাদ দিয়ে মজবুত। দরজায় তিনটে তালা। একলা ঘরে বসে ভাবছি আর ভাবছি।

ঘরটা বেশ বড়। একটা টেবিল আর চেয়ার আছে। আছে স্যাৎসেঁতে খড়ের বিছানা পাতা একটা খাট। টেবিলে লেখার সরঞ্জামও আছে। কড়ি কাঠ থেকে ঝুলছে ইলেকট্রিক ল্যাম্প! তাকে কিছু প্রসাধনী সামগ্রী। সব-কিছুই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন।

সিগারেট ধরিয়ে আকাশপাতাল ভাবতে ভাবতে দু'ঘণ্টা পার করে ফেলেছি। সম্বিৎ ফিরল দরজা খোলার শব্দে। ঘরে কে ঢুকল ভাবতে

পারেন ? হাজার কল্পনা দিয়েও আন্দাজ করতে পারবেন না।

চৌমৌকি।

সেই চৌমৌকি, বিশ্বাসঘাতক নিগ্রো। আমার প্রবন্ধগুলো যে ঘোড়ার পিঠে গুঁজে রেখে লম্বা দিয়েছিল নিশুতি রাতে।

দেখেই মাথায় রক্ত চড়ে গেল আমার। 'তবে রে' বলে তেড়ে যেতেই দড়াম করে মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে করে দিল হারামজাদা।

সামলে নিলাম নিজেকে। রাগ দেখিয়ে লাভ কি ? বরং ওর মুখেই খবর নেওয়া যাক। চৌমৌকিও বোধ হয় আঁচ করেছিল আমার মনের অবস্থা। ফের দরজা ফাঁক করে উঁকি দিল যখন আমি তখন ফের গ্যাঁট হয়ে বসেছি চেয়ারে।

বসে বসেই আগে একচোট ঝাল ঝেড়ে নিলাম। 'মুখেন মারিতং জগৎ' গোছের ! তারপর শুনলাম, চৌমৌকি এখানকার চাকর। খাবার নিয়ে এসেছে।

লজ্জায় মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে দরজাটা আরো খুলে ধরল বিশ্বাসঘাতক ; খাবার নিয়ে করিডরে দাঁড়িয়েছিল দুজন নিগ্রো। টেবিলে খাবার সাজিয়ে দিল চৌমৌকি।

পেটে যে আগুন জ্বলছে. খাবার দেখেই তা খেয়াল হল। উচ্চবাচ্য না করে আক্রমণ করলাম খাদ্যসম্ভার।

রান্না ভালই। চৌমৌকির পবিবেশনও ভাল।

খেতে খেতে জিজ্ঞেস করে যা জানলাম, তা এই :

ইচ্ছে না থাকলেও যার অতিথি হয়েছি, লোকে তাকে হ্যারি কীলার বলেই জানে। দোর্দণ্ড-প্রতাপ রাজা। অসাধারণ এক শহরের মালিক সে। অনেক বাড়ী, অনেক সাহেব এখানে। অবিশ্বাস করা গেল না। উড়ুক্কু মেশিনে উপুড় হয়ে শুয়ে সবই তো দেখতে দেখতে এসেছি।

চৌমৌকির বিশ্বাস, কায়দা করে তাকে শ্রীমতি মোরনাসের কাজে বহাল করিয়েছে এই হ্যারি কীলার। চৌমৌকি সঠিক জানে না—তবে মনে হয়। শ্রীমতি মোরনাসের প্রতি আনুগত্য তার এখনো শিথিল হয়নি। যদ্দিন উনি ঐ টেকো লোকটাকে (সেন্ট বেরেন) নিয়ে আফ্রিকায় থাকবেন, তদ্দিন চৌমৌকি তাঁদের সেবাদাস হয়ে থাকবে। নুন খেয়ে বেইমানি করবে না। কথাটা শুনে হাসবো কি কাঁদব ভেবে পেলাম না।

মোরিলিরেই চৌমৌকিকে ভাগিয়ে আনে। হ্যারি কীলারের নিজের লোক

সে। প্রথমে সোনা দিয়ে কিনতে চেয়েছিল চৌমৌকিকে। যখন পারল না, তখন লোভ দেখাল চির-স্বাধীনতার। এমন একটা সোনার দেশে নিয়ে যাবে যেখানে অঢেল আরাম আর দেদার ফুর্তি। হ্যারি কীলার যেন দেবতা সেই ভূস্বর্গের। শুনে আর লোভ সামলাতে পারেনি চৌমৌকি।

টোনগানে কোথায় জিজ্ঞেস করতেই মুখটা বীভৎস করে ফেলল চৌমৌকি। শুধু বলল—'কুঈক্‌!!"

বুঝলাম। যা আঁচ করেছিলাম, তাই হয়েছে। টোনগানে আর ধরাধামে নেই

যে রাতে অদৃশ্য হয় চৌমৌকি, সেই রাতেই কলের পাখী চড়ে ক্যাপ্টেন এডোয়ার্ড রুফুজ আসে সেই তল্লাটে। তাই অত ফিটফাট বাবুর মত দেখাচ্ছিল তাকে। সার্জেন্ট দুজন বিশজন নিগ্রো সৈন্য নিয়ে পায়ে হেঁটে এসেছিল বলেই ঐ রকম নোংরা অবস্থায় ছিল। কাঁধে বিস্ফোরক বুলেট লাগায় জখম নিগ্রোটা সার্জেন্টকে দেখেই শিউরে ওঠারও কারণটা শুনলাম। আসার পথে স্রেফ মজা করার জন্যে গ্রামের পর গ্রাম লুঠ করে এসেছিল সার্জেন্ট দুজন। নিগ্রোবেচারা তাই চিনে ফেলেছিল ওকে। কলের পাখী চেপে ক্যাপ্টেন রুফুজ পৌঁছোনোর পর, সেই পাখীর পেটে চড়ে চৌমৌকি আসে এখানে। তাই অত কাছ থেকে গর্জনটা শুনেছিলাম আমি।

অতি কষ্টে একটা নাম উচ্চারণ করল চৌমৌকি—ব্ল্যাকল্যাণ্ড। আশ্চর্য নগরী ব্ল্যাকল্যাণ্ডেই আমি এখন রয়েছি। বিশ্বের কোনো ভৌগলিক যদিও এ টাউনের হদিশ রাখেন না।

সব শোনবার পর ঘুষ দিয়ে চৌমৌকিকে বশ করতে চাইলাম। মোটা টাকার লোভ দেখালাম। মাথা নেড়ে ও বললে—"সম্ভব নয় সাহেব। এখান থেকে কেউ বেরোতে পারে না। পাঁচিলের পর পাঁচিল, তারপর মরুভূমি দিয়ে ঘেরা। বন্দুক নিয়ে পাহারাদার ঘুরছে।"

তাহলে কি জীবন-ভোর এখানে থাকতে হবে?

খাওয়া শেষ হল। এঁটোকাঁটা নিয়ে চৌমৌকি চলে গেল, এল আবার রাতে। খাওয়ার পর নটা বাজতেই ইলেকট্রিক ল্যাম্পটা গেল নিভে।

কড়া নিয়ম দেখছি। বাধ্য হয়ে ঘুমের আয়োজন করলাম। পরের দিন ২৫শে মার্চ নোটবইয়ের পাতাগুলোয় চোখ বুলোলাম, চৌমৌকি ছাড়া সারাদিন কাউকে দেখলাম না। রাত্রে নটার আগেই শুয়ে পড়লাম—আলো নেভবার আগেই। পরের দিন—আজ—২৬শে মার্চ বেশ ঝরঝরে বোধ

করছি। দুরাত ঘুমিয়ে শরীর এখন তাজা তারপর?

সন্ধ্যায়।—হিজ ম্যাজেস্টি হ্যারি কীলারকে দেখার সৌভাগ্য হয়েছে। ধাক্কা কাটিয়ে উঠতে পারিনি এখনো। গা হতে পা কাঁপছে। শিহরণ সর্বাঙ্গে! মন অবশ।

তিনটের একটু পরেই ফের দরজা দু'হাট হল। চৌমৌকি আসেনি, এসেছে আর এক পুরোনো বন্ধু—বিশ্বাসঘাতক মোরিলিরে। সঙ্গে বিশজন নিগ্রো। মোরিলিরেই এদের সর্দার মনে হল।

সেন্ট বেরেন ছাড়া সঙ্গী সাথীদের দেখলাম তাদের মধ্যে। সেন্ট বেরেন বেতো মাজা নিয়ে এখনো কুপোকাৎ।

মার্চ করিয়ে আমাদের নিয়ে যাওয়া হল অনেক সিঁড়ি, অনেক গলিপথ পেরিয়ে একটা বিরাট ঘরে। মোরিলিরে দলবল নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল বাইরের চাতালে।

ঘরটা বিরাট। কিন্তু আসবাব পত্র বলতে কেবল একটা চেয়ার, একটা টেবিল আর একটা টুল। টুলের ওপর আধ বোতল মদ আর একটা গেলাস। মদের গন্ধ বাতাসে।

চেয়ারে বসে একটা নররূপী পিশাচ। হিজ ম্যাজেস্টি হ্যারি কীলার। দেখবার মত মূর্তি।

গালে চুল নেই একদম। কিন্তু মাথাভর্তি ঝাঁকড়া জটা—জন্ম মুহূর্ত থেকে চিরুনীর সঙ্গে লড়াইয়ে অপরাজিত।

বয়স পঁয়তাল্লিশ মনে হলেও নিশ্চয় তার বেশী। বেশ ঢ্যাঙা। ষাঁড়ের মত গতর। হাত কলাগাছ বললেই চলে। ডুমো ডুমো পেশী। গায়ে হারকিউলিসের জোর ধরে—এক নজরেই বোঝা যায়।

গালে যার চুল-নেই—সে জটিল চরিত্রের মানুষ, তা কি আর বলে দিতে হবে? একাধারে পাকা শয়তান আর হাতীর মত বলবান। মাথার কেশরে পাক ধরেছে। কপাল বেশ উন্নত—প্রচণ্ড ধীশক্তির লক্ষণ। কিন্তু ঠেলে বার করা চোয়াল আর চোয়াড়ে চোকো ভারী চিবুকের মধ্যে স্থূল আর উগ্র প্রবৃত্তির ছাপ হনু উঁচু—হাড় যেন ঠেলে বেরিয়ে আসছে। ব্রোঞ্জ-রঙীন হনুর ঠিক নিচেই গলা ভেঙে তুবড়ে ভেতরে বসে গেছে—দু'দলা মাংস ঝুলছে হনুর ঠিক নিচেই—তাতে আবার ফুটকি ফুটকি রক্ত লাল ব্রন—রক্ত যেন টুসটুসিয়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে। ঠোঁটজোড়া বিশ্রীরকমের মোটা। বিশেষ করে নিচের ঠোঁটটা ওজন সামলাতে না পেরে ঝুলছে থলথলিয়ে—বেরিয়ে পড়েছে

হলদেটে নোংরা শক্ত দাঁতের সারি। কোটরে ঢোকানো চোখ জোড়া খোঁচা খোঁচা চক্ষু পল্লব দিয়ে মোড়া—কিন্তু থেকে থেকে তার মধ্যে বিদ্যুতের ঝলক দেখা যাচ্ছে। সহ্য করা যায় না সেই দ্যুতি—এত উগ্র, অসাধারণ, ভয়াবহ।

লোকটার অনু পরমাণুতে প্রচণ্ড ক্ষুধা, নরকের সমস্ত পাপ, আর শ্রীহীনতা প্রকট হয়েছে পা থেকে মাথা পর্যন্ত। কদাকার, এবং ভয়াবহ।

হিজ ম্যাজেস্টির পরনে ধূসর রঙের শিকারী পোশাক। কিন্তু ধূলি-ধূসরিত এবং নানান রঙের দাগে চিত্রিত। সামনের টেবিলে উলের হ্যাট। হ্যাটের পাশে ডান হাত। কাঁপছে এক নাগাড়ে।

চোখের ইঙ্গিতে কম্পমান হাত দেখিয়ে চোখের ভাষায় ডক্টর চাতোন্নে যা বলতে চাইলেন, তা বুঝলাম। লোকটা অত্যধিক মদ খেয়ে এখন বেহেড মাতাল।

বেশ কিছুক্ষণ নির্বাক রইল হিজ ম্যাজেস্টি। পিচ্ছিল চোখের দৃষ্টি দিয়ে নিরীক্ষণ করল আমাদের পা থেকে মাথা পর্যন্ত। একবার নয়—বারবার—প্রত্যেককে। আমরাও ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে লাললাম মহামান্যের বাণী শোনবার জন্যে।

অবশেষে মুখ খুলল হ্যারি কীলার। বলল ফরাসীতে—কিন্তু বেশ ইংরাজী টানে—ভাঙা ভাঙা খ্যাড়খেড়ে গলায়—"ছজন ছিলেন শুনলাম—পাঁচজন এসেছেন কেন ?"

"একজনের অবস্থা কাহিল—আপনাদের অত্যাচারে।" সটান জবাব দিলেন ডক্টর চাতোন্নে।

আবার কিছুক্ষণ নীরবতা। তারপর আবার আচমকা একটা প্রশ্ন :

"আমার দেশে এসেছেন কি মতলবে ?"

এই রকম একটা থমথমে রক্ত জমানো পরিবেশেও প্রশ্ন শুনে হাসি পেল। আমরা এসেছি ? না, তুমি আনিয়েছো বাছাধন ?

হ্যারি কীলার জ্বলন্ত চোখে তাকিয়ে গর্জে উঠল আবার—"স্পাইগিরি করতে ? অ্যাঁ ?"

বারজাক বললেন—"মাপ করবেন, স্যার—"

দড়াম ! প্রচণ্ড শব্দে টেবিলে ঘুসি মারল হিজ ম্যাজেস্টি। বলল সেই বজ্রনাদ কণ্ঠস্বরে—"বলুন 'মাস্টার' ! সবাই বলে।"

আর যায় কোথা ! বারজাক খেল দেখিয়ে দিলেন তক্ষুনি। তিনি যে কত বড় বক্তা, তা ঐ পরিবেশেও নাটকীয়ভাবে ফুটিয়ে তুললেন। বুকের

ওপর হাত রেখে ডান হাতে বাতাস কেটে উড়িয়ে দিয়ে বললেন উদাত্ত বজ্র-কণ্ঠে—"সতেরোশ' উনব্বই সালের পর থেকে ফরাসীরা কাউকে 'মাস্টার' বলে ডাকে না।"

অন্য সময় হলে এই নাটক দেখে হাসতে হাসতে পেটে খিল ধরে যেত। কিন্তু তখন ঐ রকম একটা দাঁতালো জানোয়ারের দাঁত খিচুনির সামনে এত সাহস দেখানো সোজা কথা নয়। এক কথায় উনি বুঝিয়ে দিলেন, 'বাপু হে, তুমি যেই হও না কেন—আমরা ফরাসী। মাথা নোয়াব না।' মঁসিয়ে পঁসি পর্যন্ত বিচলিত হলেন এই সাহসিকতায়। উত্তেজনার চোটে মুখের তালা-চাবি খুলে হেঁকে উঠলেন বিষম খ্যানখেনে গলায়—"স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় বলো কে বাঁচিতে চায়।"

সাবাস পঁসি! ওষুধ ধরল

হ্যারি কীলার শুধু কাঁধ ঝাকালো। দাবড়ানিতে কাজ হবে না বুঝতে পেরেছে। যেন আমাদের আগে দেখেনি—এইমাত্র দেখছে। এমনিভাবে আশ্চর্য ক্ষিপ্র দৃষ্টি বুলিয়ে চলল পা থেকে মাথা পর্যন্ত। প্রত্যেককে বার কয়েক চুলচেরা দেখার পর চাহনি স্তব্ধ হল বারজাকের ওপর। দুই চোখে বিভীষিকা বর্ষণ করে যেন আতংকে সিঁটিয়ে দিতে চাইল বারজাককে। কিন্তু সাহস বটে আমাদের লীডারের। এতটুকু কুণ্ঠিত হলেন না—শিউরে উঠলেন না। সাবাস লীডার! দিনে দিনে ভক্তি উথলে উঠছে আপনার ওপর!

হিজ ম্যাজেস্টি আত্মসংবরণ করেছে। খড়ের আগুন। এই জ্বলছে, এই নিভছে।

প্রশ্ন করল কামানের গোলার মত—"ইংরিজি বলা হয়?"

"হ্যাঁ।"

"সবাই বোঝে?"

"হ্যাঁ।"

"ভাল", বলে মদের নেশায় জড়িত গলায় টেনে টেনে ইংরিজিতে ফের একই প্রশ্ন করল হ্যারি কীলার।

"কি মতলবে এসেছেন এখানে?"

"প্রশ্নটা আমরা করতে চাই আপনাকে। গায়ের জোরে ধরে আনার কি অধিকার আছে আপনার?" বারজাক যেন বাঘের বাচ্চা।

"চালাকি ধরে ফেলেছি বলে। আমি জ্যান্ত থাকতে আমার সাম্রাজ্যের ধারে কাছে কাউকে ঘুর ঘুর করতে দোব না!"

সাম্রাজ্য !

হ্যারি কীলারের সাম্রাজ্য ? বলে কী ?

তড়াক করে লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠল হিজ ম্যাজেস্টি। দমাদম করে টেবিলে ঘুসি মারতে মারতে বললে—"ভেবেছেন আপনাদের মতলব আমি বুঝতে পারিনি ? টিমবাকটু পর্যন্ত ফরাসীরা এসে নাইজারে লোক পাঠাচ্ছে যখন তখন। কিছু বলিনি। এখন চর পাঠানো হয়েছে আমার এলাকায় ! জানেন আপনাদের এই কাঁচের গেলাসের মত ভেঙে গুঁড়িয়ে দিতে পারি ?"

বলেই হাতের কাছে গেলাস তুলে নিয়ে ঝনঝন শব্দে আছড়ে গুঁড়িয়ে দিল হ্যারি কীলার।

হুংকার ছাড়ল দরজার দিকে তাকিয়ে—"আর একটা গেলাস !"

দেখলাম, ফেনা গড়াচ্ছে হ্যারি কীলারের কষ বেয়ে। উন্মত্ত ক্রোধ পশুর চাইতেও অধম করে তুলেছে। তাকিয়ে দেখা যাচ্ছে না। রক্তলাল চোখ, লাল টুকটকে মুখ আর চোয়াড়ে চোয়ালে প্রকটিত জিঘাংসার বর্ণনা পৃথিবীর কোনো ভাষায় সম্ভব নয়।

হন্তদন্ত হয়ে গেলাস নিয়ে ঢুকল ব্ল্যাকগার্ড। ফিরেও তাকালো না হ্যারি-কীলার। যেন ঘোরের মধ্যে রয়েছে, এমনিভাবে ঝুলে পড়ে দুহাতে টেবিলে দমাদম ঘুসি মারতে মারতে বারজাকের অবিচল মূর্তির দিকে জ্বলন্ত চোখে তাকিয়ে যেন নায়গারার বজ্রনাদ শুনিয়ে গেল এক্সপ্রেস ট্রেনের স্পীডে।

"বারবার হুঁশিয়ার করেছি···খেয়াল আছে – 'ডোঙং-কোনো' বিষের ব্যাপারটা আপনাদের মাথায় আমিই ঢুকিয়েছিলাম আপনাদেরই মঙ্গলের জন্যে সেই হল প্রথম ওয়ার্নিং। গুণিনকে দিয়ে আমিই সাবধান করতে চেয়েছিলাম আপনাদের। তার সব কথাই সত্যি হয়েছে শুধু আপনাদের নিজেদের দোষে। আমার দাস মোরিলিরেকে আমিই পাঠিয়েছিলাম সিকাসোতে আপনাদের পথ আটকানোর জন্যে—সেই হল গিয়ে আমার শেষ চেষ্টা। তারপর সৈন্যসামন্ত সরিয়ে নিলাম—টনক নড়ল না আপনাদের। না খাইয়ে রাখলাম, তবুও সুমতি হল না। নাইজারের ভেতরে ঢুকতে লাগলেন একটু একটু করে। নাইজারে এসেছেন—এবার কি বলবেন কর্তাদের ?"

রাগের চোটে তখন ঘরময় ছুটছে আর চেঁচাচ্ছে হ্যারি কীলার। উন্মাদ, উন্মাদ, হ্যারি কীলার বদ্ধ পাগল—নইলে এরকম লম্ফঝম্প কেউ করে ?

আচমকা দাঁড়িয়ে গেল হিজ ম্যাজেস্টি। আশ্চর্য শান্ত স্বরে জিজ্ঞেস করল বারজাককে—"আপনারা তো 'সায়ে' যাচ্ছিলেন ?"

"হ্যাঁ।"

"তাহলে হঠাৎ উল্টোদিকে গেলেন কেন? কৌবোতে গেলেন কেন?"

চাহনি তো নয়, যেন গনগনে শিক। বারজাককে এফোঁড় ওফোঁড় করে প্রশ্নটা আচমকা ছুঁড়ে দিল হ্যারি কীলার। হকচকিয়ে গেলাম আমরা সকলেই। ভাগ্যিস শ্রীমতি মোরনাসের আসল নাম গোপন রেখেছিলাম।

যুৎসই জবাব এসে গেল বারজাকের মুখে—"টিমবাকটু যাচ্ছিলাম।"

"সিকাসোতে গেলেন না কেন? কাছে হত তো?"

"ভেবে দেখলাম টিমবাকটু গেলেই সুবিধে বেশী।"

"হু-উ-উ-ম!" সন্দেহ যেন যায়নি হ্যারি কীলারের মন থেকে। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ফের জিজ্ঞেস করল—"তাহলে নাইজারের পূবে যাওয়ার মতলব ছিল না?"

"একেবারেই না।"

"ইস্! আগে যদি জানতাম, তাহলে আর এতদূর আসতে হত না আপনাদের।"

আহারে, কি ঠাট্টা! গা জ্বলে গেল আমার।

সুযোগটা কিন্তু ছাড়লাম না। আমি খবর সংগ্রহ করি। যুক্তির ব্যাপারে মাথা খুব সাফ। তাই জিজ্ঞেস করলাম গলায় মিছরি মিশিয়ে অসীম বিনয় দেখিয়ে:

"মাপ করবেন। একটা কৌতূহল। এত কষ্ট করে এখানে না এনে আমাদের খতম করে দিলেই তো পারতেন।"

"তাহলে ফরাসী সরকারের টনক নড়ত।"

"এখনো তো নড়বে।"

"সেইজন্যেই তো আনতে চাইনি—ফিরিয়ে দিতে চেয়েছিলাম।" উপস্থিত বুদ্ধির অভাব নেই দেখছি হ্যারি কীলারের।

বললাম—"এখনো তা করা যায়। যেখান থেকে এনেছেন সেখানে ফিরিয়ে দিন—"

"আর দেশে গিয়ে আমার সাম্রাজ্যের খবর ছড়িয়ে দিন। অসম্ভব। ব্ল্যাক-ল্যাণ্ডে যে ঢোকে, সে আর বেরোয় না! এ সাম্রাজ্যের খবর কেউ জানে না—জানবেও না।"

দাবড়ানিতে টললাম না। বললাম—"কিন্তু তদন্ত অভিযান আসবেই।"

"তা আসবে। আমার ল্যাজে পা দিলে লড়াইও হবে—আমিই জিতব।

কিন্তু আমি চাইছি অন্যভাবে কাজ হাসিল করতে।"

"কিভাবে?"

"জামিন থাকুন—আপনাদের লাশের চাইতে তাতে কাজ বেশী হবে।"

বুঝলাম, আমাদের নিকেশ করার অভিপ্রায় নেই হ্যারি কীলারের। ভাল!

হিজ ম্যাজেস্টি ফের বসেছে চেয়ারে। কখনো ফুঁসছে কখনো গলছে। এখন বলল বরফ ঠাণ্ডা গলায়—"আমার এলাকায় যখন এসে পড়েছেন, যা খুশী করতে পারি আপনাদের নিয়ে। কাউকে জবাবদিহি করতে হবে না। অথবা আমার মতই যেখানে খুশী ঘুরে বেড়াতে পারেন আমার এই সাম্রাজ্যের মধ্যে।"

আবার সেই সাম্রাজ্য শব্দ! শব্দটায় কৌলিন্য পর্যন্ত নষ্ট হয়ে গেল শয়তানের জিভ দিয়ে বেরিয়ে।

"আপনাদের স্বাধীনতা পাওয়া নির্ভর করছে আপনাদেরই ইচ্ছের ওপর। হয় জামিন হয়ে থাকুন, নয়—"

শেষ কথাটা কিম্ভূত ভঙ্গিমায় হাত নেড়ে শেষ করল হ্যারি কীলার—"আমার সহযোগী হয়ে যান।"

আমরা বজ্রাহত! প্রস্তাব শুনে অবাক হয়েছি বললেও কম বলা হবে—আমরা যেন বজ্রপাতে নিপাত হয়ে এক প্রস্তাবেই।

শীতল স্বরে বুঝিয়ে হ্যারি কীলার—একদিন না "একদিন আমার সাম্রাজ্যের সন্ধান পাবে ফরাসী বাহিনী। তখন যুদ্ধ হবে। তারা হারবে। খামোকা শক্তিক্ষয় কি বন্ধ করা যায় না? এখন তারা নাইজারে কলোনী করা নিয়ে ব্যস্ত—আমি ব্যস্ত বালির সমুদ্রে চাষবাস নিয়ে। দুই রাষ্ট্রের মধ্যে আঁতাত হলে মন্দ কি? মৈত্রীচুক্তি হোক—ঠিকমত আলোচনা চালালে তা হবেই।"

আমাদের সবার মত এক কথায় প্রকাশ করে দিলেন বারজাক।

"আপনার সঙ্গে?"

ব্যস, অনেকক্ষণ ঠাণ্ডা ছিল হ্যারি কীলার। আর রাখা গেল না। যেন দুম করে ফেটে উড়ে গেল আগ্নেয়গিরির চূড়া।

"খুব যে তাচ্ছিল্য করছেন দেখছি? নাকি ভেবেছেন পালিয়ে বাঁচবেন? অত সোজা নয় পালানো—আসুন দেখিয়ে দিচ্ছি।"

তৎক্ষণাৎ আমাদের ঘাড় ধরে অনেক সিঁড়ি, অনেক গলিপথ আর ছোট ছাদ পেরিয়ে টেনে নিয়ে যাওয়া হল একটা বিরাট ছাদের ওপর। হ্যারি কীলার এল সঙ্গে সঙ্গে। আবার বেশ ঠাণ্ডা। উত্তাপের লেশমাত্র নেই।

বললে—"একশ বিশ ফুট ওপরে দাঁড়িয়ে আছেন আপনারা। দিগন্ত এখান থেকে পনেরো মাইল দূরে। দেখতেই পাচ্ছেন, চারপাশের মরুভূমিতে এখন ফসল ফলছে। আমার সাম্রাজ্যের ক্ষেত্রফল দশ বর্গমাইলেরও বেশী—বারোশ' বর্গমাইল তো বটেই। দশ বছরে এই সাম্রাজ্য গড়েছি আমরা।" একটু থেমে—"এখানকার বারোশ' বর্গমাইলের কোথাও কেউ পা দিতে এলে সঙ্গে সঙ্গে খবর এসে যাবে আমার কাছে তিন দ্বার ঘাঁটিদারের কাছ থেকে টেলিফোনে···"

আ-চ্ছা! এবার বুঝলাম আসবার পথে মরুদ্যানগুলো কেন দেখেছিলাম। সব কটাই আউট পোষ্ট—ঐ জন্যে ঘাঁটি আগলে বসে থাকছে মাত্র এক-জন। খুঁটিগুলোও টেলিফোনের তার টেনে নিয়ে যাওয়ার জন্যে।

হ্যারি কীলার ভাববার অবসর দিচ্ছে না। প্ল্যাটফর্মের মাঝামাঝি জায়গায় একটা বিরাট উঁচু লাইটহাউসের মত মিনার দেখাচ্ছে—যে কোনো আলোকস্তম্ভের চেয়ে তা ঢের বেশী উঁচু। ঠিক যেন একটা কাঁচের লণ্ঠন।

বলছে—"খবর পাওয়ার পরেও যদি ভেতরে ঢোকে কেউ, আমার অনুমতি না নিয়ে, ব্ল্যাকল্যাণ্ডের পাঁচিলের পাঁচফার্লং দূরের আধ মাইল জায়গা আর পেরোতে পারবে না। সারারাত জোরালো প্রোজেকটরের আলোয় দিন হয়ে থাকে জায়গাটা। বৃত্তের মত এই অঞ্চলের মধ্যে সোজা নজর রাখা হয় এইখান থেকে—এই যন্ত্রটার মধ্যে থেকে—এর নাম দিয়েছি সাইক্লোসকোপ—টেলিস্কোপের অনেক উন্নত সংস্করণ। এর মাঝে বসে থাকে একজন লোক—চারপাশের দৃশ্য বিরাট বড় হয়ে ভাসতে থাকে চারপাশে। আসুন, আমি অনুমতি দিচ্ছি, দেখে যান আমার সাইক্লোসকোপের কেরামতি—দেখে যান একা সাইক্লোসকোপ কিভাবে নজর রেখেছে নিচের বৃত্তের মত বিরাট অঞ্চলটার ওপর।"

অনুমতি পেয়ে আর দ্বিধা করলাম না। কৌতূহল জেগে উঠেছিল অদ্ভুত গ্লাস-লণ্ঠন দেখে। এখন সদলে দরজা ঠেলে ঢুকে পড়লাম ভেতরে। নিচের দিকে তাকিয়ে দেখলাম একটা সুবৃহৎ লেন্স কব্জার ওপর দুলছে আর ঘুরছে বিরামবিহীনভাবে। ভেতরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে পালটে যেতে লাগল বাইরের দৃশ্য। প্রথমে সব দিকেই দেখলাম একটা বিরাট উঁচু পাঁচিল। খাড়া পাঁচিলের ওপর কালো লাইন দিয়ে ভাগ করা অনেকগুলো আলাদা আলাদা চতুষ্কোণ বর্গক্ষেত্র।

পাঁচিলের গোড়ার দিক ছায়াবৃত। বেশ খানিকটা জায়গা জুড়ে এই

ছায়ার রাজ্য আমাদের কাছ থেকে বিস্তৃত পাঁচালের মাথা পর্যন্ত। অনেক উঁচুতে মেঘের কোল পর্যন্ত যেন গিয়ে পোঁচেছে পাঁচিলের শীর্ষদেশ। যেন কোমল আলোয় আলোকিত শীর্ষদেশ। একটু ঠাহর করতেই বুঝলাম, সমান আলো সেখানে কোথাও নেই—অগণিত দাগ, অসংখ্য ছায়া আর আবছা নকশার সংমিশ্রণ জেগে রয়েছে পুরো জায়গাটায়। আর একটু খুঁটিয়ে দেখতেই স্পষ্ট দেখতে পেলাম, ছায়াময় দাগগুলোর কোনোটা গাছ, কোনোটা রাস্তা, কোনোটা চাষের ক্ষেত। কেউ কেউ লোকজন—কাজ করছে ক্ষেতে। প্রতিটি ছবিই বহুবিবর্ধিত হওয়ায় চিনতে একটুও অসুবিধে হচ্ছে না।

বেশ তফাতে থাকা দুটো দাগ দেখাল হ্যারি কীলার।

বললে—"দুজন নিগ্রো। ধরুন, ওরা পালানোর ফিকিরে আছে। কিন্তু বেশীদূর যেতে পারবে না। দেখুন কি করি!"

বলতে বলতে টেলিফোন ট্রান্সমিটার তুলল হ্যারি কীলার।

বলল—"একশ এগারো নম্বর সার্কল। ব্যাসার্ধ পনেরোশ' আটাশ।"

তুলল আর একটা টেলিফোন ট্রান্সমিটার—"চোদ্দ নম্বর সার্কেল। ব্যাসার্ধ পনেরোশ' দুই।"

আমাদের দিকে ফিরে বললেন—"দেখুন মজাটা!"

মিনিট কয়েক কিছু ঘটল না। তারপর একটা দাগের ওপর ছোট্ট একটা ধোঁয়ার কুণ্ডলি দেখা গেল। ধোঁয়া মিলিয়ে যেতেই দেখা গেল দাগটাও মিলিয়ে গেছে।

আবেগে কেঁপে উঠল শ্রীমতি মোরনাসের গলা—"লোকটা গেল কোথায়?"

"পরলোকে!" ঠাণ্ডা জবাব হ্যারি কীলারের।

"সেকী!" সমস্বরে বললাম আমরা—"কোনো দোষ করেনি—মেরে ফেললেন!"

তিলমাত্র বিচলিত হল না হিজ ম্যাজেস্টি—"তাতে কী? নিগ্রো তো—গেলে আবার আসবে। কিন্তু দেখলেন তো আমার আকাশ-টর্পেডোর খেলাটা? পনেরো মাইল পাল্লা—অব্যর্থ লক্ষ্য—এক ইঞ্চিও এদিক ওদিক হয় না। সাংঘাতিক স্পীড—মনে রাখবেন।"

একী নিষ্ঠুরতা! মন বিহ্বল হলেও আমাদের সবার চোখ তখন আটকে রয়েছে আলোছায়াময় পটভূমির ওপর। আচমকা দৃষ্টি পথে আবির্ভূত হল একটা বস্তু। বুঝতে পারলাম না জিনিসটা কি। তীব্রবেগে কোমল

আলোয় আলোকিত পাঁচিল বরাবর ধেয়ে গেল দ্বিতীয় দাগটার দিকে—সেকেণ্ড কয়েক পরেই দেখা গেল দাগ আর নেই—অদৃশ্য হয়ে গেছে।

গলায় কথা আটকে গেল শ্রীমতি মোরনাসের। রুদ্ধস্বরে জিজ্ঞেস করলেন—"এ লোকটা? পরলোক নাকি?"

"না। ইহলোকেই। এক্ষুনি দেখবেন।"

বলেই বাইরে চলে গেল হ্যারি কালার। ঠেলে বার করে দেওয়া হল আমাদেরকেও। প্ল্যাটফর্মে আসতেই দেখলাম উল্কাবেগে আকাশ পথে একটা জিনিস ধেয়ে আসছে আমাদের দিকে। যে মেশিনে চড়ে এখানে এসেছি—সেই মেশিন—কলের পাখী; মেশিনটার তলায় কি যেন ঝুলছে।

সেই প্রথম যন্ত্রটার নাম শুনলাম হ্যারি কীলারের মুখে। বললে—"ঐ হল গিয়ে আমার হেলিপ্লেন। এক মিনিটের মধ্যেই বুঝবেন আমার ইচ্ছের বিরুদ্ধে এ জায়গা থেকে পালানোর পরিণামটা কি।"

উল্কার বেগেই বটে। দেখতে দেখতে অনেক কাছে চলে এল হেলিপ্লেন। শিউরে উঠলাম তলায় ঝুলন্ত জিনিসটা চিনতে পেরে। অতিকায় চিমটের মাঝে ছট ফট করছে একজন নিগ্রো।

মাথার ওপর চলে এল হেলিপ্লেন। টাওয়ারের ঠিক ওপরে আসতেই শিথিল হল চিমটের দাড়া—ঠিক পায়ের সামনে আছড়ে পড়ল হতভাগ্য নিগ্রো। খুলি ফেটে ঘিলু ঠিকরে গেল চারদিকে—রক্ত ছিটকে লাগল সবার গায়ে।

চিৎকার করে উঠলেন শ্রীমতি মোরনাস। তাতেও সামলাতে পারলেন না নিজেকে। নিরক্ত ঠোঁটে জলন্ত চোখে, ফ্যাকাশে মুখে ছুটে গিয়ে গলা টিপে ধরলেন পর্যন্ত হ্যারি কীলারের—"কাপুরুষ!...নরপিশাচ।...মানুষখুনে।" অনায়াসে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল হ্যারি কীলার। অসহায় অবস্থায় দেখলাম সেই দৃশ্য। শিউরে উঠল শ্রীমতির পরিণাম ভেবে। এক ইঞ্চিও নড়তে পারছি না—শাস্ত্রীরা ধরে রেখেছে পেছন থেকে।

শ্রীমতি তখনো কাঁপছেন থরথর করে। দুজন ষণ্ডামার্কা নিগ্রো এসে টেনে নিয়ে গেল তাঁকে। হ্যারী কীলারের চোখে মুখে কিন্তু দানবিক ক্রোধের বিস্ফোরণ দেখলাম না—তার বদলে জাগ্রত হল নারকীয় উল্লাস। আনন্দে ফুটিফাটা হয়ে অদ্ভুত চোখে একদৃষ্টে দেখতে লাগল শ্রীমতিকে।

বলল কৌতুকতরলিত কণ্ঠে—"খুব তেজী মেয়ে দেখছি।"

পরক্ষণেই ধাঁই করে লাথি মারল আকাশ-থেকে-ফেলে-দেওয়া নিগ্রোর দেহপিণ্ডতে—"আরে মেয়ে, এ সব তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে মাথা খারাপ করলে

কি চলে ?”

বলে দুলকি চালে নেমে এল একখানা চেয়ার আর টেবিল দিয়ে সাজানো বিরাট সেই ঘরে—পেছনে পেছনে আমরা। ঘরখানাকে এখন থেকে সিংহাসন ঘর বলব—চেয়ারটাকে সিংহাসন।

সিংহাসনে বসে আমাদের দিকে চাইল হ্যারি কীলার।

সত্যি করে বলতে গেলে চেয়ে রইল শ্রীমতি মোরনাসের দিকে। আস্তে আস্তে দুই চোখে দেখলাম নোংরা দ্যুতি, অশুভ ছায়াপাত। চোখের চেহারা দেখে হাত পা হিম হয়ে এল আমার।

বললে অনেকক্ষণ পরে—“আমার ক্ষমতা দেখিয়েছি। এবার তা টের পাইয়ে ছাড়ব। আমার প্রস্তাব শুনে নাক সিঁটকোনোর পরিণাম যে কি, নিশ্চয় তা বুঝেছেন। আর একবার বলব কথাটা—এই শেষ। শুনেছি আপনাদের একজন রাজনীতিবিদ, একজন ডাক্তার, একজন সাংবাদিক আর দুজন আস্ত বোকা···”

পুঁসিঁ বোকা হতে পারেন, কিন্তু সেন্ট বেরেনের ওপর অবিচার করা হল নাকি ?

“দরকার হলে ফ্রান্সের সঙ্গে আলোচনা করে দেখতে পারেন রাজনীতিবিদ, ডাক্তারকে একটা হাসপাতাল বানিয়ে দেব কথা দিচ্ছি, ‘ব্ল্যাকল্যাণ্ড থানডার-বোল্টে’র কাজ ছেড়ে দোব সাংবাদিকের ওপর। অন্য দুজনেরও হিল্লে আমি করে দোব। বাকী থাকল এই মেয়েটা। ভারী বাচ্চা···কিন্তু মনে ধরেছে আমার···ওকে বিয়েই করই।”

আমরা তো হাঁ। পাগলের সঙ্গে বিয়ে।

শক্ত গলায় জবাবটা শুনিয়ে দিলেন বারজাক।

বললেন—“কোনোটাই হবে না। গায়ের জোরে যেটুকু করাতে পারবেন করবেন—তার বেশী নয়। আর শ্রীমতি মোরনাসের সম্বন্ধে যা বললেন —”

“আ—হা। ভাবী বউয়ের নাম তাহলে মোরনাস ?”

রাগে অপমানে শ্রীমতি মোরনাস স্রেফ অন্ধ হয়ে গেলেন বললেই চলে। গলা চিরে চেঁচিয়ে উঠলেন সঙ্গে সঙ্গে—“আমার নাম মোরনাস হোক আর না হোক—আপনার মত জানোয়ারের মুখে তা শুনতে চাই না। আপনার প্রস্তাব অত্যন্ত অপমানকর। অত্যন্ত হীন, অত্যন্ত···”

আর বলতে পারলেন না—গলা আটকে গেল। হ্যারি কীলার ? হাসতে

লাগল পরমানন্দে। তার অনুকম্পার ওপরেঃ যে এখন নির্ভর করছে আমাদের ভবিষ্যৎ।

বললে হৃষ্টচিত্তে—"ঠিক আছে···ঠিক আছে...তাড়াতাড়ি তো নেই···এক মাস সময় দিচ্ছি সবাইকে—ভেবে মন ঠিক করে নিন।"

পরমুহূর্তেই তিরোহিত হল তূরীয় অবস্থা।

শান্ত্রীদের হুকুম দিল বজ্রকণ্ঠে—"নিয়ে যাও জেলখানায়!"

ধস্তাধস্তি করতে করতে বারজাক বললেন—"কি করবেন একমাস পরে?"

ডিকটেটর ততক্ষণে মদের গেলাস তুলে ফেলেছে ঠোঁটের কাছে—মন সরে গেছে আমাদের চিন্তা থেকে; বারজাকের প্রশ্ন শুনে গেলাস নামিয়ে, একটুও রাগের লক্ষণ না দেখিয়ে কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে বলল দোনা-মোনা স্বরে:

"দেখি। হয় তো ফাঁসিই দিতে হবে।"

৪ ॥ ২৬শে মার্চ থেকে ৮ই এপ্রিল

হ্যারি কীলার নৃশংস। হ্যারি কীলার নররূপী পিশাচ। নইলে স্রেফ ক্ষমতা দেখানোর জন্যে নিরীহ নিগ্রোকে অমন ভাবে খুন করে? বিশেষ করে শেষের মৃত্যুটা তো অকল্পনীয়! মানুষ না জানোয়ার?

অভিযাত্রীরা তাই যেন কি রকম হয়ে গেলেন। কিন্তু হ্যারি কীলার তাঁদের অবাক করে দিলেন পরের দিন থেকেই। বোধহয় ওঁদের মন জয় করার মতলবেই কিছুটা স্বাধীনতা দিলেন। গ্যালারীর ছাদে ওঠার হুকুম দিলেন। বুরুজের মধ্যে ওঁদের জেলখানা—মাথায় এই ছাদ। গ্যালারীর এক প্রান্তের সিঁড়ি দিয়ে উঠতে হয়। আরেক প্রান্তের বন্ধ দরজার ওদিকে শান্ত্রীদের চোয়াড়ে কণ্ঠস্বর আর অস্ত্রের ঝনৎকার শোনা যায়।

অভিযাত্রীরা দিনের বেলা চড়ারোদে ছাদে বসতে পারতেন না। কিন্তু সন্ধ্যের পর যতক্ষণ খুশী বসে গল্প করতেন—মতবল আঁটতেন। কেউ বাধা দিত না।

চৌমৌকি শয়তান আসত শুধু খাবার দেওয়ার সময়ে, অন্য সময়ে নয়। অভিযাত্রীরাও চাইতেন না তাঁদের স্বয়ংসম্পূর্ণ এই অ্যাপার্টমেন্টে চৌমৌকির মত বিশ্বাসঘাতক যখন তখন হাজির থাকুক—থাকলে প্রাণ খুলে কথা বলা যাবে না।

বুরুজটা চৌকোনা—প্যালেসের পশ্চিম কোণে—দুদিকে চওড়া ছাদ ; মাঝে মাঝে চত্বর। এই চত্বর পেরিয়েই মাঝখানের টাওয়ারে যেতে হয়েছিল সাইক্লোসকোপ মেশিনের কেরামতি দেখার জন্যে। ছাদের এক অংশ এসপ্ল্যানেডের ওপর—এসপ্ল্যানেডের অন্য প্রান্তে উঁচু পাঁচিল—পাঁচিলের পরেই রেড রিভার। ছাদের এই অংশ রয়েছে প্যালেস আর ফ্যাক্টরীর মাঝে। ছাদের আর এক অংশ শেষ হয়েছে রেড রিভারের মাথায়—নব্বই ফুট ওপরে।

কাজেই পালানোর আশা ছেড়ে দিয়েছেন অভিযাত্রীরা। এসপ্ল্যানেডের দিক দিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। ছাদের এই অংশে ব্ল্যাকগার্ড আর কাউন্সিল মেরী ফেলো আর নিগ্রো দাসরা অনবরত যাতায়াত করছে। তাছাড়া এস-প্ল্যানেডের চারপাশেই দুর্লঙ্ঘ্য পাঁচিল।

পালানোর একমাত্র পথ রেড রিভারের দিকের ছাদের অংশ থেকে। কিন্তু তাও দুরাশা। কেননা, নৌকো নেই যে রেড রিভার পেরোবেন, দড়ি নেই যে নব্বই ফুট ঝুলে নেমে রেড রিভারে পৌঁছোবেন।

এই ছাদে বসে ওঁরাই দেখেন রেড রিভারের দৃশ্য। দুপাশে গাছের জটলা। মাত্র দশ বছরেই এত গাছ গজিয়েছে। পেল্লায় পাঁচিল দিয়ে আলাদা করা ব্ল্যাকল্যাণ্ডের তিনটে অংশও দেখতে পান—দেখতে পান কৃষ্ণ-কায় আর শ্বেতকায়দের।

কিন্তু ফ্যাক্টরীর দিকে তাকালে মাথা ঘুরে যায়। মাথায় গোল লেগে যায়। শহরের মধ্যে যেন আর একটা শহর। একদম আলাদা। যাতায়াতের কোনো পথ নেই। কেন ?

শহরের মধ্যে শহর এবং রীতিমত সুরক্ষিত। যেন নিজের প্রতিরক্ষা নিজেই গড়ে নিয়েছে। ভেতরে থেকেও আলাদা—যোগাযোগ একদম নেই। কারখানাই যদি হবে তো অতবড় চিমনি থেকে ধোঁয়া বেরোয় না কেন ? প্যালেস-টাওয়ারের মতই ওখানেও একটা টাওয়ার আছে—কিন্তু বিদ্‌ঘুটে পাইলন দিয়ে বেমক্কা রকমের উঁচু—একশ গজ তো বটেই ! উদ্দেশ্যটা কী ? রেড রিভার বরাবর এতগুলো পেল্লায় ইমারতই বা কেন ? অনেকগুলো বাড়ীতে ঘাস সবুজ মাটির পুরু প্রলেপ কেন ? সবচেয়ে বড় বাড়ীটায় ফলের বাগান আর বাজার হাটই বা রয়েছে কেন ? দরকারটা কি ? ঘেরা পাঁচিলের মাথায় ধাতু দিয়ে তৈরী অত কারিকুরিগুলোই বা কিসের ? বিশাল উচু এই পাঁচিলটা রেড রিভার বা এসপ্ল্যানেডে এসে শেষ হয়নি কেন ? পাঁচিলের

ওদিকেই ধূ-ধূ মরুপ্রান্তর চোখে পড়ে। সব মিলিয়ে একটা কথাই বারবার মনে হয়। ছোট্ট এই শহর নিজেই নিজেকে আগলাচ্ছে—বাইরের জগতের সঙ্গে এ শহরের কোনো যোগ নেই। এ আবার কি প্রহেলিকা ?

চৌমৌকিকে জিজ্ঞেস করে জবাব পাওয়া যায়নি। বরং ভয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছে। শুধু বলেছে—"কারখানা...কারখানা !" ব্যস তার বেশী নয়। এত ভয় কেন কারখানা বাড়ীকে ? এমন কি শক্তি লুকিয়ে আছে উচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা একদম আলাদা ছোট্ট ঐ শহরটার মধ্যে ? এত কুসংস্কার, এত আতংক কেন ? আহারে, যদি নাগাল পাওয়া যেত রহস্যময় এই শক্তির, যদি কাজে লাগানো যেত দরকার মত......

দিনরাত এইসব ভাবেন আর আলোচনা করেন অভিযাত্রীরা—কিন্তু পালানোর পথ আর পাওয়া যায় না।

জেন ব্লেজনের কপাল ভাল। হ্যারি কীলার তাঁকে আরো স্বাধীনতা দিয়েছে। প্যালেস আর এসপ্ল্যানেডের যেখানে খুশী তিনি যেতে পারেন—শুধু রেড রিভার পেরোতে পারবেন না—সম্ভবও নয়—একজন মেরী ফেলো পাহারায় থাকে কাস্‌ল্‌ ব্রীজে।

জেন ব্লেজন রাজী হননি। সঙ্গীদের চাইতে বেশী স্বাধীনতা তাঁর দরকার নেই। সবার ভাগ্যে যা ঘটেছে, তাঁর ভাগ্যে তাই ঘটুক।

তাতে আশ্চর্য হয়েছে চৌমৌকি। বলেও ফেলেছিল—"সেকি মেমসাব ! দুদিন পরে আপনি মাস্টারের বউ হবেন। দেখেশুনে নিন। কত সোনাদানা হীরে জহরৎ পাবেন জানেন ?"

জবাব দেননি জেন ব্লেজন। উপদেশে কর্ণপাত করেননি।

আড্ডার ফাঁকে ফাঁকে প্রত্যেকেই ব্যস্ত নিজের নিজের খেয়াল নিয়ে। যেমন, বারজাকের বুক দশহাত হয়েছে প্রশংসা শুনে। হ্যারি কীলারের সামনে কাহিল শরীর নিয়েও মনের যা জোর দেখিয়েছেন—তার তুলনা হয় না। গ্যাস খেয়ে বারজাক সময় পেলেই নাটকীয় কায়দায় একটা বক্তৃতার মহড়া দিচ্ছেন। দেখা হলেই ঝাড়বেন পাষণ্ড হ্যারি কীলারের ওপর।

ডক্টর চাতোন্নে এবং সেন্‌ট বেরেনের সময় আর কাটে না। প্রথম জনের হাতে রুগী নেই—কেননা সেন্ট বেরেন এখন চাঙা হয়ে উঠেছেন। হয়ে আরও বিপদে পড়েছেন। মাছ ধরার সুযোগ কই ? দিনরাত গজগজ করছেন তাই নিয়ে।

অ্যামিদী ফ্লোরেন্স ফাঁক পেলেই রিপোর্টগুলো মেজেঘসে রাখছেন। বার-

জাক মিশনের অ্যাডভেঞ্চার কাহিনী দিয়ে সাড়া জাগাবেন ইউরোপে—একবার বেরোতে পারলে হয়!

পঁসিঁ দিনরাত বসে ইয়ামোটা নোট বইয়ের রাশি রাশি গুপ্ত অংক কষছেন ঘোর ষড়যন্ত্রকারীর মত। অ্যামিদী ফ্লোরেন্সের কৌতূহল আর বাগ মানল না।

একদিন জিজ্ঞেস করলেন—"ও মশায়, কি এত লিখছেন বলবেন?"

"ধাঁধার জবাব খুঁজছি।" খুব গম্ভীর গলায় বললেন পঁসিঁ।

"বটে।"

"আজ্ঞে। ধাঁধাটা এই—"

বলে একটা ভজঘট হেঁয়ালি শুনিয়ে বললেন—"এর নাম চৈনিক ধাঁধা।"

"সে তো শুনেই বুঝেছি। কিন্তু অ্যাদ্দিন ধরে কি একটা ধাঁধারই জবাব খুঁজছেন?"

"নিশ্চয়। জবাব কি একটা। এইমাত্র ১১৯৭ নম্বর সমাধান পেয়ে গেলাম।"

"সব কটাই সঠিক সমাধান? আগের ১১৯৬টাও!"

"আলবৎ।"

"জঙ্গল ঠেঙিয়ে আসবার সময়ে পাতায় পাতায় অনেক কিছুই তো নোট করেছিলেন, সে সব কি?"

"মনে রাখবেন আমি একজন পরিসংখ্যানবিদ।"

"স্ট্যাটিসৃটিসিয়ান?"

"আজ্ঞে।"

"নোট বই বোঝাই শুধু পরিসংখ্যানের হিসেব লিখেছেন?"

"আজ্ঞে। কত কি আবিষ্কার করেছি জানেন? শুনলে আপনার মুণ্ডু ঘুরে যাবে?"

"যেমন?"

"জঙ্গলে শিংওলা হরিণটা কটা দেখেছিলাম, এই দেখুন ১৬ই ফেব্রুয়ারী লিখে রেখেছিলাম। নাইজারের ক্ষেত্রফল যদি ২৫,০০০ বর্গমাইল হয়, তাহলে সেখানে মোট শিংওলা হরিণের সংখ্যা দাঁড়াচ্ছে ৫৫৬,০৫৫ আর. ৮৪২টা। কী? চোখ কপালে উঠে গেল যে?"

"ঠিক...ঠিকই বলেছেন!" ফ্লোরেন্স হতবাক।

সোৎসাহে পঁসিঁ বললেন—"জানেন কি, এ অঞ্চলের নিগ্রোদের উক্তি যদি

পর পর জোড়া যায়, তাহলে তা পৃথিবীকে ১০৩,৫৮৯ বার বেড় দিতে পারবে ?”

“বলেন কী ?”

“আজ্ঞে। আরও জেনে রাখুন, ৫ই ডিসেম্বর নাইজার বেণ্ডের মোট জন-সংখ্যা ছিল ১,৪৭৯,১১৪ জন।”

“বটে! কিন্তু ১৬ই ফেব্রুয়ারী তো লিখেছেন মোট জনসংখ্যা ৪৭০,৬৫২। কোনটা ঠিক!”

“দুটোই ঠিক।”

“তার মানে ? তাহলে কি মড়ক লেগে লোকসংখ্যা কমে গেছে ?”

“মশায়, পরিসংখ্যান একটা আশ্চর্য বিজ্ঞান—চিরবিবর্তনের বিজ্ঞান। পরি-সংখ্যান যা দেখে, তারই হিসেব দেয়। অংকে যা দাঁড়ায়—তাই ঠিক। দুটো অংকের ফল দুরকম হল কিনা, তা নিয়ে মাথা ঘামায় না।”

মাথা চুলকে সরে পড়লেন অ্যামিদী ফ্লোরেন্স। এই ধরনের হাল্কা ব্যাপারের ফাঁকে ফাঁকে হ্যারি কীলারকে নিয়েও গবেষণা চলেছে। বারজাক জিজ্ঞেস করেছিলেন—“লোকটা কে মনে হয় ?”

“ইংরেজ। উচ্চারণ তাই।” বলেছেন জেন ব্লেজন।

“অসাধারণ ইংরেজ। মাত্র দশ বছরের মধ্যে মরুভূমিতে শস্য ফলানো চাট্টিখানি কথা নয়। এর পেছনে যে বৈজ্ঞানিক প্রতিভা, তার অধিকারী কি এই নরপিশাচ ? ভাবতেও কষ্ট হয়,” বারজাকের মন্তব্য।

“ওটা একটা পাগল,” বলেছেন ফ্লোরেন্স।

“আধ পাগল।” শুধরে দিয়েছেন চাতোন্নে। “বাকী আধখানা মাতাল। সেই জন্যেই বেশী বিপজ্জনক। অতি ভয়ংকর।”

বারজাক বললেন—“এ ধরনের চরিত্র আফ্রিকায় আকছার দেখা যায়। কথায় কথায় মাথায় খুন চাপে, নৃশংস অত্যাচার চালায়। বছরের পর বছর হীন লোকের সংসর্গে থাকলে যা হয় আর কি।”

ফ্লোরেন্স বলেছেন—“আমি কিন্তু ওকে পাগলই বলব। বদ্ধ উন্মাদ। এই ফুঁসছে, এই জল হচ্ছে। আমাদের কথা এখন খেয়াল নেই—খেয়াল যখন হবে, পাঁচ মিনিটের মধ্যে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দেবে।”

দিন সাতেক কাটল এই সব গবেষণায়। তেসরা এপ্রিল ঘটল পর পর দুটো চাঞ্চল্যকর ঘটনা। ভিন্ন ধরনের দুটো পিলে চমকানো ব্যাপার।

বিকেল তিনটে নাগাদ হঠাৎ এসে পৌঁছোলো মালিক। সটান আছড়ে

পড়ল জেন ব্লেজনের পায়ে।

মালিক এসেছে পদাতিকদের সঙ্গে—হেলিপ্লেনে নয়। আসবার পথে বেচারীর ওপর অকথ্য অত্যাচার চালিয়েছে সার্জেন্ট দুজন বিশজন নিগ্রো সৈন্য সমেত।

না। টোনগানের খবর সে জানে না। কেউ বলেনি।

পাঁচটা নাগাদ ঘটল দ্বিতীয় ঘটনাটা। হন্তদন্ত হয়ে দৌড়ে এল চৌমৌকি। ভীষণ উত্তেজিত। হ্যারি কীলার পাঠিয়েছে তাকে। ভাবী বউ জেন মোরনাসকে নিয়ে যেতে হবে।

একবাক্যে চৌমৌকিকে হাঁকিয়ে দিলেন অভিযাত্রীরা। কাকুতিমিনতি করল চৌমৌকি। এরকম করবেন না—সর্বনাশ হয়ে যাবে—মাস্টার রেগে গেলে আর রক্ষে নেই। কর্ণপাত করলেন না কেউ। বিদায় হল চৌমৌকি। সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ হয়ে গেল গরম গরম আলোচনা। ব্যাপার কি? হঠাৎ তলব কেন? কেন এমন অদ্ভুত আমন্ত্রণ? না—কোনমতেই না—জেন ব্লেজনকে সঙ্গ ছাড়া করা হবে না কোনমতেই।

জেন ব্লেজন তখন সবাইকে সাধুবাদ জানিয়ে বললেন—"আপনারা খামোকা ভয় পাচ্ছেন। নিজেকে আগলাতে আমি পারি। এই দেখুন।"

বলে, পোশাকের আড়াল থেকে টেনে বার করে দেখালো সেই ছোরাটা—যা তার দাদার কংকালের বুক থেকে উদ্ধার করা হয়েছে।

বললে—"দরকার হলে এ ছোরা বুকে বিঁধিয়ে দিতে দ্বিধা করবো না। মেয়ে বলে আমার দেহ তল্লাসি হয় নি। তাই পরোয়া করিনা কাউকেই।"

পোশাকের আড়ালে ছোরা লুকোতে না লুকোতেই ঝড়ের মত হাজির হল চৌমৌকি। চোখ ঠেলে বেরিয়ে আসছে উত্তেজনায়—কাঁপছে থর থর করে। সাংঘাতিক খেপেছে মাস্টার। এক্ষুনি নিয়ে যেতে হবে ভাবী বধূকে, নইলে ছজনকেই ফাঁসি দিতে বলেছে।

নিজের জন্যে এত বড় বিপদের মধ্যে সঙ্গীদের ঠেলে দিতে চাইলেন না জেন ব্লেজন। বললেন—"আমি যাচ্ছি। আপনারা দাঁড়ান।"

আপত্তি ধোপে টিঁকল না। মহাউত্তেজিত চৌমৌকির চিৎকারে একজন নিগ্রো দৌড়ে এসে চেপে ধরল সঙ্গীদের। চৌমৌকির সঙ্গে চলে গেলেন শ্রীমতি।

ফিরে এলেন তিন ঘণ্টা পরে—আটটার সময়ে। এই তিন ঘণ্টা মহা-উদ্বেগে রইলেন পুরুষ সঙ্গীরা—বিশেষ করে সেন্ট বেরেন। তাঁর কান্না

থামানো গেল না।

আটটার সময়ে শ্রীমতিকে দেখেই সমস্বরে সবাই বললেন—"কি হল ?"

"কি আবার হবে ?" রীতিমত কাঁপতে কাঁপতেই বললেন জেন ব্লেজন।

"ডেকেছিল কেন ?"

"স্রেফ বড়াই করার জন্যে, নিজের প্রশংসা আর আমার প্রশংসা করার জন্যে। আমার মত ছোটখাট একটা মেয়েকে তার গিন্নী করার ইচ্ছে হয়েছে। খুব আরামে রাখবে। সাম্রাজ্যের সম্রাজ্ঞী হয়ে থাকব। আমি বললাম, সব তো বুঝলাম, কিন্তু একমাস সময় দেওয়া হয়েছে, সে খেয়াল আছে ? তার আগে এ সব কথা কেন ? অবাক কাণ্ড, একটুও রাগল না হ্যারি কীলার। বললে, 'ঠিক আছে। একমাস সময়ই পাবেন—কিন্তু রোজ বিকেলে এই সময়ে এসে সঙ্গদান করে যেতে হবে।"

"রাজী হলি তুই ?" সেন্ট বেরেন প্রায় নাচতে লাগলেন।

"হলাম বইকি। শুনে বুঝলে না ওর ওপর এর মধ্যেই একটা প্রভাব এসে গেছে আমার ? আমি তাকে কাজে লাগাতে চাই। ঝুঁকি একদম নেই। যখন গেলাম, তখনি মদে পা টলছে। আমি কেবল গেলাস ভরে গেলাম, তামাক পাইপ জ্বালিয়ে গেলাম। সাতটা নাগাদ নাক ডাকা আরম্ভ হতেই পালিয়ে এলাম। রোজ তাই করব—দেখি না। কি হয়।"

সত্যিই রোজ তিনটে বাজলেই হ্যারি কীলারের কাছে যাওয়া আরম্ভ করলেন শ্রীমতি। আটটার সময়ে ফিরে আসতেন। গিয়ে দেখতেন রক্ত লোলুপ কাউন্সিলরদের নিয়ে মিটিং করছে মাস্টার। অত্যন্ত বিচক্ষণ মন্ত্রণা দিচ্ছে—রাজ্যপাট চালানোয় কোন ত্রুটি নেই। এমন কি, ব্ল্যাকল্যাণ্ড গভর্ণমেন্টে কোনো রহস্য আছে বলে মনেই হত না যদি না মাঝে মাঝে কাউন্সিলরদের ডেকে কানে কানে কি যেন মন্ত্রণা দিত হ্যারি কীলার। মন্ত্রটা কি জেন ব্লেজন তা আঁচ করতে পারেন নি।

রাজ সভা চলত ঠিক চার ঘণ্টা। চারটে বাজলেই ঘরে শ্রীমতি একলা থাকত সম্রাটের সঙ্গে। কিন্তু সাড়ে চারটের সময়ে কোমর থেকে একটা চাবি বার করে পেছনের ছোট একটা দরজা খুলে আধঘণ্টার জন্যে উধাও হত সম্রাট হ্যারি কীলার। ফিরত পাঁচটায়।

এই আধঘণ্টায় অদ্ভুত চাপা চিৎকার ভেসে আসত ছোট দরজার দিক থেকে। যেন নিঃসীম যন্ত্রণায় কে কাতরাচ্ছে—সহ্য করতে আর পারছে না।

পাঁচটায় মহাফুর্তিতে ডগমগভাবে ফিরে এসে মদ আর তামাক নিয়ে

বসত সম্রাট। জেন ব্রেজন মদ ঢালত গেলাসে, আগুন দিত তামাকে। সাতটায় নাক ডাকা আরম্ভ হত। তখন অনেকদিন ইচ্ছে হয়েছে শ্রীমতির পকেট থেকে চাবিটা বার করে দেখে আসে ছোট্ট দরজায় ওপারে কোন রহস্য লুকিয়ে আছে, কে অমন কাৎরায়, কেন কাৎরায়। কিন্তু সাহসে কুলোয়নি।

শুধু এই দুটি কৌতূহল নিরশন হচ্ছিল না বলে আর একটা মহৎ কাজ করতে পারছেন না শ্রীমতি। সাতটায় যখন হ্যারি কীলার মদে বেহুঁশ, তখন দাদার বুকের পাঁজর থেকে উদ্ধার করা মরচে ধরা ছোরাটা হ্যারি কীলারের বুকের রক্তে ভিজিয়ে নেওয়া যায় অনায়াসে।

অনেক ভেবে সে ইচ্ছেটা দমন করতে হয়েছে। কেন না, হ্যারি কীলারই এ দেশে একমাত্র ব্যক্তি যে বুঝেছে বন্দীদের ছেড়ে দিলে লাভ আছে। তাছাড়া, তাকে মারলেও কাউন্সিলর, মেরী ফেলো, ব্ল্যাক গার্ড রয়েছে। অত জনের চোখ এড়িয়ে পালানো তো যাবে না।

জামিন স্বরূপ ধরে নিয়ে যাওয়া যেতে পারে। তাতেও আখেরে লাভ হবে বলে মনে হয় না। কেননা, গুণধর স্যাঙাৎরা হয়ত হাঁফ ছেড়ে বাঁচবে মাস্টার বিদেয় হলে। তাছাড়া শান্তি চুক্তি যদিও বা হয় ব্ল্যাকল্যাণ্ড যে মেনে চলবে, তার নিশ্চতা কি?

তাই হ্যারি কীলারকে জিইয়ে রাখার সিদ্ধান্ত নিলেন অভিযাত্রীরা।

কিন্তু ঐ রহস্যময় আধঘন্টায় চাপা কাৎরানির শব্দ আর সইতে না পেরে বাইরে এক চক্কর দিয়ে আসতেন শ্রীমতি। দিন কয়েকের মধ্যেই মেরী ফেলো আর ব্ল্যাক গার্ডরা চিনে ফেলল তাঁকে এবং দেখা গেল বেশ সমীহ করছে। ভাবী সম্রাজ্ঞী যে!

এই ভাবেই গেল পাঁচটা দিন। এল আটুই এপ্রিল।

সাড়ে নটা নাগাদ রেড রিভারের পাশের ছাদে জড়ো হয়েছেন অভিযাত্রীরা। নিচের তলায় এঁটোকাটা কুড়োচ্ছে চৌমৌকি—এবার যাবে। শ্রীমতি সবে বলতে শুরু করবেন হ্যারি কীলারের কাছে তাঁর সেদিনের অভিজ্ঞতা।

আকাশ অন্ধকার। চাঁদ এখনো আছে—কিন্তু ঘন মেঘের আড়ালে। বৃষ্টির বেশী দেরী নেই। মেঘের জল ঝরতে পারে যখন তখন।

ঘন অন্ধকার ছাদের ওপরেও। রেড রিভারের আলো এতদূর আসছে না।

আচমকা ঠক্ করে কি যেন এসে পড়ল পাথরে বাঁধানো ছাদে! চমকে

উঠলেন সবাই। বসে রইলেন কাঠের মত।

প্রথমে সম্বিৎ ফিরল ফ্লোরেন্সের।

উঠে গিয়ে হাতরে হাতরে তুলে আনলেন একটা নুড়ি। নুড়ির সঙ্গে বাঁধা খুব সরু একটা দড়ি।

ছুঁড়ল কে? শত্রু না, বন্ধু? ফাঁদ পাততে চায় কি হ্যারি কীলারের লোকজন? নাকি, সত্যিই কোনো বন্ধু এই দুর্দিনে বার্তা পাঠাতে চায় অসহায় বন্দীদের কাছে?

যা থাকে কপালে, দড়ি ধরে টানতে লাগলেন ফ্লোরেন্স। ছাদের প্যাঁচিল বেয়ে দড়ি ঝুলছে রেড রিভারের ওপর। একা টানতে পারলেন না—ভীষণ সরু—আঙুলের মধ্যে দিয়ে গলে যাচ্ছে। ডাকলেন চাতোন্নেকে, দুজনে মিলে একটু টানতেই হাতে উঠে এল একটা তার চাইতেও মোটা দড়ি। সরু দড়ির সঙ্গে বাঁধা।

মোটা দড়িটা আন্দাজ তিরিশ ফুট পর্যন্ত টেনে তোলার পর আটকে গেল। মনে হল যেন দড়ির প্রান্তে কেউ রয়েছে। দড়ি আলগা দিয়েই ফের টেনে ধরছে।

ফ্লোরেন্স বললেন—"বেঁধে দিন দড়ির এদিক।"

তাই বাঁধা হল। সঙ্গে সঙ্গে টানটান হয়ে গেল দড়িটা। দুলে দুলে উঠতে লাগল ভীষণ ভাবে। প্যাঁচিলে হেঁট হয়ে দেখলেন, ছায়ার মত কি যেন দ্রুতবেগে দড়ি বেয়ে উঠে আসছে। আরও একটু কাছে আসতেই দেখা গেল একটা মানুষ।

দেখতে দেখতে পাঁচিল টপকে ছাদে এসে পড়ল লোকটা। ঘিরে দাঁড়ালেন অভিযাত্রীরা।

বিষম বিস্ময়কে অতিকষ্টে দমন করে সমস্বরে বললেন চাপা গলায়:

"টোনগানে!"

৫ ॥ নতুন কারাগার

হ্যাঁ, টোনগানে।

শুধু বেঁচেই নেই। অক্ষতও বটে! কোথাও কোনো চোট লাগেনি-এতটুকু জখম হয়নি।

হেলিপ্লেনের সার্চলাইট তার গায়ে পড়েনি। তাই পিসারে পালিয়েছিল বনের অন্ধকারে। কেউ তাকে নিয়ে মাথাও ঘামায় নি।

তাই বলে কি পালিয়ে যাবে টোনগানে? কক্ষনো নয়। বিশেষ করে মালিককে যারা ধরে নিয়ে যাচ্ছে, তাদের পেছন পেছন যেতেই হবে—যা থাকে কপালে।

তাই অশ্বারোহী শয়তানদের পেছনে আঠার মত লেগেছিল টোনগানে। প্রাণ হাতে নিয়ে দৌড়েছে পেছন পেছন—পায়ে দৌড়েও ঘোড়াদের নজর ছাড়া করেনি—দিনে তিরিশ মাইল পেরিয়ে এসেছে এইভাবে!

ক্ষেতখামারের কিনারায় পৌঁছে সারারাত লুকিয়ে থেকেছে ঝোপের মধ্যে। ভোর হতেই চাষী নিগ্রোদের সঙ্গে ভিড়ে গিয়ে চাষ আবাদ করছে সারাদিন। মার খেয়েছে শান্ত্রীদের হাতে। সন্ধ্যে হতে তাদের দলে ভিড়ে মেরী ফেলোদের তাড়া খেয়ে ঢুকেছে শহরের তৃতীয় অংশে—দাসদের কোয়ার্টারে। কেউ তাকিয়েও দেখেনি।

দিন কয়েক পরে একটা পরিত্যক্ত কুঁড়েঘরে পেয়েছে এক বাণ্ডিল দড়ি। সেই দড়ি নিয়ে সিভিল বডির পেছন ধরে পৌঁছেছে নদীর তীরে। দুদিন লুকিয়ে থেকেছে একটা নর্দমার মধ্যে সুযোগের প্রতীক্ষায়।

বুরুজের ছাদে অভিযাত্রীদের টহল দিতে দেখেছে, কিন্তু দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেনি—চেষ্টা যদিও করেছিল। সুযোগ এসেছে তৃতীয় দিনে—আটুই এপ্রিলে। মেঘে ঢাকা অন্ধকার আকাশের সুযোগ নিয়ে নর্দমা থেকে বেরিয়ে উঠে এসেছে মনিবের চরণতলে।

পালানোর এই হল মোক্ষম সুযোগ। এই দড়ি বেয়েই নেমে যাওয়া যাক নদীর পাড়ে। একটা নৌকো জোগাড় করে জলে ভাসিয়ে রেখেছে টোনগানে। জলপথে পগার পার হতে কতক্ষণ?

প্ল্যানটা মনে ধরল প্রত্যেকের। চারজনে মিলে দাঁড় টানলে ঘণ্টায় ছ' মাইল যাওয়া যাবে। এগারোটায় রওনা হলে ভোরের আগেই প‍ঁয়তাল্লিশ মাইল পেরিয়ে যেতে পারবেন। সাইক্লোসকোপের নজর এড়িয়ে যাওয়া যাবে গাছের অন্ধকারে থেকে—ভোরের আগেই শুধু সাইক্লোস্কোপের এখতিয়ারই নয়—ক্ষেতখামারের শেষে সর্বশেষ ঘাঁটি পর্যন্ত পেরিয়ে যাওয়া যাবে। তারপর দিনের বেলা রেডরিভারের পাড়ে গাছের আড়ালে লুকিয়ে থাকলে হেলিপ্লেন থেকে দেখা যাবে না। রাতের অন্ধকারে ফের দাঁড় বেয়ে যাওয়া যাবে জলপথে। এইভাবেই নিশ্চয় পৌঁছোনো যাবে 'সায়ে'র কাছাকাছি 'বিকিনি'

গ্রামে। সব মিলিয়ে ২৮০ মাইল রাস্তা—চার পাঁচ রাত নৌকো চালিয়ে গেলেই হল।

ফন্দীমত-কাজ-আরম্ভ হয়ে গেল তৎক্ষণাৎ। আগে ব্যবস্থা করা দরকার বিশ্বাসঘাতক চৌমৌকির। নিচের তলায় ধীরে সুস্থে তখনও সে কাজ সারছে—হাত যেন আর চলে না। শ্রীমতি ব্লেজন আর অপদার্থ পাঁসিঁকে ছাদে রেখে বাকী সবাই গেলেন সেখানে। চৌমৌকির সন্দেহ হল না। হওয়ার কোনো কারণ নেই। প্রথম আক্রমণ করলেন সেন্ট বেরেন। ঘ্যাঁক করে টিপে ধরলেন বিশ্বাসঘাতকের কণ্ঠদেশ—তুলে আছাড় মারলেন মাটিতে। টুঁ শব্দ করার আগেই বাকী সবাই ঝটপট হাত-পা বেঁধে মুখে ঠুসে দিলেন ন্যাকড়া—নিয়ে গেলেন একটা কারাকক্ষে দরজায়। তালা দিয়ে চাবিটা ফেলে দিলেন রেড রিভারের জলে।

একটা আপদ গেল। এদিকে বৃস্টি নেমেছে ঝমাঝম। বিশ গজ দূরে কি আছে দেখা যাচ্ছে না। নদীর অপর পাড়ে মেরী ফেলোদের কোয়ার্টারে আলো পর্যন্ত ঠাহর করা যাচ্ছে না।

সঙ্গে সঙ্গে, একদম নষ্ট না করে দড়ি ধরে নেমে গেলেন অভিযাত্রীরা। সবার আগে অ্যামিদী ফ্লোরেন্স—সবার শেষে টোনগানে। শ্রীমতিকে দড়িতে বেঁধে ঝুলিয়ে নামিয়ে দেওয়ার প্রস্তাব হয়েছিল—তিনি রাজী হননি। গেছো মেয়ে তিনি—পুরুষের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারেন বইকি।

টোনগানে নামল সবার শেষে। দড়ির দুটো প্রান্ত পাঁচিলের খাঁজের মধ্যে দিয়ে গলিয়ে ঝুলিয়ে দিল নীচে। দুগাছি দড়ি একসঙ্গে ধরে নামল নদীর পাড়ে। তারপর একগাছি টানতেই সড়সড় করে দড়ি এসে গেল হাতে—পালানোর কোন চিহ্নই রইল না ছাদে।

দশটার একটু পরেই নোঙর খুলে শুরু হয়ে গেল জলযাত্রা। একপাশে কাঠের আড়ালে লুকিয়ে রইলেন সবাই—দূর থেকে দেখা না যায়। স্রোতের টানে আপনিই ভেসে গেল নৌকো। শহরের সীমানা পেরিয়ে আসার পর—বাইরের পাঁচিল যখন ছশগজ দূরে—দাঁড় তুলে নিয়ে টানতে আরম্ভ করলেন চারজনে। বৃষ্টির ফলে নিশ্চিন্ত থাকা গেল—কেউ দেখতে পেল না।

মিনিট কয়েক পরেই ঘটল বিপত্তি। দাঁড় টানার ফলে নৌকো তখন বেশ জোরে চলেছে। শহর বেশ পেছনে পড়েছে। এমন সময়ে দড়াম করে কিসে ধাক্কা খেয়ে দাঁড়িয়ে গেল নৌকো।

নদী জুড়ে দাঁড়িয়ে একটা লোহার জালতি। নীচের দিকটা নদীতে

তলিয়ে গেছে—ওপর দিকে লোহার মসৃণ চাদর। একপাশ গাঁথা মেরী ফেলো আর সিভিল বডির কোয়ার্টার যে পাড়ে—সেখানকার দেওয়ালে। আর একপাশ গাঁথা অন্যপাড়ে বৃত্তাকার রাস্তার পাঁচিলে—পুরো ফ্যাক্টরীকে ঘিরে রয়েছে এই রাস্তা!

পালানোর কোন পথ নেই।

হ্যারি কীলার বাড়িয়ে বলেনি। ব্ল্যাকল্যাণ্ড থেকে পালানো যায় না। তাই দিনের আলোয় নদীপথ খোলা থাকে, রাতের অন্ধকারে তা গ্রীল দিয়ে বন্ধ থাকে।

এখন উপায়? নিরুৎসাহ হওয়ার পাত্র নন অভিযাত্রীরা। দমে গিয়েও তাই সাহসে বুক বাঁধলেন। গ্রীল টপকাবেন? অসম্ভব। তেলতেলে মসৃণ, ছিদ্রহীন লোহার পাত বেয়ে কেবল টিকটিকিই উঠতে পারবে—মানুষে নয়। তার চেয়েও বড় কথা নৌকোটাকে গ্রীলের ওপরে নেওয়া তো যাবে না। নৌকো ছাড়া স্থলপথে যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না।

তবে কি প্যালেসে ফিরে যাবেন? নতজানু হয়ে সম্রাট হ্যারি কীলারের পদতলে প্রাণভিক্ষা চাইবেন?

কখনোই নয়। প্যালেস ছাড়া যেদিকে দু'চোখ যায় যাবেন। জাহান্নামে যেতেও আপত্তি নেই।

এই সময় অভিনব প্রস্তাবটা পেশ করলেন অ্যামিদী ফ্লোরেন্স।

বললেন—"ফ্যাক্টরীর মধ্যে কি ঠাঁই পাওয়া যাবে না? চেহারা যখন শহরের মত নয়—কপাল ঠুকে দেখতে ক্ষতি কি?"

পাশ হয়ে গেল প্রস্তাব। দাঁড় টেনে এলেন বাঁ পড়ে। স্রোত ঠেলে একটু এগিয়ে গেলেন পঞ্চাশগজ চওড়া রাস্তাটা যেখানে মোড় নিয়ে কারখানাকে পাক মেরেছে—সেইখানে। বৃষ্টিতে দুহাত দূরের জিনিস ভাল দেখা যাচ্ছে না—তার ওপর নিকষ অন্ধকার। ঝমাঝম শব্দের জ্বালায় কিছু শোনা যাচ্ছে না। তা সত্ত্বেও রাস্তা বরাবর পা টিপেটিপে এগোলে পলাতকরা।

অর্ধেক পথ গিয়ে থমকে দাঁড়ালেন।

আবছা ভাবে দেখা গেল প্রায় বিশ গজ দূরে ফ্যাক্টরীর পশ্চিম আর উত্তর দিকের কোণায় শান্ত্রীর গুমটি ঘর। গুমটি ঘর যখন আছে, তখন শান্ত্রীও নিশ্চয় আছে। বৃষ্টির জন্যে ভেতরে ঢুকে বসে আছে।

ফ্যাক্টরীর এদিকের দেওয়াল নদীর পাড় বরাবর বিস্তৃত—পঞ্চাশগজ চওড়া রাস্তার ধারে। একটা মস্ত জেটি রয়েছে সেখানে। কারখানার পাঁচিল জল

পর্যন্ত পৌঁছোয়নি।

গুমটি ঘরের জানলা নিশ্চয় নদীর দিকে। সেই সুযোগ নিলেন অভিযাত্রীরা। শান্ত্রীর ভয়ে সারারাত তো দাঁড়িয়ে থাকা যায় না। নদীপথে পেছিয়ে গিয়ে নামলেন পাড়ে। রাস্তা বেয়ে পেছন দিক থেকে এগোলেন গুমটি ঘরের দিকে। তফাতে এসে আচমকা নক্ষত্র বেগে ধেয়ে গেলেন সেন্ট বেরেন, ফ্লোরেন্স এবং টোনগানে। শান্ত্রী বেচারা কল্পনাও করতে পারেনি এমন জলঝড়ের রাতে কেউ আক্রমণ করবে। ভ্যাবাচাকা খেয়ে চেঁচাবার আগেই সাঁড়াশি হাতে গলা টিপে ধরে মনের সুখে ফের আছাড় মারলেন সেন্ট বেরেন—সঙ্গে সঙ্গে হাত-পা বেঁধে মুখে ন্যাকড়া ঠুসে দিলেন ফ্লোরেন্স আর টোনগানে। ভাগ্যিস দড়িটা সঙ্গে এনেছিল টোনগানে।

পথ পরিষ্কার। কারখানার পাঁচিল বরাবর লাইন বেঁধে সবাই এগোলেন দরজার সন্ধানে।

কিন্তু কোথায় দরজা? বুরুজের ছাদ থেকেই দেখা গিয়েছিল, এসপ্ল্যানেডের দিকের দেওয়াল একদম মসৃণ—ঘুলঘুলি পর্যন্ত। উল্টোদিকের পাঁচিলের অবস্থাও তাই। কিন্তু উত্তর দিকে যখন জেটি—তখন নিশ্চয় দরজা জাতীয় কিছু একটা থাকা উচিত সেখানে। জেটি থাকা মানেই জলপথে মালপত্র নামানো হয় ফ্যাক্টরীতেই ঢোকানোর জন্যে—পথ নিশ্চয় আছে।

পরিশ্রম বৃথা গেল না। কিছুদূরে দেখা গেল ইস্পাতের পাত দিয়ে তৈরী বিশাল একটা দরজা— কামান দেগেও ভাঙা যায় না—এমন মজবুত।

এ দরজা তো খোলা যাবে না। তেলতেলে মসৃণ ইস্পাতের চাদরে ফুটোফাটাও নেই কোথাও।

পাশেই রয়েছে আর একটা দরজা। আকারে ছোট। ইস্পাতের চাদরের তৈরী পাল্লা। কিন্তু চাবি দেওয়া।

চাবি ছাড়া এ তালা খোলা যাবে না। এমন কিছুও কাছে নেই যে খুঁচে খোলা যায়।

শেষ পর্যন্ত দমাদম ঘুসি লাগিয়ে মারবেন ঠিক করলেন অভিযাত্রীরা। হাত তুলেছেন, এমন সময়ে দেখা গেল এসপ্ল্যানেডের দিক থেকে ভিজতে ভিজতে একটা ছায়ামূর্তি আসছে ওঁদের দিকেই।

তৎক্ষণাৎ পাঁচলের গা ঘেঁসে বড় দরজার ছাঁচের তলায় দাঁড়িয়ে গেলেন আটজনে। আগুয়ান মনুষ্য মূর্তি তন্ময় হয়ে ওঁদের পাশ দিয়ে গেলেন—দেখা উচিত ছিল, পাশেই আটটি মূর্তি ঘাপটি মেরে রয়েছে, কিন্তু দেখলেন না

পলাতকরাও তৈরী ছিলেন। বেগতিক দেখলেই হাত চালাতেন।

কিন্তু অদ্ভুত লোকটা ওঁদের পাশ দিয়ে গেলেন—ফিরেও তাকালেন না। ওঁরাও একে একে গেলেন পেছন পেছন।

অদ্ভুত মানুষটা পকেট থেকে চাবি বার করে তালার ফুটোয় লাগালেন—আটজনে অর্ধচন্দ্রাকারে দাঁড়িয়ে রইল পেছনে।

অদ্ভুত ব্যক্তি দরজা খুললেন—সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে ঠেলে ঢুকিয়ে নিয়ে ঝড়ের বেগে আটজন ঢুকে পডলেন ভেতরে—পরমুহূর্তে বন্ধ করে দিলেন দরজা।

অন্ধকারে শোনা গেল বিস্ময়চকিত কোমল কণ্ঠস্বর :

"এ আবার কী ?"

কথা শেষ হতে না হতেই অন্ধকারে জ্বলে উঠল ব্লেজনের ইলেকট্রিক টর্চ—সেই টর্চ জ্বালিয়ে কোকোরোতে জংলাদের বশ করেছিলেন।

টর্চের আলো সোজা গিয়ে পড়ল দুজনের মুখে। একজন টোনগানে। অপর জন তার সামনেই দেওয়ালে হেলান দিয়ে হাঁপাচ্ছেন—ভিজে একসা অবস্থা। ক্ষীণকায় মানুষ ! মাথায় হাল্কা সোনালী চুল।

দুজনে দুজনকে দেখে চমকে উঠল।

অবাক বিস্ময়ে একদম অন্য গলায় কিন্তু নরম স্বরে বললেন ক্ষীণকায় ব্যক্তি :

"সার্জেন্ট টোনগানে !"

অবাক বিস্ময়ে আতংক বিস্ফারিত চোখে বলল টোনগানে :

"মাসা ক্যাম্যারেট !"

ক্যাম্যারেট !···শিউরে উঠলেন মিস ব্লেজন ! নিহত দাদার সহযোগী ছিলেন না ? সেই ক্যাম্যারেট ?

এক পা এগিয়ে এলেন অ্যাদিমী ফ্লোরেন্স। বললেন "মঁসিয়ে ক্যাম্যারেট, আপনার সঙ্গে কথা আছে।"

"বেশ তো" সহজ শান্ত সুরে বললেন ক্যাম্যারেট।

টিপে ধরলেন একটা বোতাম। ঝলমল করে উঠল বিদ্যুৎবাতি। দেখা গেল। একটা খিলেনওলা আসবাবহীন ঘরে দাঁড়িয়ে আছেন পলাতকরা।

একদিকের দরজা খুললেন ক্যাম্যারেট। সামনেই সিঁড়ি। সরে দাঁড়িয়ে হাতের ইঙ্গিতে পথ দেখিয়ে বললেন বিনয় ভদ্র স্বরে :

"আসুন।"

যেন এর চাইতে সহজ স্বাভাবিক অরে কিছুই নেই দুনিয়ায় !

৬ ॥ মারসেল ক্যামারেট

তুচ্ছ সৌজন্য—কিছুই নয় কিন্তু অনন্যসাধারণ এই পরিস্থিতিতে এইটুকুই যেন খাপ পাচ্ছে না। একেবারে বিমূঢ় হয়ে গেলেন অভিযাত্রীরা। এই অবস্থায় এ ধরনের সাদর স্বাগতম তাঁরা কল্পনাও করতে পারেন নি।

নিগ্রোদ্বজনকে পেছনে নিয়ে দু'জনে উঠে এলেন সিঁড়ি বেয়ে। সিঁড়ি পথ ঝলমল করছে অতি উজ্জ্বল ইলেকট্রিক ল্যাম্পে। বিশ ধাপ পেরিয়ে এসে দাঁড়ালেন আর একটা হলঘরে। পেছন পেছনে এলেন মারসেল ক্যামারেট। আর একটা দরজা খুলে সবিনয়ে অতিথিদের আগে যেতে অনুরোধ জানালেন।

এ ঘরটা বেশ বড়। একেবারেই অগোছালো একদিকের টেবিল ঘেঁসে একটা প্রকাণ্ড টেবিল—নকশা-আঁকিয়ে ড্রাফ্‌ট্‌স্‌ম্যানের টেবিল। বাকী তিন দিকের দেওয়ালে কড়ি কাঠ পর্যন্ত বইয়ের আলমারী ঘরময় ছড়ানো খান বারো চেয়ারের প্রতিটিতে তাগড়া করা রাশি রাশি বই। একটা চেয়ার থেকে বইয়ের গাদা মাটিতে নামিয়ে রেখে বসলেন মারসেল ক্যাম্যারেট। দেখাদেখি অভিযাত্রীরাও ছ'টি চেয়ারের বই মাটিতে নামিয় রেখে বসলেন। মালিক আর টোনগানে কেবল দাঁড়িয়ে রইল সসম্মানে।

"বলুন কি করতে পারি" সহজ শান্ত স্বরে বললেন ক্যাম্যারেট। বলা নেই কওয়া নেই, ডুম করে আটটা মানুষ যে বাড়ীতে চড়াও হয়েছে—তা নিয়ে বিন্দুমাত্র বিস্ময় নেই হাবভাবে।

মিনিট কয়েক অভ্যাগতরা তাই নিরীক্ষণ করে গেলেন বিচিত্র এই মানুষটিকে। জেটিতে হাঁটছিলেন চিন্তায় আচ্ছন্ন অবস্থায়—আটজনকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেও দেখেনি। ঠেলে ভেতরে ঢোকার পরেও চমকে ওঠেন নি—সামান্য অবাক হয়েছেন। হাবভাব সহজ সরল। চোখ-মুখে শিশুসুলভ সরলতা। সততার প্রোজ্জ্বল মূর্তি। দেহ কিশোরের মত—ললাট অতিমানুষের মত—নিখুঁত, প্রকাণ্ড, ভাস্বর। শিষ্ট, সজ্জন, ভদ্র, বিনয়ী না, এ মানুষকে হ্যারি পরিবারভুক্ত কীলারের বলা চলে না কিছুতেই।

আত্মবিশ্বাস ফিরে পেয়ে বারজাক বললেন—"মঁসিয়ে ক্যাম্যারেট, আপনার কাছে আশ্রয় চাইছি। আমাদের বাঁচান।"

বাঁচাব? কার হাত থেকে?" সামান্য অবাক হলেন ক্যাম্যারেট।

"টাউনের অত্যাচারী স্বেচ্ছাচারী মাস্টার—হ্যারি কীলারের হাত থেকে।"

"হ্যারি কীলার অত্যাচারি !...হ্যারি কীলার স্বেচ্ছাচারী !..."ক্যাম্যারেট যেন কিছুই বুঝতে পারছেন না।

বারজাক এবার আকাশ থেকে পড়লেন যেন—"জানেন না" ?

"না তো।"

বারজাক এবার অসহিষ্ণু হলেন—"এখানে একটা টাউন আছে, সে খবর রাখেন তো ?"

"তা রাখি বইকি ?"

"টাউনটার নাম ব্ল্যাকল্যাণ্ড—নয় কি ?"

"তাই নাকি ? ব্লাকল্যাণ্ড নাম দিয়েছে বুঝি ? মন্দ নাম কি ? অবশ্য এই প্রথম শুনলাম আপনার মুখে। অত খবর রেখে আমার দরকার নেই বলেই রাখিনি।"

বারজাক এবার শ্লেষ মিশোলেন গলার সুরে—"টাউনের নাম না হয় না জানেন, শহরে লোকজন আছে। সে খবর রাখেন তো ? একজন দুজন নয়—বেশ লোক ?"

"তা তো থাকবেই।"

"শহর থাকলেই শাসন ব্যবস্থা থাকে—গভর্ণমেন্ট থাকে। তাই তো ?"

"খুব স্বাভাবিক।"

"ব্ল্যাকল্যাণ্ডের গভর্ণমেন্ট রয়েছে হ্যারি কীলারের হাতের মুঠোয়। রক্ত-পিশাচ, বদমাস, নিষ্ঠুর, অত্যাচারী স্বেচ্ছাচারী হ্যারি কীলার...মাতাল জানোয়ার হ্যারি কীলার...পাগলও বটে।"

এতক্ষণ চোখ নামিয়ে বিনয়নম্র শান্তস্বরে জবাব দিচ্ছিলেন ক্যাম্যারেট। এবার বিমূঢ় হলেন। যেন আকাশ থেকে পড়লেন।

"আ-আপনি কিন্তু এমন ভাষায় কথা বলছেন..."

মেজাজ খিঁচড়ে গেল বারজাকের! বললেন বাঁকা গলায়—"অনেক ভদ্রভাষায় বলছি জানবেন। সে যা করেছে, তার তুলনায় কিছুই নয়। সব কথা বলার আগে শুনুন আমরা কে।"

জেন ব্লেজনের আসল পরিচয়টা কেবল গোপন করে গেলেন বারজাক। ক্যাম্যারেট উদাসীন ভঙ্গিমায় শুনে গেলেন সবার পরিচয়। শোনবার আগ্রহ যেন একেবারেই নেই।

বারজাক বললেন—"টোনগানেকে তো আগে থেকেই চেনেন।"

"হ্যাঁ...হ্যাঁ...চিনি বইকি," ফের চোখ নামিয়ে নিলেন ক্যাম্যারেট।

"আপনি নিজে ফরাসী ?"

"হ্যাঁ," আবেগশূন্য কণ্ঠস্বর ইঞ্জিনীয়ারের।

"ফরাসী সরকারের নির্দেশে একটা মিশন এসেছিল নাইজার বেণ্ডে। বারজাক মিশন। আমিই সেই মিশনের লীডার—এঁরা আমার সহযোগী। হ্যারি কীলার পদে পদে আমাদের বাধা দিয়েছে—ফলে অসীম কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে আমাদের।"

"কেন ? বাধা দেবে কেন ?" ক্যাম্যারেট প্রতিবাদ করলেন। এই প্রথম শোনবার আগ্রহ দেখালেন।

"যাতে তার গোপন বিবরের সন্ধান ইউরোপ না জানতে পারে। নাইজারে আমাদের ঢুকতে দিতে চায় নি—ব্ল্যাকল্যাণ্ডকে চিরকাল অজ্ঞাত অঞ্চল করে রাখতে চেয়েছে।"

"কী বলছেন !" ক্যাম্যারেট সিধে হয়ে বসলেন—"ইউরোপ খবর রাখে না বলছেন কেন ? শ্রমিক কর্মচারারা দেশে ফিরে গিয়ে নিশ্চয় বলেছে।"

"না। ইউরোপের কেউ জানে না ব্ল্যাকল্যাণ্ড বলে একটা আশ্চর্য দেশ আছে মরুভূমির বুকে।"

"কেউ জানে না ? এমন একটা টাউনের খবর কেউ রাখে না ? এত চাষআবাদের খবর কেউ শোনেনি ? কি বলছেন আপনি ?" একটু একটু করে বেড়েই চলল ক্যাম্যারেটের উদ্বেগ।

"না। কেউ জানে না।"

"মরুভূমিতে ফসল ফলছে—কেউ শোনেনি ?"

"বললাম তো—কেউ শোনেনি।"

উঠে দাঁড়ালেন ক্যাম্যারেট। অধীর আবেগে পায়চারী করতে লাগলেন ঘরের এদিক থেকে সেদিকে।

"ভাবা যায় না...ভাবা যায় না...এ যে ভাবতেও পারছি না।"

মিনিট কয়েক পরেই প্রকৃতস্থ হলেন ক্যাম্যারেট। সামলে নিলেন উত্তেজনা। চেয়ারে বসে বললেন শান্তস্বরে, কিন্তু ফ্যাকাশে মুখে—"তারপর ?"

"হ্যারি কীলার আমাদের ওপরে কত রকম অমানুষিক অত্যাচার যে করেছে। সব বর্ণনা দিয়ে আপনার ধৈর্যচ্যুতি ঘটাবো না। শেষকালে যখন কোনভাবেই আমাদের অভিযান ভণ্ডুল করতে পারল না—তখন নিশুতি রাতে ডাকাতের মত ঝাঁপিয়ে পড়ল আমাদের ওপর। আজ চোদ্দদিন হল এখানে এনে বন্দী করে রেখেছে আমাদের—হুমকি দিয়েছে আর ষোলদিন

পরে ফাঁসি দেবে।"

মুখ লাল হয়ে উঠল ক্যাম্যারেটের। শক্ত হয়ে উঠছে চোয়ালের হাড়।

"বলছেন কি! হ্যারি কীলার এমন করতে পারে?"

"আরও যা করেছে, শুনলে আপনি সহ্য করতে পারবেন না," বলে বারজাক বলে গেলেন কিভাবে জেন ব্লেজনের ওপর মানসিক অত্যাচার চালিয়েছে হ্যারি কীলার, কিভাবে ক্ষমতা দেখানোর জন্যে দু'দুজন নিরীহ নিগ্রোকে বর্বরের মত খুন করেছে—একজনকে আকাশ-টর্পেডো মেরে, আর একজনকে আকাশ থেকে ফেলে দিয়ে।

থ হয়ে বসে রইলেন মারসেল ক্যাম্যারেট। এই প্রথম চিন্তার জগৎ থেকে তিনি বাস্তব জগতে এসে পড়লেন। জাগতিক সব ব্যাপারে যিনি অনীহা দেখিয়েছিলেন প্রথম দিকে, এখন তিনিই শিউরে উঠলেন রক্ত জমানো বীভৎস নিষ্ঠুরতার বর্ণনা শুনে। সহজ সরল নিষ্পাপ মানুষ উনি। একটা মাছি মারতে পারেন না নিজের হাতে। অথচ একটা পাপিষ্ঠ মানুষ খুনের সংসর্গে কাটিয়েছেন দশ দশটা বছর। এতটুকু সন্দেহ হয়নি!

"কী ভয়ংকর!···কী ভয়ংকর!···গায়ে কাঁটা দিচ্ছে শুনে!"

মারসেল অপাপবিদ্ধ বৈজ্ঞানিক—প্রকৃতি অত্যন্ত নরম। এহেন পাপাচারের কাহিনী শুনে তাই বিবেককে দাবিয়ে রাখতে আর পারলেন না। এরকম নরকের কীটের সঙ্গে এত বছর একসঙ্গে কাটিয়েছেন ভাবতেই আত্মধিক্কারে রি-রি করে উঠল সর্বাঙ্গ।

বারজাক বললেন—"মঁসিয়ে ক্যাম্যারেট, এত অন্যায় যে করতে পারে—সে নিশ্চয় আগেও অনেক করেছে। খবর-টবর কিছু রাখেন হ্যারি কীলার সম্পর্কে?"

"আপনি···আপনি আমাকে জিজ্ঞেস করছেন?" প্রতিবাদে ফেটে পড়লেন ক্যাম্যারেট। "জানলে কি আমি তার সঙ্গে দশ বছর থাকতাম? ফ্যাক্টরী নিয়ে থাকি, দিনরাত নানান পরিকল্পনা চিন্তা করি—বাইরের কোনো খবরই রাখি না। কোনোদিন কিছু দেখিনি, শুনিনি, জানিনি।"

"মঁসিয়ে ক্যাম্যারেট, তাহলে একটা প্রশ্নের জবাব দিন। এখানে এসে ইস্তক ব্ল্যাকল্যাণ্ডের বিস্ময় আমাদের মাথা ঘুরিয়ে দিচ্ছে। দশ বছর আগেও যেখানে ধূ-ধূ মরুভূমি ছিল—আজ সেখানে এলাহি কাণ্ড কারখানা চলছে। হ্যারি কীলারের ব্রেন হয়ত এককালে ছিল—কিন্তু এখন তা মদে নষ্ট হয়ে গেছে। তাহলে এ বিস্ময় সৃষ্টি করল কে?"

মারসেল ক্যাম্যারেট যেন আঁৎকে উঠলেন—"হ্যারি কীলার ছাই করেছে ? ওর মাথায় আছে কী ? এ সবের মূলে এমন একজন আছে হ্যারি কীলারের সঙ্গে যার তুলনাই হয় না।"

"সে কে ?"

"আমি !" অহংকারে ফুলে উঠলেন ক্যাম্যারেট। প্রদীপ্ত হল মুখচ্ছবি। "আমিই এই সবের সৃষ্টিকর্তা। আমিই বালিতে বৃষ্টি ঝরিয়েছি, মরুভূমিতে ফসল ফলিয়েছি। মহাশূন্য থেকে ঈশ্বর যেমন জগৎ সৃষ্টি করেছিলেন, আমিও শূন্য থেকে আশ্চর্য এই নগর বানিয়েছি !"

ওপর পানে তাকিয়ে আছেন মারসেল ক্যাম্যারেট—যেন নিজের সমকক্ষকে চ্যালেঞ্জ করছেন ঊর্ধ্ব গগনের পানে তাকিয়ে। এক হাত ভাঁজ করে বুকে রেখে এই মুহূর্তে তিনি আত্মসমাহিত, ঊর্ধ্বনেত্র এবং আত্মপ্রশস্তিতে তন্ময়। আর এক পাগলের পাল্লায় পড়লেন নাকি অভিযাত্রীরা ? উসখুস করে উঠলেন সবাই। দৃষ্টি বিনিময় করলেন নিজেদের মধ্যে।

নৈঃশব্দ্য ভঙ্গ করে চাতোন্নে বললেন—"নিজের হাতে এত সৃষ্টি হ্যারি কীলারের হাতে সব সঁপে দিলেন কি আক্কেলে ? হ্যারি কীলার আপনার সৃষ্টিকে কি কাজে লাগাবে, তা কি ভাবেন নি ?"

"ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি করার আগে কি ভেবেছিলেন জগতের কি হবে ?"

"দণ্ড দেওয়ার ভারটা কিন্তু তিনি হাতেই রেখেছিলেন।"

"আমারও আছে। হ্যারি কীলারের পাপের সাজা আমিই দেব।" আবার চোখ জ্বলে উঠল ক্যাম্যারেটের—অসুস্থ দ্যুতি। ঘাবড়ে গেলেন অভিযাত্রীরা। ক্যাম্যারেট প্রতিভাধর ঠিকই—কিন্তু বেসামাল। মনে ভারসাম্য নেই। এমন লোকের ওপর ভরসা করা কি ঠিক ?

অ্যামিদী ফ্লোরেন্স চিরকাল বড় বাস্তববাদী। সোজা কাজের কথায় চলে এলেন—"হ্যারি কীলারকে চিনলেন কিভাবে ? ব্ল্যাকল্যাণ্ড সৃষ্টির পরিকল্পনাটাই বা আপনার মাথায় এল কেন ?

"পরিকল্পনা আমার নয়—হ্যারি কীলারের—আমি শুধু তার রূপ দিয়েছি।" আস্তে আস্তে আবার শান্ত হয়ে আসছেন ক্যাম্যারেট। "জর্জ ব্লেজন নামে একজন ক্যাপ্টেন একটা ইংলিশ সৈন্যবাহিনী নিয়ে আফ্রিকায় এসেছিলেন—আমি ছিলাম সেই অভিযানে।"

নামটা শুনেই সবার চোখ ঘুরে গেল জেনের ওপর। তিনি কিন্তু একটুও বিচলিত হলেন না।

"সার্জেন্ট টোনগানেও ছিল সেই বাহিনীতে। ঐ জন্যে দেখেই চিনেছি। আমি ছিলাম ইঞ্জিনীয়ার। পর্বত সম্বন্ধীয় ভূগোল অরগ্র্যাফি-পৃথিবীর জল, ভাগের বৈজ্ঞানিক বিবরণ সম্পর্কীয় শাস্ত্র হাইড্রগ্রাফি, আর খনিজবিজ্ঞান মিন্যারলজি নিয়ে গবেষণার জন্যে এসেছিলাম। আশান্তি-ল্যাণ্ডের আসিরা থেকে রওনা হয়ে দু'মাস অভিযান চালানোর পর একদিন আমাদের দলে এসে যোগ দিল হ্যারি কীলার। ক্যাপ্টেন জর্জ ব্লেজন সাদরে তাকে দলে টেনে নিলেন। সেই থেকে আমাদের কাছ ছাড়া হয়নি।"

জেন ব্লেজন বলে উঠলেন—"আরো স্পষ্ট করে বললে, সেইদিন থেকে আস্তে আস্তে হ্যারি কীলার ক্যাপ্টেন ব্লেজনের জায়গা এমন ভাবে দখল করল যে কেউ আর তা খেয়ালও করেনি?"

ক্যামারেট প্রশ্ন শুনে অবাক হলেন না। বললেন—"সঠিক বলতে পারব না। নিজের কাজে ডুবে থাকতাম। দুজনের কাউকেই খুব একটা দেখতাম না। তবে যা বললেন, তা হলেও হতে পারে। একদিন আটচল্লিশ ঘণ্টা পরে একটা ব্যক্তিগত অভিযান শেষ করে ক্যাম্পে ফিরে সৈন্য সামন্ত যন্ত্রপাতি কিছুই আর দেখতে পেলাম না। কিছুই নেই—আমি একা। মন খিঁচড়ে গেল। কোন দিকে যাব ভাবছি, এমন সময় দেখা হল হ্যারি কীলারের সঙ্গে।

"আমাকে বলল, দলের বেশীর ভাগ লোকজন নিয়ে উপকূলের দিকে রওনা হয়েছেন ক্যাপ্টেন ব্লেজন। হ্যারি কীলারের সঙ্গে বিশজন লোক আছে। আমাকে নিয়ে বাকী পথ পাড়ি দেবে। বেঁচে গেলাম। দ্বিধা করলাম না। কেন করব? ক্যাপ্টেন কোথায় গেছেন, তা জানি না। খুঁজব কি করে, তাও জানি না। গেলাম হ্যারি কীলারের সঙ্গে। আমার মাথায় বেশ কয়েকটা আবিষ্কারের প্ল্যান এসেছিল। হ্যারি কীলারকে বলেছিলাম। এইখানে আনল আমাকে। বলল, যা পারেন করুন। রাজী হলাম। ওর সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে উঠল সেই থেকে।"

জেন ব্লেজন বললেন—"মঁসিয়ে ক্যামারেট, হ্যারি কীলার সম্পর্কে আপনি যা জানেন না, এবার আমাকে তা বলতে দিন। যেদিন থেকে সে ক্যাপ্টেন ব্লেজনের দলে আসে, সেইদিন থেকে পুরো বাহিনীটা খুন জখম লুঠতরাজ রাহাজানি চালিয়ে গেছে। সৈন্য বাহিনী শেষ পর্যন্ত ডাকাত বাহিনী হয়ে উঠেছে। গ্রাম পুড়িয়েছে, পুরুষদের জবাই করেছে, মেয়েদের কচুকাটা করেছে, বাচ্চাদের টুকরো টুকরো করেছে।"

"অসম্ভব! ···হতেই পারে না। আমার চোখে পড়েনি।"

"চোখে পড়েনি এখানকার কাণ্ডকারখানাও—অথচ আপনার চোখের সামনেই সব ঘটেচে—দশ বছর ধরে। দেখেও দেখেন নি হ্যারি কীলার নরক গড়ে তুলেছে আপনারই চোখের সামনে—আপনার বলেই বলীয়ান হয়ে। কিন্তু আমি যা বললাম, তা এখন ঐতিহাসিক ঘটনা। উড়িয়ে দেওয়া যায় না।"

"কিন্তু···কিন্তু আমি জানতাম না!" আমতা আমতা করতে লাগলেন ক্যামারেট।

"যাই হোক, সৈন্য বাহিনীর কুকীর্তি ইউরোপে সাড়া জাগায়। গুজবের আকারে খবর পৌঁছোয় সভ্যদেশে। সশস্ত্র বাহিনী পাঠানো হয়। তারা ধ্বংস করে ক্যাপ্টেন ব্লেজনের বিদ্রোহী বাহিনীকে। আপনি ব্যক্তিগত অভিযান থেকে ফিরে এসে তাই তাঁদের দেখতে পাননি। আপনি ভেবেছিলেন, ক্যাপ্টেন ব্লেজন আপনাকে ফেলে চলে গেছেন। আসলে তিনি খুন হয়েছিলেন।"

"খুন!"

"সশস্ত্র বাহিনীর গুলিতে নয়—ছোরার ঘায়ে। পেছন থেকে ছোরা মেরে গুম খুন করা হয় তাঁকে।"

"গুম খুন!"

"আপনাকে আমার আসল পরিচয় দেওয়া হয়নি। আমার নাম·জেন মোরনাস নয়—জেন ব্লেজন—ক্যাপ্টেন ব্লেজনের ছোট বোন। দাদাকে নিয়ে সারা ইউরোপে ঢি-ঢি পড়ে যায়। লজ্জায় অপমানে বাবার মাথা হেঁট হয়ে যায়। তাঁর মন ভেঙ্গে যায়। তাই আমি এসেছিলাম দাদা যে নিরপরাধ, তা প্রমাণ করার জন্যে। যা ভেবেছিলাম, দেখছি তাই হয়েছে। দাদার নামে ডাকাতি করে অন্য একজন—তারপর গুম খুন করেছে দাদাকে।"

"গুম খুন!" মাথা হেঁট করে বিড়বিড় করলেন ক্যামারেট।

"পেছন থেকে।" বলে, পোশাকের ভেতর থেকে মরচে পড়া ছোরাটা বার করলেন জেন ব্লেজন—"এই ছোরা দিয়ে · খুন করা হয় তাকে। দাদার কবর খুঁড়ে তার কংকালের বুকের পাঁজরা থেকে উদ্ধার করেছি। হাতলে হত্যাকারীর নাম লেখা ছিল—এখন শুধু দুটো অক্ষর পড়া যাচ্ছে—এই দেখুন। তখন বুঝিনি পুরোনো নামটা কি। এখন বুঝেছি—'হ্যারি কীলার'।"

একটু একটু করে উত্তেজিত হয়ে উঠছিলেন ক্যামারেট। ঘন ঘন অস্থির হাতে কপালের ঘাম মুছছিলেন।

"কী ভয়ংকর! ···কী ভয়ংকর! ···কিছুই জানি না আমি।" আবার

সেই বেসামাল চাহনি ফুটে উঠল চোখের তারায়।

বারজাক বললেন—"ঠাঁই দেবেন তো ?"

"দেব না ভাবলেন কি করে ? জিজ্ঞেস করার কি আছে ?" জ্বলে উঠলেন ক্যামারেট—যা তাঁর স্বভাবের ঠিক উল্টো। "আপনি কি ভাবেন এত বড় অন্যায় যে করেছে, তার সঙ্গে হাত মিলিবো ? সাজা দেব—সাংঘাতিক সাজা।"

ফ্লোরেন্স চিরকাল বাস্তববাদী। ফস করে বললেন—"সাজা দেবেন পরে—আগে আমাদের বাঁচান হ্যারি কীলারের খপ্পর থেকে।"

হাসলেন ক্যামারেট। আবার সহজ হয়ে উঠেছেন ভদ্রলোক।

বললেন—"সে জানে না আপনারা এখানে। জানলেও আপানারা নিশ্চিন্ত থাকুন।"

বোতাম টিপতেই ঘরে ঢুকল একজন নিগ্রো।

"জ্যাকো, এঁদের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করো।" যেন ভারী সোজা ব্যাপার, এমনিভাবে কথাটা বলেই চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন ক্যামারেট। দরজার কাছে গিয়ে শুভরাত্রি জানিয়ে প্রশান্ত ভাবে বেরিয়ে গেলেন।

ভ্যাবাচাকা খেয়ে দাঁড়িয়ে রইল বেচারা জ্যাকো। কারখানা বাড়ীতে অতিথিদের থাকার ব্যবস্থা নেই। এত রাতে শ্রমিক কর্মচারীদের ডেকে তুলতে হবে নাকি ? ঘর কোথায় ?

সমাধান বাতলে দিলেন অভিযাত্রীরা। রাত অনেক হয়েছে। বাকী রাতটা এই ঘরেই তাঁরা কাটাবেন। খান কয়েক চেয়ার আর চাদর পেলেই যথেষ্ট।

ভোরবেলা প্রশান্ত মূর্তিকে ঘরে এলেন ক্যাম্যাবেট। গতরাতে যেমন সহজভাবে "গুডনাইট' বলে গেছিলেন, সেইরকম সহজভাবে গুডমর্ণিং বললেন।

তারপর বললেন—''জেন্টেলসেন, এই পরিস্থিতির এখুনি বিহিত করা দরকার।"

বোতাম টিপলেন। ঘন্টা বেজে উঠল কারখানা ময়। বললেন—"আসুন।"

বেশ কয়েকটা গলিপথ পেরিয়ে পৌঁছোলেন একটা বড় হলঘরে। সারি সারি মেশিন সেখানে। কোনোটাই চলছে না। শ্রমিক কর্মচারীরা দাঁড়িয়ে আছে।

ক্যাম্যাবেট বলবেন—"রিগড, রোলকল করো।"

দেখা গেল সবাই হাজির।

ক্যাম্যারেট তখন প্রথমে পরিচয় দিলেন আটজন নবাগতের। তারপর বললেন কাল রাতে যা শুনেছেন—ভয়ংকর সেই কাহিনী। কিভাবে ক্যাপ্টেন ব্লেজনকে দিয়ে খুন জখম লুঠ তরাজ চালিয়েছে হ্যারি কীলার, কিভাবে খুন করা হয়েছে ক্যাপ্টেনকে, কিভাবে বারজাক মিশনের সদস্যদের গায়ের করে এনে বন্দী করা হয়েছে ব্ল্যাকল্যাণ্ডে, কি ভাবে জেন ব্লেজনের ওপর মানসিক অত্যাচার চলেছে এবং কিভাবে দুজন নিরীহ নিগ্রোকে বর্বরের মত খুন করা হয়েছে। একটা কথাও বাদ দিলেন না।

স্তম্ভিত হয়ে শুনে গেল শ্রমিক কর্মচারীরা। ডিরেক্টরকে তারা শ্রদ্ধা করে। অবিশ্বাস করার প্রশ্নই ওঠে না।

ক্যাম্যারেট গুছিয়ে বলে গেলেন, তাহলে দেখা যাচ্ছে না জেনে তাঁরা একদল খুনে ডাকাতেরা সাগরেদি করে যাচ্ছেন, ফ্যাক্টরীকে এরা কাজে লাগাচ্ছে কুকাজে। এর বিহিত হওয়া দরকার। বারজাক মিশনের কোনো সদস্যকেই আটক রাখার অধিকার হ্যারি কীলারের নেই। এঁদের দেশে ফিরিয়ে দিতে হবে এবং এ-নিয়ে হ্যারি কীলারের কোন কথাই শোনা হবে না।

সবিস্ময়ে সব শুনল শ্রমিক কর্মচারী। একটা কথাও কেউ বলল না। ডিরেক্টরের সঙ্গে যে একমত প্রত্যেকেই—তা মৌনতার মধ্যেই প্রকাশ পেল।

মোক্ষম খবরটা দেওয়া হল সবশেষে। শ্রোতাদের কল্পনা উদ্দীপ্ত করার পর, তাদের মনের জমি তৈরী করে নেওয়ার পর, ক্যাম্যারেট বললেন :

"সবচেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার হচ্ছে, ইউরোপের কেউ জানে না মরুভূমির মাঝে এমন একটা শহর আছে। অথচ জানার কথা অ্যাদ্দিনে। এটা ঠিক যে এই শহর মরুভূমির এমন ভেতরে যেখান দিয়ে উটের কনভয় পর্যন্ত যায় না। কিন্তু এখানে এসে বাড়ীর জন্যে মন কেমন করায় অনেকে চলে গেছেন। কাল রাত্রে গুনে দেখলাম, এই দশ বছরে একশ সাঁইত্রিশ জন ফ্যাক্টরী থেকে দেশে গেছেন। এঁদের কয়েকজনও দেশে পৌঁছোলে আশ্চর্য এই শহর আর ক্ষেত খামারের কথা সারা ইউরোপ জেনে যেত। কিন্তু কেউ যখন শোনেনি, আমরা ধরে নেব—এই একশ সাঁইত্রিশ জনের একজনও দেশে পৌঁছোন নি।"

অকাট্য যুক্তি। মানতে বাধ্য হল শ্রোতারা। বজ্রাহতের মত স্তম্ভিত প্রত্যেকেই। ঘর নিস্তব্ধ।

ক্যাম্যারেট শেষ করলেন বড সুন্দর ভাবে।

বললেন—"পরিণামটা কি বুঝতেই পারছেন। আমরা কেউ আর দেশে ফিরতে পারব না। হ্যারি কীলার কাউকে দেশের মাটিতে পা দিতে দেবে না। আমাদের জীবন মুঠোর মধ্যে নিয়ে বসে আছে হ্যারি কীলার। এ অবস্থা চলতে দেওয়া যায় না। বিদ্রোহ করতেই হবে।"

"হ্যাঁ।...হ্যাঁ।...আমরা আছি আপনার পাশে।" ঘর যেন ফেটে গেল চিৎকারের পর চিৎকারে।

মারসেল ক্যাম্যারেটের ওপর আস্থা তাদের অসীম। প্রথমে দমে গিয়েও তাই সাহস ফিরে পেয়েছে শ্রমিক কর্মচারীরা। একযোগে প্রত্যেকে তাই হাত বাড়িয়ে দিলে নেতার দিকে—সবাই আছে সঙ্গে? জলুক বিদ্রোহের আগুন।

ক্যাম্যারেট বললেন—"আপনারা যে-যার কাজ করে যান। আমি থাকতে আপনাদের কোনো ভয় নেই।"

হুল্লোরের অট্টরোলে ঘর যেন ফেটে চৌচির হওয়ার উপক্রম হল।

ফোরম্যান রিগড়কে নিয়ে বেরিয়ে এলেন ক্যামারেট—পেছনে অভিযাত্রীরা। নিজের ঘরে আসতে না আসতেই বেজে উঠল টেলিফোন রিসিভার তুলে নিলেন মারসেল ক্যাম্যারেট।

নরম স্বরে বললেন—"হ্যাঁ...না...বেশতো...যা ভাল বোঝেন।" হাসলেন। রিসিভার রেখে দিলেন।

তিলমাত্র আবেগ বা উত্তেজনা না দেখিয়ে বিনম্র স্বরে বললেন অভি-যাত্রীদের—"হ্যারি কীলার ফোন করছিল। আপনারা এখানে এসেছেন, জেনে গেছে।..."

"এর মধ্যেই!" বারজাক যেন আঁৎকে উঠলেন।

"হ্যাঁ, চৌমৌকি বলে একটা লোক খবর দিয়েছে। তাকে বাঁধা অবস্থায় পাওয়া গেছে। নদীতে একটা নৌকো ভাসতে দেখা গেছে। শহরের বাইরে আপনারা যেতে পারেন নি—যদি যেতেন নিশ্চয় খবর পেয়ে যেত হ্যারি কীলার। তাই ধরে নিয়েছে আপনারা এখানে এসেছেন। আমি অস্বীকার করলাম না। তখন ও বললে, আপনাদের যেন ফিরিয়ে দিই। আমি রাজী হলাম না। তখন রেগে গিয়ে বললে গায়ের জোরে আপনাদের ধরে নিয়ে যাবে। আমি হেসে লাইন ছেড়ে দিলাম।"

একসঙ্গে উঠে দাঁড়ালেন অভিযাত্রীরা।

বারজাক বললেন—"আমাদের বন্দুক দিন।"

"বন্দুক?" হাসলেন ক্যাম্যাবেট। "বন্দুক দিয়ে কি. হবে? তাছাড়া এখানে ও জিনিস নেই। দরকারও হবে না। অন্য পন্থায় কাজ সারব।"

"প্যালেস থেকে কামান ছুঁড়লে রুখতে পারবেন?"

"নিশ্চয়। সব ব্যবস্থাই আছে। ইচ্ছে করলে পুরো শহরটাকে মাটিতে মিশিয়ে দিতে পারি—চক্ষের নিমেষে। কিন্তু অতদূর যেতে চাই না। প্যালেস-কামানও দাগা হবে না—নিশ্চিন্ত থাকুন। কারণ হ্যারি কীলার জানে আমার ক্ষমতা, জানে ফ্যাক্টরীর বেশীর ভাগ অংশ শেল-প্রুফ—কামান দেগে ভাঙা যায় না। আরও জানে এই ফ্যাক্টরীই ওর যত কিছু শক্তির উৎস ওর প্রাণ ভোমরা। কাজেই কামান দেগে কারখানা ভাঙবে না—লোক পাঠাবে গায়ের জোরে কাজ হাসিল করার জন্যে। কিন্তু পারবে না।"

কথাটা যে কতদূর খাঁটি তার প্রমাণ পাওয়া পাওয়া গেল সঙ্গে সঙ্গে। একটা গুম গুম শব্দ শোনা গেল। শব্দটা আসছে নিচের তলা থেকে।

প্রসন্ন কণ্ঠে ক্যাম্যাবেট বললেন—"দেখলেন তো? দরজা ভাঙবার চেষ্টা করছে। কিন্তু ও দরজা ভাঙবার ক্ষমতা ওদের নেই।"

"কিন্তু যদি কামান নিয়ে আসে?" ইঞ্জিনীয়ারের আত্মবিশ্বাসে মোটেই যেন আশ্বস্ত হতে পারছেন না বারজাক।

"তাহলেও নাকের জলে চোখের জলে হতে হবে। প্যালেস থেকে জলপথে জেটিতে কামান নিয়ে আসা চাট্টিখানি কথা নয়। কাজেই আপাতত: ওরা কাঠের বরগা মেরে কপাট ভাঙতে চাইবে। ফলে, একশ বছর লাগবে পাল্লা ভাঙতে। আসুন আপনারা—দেখে যান ফ্যাক্টরী অবরোধ অত সোজা নয়।"

ক্যাম্যাবেটের পেছন পেছন এলেন সবাই। উদ্বেগ বাগ মানছে না কারোরই। হ্যারি কীলার খেপেছে। হ্যারি কীলার আক্রমণ করেছে! পারবেন কি ক্ষীণকায় এই পুরুষ তার বর্বর শক্তির সঙ্গে টক্কর দিতে?

মেশিন ঘরে কোন মেশিন চলছে না। শ্রমিক-কর্মচারীরা জটলা পাকাচ্ছে। গুলতানি করছে। কাজে মন নেই। দেখেও দেখলেন না ক্যাম্যাবেট।

করিডরের পর পর করিডর পেরিয়ে একটা ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে উঠে পৌঁছোলেন টাওয়ারের প্ল্যাটফর্মে। প্যালেসেও এমনি টাওয়ার আর প্ল্যাট-ফর্ম দেখেছেন অভিযাত্রীরা। কিন্তু এখানকার প্ল্যাটফর্মের চারপাশে বেড়

দিয়ে রহস্যময় সেই পাইলন প্রায় একশ গজ শূন্যে মাথা উঁচিয়ে রয়েছে। প্যালেস-টাওয়ারের মত এখানেও রয়েছে একটা সাইক্লোসকোপ—পাইলনের মাঝামাঝি। সাইক্লোসকোপের ভেতরে ঢুকলেন ক্যাম্যাবেট—পেছনে অভিযাত্রীরা।

বললেন—"হ্যারি কীলারকে যে সাইক্লোসকোপ বানিয়ে দিয়েছি প্যালেস-টাওয়ারে—এটা তার মত বেশীদূর নজর রাখতে পারে না। কিন্তু এর কাজ অন্য। প্যালেসের নানান কোণে কায়দা করে কয়েকটা আয়না বসানো আছে। ফ্যাক্টরীর পাঁচিলের তলা পর্যন্ত প্রতিফলিত হয় সেই আয়নায়, দেখা যায় এখানকার সাইক্লোসকোপে।"

সত্যিই দেখা যাচ্ছে। এসপ্ল্যানেড, জেটি আর ফ্যাক্টরীর পাঁচিল বরাবর রাস্তায় লোকজন ছুটোছুটি করছে। আকারে ছবিগুলো ছোট হলেও স্পষ্ট। দরজার কাছে দেখা যাচ্ছে জনা বিশেক লোক কালঘাম ছোটাচ্ছে পাল্লা ভাঙবার চেষ্টায়।

ক্যাম্যাবেট বললেন—"যা ভেবেছিলাম। কারখানার ভেতরে লোক ঢোকাবার চেষ্টা করছে হ্যারি কীলার। ঠিক আছে, আমিও তৈরী।"

দেখা গেল বেশ কয়েকটা মই লাগানো হয়েছে পাঁচিলের গায়ে। বেশ কয়েকজন মেরী ফেলো মই বেয়ে উঠে সাত পাঁচ না ভেবেই খামচে ধরল পাঁচিলের মাথা।

ব্যস, সঙ্গে সঙ্গে পালটে গেল চিত্রপট। পাঁচিলের মাথায় হাত দিতে না দিতে তাণ্ডব নাচ আরম্ভ করে দিল মেরী ফেলোরা। যেন আঠায় হাত আটকে গেছে. এমনিভাবে পাঁচিলের মাথা ধরে ঝুলতে ঝুলতে পা ছুঁড়ে শরীর নাচিয়ে সে এক অবর্ণনীয় নাচ নাচতে লাগল ঝুলন্ত অবস্থায়। যেন অদৃশ্য সুতোয় বাঁধা একদল পুতুল—পুতুল নাচানিয়া সুতোয় টান দিচ্ছে আড়াল থেকে—শূন্যে নাচছে পুতুলের দল।

"বোকার দল।" বুঝিয়ে দিলেন ক্যাম্যাবেট। "তামার চাইতে বিদ্যুৎ পরিবাহিতা যার একশগুণ বেশী, এমনি একটা ধাতু দিয়ে পাঁচিলের মাথা মুড়ে দিয়েছি—বুঝতেই পারছেন এ ধাতুর নাম কেউ শোনেনি—আমার আবিষ্কার। জোরালো ভোল্টেজের অলটারনেটিং কারেন্ট মানে, এ. সি. বিদ্যুৎ চালিয়ে দিয়েছি ধাতুর পাতের মধ্যে দিয়ে। ফলটা দেখতেই পাচ্ছেন।"

ইতিমধ্যে আর এক কাণ্ড হয়েছে। মইয়ের ওপরে উঠে মেরী ফেলোরা

হঠাৎ কেন অমন বিদঘুটে নাচ নাচছে, বুঝতে না পেরে মইয়ের নিচের ধাপের লোকেরা পা চেপে ধরেছিল ওপরের লোকেদের। সঙ্গে সঙ্গে তাদের হাতও যেন আঠার মত লেগে গেল ওপরের লোকেদের পায়ে। একই ঢংয়ে নাচ আরম্ভ হয়ে গেল উদ্দাম অবর্ণনীয় ভঙ্গিমায়! হাঁ করে চেয়ে সেন্ট বেরেন বললেন—"আচ্ছা পাগল তো! হাত ছেড়ে দিয়ে লাফিয়ে পড়লেই পারে।"

"হাত টেনে তুলতে পারলে তো! যতক্ষণ খুশী আটকে রাখতে পারি এই ভাবে। তবে এর চাইতেও ভাল একটা খেলা দেখাচ্ছি দেখুন।"

বলেই একটা সুইচ টিপে দিলেন ক্যাম্যারেট। সঙ্গে সঙ্গে যেন অদৃশ্য হাতে কে ঠেলে দিল মইগুলো। পাঁচিল থেকে ঠিকরে গিয়ে দমাস্ করে আছড়ে পড়ল রাস্তার ওপর—সেই সঙ্গে হুড়মুড় করে ঘাড়ের ওপর ঘাড়ের ওপর পড়ল হানাদাররা।

হৃষ্টস্বরে ক্যাম্যারেট বললেন—"হাত-পা ভাঙলে আমি দায়ী নই—ওরাই আগে চড়াও হয়েছে। কি করে পড়ল মইগুলো শুনতে চান?"

"বলুন না।"

"আমার মতে সব শক্তিই ইথারের মধ্যে এক এক রকমের কম্পন ছাড়া কিছুই নয়। যেমন, আলো এক বিশেষ তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের কম্পন। বিদ্যুতও তাই—তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য কেবল অন্য রকমের। আমার বিশ্বাস, তাপমাত্রার সঙ্গে এই শেষের কম্পনের কোথাও একটা মিল আছে। কারণটা সঠিক ধরতে পারিনি—তবে কম্পনটা সৃষ্টি করতে পারি ইথারের মধ্যে। অদ্ভুত ফলাফল পেয়েছি প্রতিবারে। এইমাত্র একটা প্রমাণ দেখতে পেলেন।"

ঝুলন্ত আঙুরের মত নরদেহগুলো তখনও ফ্যানট্যাসটিক নৃত্য নেচে চলেছে।

ক্যাম্যারেট বললেন—"অনেকক্ষণ হয়েছে—এবার ছুটি।" বলেই পটাং করে টিপে দিলেন আর একটা সুইচ।

অমনি তিরিশফুট ওপর থেকে ধড়াধ্বড় লোকগুলো এসে পড়ল রাস্তার ওপর—পড়েই রইল—নড়ল না। কিছুক্ষণ ভয়ে ভয়ে দূরে থাকার পর সঙ্গীরা এসে তাদের ধরাধরি করে নিয়ে গেল তফাতে।

স্বভাবসিদ্ধ প্রশান্ত কণ্ঠে ক্যাম্যারেট বললেন—"প্রথম অংকে যবনিকা পড়ল। এবার যারা দরজা ঠেঙাচ্ছে আসুন তাদের একটু শিক্ষা দিই।" টেলিফোন ট্রান্সমিটার তুলে নিয়ে—"রিগড, তৈরী তো?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ," সাইক্লোসকোপের সর্বত্র শোনা গেল রিগডের কণ্ঠস্বর।'

"দাও ছেড়ে!"

ক্যাম্যারেটের সরাসরি হুকুম শুনেই যেন তৎক্ষণাৎ টাওয়ারের নিচের দিক থেকে বেরিয়ে এল অদ্ভুত দর্শন একটা যন্ত্র। একটা চোঙা। শঙ্কুর মত ছুঁচোলো মুখটা নিচের দিকে রেখে খাড়াই অবস্থায় টাওয়ারের গা থেকে তফাতে সরে এল কিম্ভূতকিমাকার চোঙাটা। দেখা গেল চোঙার পেছনে চারটে প্রপেলার। একটা রয়েছে খাড়াই অবস্থায়. তিনটে অনুভূমিক অবস্থায়। চারটে প্রপেলারই ঘুরছে বন্‌বন্‌ করে এত জোরে ঘুরছে যে দেখাই যাচ্ছে না। মাটি থেকে কয়েক গজ শূন্যে উঠেই যেন শূন্যে শুয়ে পড়ল চোঙাটা—অনুভূমিক অবস্থায় উড়ে গেল পাঁচিলের গা ঘেসে।

ঠিক পেছনেই বেরিয়ে এল আর একটা। তারও পেছনে একটা। নিয়মিত সময়ের ব্যবধানে কিম্ভূতকিমাকার বিশটি যন্ত্র বিহঙ্গ বাসা থেকে বেরিয়ে এসে পাঁচিলের গা ঘেঁসে লাইন দিয়ে উড়ে গেল একই দিকে।

"আমার বোলতা বাহিনী", 'বোলতা' শব্দটার ওপর জোর দিয়ে বললেন ক্যাম্যারেট—'পরে বলব কি ভাবে উড়ছে এরা। এখন শুধু রগড় দেখুন।'

বলেই, রিসিভার তুললেন—"রিগড, সাবধান করো।" নতুন বন্ধুদের তাকিয়ে—'ওরা তো আমার স্বাতি বর্গের—তাই শুধু সাবধান করে দিচ্ছি।"

মই পড়ে যাওয়ার পর আহত আর নিহতদের নিয়ে সার্কুলার রোড ছেড়ে একটা দল জড়ো হয়েছে এসপ্ল্যানেডে। কিন্তু অন্য দলটা বিরাট একটা কড়ি-কাঠ দিয়ে সমানে গুঁতোচ্ছে দরজা। বিশজন গুণ্ডামার্কা লোক দেহের সমস্ত শক্তি দিয়ে কড়িকাঠের প্রচণ্ড গুঁতো মেরেও কব্জা থেকে পাল্লা খসাতে পারছে না। এমন সময়ে পাঁচিলের কোণ ঘুরে বোলতা বাহিনীর পুরোধা উড়ে এল তাদের মাথার ওপরে। ভ্রূক্ষেপ করল না আততায়ীরা।

সঙ্গে সঙ্গে গজে উঠল প্রথম বোলতা। এক ঝাঁক মেশিন গানের গুলি চক্রাকারে আততায়ীদের প্রায় একশ গজ পেছনে ধুলো উড়িয়ে নিয়ে গেল। সচমকে কড়িকাঠ হাতে ওপরে চাইল দুশমনের দল।

তৎক্ষণে দ্বিতীয় বোলতা এসে গেছে মাথার ওপর। আবার কট-কট-কট-কট শব্দে গর্জে উঠল মেশিন গান, আবার এক ঝাঁক গুলি চক্রাকারে ধুলো উড়িয়ে নিয়ে গেল আততায়ীদের পেছন থেকে—এবার অত তফাতে নয় বেশ কাছ থেকে। কয়েক জন গুলির ঘায়ে লুটিয়ে পড়ল রাস্তায়। বাকী

সবাই কড়িকাঠ ফেলে ভোঁ দৌড় দিল এসপ্লানেডের দিকে।

চোখে দেখেও যেন বিশ্বাস করতে পারছিলেন না অভিযাত্রীরা। প্রত্যেকটা বোলতা ঝাঁকে ঝাঁকে গুলিবৃষ্টি করে আপনা হতেই পেছন্ ঘুরে ফিরে আসছে বাসায়—টাওয়ারের গোড়ায়। গুলি ভরে নিয়ে ফের উড়ে যাচ্ছে পাঁচিলের গা ঘেঁসে শত্রুর মোকাবিলা করতে।

ক্যাম্যারেট বললেন—"এদের নিয়ে মাথা ঘামানোর আর দরকার নেই। ফ্যাক্টরী দেখাই চলুন।"

৭ ॥ ব্ল্যাকল্যাণ্ড ফ্যাক্টরী

সাগ্রহে রাজী হলেন অতিথিরা।

ক্যাম্যারেট বললেন—"ফ্যাক্টরী দেখে ফের আসব এখানে। কারখানার নকশাটা দেখে নিন। চওড়ায় আড়াইশ গজ। লম্বায় তিনশ ষাট গজ—রেড রিভারের পাড় বরাবর। আকারে একটা আয়তক্ষেত্র। মোট ক্ষেত্রফল প্রায় ষাট বিঘে। আয়তক্ষেত্রের পশ্চিম দিকে রয়েছে ফ্যাক্টরীর বাগান। ষাট বিঘে জমির পাঁচভাগের তিনভাগ—মানে, ছত্রিশ বিঘে জমি জুড়ে কেবল বাগান।"

"বাগান কেন?" অ্যামিদী ফ্লোরেন্সের প্রশ্ন!

"খাবারের জন্যে। কিছুটা পাই বাগান থেকে—বাকীটা আসে বাইরে থেকে। ফ্যাক্টরী তৈরী হয়েছে বাকী জমিতে জেটির গা ঘেঁসে প্রায় একশ গজ চওড়া জমির ওপর। মাঝখানে আড়াইশ গজ লম্বা জমির ওপর ওয়ার্কশপ আর আমার কোয়ার্টার—টাওয়ারের ঠিক তলায়। দুপ্রান্তে ষাট গজ চওড়া দুটো জমির ওপর দুটো রাস্তা দুসারি শ্রমিক কর্মচারীদের তফাত রেখেছে। প্রত্যেক সারিতে সাতটা বাড়ী, প্রত্যেক বাড়ী চারতলা—সব মিলিয়ে ১২০ টা ফ্ল্যাট।"

"লোকজন কত?" বারজাকের প্রশ্ন।

"একশ। কিন্তু কয়েকজন বিবাহিত—বাচ্চাকাচ্চাও আছে। ওয়ার্কশপটা একতলা উঁচু দেখতেই পাচ্ছেন। ঘাসের চাবড়া দিয়ে ঢাকা পুরু মাটির স্তর দিয়ে আগাগোড়া মোড়া। ফলে, কামানের গোলা সুবিধে করতে পারবে না। মোটামুটি নকশা তো দেখলেন। এবার আসুন নিচের তলায় যাওয়া যাক।"

নিচে যাওয়ার আগে অভিযাত্রীরা ফের দেখলেন পরিস্থিতি। বোলতা-বাহিনী এখনো উড়ছে। হানাদারদের আক্কেল হয়েছে। বিপদ এলাকার ধারে কাছে ঘেঁসছে না। দেখে, আশ্বস্ত হলেন। ক্যাম্যারেটের পেছন ধরলেন।

প্রথমে গেলেন 'মৌচাকে'— যেখান থেকে বোলতা বাহিনী যাচ্ছে আর আসছে—টাওয়ারের গোড়ায়। অনেকগুলো ক্ষুদে ঘর রয়েছে বোলতাদের জন্য —গোলাবারুদ রাখবার ঘরও রয়েছে পাশে পাশে। তারপর পেরিয়ে এলেন বেশ কিছু কারখানা ঘর, যন্ত্রের বিভিন্ন অংশ জোড়া লাগানোর ফিটিং-শপ, জাঁতাকল, কামারশালা, ঢালাই কাজের ফাউণ্ড্রি এবং আরও অনেক ঘর। বেরিয়ে এলেন বাগানে—প্যালেসের দিকে।

ফ্যাক্টরীর উঁচু পাঁচিলের দরুন প্যালেস থেকে ওঁদের দেখতে পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু পাঁচিলের কাছ থেকে পঞ্চাশ গজ যেতেই দেখা গেল হ্যারি কীলারের টাওয়ারের চুড়ো। সঙ্গে সঙ্গে দড়াম করে বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গেল চূড়োয় এবং শন্ শন্ করে বুলেট উড়ে গেল মাথার ওপর দিয়ে। ত্রস্তে সরে এলেন সবাই।

ক্যাম্যারেট বাদে। গতি শ্লথ করলেন না,—দাঁড়ালেন না। একইভাবে যেতে যেতে বিড়বিড় করে 'বোকা কোথাকার!' বলেই একটা হাত তুললেন শূন্যে।

ঐটুকু ইসারাই যথেষ্ট। একটা প্রচণ্ড হিস্-হিস্ শব্দ শোনা গেল মাথার ওপরে। ফ্যাক্টরীর দিকে চাইলেন অভিযাত্রীরা। ক্যাম্যারেট কিন্তু আঙুল তুলে দেখালেন প্যালেসের দিকে। টাওয়ারের মাথার সাইক্লোস্কোপ আর নেই—হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে!

সাইক্লোস্কোপের আবিষ্কর্তা শুধু বললেন—"ওতেই শিক্ষা হবে। আর একটা সাইক্লোস্কোপ পরে বানিয়ে দেব'খন। আকাশ টর্পেডোও আছে আমার—ওদের যত আছে, তার চেয়েও বেশী—কারণ বানিয়েছি আমিই।"

অ্যামিদী ফ্লোরেন্স বললেন—"খান কয়েক ছুড়ুন না হ্যারি কীলারের ওপর।"

আবার যেন গোলমাল লেগে গেল ক্যাম্যারেটের মাথায়—চোখের মধ্যে ফুটে উঠল দোনামোনা চাহনি।

"আমার...আমার সৃষ্টি আমি নষ্ট করব!"

আবার সেই আত্মপ্রশংসা। লোকটার ধীশক্তির তুলনা হয় না—কিন্তু

চাঁদেও কলঙ্ক থাকে। নইলে এত আত্মশ্লাঘা কেন? কথা বাড়ালেন না ফ্লোরেন্স। দৃষ্টি বিনিময় করলেন বন্ধুদের সঙ্গে।

চারিদিক নিশ্চুপ। শিক্ষা হয়ে গেছে প্যালেসের।

নতুন করে আক্রমণের প্রচেষ্টা নেই। বাগান পেরিয়ে এলেন নির্বিঘ্নে।

একটা দরজা খুলে ধরে বললেন ক্যাম্যারেট—"আসুন, একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস দেখাই। আগে এই ছিল আমার পাওয়ার হাউস। মোটর, স্টীম-ইঞ্জিন আর বয়লার চালু থাকত। অন্য কোন জ্বালানি পাওয়া যেত না বলে কাঠ জ্বালিয়ে বয়লার চালু করতে হত। সে এক ঝঞ্ঝাটের ব্যাপার। কাঠ আনতে হত অনেক দূরের জঙ্গল থেকে—পরিমাণেও নেহাৎ কম নয়। ভাগ্যভাল বেশীদিন এ ঝামেলা পোহাতে হয়নি। আকাশ থেকে বৃষ্টি ঝরিয়ে নদী সৃষ্টি করার পর জল-বিদ্যুৎ কেন্দ্র বানিয়ে নিলাম। স্টেশনটা বানিয়েছি এখান থেকে ছ'মাইল দূরে নদীর ওপর। এখন আর এই সেকেলে পাওয়ার হাউসের দরকার হয় না—চিমনি দিয়েও তার ধোঁয়া বেরোয় না। জেনারেটরের বিদ্যুতেই কাজ চলে যায়।"

আর একটা ঘরে গেলেন ক্যাম্যারেট।

বললেন—"এখানে যা দেখেছেন—এই সব মেশিন এর পরের ঘরগুলোতেও দেখবেন। ডায়নামো, অলটারনেটর, ট্রান্সফরমার আর কয়েল। এই হল আমার বজ্রকেন্দ্র। স্টেশন থেকে ওরা বিদ্যুৎ পাঠায়—আমি তা থেকে বজ্র বানাই।"

হকচকিয়ে গেলেন ফ্লোরেন্স—"বলেন কী। এত মেশিন আনিয়েছেন?"

"সব আনাইনি। বেশীর ভাগই বানিয়ে নিয়েছি।"

"কাঁচা মাল তো লেগেছে। মরুভূমির মাঝে আনালেন কি করে?"

চিন্তায় পড়লেন ক্যাম্যারেট। প্রশ্নটা যেন এই শুনলেন—এ সমস্যা নিয়ে যেন কখনো মাথা ঘামাতে হয়নি।

বললেন—"ঠিক বলেছেন। প্রথম মেশিন আর কাঁচামাল কি করে এল, অতশত ভাবিনি—জিজ্ঞেসও করিনি। যা দরকার, যখন দরকার—চেয়েছি। পেয়েছি। কিন্তু আপনি যখন কথাটা তুললেন—"

"হেলিপ্লেন তৈরীর আগে মরুভূমি পেরিয়ে এত জিনিস আনতে কত লোকের জীবন গেছে, কল্পনা করতে পারেন?"

"তা ঠিক···তা ঠিক", মুখ থেকে যেন সমস্ত রক্ত নেমে গেল ক্যাম্যারেটের।

"টাকার কথাটাও খেয়াল রাখবেন। নগদ টাকা ছাড়া এত জিনিস কেনা

যায় না।"

"টাকা?"

"টাকার পাহাড়ে বসে আছেন নিশ্চয়।"

"আমার টাকা! পকেট ঝাড়লে পাঁচটা পয়সাও পাবেন না!"

"তাহলে কার টাকা?"

"হ্যারি কীলারের," মিনমিন করে বললেন ক্যাম্যারেট।

"হ্যারি কীলার এত টাকা পেল কোত্থেকে? সে কি কোটিপতি না কুবেরের নাতজামাই?"

অসহায় ভঙ্গিমায় হাত নাড়লেন ক্যাম্যারেট। জানেন না, সত্যিই তিনি কিছু জানেন না। এ প্রশ্ন তাঁর কাছে কখনো আসেনি—হঠাৎ আসায় তিনি হতচকিত। চোখের তারায় আবার সেই ঘোলাটে চাহনি দেখে ডক্টর চাতোন্নের মায়া হল। বেচারা!

বললেন—"ঠিক আছে, ঠিক আছে, ও নিয়ে পরে ভাবা যাবে'খন, এখন হাঁ করে দাঁড়িয়ে না থেকে দেখান যা দেখাতে এনেছেন।"

জোর করে যেন চিন্তাটাকে মন থেকে তাড়িয়ে দিলেন ক্যাম্যারেট। হাত দিয়ে কপাল ঝেড়ে ঢুকলেন পাশের ঘরে।

বললেন আবেগ কম্পিত স্বরে—"এই হল আমার কমপ্রেসর্স। তরল বাতাস আর অনেক রকম তরল গ্যাস কাজে লাগাই এখানে। জানেন তো, সব গ্যাসকেই তরল অবস্থায় আনা যায়। তাপমাত্রা কমিয়ে চেপে রেখে দিলে তরল অবস্থায় থাকে। কিন্তু চাপ তুলে নিলেই আবার তা গরম হয়ে ওঠে। তখন যদি তরল গ্যাস কোনো বদ্ধ আধারের মধ্যে থাকে—আধার ফাটিয়ে টুকরো টুকরো করে দেয়—কেন না তরল অবস্থা থেকে তা গ্যাসের অবস্থায় ফিরে যায়।

"কিন্তু আমার একটি মাত্র আবিষ্কারের ফলে সেটি আর হতে দিচ্ছি না। এমন একটা বস্তু আবিষ্কার করছি যা একেবারেই অ্যান্টি-ডায়াথারমিক—উত্তাপ যার মধ্যে একেবারেই ঢুকতে পারে না। এই বস্তু দিয়ে আধার তৈরী করে তরল বাতাস বা গ্যাস রেখে দিলে, তরল বাতাস বা গ্যাসের তাপমাত্রা পালটায় না—এক থেকে যায়। তরল অবস্থাতেই থাকে—গ্যাস হয়ে আধার ফাটিয়ে বেরিয়ে যেতে পারে না। এই একটি মাত্র আবিষ্কার থেকে আরও কয়েকটা আবিষ্কার করে ফেললাম। যেমন, দূরপাল্লার হেলিপ্লেন।"

"হেলিপ্লেনও আপনার সৃষ্টি?" অ্যামিদী ফ্লোরেন্স বিস্মিত।

"তবে কার সৃষ্টি?" অহংকারে ঘা দেওয়ায় ক্যাম্যারেট ঈষৎ উত্তেজিত। অচিরেই সামলে নিলেন অবশ্য। ফিরে এল সহজাত প্রশান্তি।

বললেন—"তিনটে বৈশিষ্ট্য আছে আমার হেলিপ্লেনের। স্থির থাকার ক্ষমতা, জমি ছেড়ে সোজা আকাশে ওড়ার ক্ষমতা আর এক নাগাড়ে তিন হাজার মাইল ইঞ্জিন চালু রাখার ক্ষমতা—এক কথায় যার নাম চালকশক্তি—মোটিভ পাওয়ার।

"প্রথমে দেখা যাক স্থির থাকার ক্ষমতাটা আসছে কি করে। হঠাৎ হাওয়ার ঝাপটায় ভারসাম্য ফিরিয়ে আনার জন্যে পাখীকে অংক কষতে হয় না—হিসেব করার দরকারই হয় না। স্নায়ুমণ্ডলী আপনা থেকেই ব্যালেন্স ফিরিয়ে আনে। দেহবিজ্ঞানীরা একেই বলেছেন রিফ্লেক্স অ্যাকশন—প্রতিবর্তী ক্রিয়া। আমার হেলিপ্লেনের স্থির থাকার ক্ষমতাটা অটোমেটিক হওয়া দরকার—তাই রিফ্লেক্স অ্যাকশনের মতই একটা ব্যবস্থা গড়ে দিলাম হেলি-প্লেনে। প্যাসেঞ্জার, পাইলট আর মোটর রাখার জন্যে যে প্ল্যাটফর্ম, তার ঠিক ওপরেই পনেরো ফুট উঁচু একটা পাইলনের মাথায় একজোড়া ডানা নিশ্চয় দেখেছেন। এত কাণ্ড করা হয়েছে কেবল ভারকেন্দ্র কমিয়ে আনার জন্যে।

"ডানার সঙ্গে সম্পর্ক রেখে কিন্তু পাইলন লাগানো হয়নি। দিকনির্দেশী বা উচ্চতানির্দেশী হালের সঙ্গে যদি বাঁধা না থাকে, তাহলে শীর্ষবিন্দুর চার-পাশে যেদিকে প্রয়োজন অল্পসল্প দুলতে পারে এই পাইলন। তাই ডানা জোড়া যদি পাশে বা সামনে ঝোঁকে, হাল সামাল দেয় ঠিকই—তা ছাড়াও পাইলন নিজের ওজনেই এদের সঙ্গে নতুন কোণে হেলে পড়ে। তৎক্ষণাৎ ডানার সঙ্গে সমান্তরালভাবে অথবা লম্বাভাবে ওজন পিছলে যায়—আপনা থেকেই হেলিপ্লেনের দুলুনি ঠিক হয়ে যায়—হঠাৎ ঝাঁকুনিতেও কিছু টের পাওয়া যায় না।"

মেঝের দিকে তাকিয়ে প্রশান্ত স্বরে কলেজ-ক্লাশে লেকচার দেওয়ার ভঙ্গিমায় বুঝিয়ে গেলেন ক্যাম্যারেট। আমতা আমতা করলেন না, শব্দ হাতরাতে হল না—পুরো বক্তৃতাটা যেন জিভের ডগায় সাজানোই ছিল—স্বচ্ছন্দ সরলভাবে শুধু বলে গেলেন।

"এবার আসা যাক দ্বিতীয় পয়েন্টে—জমি ছেড়ে সোজা আকাশে ওড়ার ক্ষমতায়। টেক-অফ করার সময়ে ডানা দুটো নিচে নামানো থাকে—পাইলনের গায়ে লেপটে থাকে সিধে হয়ে। প্রপেলার তখন অনুভূমিক

অবস্থায় ঘুরতে থাকে—ফলে হেলিকপটার হয়ে যায় হেলিপ্লেন। মেশিনকে শূন্যে ভাসিয়ে রাখে প্রপেলার। বেশ খানিকটা উঁচুতে উঠে যাওয়ার পর ডানা খুলে যায়—সঙ্গে সঙ্গে প্রপেলার হেলে পড়ে সামনে—তখন হেলিপ্লেন হয়ে যায় এরোপ্লেন। এরোপ্লেনের প্রপেলারের মতই শক্তিশালী প্রপেলার সামনে উড়িয়ে নিয়ে যায় হেলিপ্লেনকে।

"এবার আসুন চালকশক্তির রহস্যে। হেলিপ্লেনকে চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার শক্তির জোগান দিচ্ছে তরল বাতাস। উত্তাপ-অপ্রবেশ্য যে ধাতুব কথা একটু আগে আপনাদের বললাম, অ্যান্টি-ডায়াথারমিক সেই বস্তু দিয়ে তৈরী ফুয়েল-ট্যাঙ্কে থাকে তরল বাতাস। অনেকগুলো ভালভের মধ্যে দিয়ে সব সময়ে উত্তপ্ত একটা সরু নলের মুখে পৌঁছোলেই তরল বাতাস আর তরল থাকে না —প্রচণ্ড চাপ মেরে বায়বীয় অবস্থায় ফিরে গেলেই চাপের চোটে মোটর চলতে থাকে।"

"কত স্পীড আপনার হেলিপ্লেনের?" প্রশ্ন করলেন অ্যামিদী ফ্লোরেন্স।

"ঘন্টায় আড়াইশ মাইল। ফুয়েল-ট্যাঙ্ক একবার বোঝাই করে নিলে এক নাগাড়ে তিন হাজার মাইল পর্যন্ত যেতে পারে।"

তাজ্জব আবিষ্কার তো! মহামতি হোরেস বলেছেন, কোনো কিছুতেই চোখ কপালে তুলে ফেলো না—এ দুনিয়ায় সব সম্ভব—অবাক হওয়ার কিছু নেই। এহেন আপ্তবাক্য সত্ত্বেও চোখ কপালে তুলে ফেললেন ক্যাম্যারেটের শ্রোতারা। ভূয়সী প্রশংসা করতে লাগলেন ক্যাম্যারেটের। প্রশংসার উপযুক্ত ভাষা পর্যন্ত খুঁজে পেলেন না। ক্যাম্যারেট কিন্তু অবিচলিত—প্রশংসা শোনবার জন্যেই যেন তিনি আছেন—তাই শুনলে আর ফুলে ওঠেন না। অথচ মাঝে মাঝে ইনিই নিজের প্রশংসা করেন পঞ্চমুখে—ফেটে পড়েন অহংকারে। অদ্ভুত লোক বটে!

টাওয়ারে ফিরে এসে বললেন—"এবার আসছি ফ্যাক্টরীর প্রাণকেন্দ্রে। টাওয়ারের এই যে তলায় আমরা দাঁড়িয়ে—ঠিক এই রকম আরও পাঁচটা তলা আছে মাথার ওপরে—প্রত্যেকটা একই রকম যন্ত্রপাতি দিয়ে সাজানো। টাওয়ারের ওপরে চারদিক ঘিরে পেল্লায় উঁচু পাইলনটাও নিশ্চয় দেখেছেন। এই হল আমার ওয়েভ-প্রোজেক্টর—তরঙ্গ-প্রক্ষেপক। পাইলনের গায়ে অনেকগুলো কাঁটা আছে—এরাও এক-একটা প্রোজেক্টর—আকারে আর ক্ষমতায় অনেক ছোট।"

"ওয়েভ-প্রোজেক্টর?" জিজ্ঞেস করলেন ডক্টর চাতোন্নে।

হাসলেন ক্যামারেট—"পদার্থ-বিজ্ঞান নিয়ে আর জ্ঞান দেব না আপনাদের। কিন্তু ওয়েভ-প্রোজেক্টরের মূল তত্ত্বটা একটু বুঝিয়ে দেওয়া দরকার। হয়ত জানেন, তাই মনে করিয়ে দিচ্ছি; অথবা যদি না জানেন, তাহলে শুনে রাখুন—কিছুদিন আগে হার্জ নামে এক বিখ্যাত জার্মান বৈজ্ঞানিক লক্ষ্য করেছিলেন, একটা কনডেনসারের দুটো টার্মিন্যাল পয়েন্টের মাঝের ছোট ফাঁকটায় যদি একটা ইলেকট্রিক স্পার্ক চালিয়ে দেওয়া হয় ইনডাকসন কয়েল থেকে, তাহলে যন্ত্রটার দুই মেরুর মধ্যে এই স্পার্কের ফলে একটা দোলায়মান ক্ষরণ বা তড়িৎ-প্রবাহের সৃষ্টি হয়। কনডেনসারকে অবশ্য আপনারা কেউ বলেন রেজোনেটর, কেউ বলেন অসিলেটর—যে নামে হয় বুঝে নিন।

"এখন, এই যে দোলনের সৃষ্টি হল দুটো পয়েন্টের মধ্যে—এটা এই দুই পয়েন্টের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না—আশপাশের বাতাসে, আরও সঠিকভাবে বলতে গেলে. ইথারের মধ্যেও একটা আলোড়ন সৃষ্টি করে। ইথার বলতে আমি সেই গ্যাসীয় পদার্থকে বোঝাচ্ছি যার ওজন নেই, অতি লঘু, অনুভব করা যায় না, অথচ যা এক নক্ষত্র থেকে আরেক নক্ষত্রের মাঝের মহাশূন্য থেকে শুরু করে বস্তুদেহের এক কোষ থেকে আরেক কোষের মাঝের শূন্যস্থান পর্যন্ত পূর্ণ করে রেখেছে।

"প্রত্যেকটা এদিক-ওদিক দোলন অনুরূপ ইথিরীর অনুকম্পন সৃষ্টি করে—একটু একটু করে নিয়মিত মাত্রায় তা দূরে সরে যায়। এই অনুকম্পনকে বা ভাইব্রেশনকেই বলা হয় হার্জিয়ান ওয়েভস্। বোঝাতে পেরেছি কি?"

"দারুণভাবে পেরেছেন," রাজনীতিবিদ বারজাক বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যায় হাবুডুবু খেতে খেতে বললেন।

জের টেনে নিয়ে বললেন বৈজ্ঞানিক—"আশ্চর্য এই ওয়েভ এতদিন বীক্ষণাগারে কেবল কৌতূহলই সৃষ্টি করেছে—কাজে লাগানোর কথা কেউ ভাবে নি। আমিই প্রথম তা করেছি। যে পয়েন্ট থেকে বেরোচ্ছে ওয়েভ, তার কাছ থেকে দূরে পয়েন্ট থেকে সংস্পর্শ বিহীন অবস্থায় বিভিন্ন দূরত্বে রাখা ধাতব দেহে তড়িৎ সঞ্চার করার জন্যে এই ওয়েভকে প্রয়োগ করা হত। কিন্তু একটা অসুবিধে ছিল। পুকুরে ঢিল ফেললে যেমন এক-কেন্দ্রীয় বৃত্তাকারে ঢেউ ছড়িয়ে পড়ে দূর হতে দূরে—ঠিক তেমনি পয়েন্ট থেকে বেরিয়ে ওয়েভগুলোও ছড়িয়ে যেত সব দিকে। ফলে, শুরুতে যে এনার্জি নিয়ে ওয়েভগুলো বেরোয়—দূরে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তত এনার্জি আর থাকে না—

কমতে থাকে, শূন্যে নষ্ট হয়ে যায়, পাতলা হয়ে দুর্বল হয়ে পড়ে। উৎস-পয়েন্ট থেকে মাত্র কয়েক গজ দূরে নগণ্য প্রতিক্রিয়ার পর্যবসিত হয়। এখনো বুঝছেন তো? বোঝাতে পারছি?"

"জলের মত," বললেন অ্যামিদী ফ্লোরেন্স।

"আলো যেমন আয়নায় প্রতিফলিত হয়, এই ওয়েভকেও তেমনি প্রতিফলিত করা যায়—অনেকেই তা লক্ষ্য করেছিলেন—কিন্তু কোনো সিদ্ধান্তে আসতে পারেননি—আমিই প্রথম এলাম। পাঁচিলের মাথা যে ধাতু দিয়ে মুড়ে দিয়েছি, যার তাপ আর তড়িৎ সঞ্চালন শক্তি, মানে, পরিবাহিতা তামার চেয়ে শতগুণে বেশী—সুপারকনডাকটিভ সেই মেট্যাল আবিষ্কার করে এমন রিফ্লেকটর বানিয়েছি যে ওয়েভসের পুরোশক্তি যে কোনো দিকে যে কোনো পয়েন্টে আমি সংহত করতে পারি।

শূন্যপথে যাওয়ার সময়ে এক কণা শক্তিও নষ্ট হয় না বলে আরম্ভে যা থাকে, শেষেও তাই থাকে। দোলনটাকে কত সময়ের ব্যবধানে কতবার সৃষ্টি করা যাবে, সে পদ্ধতি সবাই জানে। কাজেই তাল মিলিয়ে রিসিভার বানিয়ে নেওয়ার কথা ভাবলাম। যে ফ্রিকোয়েন্সিতে ওয়েভ সৃষ্টি হচ্ছে, সেই একই ফ্রিকোয়েন্সিব রিসিভার তৈরী করা দরকার। পদার্থ বিজ্ঞানীরা এই তত্ত্বকে বলেন 'সিনটোনাইজেসন'।

"যে ফ্রিকোয়েন্সির ওয়েভ, ঠিক সেই ফ্রিকোয়েন্সির রিসিভার বানাতে হবে। সম্ভাব্য ফ্রিকোয়েন্সির সংখ্যা যেহেতু অসীম, অসীম সংখ্যক মোটর আমি বানাতে সক্ষম হব—যার দুটো মোটর কখনো অভিন্ন দুটো ওয়েভের ধাক্কায় সাড়া দেবে না। বলুন, এখনো বুঝতে পারছেন কিনা?"

বারজাক বললেন—"একটু কঠিন তত্ত্ব। তবে মাথায় ঢুকছে।"

"আমারও শেষ হয়ে এসেছে," বললেন ক্যামারেট। "এই পদ্ধতি দিয়ে বহুদূরের অসংখ্য চাষের যন্ত্র আমি চালাই। টাওয়ারের ওপরে অত কাঁটা রয়েছে ঐ জন্যেই—এক একটা কাঁটা এক একটা মেশিনের উৎস। সোজা কথায়, কাঁটাগুলো প্রোজেক্টর—মেশিনগুলো রিসিভার। একই পদ্ধতিতে চালু রেখেছি 'বোলতা'দের। প্রত্যেকটা বোলতার চারটে প্রোপেলারের মধ্যে রয়েছে চারটে ছোট সাইজের মোটর। প্রত্যেক মোটরের সিনটোনাইজেসন পৃথক। ইচ্ছেমত চারটে মোটরের যে কোনোটাকে চালনা করতে পারি টাওয়ারে বসেই। সবশেষে শুনুন, এই একই পন্থায়, যদি ইচ্ছে করি, গোটা শহরটাকে ধ্বংস করতে পারি চোখের পাতা ফেলার আগেই।"

"এখান থেকে শহর ধ্বংস করতে পারেন?" বারজাক প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন।

"অতি সহজে পারি। হ্যারি কীলার চেয়েছিল অজেয় শহর তৈরী হোক। আমি তাই অজেয় শহর বানিয়েছি। প্রত্যেক রাস্তা, প্রত্যেক বাড়ী, প্যালেস আর ফ্যাক্টরীর তলায় শক্তিশালী বারুদ রেখেছি—প্রত্যেকটার সঙ্গে এমন বিস্ফোরক লাগিয়ে রেখেছি যার সঙ্গে বিশেষ ওয়েভের সিনক্রোনাইজেশন রয়েছে এবং সে ওয়েভ যে কি, তা কেবল আমিই জানি। মাইনের সঙ্গে লাগানো বিস্ফোরক যে ওয়েভ দিয়ে ফাটানো যাবে—সেই ওয়েভ এখান থেকে পাঠিয়ে দিলেই ফাটবে একটার পর একটা মাইন। ধ্বংস হবে রাস্তা, বাড়ী, প্যালেস।"

ক্ষিপ্রের মত নোট বইয়ে তত্ত্বকথাগুলো লিখে নিচ্ছিলেন অ্যামিদী ফ্লোরেন্স। একবার ইচ্ছে হল বলেন, তাহলে দেরী কেন মশাই? দিন না শেষ করে হ্যারি কীলারের জারিজুরি। তারপর ভেবে দেখলেন, বলে মুখ নষ্ট হবে। আকাশ-টর্পেডো ছুঁড়তে বলায় যেমন কাজ হয়নি, এখনো তেমনি নিজের সৃষ্টি ধ্বংস করার কথা শুনলেই প্রাণ কাঁদবে স্রষ্টার।

ডক্টর চাতোন্নে জিজ্ঞেস করলেন—"টাওয়ারের মাথায় বড় পাইলনটার কাজ কী?"

"বলছি সে কথা। হার্ভিয়ান ওয়েভসের একটা অদ্ভুত ধর্ম দেখা গেছে। মাধ্যাকর্ষণের টানে নুয়ে পড়ে। উঁচু জায়গা থেকে ওয়েভ পাঠালে, আস্তে আস্তে মাটির দিকে নামতে থাকে—তারপরেই মিশে যায় মাটিতে।

"কাজেই বেশীদূরে ওয়েভ পাঠাতে হলে সেই রকম উঁচু থেকে পাঠানো দরকার। আমার ক্ষেত্রে উচ্চতাটা আরো বেশী হওয়া দরকার—কেননা, আমি বেশীদূরে পাঠাতে চাই না—বেশী ওপরে পাঠাতে চাই। সমস্যা তাতে বাড়ছে। কিন্তু এই সমস্যারও সমাধান করেছি দুরকমভাবে। একশ গজ উঁচু পাইলনের সঙ্গে দোলক মেশিনের যোগাযোগ রেখে আর পাইলনের মাথায় আমার আবিষ্কার করা রিফ্লেকটর বসিয়ে।"

ঝড়ের মত লিখতে লিখতে তখন দম ফুরিয়ে এসেছে অ্যামিদী ফ্লোরেন্সের। সেই অবস্থাতেই কোনমতে বললেন—"বেশী ওপরে ওয়েভ পাঠাতে চান কেন?"

"বৃষ্টি ঝরানোর জন্যে। হ্যারি কীলারের সঙ্গে যখন দেখা, তখন এই তত্ত্বটাই আমার মাথায় ঘুরছিল। শুনে আমাকে সাহায্য করে হ্যারি

কাম্নার। পাইলন আর রিফ্লেক্টরের দৌলতে মেঘ লক্ষ্য করে ওয়েভ পাঠাই, তড়িৎ-প্রবাহ দিয়ে মেঘের জলকে সংপৃক্তির পয়েন্টে নিয়ে যাই—যখন মেঘ আর জল ধরে রাখতে পারে না। এক কথায় স্যাচিউরেসন পয়েন্ট। যখন পাশাপাশি দুটো মেঘ বা মেঘ আর মাটির মধ্যেকার প্রচ্ছন্ন শক্তি বা ঐশ্বর্য প্রচণ্ড হয়ে ওঠে—খুব অল্প সময়ের মধ্যেই তা ঘটে—ঝড় ওঠে, বৃষ্টি নেমে আসে। আমার এই পদ্ধতির প্রকৃষ্ট প্রমাণ হল মরুভূমিকে উর্বর জমিতে রূপান্তরকরণ।"

"কিন্তু সেজন্য তো মেঘ জোগাড় করতে হবে," বললেন ডক্টর চাতোন্নে।

"তাতো বটেই—আর্দ্র আবহাওয়াতে কাজ হয়। কিন্তু মেঘ তো একদিন না একদিন আসবেই। এসে যেন চলে না যায়—মুচড়ে জল বার করতে হবে এখানেই—অন্যত্র নয়। সমস্যা সেইটাই। এখন কাজ খুব সোজা হয়ে গেছে। জমিতে ফসল ফলছে, অনেক গাছ গজিয়েছে, প্রায় বৃষ্টি হচ্ছে, মেঘের দলও বাড়ছে। মেঘ এলেই এই সুইচটা টিপে দিই। সঙ্গে সঙ্গে হাজার অণুশক্তির তেজে ওয়েভ আছড়ে পড়ে মেঘের বুকে—অসংখ্য ভাইব্রেশনের বোমাবর্ষণে মুষলধারে আরম্ভ হয় বৃষ্টি।

"মারভেলাস্!" উৎসাহে প্রোজ্জ্বল প্রত্যেকেই।

একটু একটু করে উত্তেজিত হচ্ছিলেন ক্যাম্যারেট—এক একটা আবিষ্কার বোঝাচ্ছেন—আর উত্তেজনা বাড়ছে।

এখন বললেন—"আপনারা টের না পেলেও এই মুহূর্তে পাইলনের চূড়ো থেকে ওয়েভ ছুটে গিয়ে হারিয়ে যাচ্ছে অনন্ত যাত্রায়। কিন্তু এদের ভবিষ্যৎ নিয়েও ভেবেছি আমি। আমি বিশ্বাস করি, হাজার বিভিন্ন কাজে লাগানো যায় দলছুট,এই ওয়েভদের। যেমন ধরুন, ভূপৃষ্ঠের সর্বত্র টেলিগ্রাফ বা টেলিফোন ব্যবস্থা চালু করা যায় বিনা তারে।"

"বিনা তারে!"

"হ্যাঁ, বিনা তারে। তারের দরকার কী? শুধু যুতসই একটা রিসিভার বানিয়ে নিলেই হল। তাই নিয়ে গবেষণা করছি আপাততঃ। প্রায় বানিয়ে এনেছি—শেষ হয়নি এখনো।"

"এবার কিন্তু বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে," বললেন বারজাক।

উত্তেজনা বৃদ্ধি পেল ক্যামারেটের—"কঠিন কিছু নয়। মামুলী টেলিগ্রাফ যন্ত্রে মর্সযন্ত্র ব্যবহার করা হয়। এই দেখুন সেই যন্ত্র—বিশেষ সারকিট, মানে, তড়িৎ-প্রবাহের পথে লাগিয়ে রেখেছি। এই সুইচগুলো টিপলেই," খানকয়েক

সুইচে হাত বুলোতে বুলোতে বললেন ক্যাম্যারেট—"ওয়েভসৃষ্টিকারী কারেন্ট ঢুকবে দারকিটে। মর্স-চাবি তোলা থাকলে হার্জিয়ান ওয়েভ্‌স্‌ চালান্‌ যাবে না। নামানো থাকলে, পাইলন থেকে ওয়েভ্‌স্‌ ছুটে যাবে।

"এখন কিন্তু ওয়েভ প্রোজেকটরের মুখ আকাশের দিকে ফেরানো নেই—রয়েছে—কল্পনায় ধরে নেওয়া এক রিসিভারের দিকে। রিফ্লেক্টরের মুখ সেই দিকে ফিরিয়ে দিলেই হল—ওয়েভ্‌স্‌ গিয়ে সংহত হবে বিশেষ সেই রিসিভারে। কোন দিকে রিসিভার আছে, যদি জানা না থাকে, তাহলে এই সুইচটা টিপে রিফ্লেক্টরকে লাইন থেকে বাদ দিলেই হল। তখন ওয়েভ ছুটে যাবে দিকে দিকে—রিসিভার যদি কোথাও থাকে—আমার এই টেলিগ্রাফের খবর গিয়ে পৌঁছোবে সেখানে। দুর্ভাগ্যের বিষয় কোথাও কোনো রিসিভার এখন নেই।"

জেন ব্লেজন বললেন—"টেলিগ্রাফ বলতে কি বোঝাচ্ছেন ?"

"যা বোঝায়। টেলিগ্রফি যারা শিখেছে, তারা জানে এই সুইচ নেড়ে কি ভাবে মর্স হরফ পাঠাতে হয়। উদাহরণ দিলে চট করে বুঝতে পারবেন। কল্পনায় ধরে নেওয়া রিসিভারটা আদৌ যদি কোথাও থাকে, এখানকার খবর সেখানে পাঠিয়ে পরিত্রাণের প্রথম সুযোগ কাজে লাগাবেন। কেমন ?"

"একশ বার !"

ক্যাম্যারেট বললেন—"তাহলে ধরে নিন সত্যিই এরকম একটা রিসিভার কোথাও আছে। কাকে টেলিগ্রাফ করবেন ?"

"কাউকেও তো চিনি না" হেসে ফেললেন জেন ব্লেজন। "একজনকে অবশ্য...মানে, ক্যাপ্টেন মারসিনেকে চিনি।" মুখ লাল হয়ে গেল শ্রীমতির।

খটাখট করে চাবি টিপে দীর্ঘ আর হ্রস্ব হরফ পাঠাতে পাঠাতে ক্যাম্যারেট বললেন—"বেশ ক্যাপ্টেন মারসিনেকেই খবর পাঠাচ্ছি...কোথায় আছেন তিনি ?"

"খুব সম্ভব টিমবাকটুতে," দ্বিধার সঙ্গে বললেন শ্রীমতি।

"টিমবাকটু।" খটাখট চাবি টিপতে টিপতে মুখে বলে গেলেন ক্যাম্যারেট—"কি বলতে চান ক্যাপ্টেন মারসিনেকে ?

"ক্যাপ্টেন মারসিনে আমাকে জেন মোরনাস নামে চেনেন।"

"তাতে কিছু এসে যায় না। কেননা, এ খবর কোনোদিনই তাঁর কাছে

পৌঁছোবে না। তাহলেও বলছেন যখন তখন মোরনাসুই থাকুক, এই খবর যাচ্ছে শুনুন : 'ব্ল্যাকল্যাণ্ডে বন্দিনী জেন মোরনাসকে উদ্ধার করে নিয়ে যান।' ...দাঁড়ান, দাঁড়ান...বাইরের দুনিয়ায় ব্ল্যাকল্যাণ্ড একটা অজ্ঞাত অঞ্চল। তাই জায়গাটার ঠিকানা দেওয়া যাক—'অক্ষাংশ ৫ ডিগ্রী ৫০ মিনিট উত্তরে, দ্রাঘিমা...।'

তড়াক করে চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠলেন ক্যাম্যারেট।

"যাচ্চলে! কারেন্ট বন্ধ করে দিল হ্যারি কীলার!"

চারপাশে ভীড় করে এলেন অতিথিরা।

ক্যাম্যারেট বললেন—"আপনাদের বলেছিলাম না ছমাইল দূরের জল বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে কারেন্ট আসে এখানে। এইমাত্র সেখান থেকে কারেন্ট পাঠানো বন্ধ করল হ্যারি কীলার।"

'মেশিনপত্র সব তাহলে থেমে যাবে!" বললেন ডক্টর চাতোন্নে।

"যাবে কি, গেছে।"

"বোলতা বাহিনী?"

"মাটিতে আছড়ে পড়েছে।"

"হ্যারি কীলার তো তাহলে বোলতাদের কাজে লাগাবে," জেন ব্লেজন বললেন।

"পারবে না! আসুন আমার সঙ্গে। দেখে যান কারেন্ট বন্ধ করেও লাভ হয়নি হ্যারি কীলারের।"

তরতর করে সবাই উঠে গেলেন ওপর তলায়, ঢুকলেন সাইক্লোসকোপে। দেখতে পেলেন পাঁচিলের বাইরের দিক। পাশের পরিখা পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। নিথর বোলতারা পড়ে আছে সেই পরিখায়।

এসপ্ল্যানেডের দিকে হৈ-হৈ করছে মেরী ফেলোরা। আনন্দে নাচতে নাচতে ছুটে আসছে নতুন করে আক্রমণ করার জন্যে। কয়েকজন ঝপাঝপ পরিখায় ল্যাফিয়ে পড়ে এত কষ্টের মূল বোলতাদের গায়ে হাত দিচ্ছে।

কিন্তু হাত দিতে না দিতেই কি রকম যেন অস্থির হয়ে পড়ল মেরী ফেলোরা। ভয় পেয়ে কয়েকজন পরিখা বেয়ে উঠতে গেল কয়েকজন এত দুর্বল হয়ে পড়ল যে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল পরিখার মধ্যেই।

ঠাণ্ডা গলায় ক্যাম্যারেট বললেন—"আর বাঁচাতে যাব না বাছাধনদের। এরকমটা যে ঘটবে, আগেই ভেবেছিলাম। সেই রকম ব্যবস্থাও রেখেছিলাম। কারেন্ট বন্ধ করে আপনা থেকেই হ্যারি কীলার তরল কার্বনডায়অক্সাইড

গ্যাসের আধারের মুখ খুলে দিয়েছে। গ্যাসে ভরে উঠেছে পরিখা। বাতাসের চেয়ে ভারী বলে কার্বনডায়অক্সাইড পরিখার মধ্যেই থাকবে। যে নামবে দম আটকে সে মরবে।”

“আহারে!” জেন ব্লেজন সহ্য করতে পারলেন না সেই দৃশ্য।

“দোষ ওদেরই—আমার পক্ষে বাঁচানো আর সম্ভব নয়। মেশিনপত্র সম্বন্ধে আগে থেকে ব্যবস্থা করা আছে। কারেন্টের বদলে তরল বাতাস দিয়ে ইলেক ট্রিক্যাল মেশিন চালানোর ব্যবস্থা হচ্ছে। তরল বাতাসের অভাব আমার নেই। সকাল থেকেই তৈরী ছিলাম। ঐ দেখুন বোলতারা ফের উড়ছে।”

সত্যিই আবার ভীষণ বেগে ঘুরছে বোলতাদের পেছনের প্রোপেলার—আবার পাঁচিল ঘেঁসে পরিক্রমা শুরু করেছে বোলতা বাহিনী। মেরী ফেলোরা স্যাঙাতদের পরিখায় ফেলেই পালাচ্ছে প্যালেসের দিকে।

ঘুরে দাঁড়ালেন মারসেল ক্যাম্যারেট। অস্বাভাবিক উত্তেজনার সঙ্গে স্নায়ু-দৌর্বল্যও মিশেছে। চোখের তারায় ফের দেখা দিয়েছে সেই অসুস্থ দ্যুতি। ঘোলাটে হয়ে এসেছে চাহনি।

কিন্তু কথা বললেন বেশ গর্বের সঙ্গে—“নাকে তেল দিয়ে এবার ঘুমোনো যাবে।”

৮ ॥ মহাশূন্যে ডাক ছুটেছে

মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল ক্যাপ্টেন মারসিনের বারজাক মিশন ছেড়ে আসার সময়ে—বিশেষ করে মন ভার হল জেন মোরনাসকে ছেড়ে আসতে হল বলে। কিন্তু দ্বিধা করলেন না।

সিগৌ-সিকোরো পর্যন্ত জোর কদমে গেলেন। মনে প্রাণে তিনি সৈনিক। নিজের ভালমন্দ ভাবেন না। দেশের জন্যে জীবন পর্যন্ত বিলিয়ে দিতে প্রস্তুত—দুঃখবরণ সে তুলনায় কিছুই নয়।

নদিনে তিনশ মাইল পেরিয়ে ২২ শে ফেব্রুয়ারী রাত্রে পৌঁছোলেন সিগৌ সিকোরো। পরের দিন সকালেই কর্ণেল সারজাইন্সকে দেখালেন কর্ণেল সেন্ট-অবানের হুকুমনামা।

তিনবার পড়লেন কর্ণেল সারজাইন্স! অবাক হলেন। মানে বুঝলেন না।

বললেন—“অদ্ভুত হুকুম দেখছি! টিমবাকটুতে পাঠানোর জন্যে সিকা-

সোতে লোক তলব করা হচ্ছে! ভাবাও যায় না!"

"আপনি জানেন না আমরা আসছি?" প্রশ্ন করলেন ক্যাপ্টেন।

"একেবারেই না।"

"টিমবাকটুতে গোলমাল দেখা দিয়েছে—এই কথাই তো শুনলাম লেফটেন্যান্ট ল্যাকোরের মুখে।"

"আমি কিন্তু এই প্রথম শুনছি। গতকাল পিরোলিজ গেছেন এখান দিয়ে। টিমবাকটু থেকে ডাকার যাচ্ছেন। কিছু বললেন না তো।"

"কিন্তু আমার ওপর যে হুকুম রয়েছে টিমবাকটু যাওয়ার।"

"হুকুম যখন রয়েছে, যাবেন বৈকি। কিন্তু হুকুমটার মাথামুণ্ডুই তো বুঝছি না।"

আটদিন গেল জোগাড়যন্ত্র করতে। দোসরা মার্চ রওনা হলেন ক্যাপ্টেন। ১৭ই মার্চ পৌঁছোলেন টিমবাকটুর বন্দর কাবারা-তে।

কর্ণেল অ্যালিগ্রেকে কর্ণেল সেন্ট অবানের হুকুমনামা দেখালেন ক্যাপ্টেন। তিনিও আকাশ থেকে পড়লেন। টিমবাকটুতে কোনো গোলমাল নেই—লোক চাইতে যাবেন কেন? কর্ণেল সেন্ট অবান এরকম হুকুম দিতে গেলেন কোন আক্কেলে?

অদ্ভুত পরিস্থিতি। ক্যাপ্টেনের খটকা লাগল। সই জাল হয় নি তো? কিন্তু কেন? কিসের জন্যে? উত্তর একটাই। বারজাক মিশনের সদস্যদের অসহায় অবস্থায় ফেলে প্রাণে মেরে ফেলা। মনে মনে ভেঙে পড়লেন ক্যাপ্টেন। জেন মোরনাসের হাল কল্পনা করতেও শিউরে উঠলেন।

ভয়টা দৃঢ়তর হল লেফটেন্যান্ট ল্যাকোরকে কেউ চিনতে না পারায়। কে সে?

অথচ কর্ণেল সেন্ট অবানের সই পরীক্ষা করে দেখা গেল জাল মোটেই নয়। অর্ডারের কোথাও কোনো জালিয়াতি নেই। শেষকালে ঠিক হল, যাঁর অর্ডার তাঁর কাছেই পাঠানো হোক হুকুমনামা—তিনিই বলবেন, আসল কি নকল।

কিন্তু এই দশ মাইল জঙ্গল ঠেঙিয়ে যাতায়াত করতেও তো সময় লাগবে। কি করে যে অ্যাদ্দিন সময় কাটাবেন, ভেবে পেলেন না ক্যাপ্টেন।

ভগবান মুখ তুলে চাইলেন। মারসিনের এক পুরোনো বন্ধু এসে পৌঁছোলেন টিমবাকটু। নাম, ক্যাপ্টেন পেরিগনি। দু'বছরের জন্যে মোতায়েন রয়েছেন বলে সঙ্গে করে অনেক বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি এনেছেন।

ডিউটির ফাঁকে ফাঁকে বিজ্ঞান-চর্চা করবেন। পেরিগনির এই বাতিক নিয়ে মারসিনে অনেক ঠাট্টা করেছেন এককালে। এখনো করেন। দুই বন্ধুতে সাপে-নেউলে লড়াই লেগে যায় তখন। পেরিগানকে মারসিনে বলেন—"বইয়ের পোকা ইঁদুর বোকা!" মারসিনেকে পেরিগনি বলেন—"রক্তখেকো নেকড়ে পিশাচ!" তা সত্ত্বেও দুই বন্ধুতে ভীষণ ভাব। দুজনেই ভাল অফিসার।

দিন কয়েক পরে মারসিনে গেলেন পেরিগনির ঘরে। গিয়ে দেখলেন, একটা নতুন ধরনের যন্ত্র সাজাচ্ছেন পেরিগনি। দুটো ইলেকট্রিক ব্যাটারী, কিছু ইলেকট্রিক-ম্যাগনেট, ধাতুর কুচো ভর্তি একটা ছোট কাঁচের নলকে ঘিরে কয়েক গজ খাড়াই একটা তামা—এই হল যন্ত্র।

"এটা আবার কী?" শুধোন মারসিনে।

"তোকে দেখানোর জন্যে খাড়া করছি। ডাকিনী বিদ্যে কাকে বলে দেখে যা। এই হল বেতার টেলিগ্রাফি—রিসিভার এই যন্ত্র," বললেন পেরিগনি।

শুনে আগ্রহ দেখালেন মারসিনে। বললেন—"সে তো কয়েক বছর ধরেই শুনছি। কাজ কিছু হয়েছে?"

"আলবাৎ হয়েছে। একই সঙ্গে পৃথিবীর দুজন মানুষ দুটো আবিষ্কার করে বসে আছেন। একজন ইটালির মানুষ। নাম, মার্কনি। শূন্যে হার্জিয়ান ওয়েভ্‌স্ পাঠানোর কৌশল বার করে ফেলেছেন। আর একজন ফ্রান্সের আদমি। নাম, ডক্টর ব্রানলি। উনি সেই ওয়েভ্‌স্‌কে পাকড়াও করার রিসিভার বার করে ফেলেছেন। দারুণ যন্ত্র রে। ছোট্ট হলেও দেখবার মত।"

"এই যন্ত্র?"

"হ্যাঁ। ব্রানলি দেখেছিলেন, লোহার কুচোর তড়িৎ পরিবাহিতা একেবারে নেই বললেই চলে—কিন্তু হার্জিয়ান ওয়েভ্‌স্‌য়ের সংস্পর্শে এলেই তা উৎকৃষ্ট তড়িত-পরিবাহী হয়ে দাঁড়ায়। তখন কুচোগুলো নিজেরাই নিজেদের টানাটানি করে সংসক্তি-প্রবণ হয়ে যায়—নতুন শক্তির জোরে গায়ে গায়ে আটকে এক হয়ে যায়। ছোট্ট এই নলটা দেখছিস?"

"দেখতেই তো পাচ্ছি।"

"এর মধ্যেই সংসক্তি-প্রবণতার খেলা চলে—সোজা কথায় এই টিউব তখন একটা ভালভ-টিউব হয়ে দাঁড়ায়—অথবা ওয়েভ-ডিটেকটর। ওয়েভের সংস্পর্শ পেলেই লোহার কুচো গায়ে গায়ে লেগে যায়। বুঝেছো মাথা মোটা?"

"তারপর ?"

"লোহার কুচিভর্তি টিউবটা এখন লাগানো রয়েছে ব্যাটারী সার্কিটে। টিউবের তড়িৎ পরিবাহিতা কম বলে কারেন্ট যাচ্ছে না। ঢুকেছে মাথায় ?"

"একেবারে।"

"এই যে তামার অ্যানটেনা দেখছিস, এর সঙ্গে টিউবের যোগাযোগ রাখা হয়েছে কেন জানিস ? যদি শূন্য পথে হার্জিয়ান ওয়েভ্স্ এসে পৌঁছোয়, তামার অ্যানটেনা দিয়ে তা টিউব স্পর্শ করবে। সঙ্গে সঙ্গে টিউবটা বিদ্যুৎ পরিবাহী হয়ে যাবে। ব্যাটারী সার্কিটের মধ্যে কারেন্ট ছুটবে। বুঝেছো রক্তখেকো নেকড়ে-পিশাচ ?"

"খুব বুঝেছি বইয়ের পোকা ইঁদুর বোকা। বলে যা খুদে বৈজ্ঞানিক, বলে যা।"

"বাকীটা আমার ব্রেন থেকে বেরিয়েছে। কারেন্ট গিয়ে একটা মর্স রিসিভার চালু করে দেয়—রিসিভার থেকে ছাপা হয়ে কাগজের ফিতে বেরিয়ে আসে। একই সঙ্গে ছোট্ট এই হাতুড়িটা ঠক্ করে পেটায় ওয়েভ-ডিটেক্টর এই টিউবটাকে। ঠোক্কর খেলেই ঝাঁকুনির চোটে লোহার কুচিগুলো ছাড়া ছাড়া হয়ে যায়—তড়িৎ-পরিবাহিতা চলে গেলেই কারেন্ট যাওয়া বন্ধ হয়ে যায়—মর্স রিসিভারে কাগজের ফিতে ছাপাও বন্ধ হয়ে যায়।

"তুই বলবি, এর ফলে মাত্র একটা পয়েন্টই তো ছাপা হবে কাগজে। কিন্তু তা নয়। পরপর পয়েন্ট ছাপা হয়ে চলে এইভাবে। হার্জিয়ান ওয়েভ যতক্ষণ অ্যান্টেনার মধ্যে আসতে থাকবে, ততক্ষণ পরের পর পয়েন্ট ছাপা হয়ে চলবে। ওয়েভ আসা বন্ধ হলেই কিছু ছাপা হবে না—তার পরের ওয়েভ এলেই ফের ছাপা শুরু হয়ে যাবে। ফলে ছোট ছোট দলে ভাগ করা সারি সারি অনেকগুলো পয়েন্ট পাওয়া যায়—মর্সের দীর্ঘ আর হ্রস্ব হরফের মত আর কি। টেলিগ্র্যাফি যে জানে, পয়েন্টের সিরিজ দেখেই সে বলে দিতে পারবে কি লেখা আছে।"

"শহর থেকে এত দূরে এ-যন্ত্র এনেছিস কেন বইয়ের পোকা ইঁদুর বোকা ?"

"ওয়েভ যেখানে তৈরী হচ্ছে—মানে, ট্রান্সমিটার আর ওয়েভ যেখানে ধরা হচ্ছে—মানে, এই রিসিভার চালু হবে কাল থেকে। বেতার টেলিগ্র্যাফিতে আমিই হব সাহারার প্রথম বৈজ্ঞানিক, বুঝেছো রক্তখেকো নেকড়ে-পিশাচ ?"

"চুপ কর !"

"তুই চুপ কর ! এখান থেকে খবর পাঠাবো সেন্ট লুইতে—"

"বড্ড দূরে হয়ে গেল না ?"

"দূরে কিরে ? দূর পাল্লায় খবর পাঠানোর এক্সপেরিমেন্ট এর মধ্যেই করা হয়েছে। আমিও করব একটার পর একটা এক্সপেরিমেন্ট এই নাইজারে…"

আচমকা থেমে গেলেন পেরিগনি। চোখ বড় বড় করে তাকালেন আজব যন্ত্রটার দিকে।

বললেন বোকা বোকা স্বরে—"একী ! মেশিন চলছে যে !"

"মেশিন চলছে !"

"হ্যাঁ…হ্যাঁ…শুনতে পাচ্ছিস না কালা কোথাকার ? খড়খড় করে একটা আওয়াজ হচ্ছে ?"

"থাম ! আফ্রিকায় এ যন্ত্র একটাই। কে তোকে খবর পাঠাবে শুনি ? হয় তোর মেশিন বিগড়েছে, নয় তোর মাথা।"

জবাব দিলেন না পেরিগনি। ঝুঁকে পড়লেন রিসিভারের ওপর। মেশিন বিগড়োলে এই লেখাটা আসছে কোত্থেকে ?

'ক্যাপ…টেন…ক্যাপ…টেন…মার…ক্যাপ্টেন মারসিনি !'

"ফুঃ ! আমার নাম তোর মেশিনে ? ধাপ্পা দেবার আর জায়গা পাসনি ?"

"হ্যাঁ…হ্যাঁ…তোর নাম ?" আবেগে কথা আটকে গেল পেরিগনির। দেখে আর টিটকিরি দিতে পারলেন মারসিনে।

স্তব্ধ হল যন্ত্র। ব্যগ্র চোখে চেয়ে রইলেন দুই অফিসার। কিছুক্ষণ সব চুপচাপ। তারপরেই ফের আরম্ভ হল খটাখট আওয়াজ—মর্স টেলিগ্রাফি !

ঝুঁকে পড়লেন পেরিগনি—"মারসিনে…মারসিনে"…এবার তোর ঠিকানা …শোন…'টিমবাকটু'।"

যন্ত্রবৎ পুনরাবৃত্তি করলেন মারসিনে—"টিমবাকটু।" আবেগের ছোঁয়া লেগেছে তাঁর স্বরেও। বিচিত্র আবেগে গলা কাঁপছে।

আবার নিথর নিস্তব্ধ হল রিসিভার। চালু হল একটু পরেই। ছাপা ফিতে বেরিয়ে এল বাইরে। তারপরেই গেল থেমে। শুনিয়ে শুনিয়ে পড়লেন পেরিগনি—"আমি জেন ব্লেজন।"

কেন যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন মারসিনে।

বললেন—"চিনি না। পেরিগনি, কেউ মজা করছে আমাদের নিয়ে।"

"মজা করছে ? কেন ? তাছাড়া—আরে ! আবার শুরু হয়েছে।

মেশিনের ওপর ঝুঁকে পড়ে থেমে থেমে পড়তে লাগলেন বিষম উত্তেজিত পেরিগনি—"ব্ল্যাক···ল্যাণ্ডে···বন্দিনী···জেন···মোরনাসকে···উদ্ধার···করে নিয়ে···যান।"

"জেন মোরনাস!" যেন দম আটকে এল মারসিনের—খুলে ফেললেন কলারের বোতাম।

মেশিন ফের থেমেছে। এই নিয়ে চতুর্থবার সিধে হয়ে দাঁড়ালেন পেরিগনি। চাইলেন বন্ধুর মুখের দিকে। ফ্যাকাশে হয়ে গেছেন মারসিনে।

"মারসিনে, এমন করছিস কেন?

"পরে শুনবি। কিন্তু ব্ল্যাকল্যাণ্ড জায়গাটা কোথায়?" কথা বলতেও বুঝি কষ্ট হচ্ছে মারসিনের।

জবার দেবার সময় পেলেন না পেরিগনি—ফের চালু হয়ে গেল মেশিন। পড়লেন থেমে থেমে— "অক্ষাংশ ··· পনেরো—ডিগ্রী—প—ঞ্চা—শ—মিনিট উত্তর—দ্রা—ঘি—মা···।"

আবার থেমে গেল মেশিন। দুই বন্ধু উদভ্রান্তের মত চেয়ে রইলেন। কিন্তু নীরব যন্ত্র আর মুখর হল না। হঠাৎ থেমে গিয়ে নতুন করে চালু হল না। একেবারেই থেমে রইল।

ভাবনায় পড়লেন পেরিগনি—"মারসিনে, পাণ্ডববর্জিত এ দেশে আমার মত আর একজন সখের বৈজ্ঞানিক বেতার যন্ত্র নিয়ে বসে আছে···তাও কি হয়? তবে তাকে কেউ চেনে দেখছি।"

বলে মুখ তুলে চাইলেন। ভড়কে গেলেন বন্ধুর মুখের চেহারা দেখে—"একী! মুখ শুকনো কেন? কি হল?"

সংক্ষেপে মারসিনে বললেন জেন মোরনাস কে। বারজাক মিশনকে আগলে নিয়ে যাওয়ার সময়ে আলাপ তাঁর সঙ্গে। মুখ ফুটে কেউ কাউকে মনের কথা বলেন নি। কিন্তু মারসিনে জানেন, একদিন তাঁর ঘরেই বউ হয়ে আসবে এই জেন মোরনাস।

বিপদে পড়েছে তাঁর হবু বউ। প্রথম যখন মর্স ফিতেতে নিজের নাম দেখেন মারসিনে, উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন। এখন জেন মোরনাসের নাম দেখে আতংকিত হয়েছেন। কর্ণেল সেন্ট অবানের হুকুমনামা জাল করে সৈন্যসমেত তাঁকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে জেন মোরনাসকে বন্দী করবার জন্যে। আর কোনো সন্দেহ নেই। এখন উপায়?

পেরিগনি বললেন—"যাব সবাই—উদ্ধার করে আনব তোর ভাবী স্ত্রীকে।

তবে অত ঘাবড়াসনি। ভদ্রমহিলা খুব বিপদে নেই।"

"কি বলছিস?"

"ঠিকই বলছি। উনি একা নেই—থাকলে বেতার প্রেরক যন্ত্র পেতেন না। এ যন্ত্র যিনি তৈরী করেছেন, তিনি নিঃসন্দেহে প্রতিভাবান। তিনিই আগলে রেখেছেন শ্রীমতিকে। তাছাড়া, টিমবাকটুতে তুই আছিস, টিমবাকটু যে বহুদূরের পথ এবং টেলিগ্রাফ করলেও যে ঝাঁ করে তুই তাঁর পাশে গিয়ে পড়বি না—সব জেনেও খবরটা পাঠাচ্ছেন। কারণ, উনি জানেন মাথার ওপর খাঁড়া ঝুলছে না। খবরটা শুধু তোকে জানিয়ে রাখলেন।"

"তাহলে কি করতে বলিস?"

"মাথাটাকে আগে ঠাণ্ডা কর। তারপর চল কর্ণেলকে গিয়ে বলি, এই ব্যাপার। এখুনি সৈন্যসামন্ত নিয়ে বেরোতে হবে বারজাক মিশনের সবাইকে উদ্ধার করার জন্যে।"

তৎক্ষণাৎ দুই ক্যাপ্টেন গেলেন কর্ণেলের সামনে। কর্ণেল ফিতের সমাচার পড়লেন।

বললেন—"এতে বারজাকের কথা লেখা নেই।"

"কিন্তু শ্রীমতি মোরনাস ওঁর সঙ্গেই ছিলেন," বললেন পেরিগনি।

"পরে নিশ্চয় দলছাড়া হয়েছেন। বারজাক মিশন যে রাস্তা ধরে যাবে, আমি তা জানি। এত উঁচু ল্যাটিচিউডে যাওয়ার কথা নয় তাঁর।"

"কথাটা ঠিক", সায় দিলেন মারসিনে। "মিস মোরনাস বলেছিলেন বটে উত্তরে একলা যাবেন।"

"তাহলে তো মিটেই গেল। বারজাক মিশন সরকারী অভিযান—তাঁরা বিপদে পড়লে সৈন্য পাঠানো যায়। কিন্তু বেসরকারী ব্যক্তি বিশেষের জন্যে—"

"কিন্তু মিথ্যে অর্ডার দিয়ে যে রাস্কেলরা আমাকে সরিয়েছে, তাদের হাতেই বারজাক নাস্তানাবুদ হচ্ছে কিনা জানছেন কি করে?" মারসিনে উত্তেজিত।

"হতে পারেন। কিন্তু বামাকো থেকে জবাব না এলে তো সেটাও জানা যাচ্ছে না।"

"কিন্তু আর কি দেরী করা যায়?"

"নিরুপায় আমি। তাছাড়া ব্ল্যাকল্যাণ্ড জায়গাটা কোথায়? যে ল্যাটিচিউডের কথা বলা হয়েছে, ওটাতো মরুভূমির একদম ভেতরে। সৈন্য পাঠানোর ঝুঁকি নেওয়া যায় কি? অসম্ভব। আরও মুস্কিল আছে। ব্ল্যাকল্যাণ্ড

শব্দটা ইংরেজী শব্দ। যে ঠিকানা দেওয়া হয়েছে, ইংলিশ কলোনী 'সোকোটো ওর খুব কাছেই। শেষকালে সৈন্য নিয়ে গিয়ে অন্য রাষ্ট্র আক্রমণের ঝামেলায় পড়ব? সবচেয়ে বড় কথা, কিছুদিন ধরেই রহস্যজনক একটা গুজব শোনা যাচ্ছে লোকেদের মুখে। মরুভূমির মধ্যে কোথায় নাকি একটা আশ্চর্য সা াজ্য গড়ে উঠেছে—সেখানকার লোকজন কেউ সুবিধের নয়। কে জানে এই ব্ল্যাকল্যাণ্ড সেই সাম্রাজ্যের রাজধানী কিনা? ল্যাটিচিউড দেখে তো সেই রকমই মনে হচ্ছে। না, ক্যাপ্টেন মারসিনে, আপনাকে সৈন্য দিয়ে পাঠানো আমার পক্ষে সম্ভব নয়।"

"বেশ তো, আমি একশ সৈন্য নিয়ে এসেছি—তাদের নিয়ে যেতে দিন।"

"সে সৈন্য সরকারী সৈন্য। তাছাড়া অত অধৈর্য হচ্ছেন কেন? ভদ্র-মহিলা একবার যখন টেলিগ্রাফ করেছেন—আবার করবেন।"

"সেটা অনিশ্চিত। তার জন্যে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকা যায় না।"

"আমি নিরুপায়।"

'আর যদি টেলিগ্রাফ না করেন? বেতারবার্তা মাঝপথে হঠাৎ বন্ধ হয়ে যাওয়াটা বিপদের সংকেত নয়?"

"আমি নিরুপায় ক্যাপ্টেন!"

"কর্ণেল অ্যালিগ্রে, আমি তাহলে একাই যাব।"

"একা যাবেন?"

"হ্যাঁ। আমাকে ছুটি দিন।"

"কিন্তু ছুটি তো আমি দেব না। এরকম ঝুঁকির মধ্যে আমার অফিসারকে আমি ছাডতে পারি না।"

"তাহলে আমি চাকরি ছেড়ে দিচ্ছি।"

চেয়ে রইলেন কর্ণের অ্যালিগ্রী, বুঝলেন, ক্যাপ্টেন মারসিনে ধাতস্থ নন। বললেন নরম সুরে—"আপনি ভুলে যাচ্ছেন আপনার পদত্যাগপত্র নেওয়ার অধিকার আমার নেই—উপযুক্ত দপ্তরে পাঠাতে হবে। যাই হোক, আজ আপনি যান। বিশ্রাম নিন, এ নিয়ে কথা হবে কাল সকালে।"

স্যালুট করে বেরিয়ে গেলেন দুই অফিসার। পেরিগনি বন্ধুকে অনেক আশ্বাস দিলেন। তারপর গেলেন নিজের ঘরে।

ক্যাপ্টেন মারসিনে ঘরে গিয়ে ভেতর থেকে তালা দিয়ে আছড়ে পড়লেন বিছানায়। অনেকক্ষণ সিধে ছিলেন, শক্ত ছিলেন, তেজী ছিলেন।

এখন আর ধরে রাখতে পারলেন না নিজেকে। ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন বালিশে মুখ গুঁজে।

৯ ॥ বিপর্যয়

জল-বিদ্যুৎ ঘাঁটি থেকে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ করে নিজেই ফাঁপড়ে পড়ল হ্যারি কীলার। তাই ৯ই এপ্রিল বন্ধ করার পর ফের বিদ্যুৎ সরবরাহ শুরু হল পরের দিন সকালে।

নাকের জলে চোখের জলে হতে হল বেচারাকে। ফ্যাক্টরীকে কারেন্ট না দিলে ফ্যাক্টরী তাদের শক্তি জোগাবে কেন?

ফলে বন্ধ হয়ে গেল চাষের মেশিন—পাইলন থেকে ওয়েভ তো আর যাচ্ছে না।

বন্ধ হয়ে গেল জলের পাম্প। দুটো পাম্পের একটা থাকে ফ্যাক্টরীর মধ্যে। আর একটা ব্ল্যাকগার্ডদের আস্তানায়। পাম্প বন্ধ হতেই রিজার্ভার খালি হওয়ার পর আর জল উঠল না নদী থেকে। গোটা ব্ল্যাকলাণ্ডে এক ফোঁটা জলও আর কেউ পেল না।

রাত হল! ব্ল্যাকল্যাণ্ডে কোথাও কোনো আলো জ্বলল না। বিদ্যুৎ নেই, আলো জ্বলবে কি করে? হ্যারি কীলার তুরুক লাফ লাফাতে লাগল অন্ধকার ব্ল্যাকল্যাণ্ডের পাশে ঝলমলে ফ্যাক্টরী দেখে। জোরালো সার্চলাইট-গুলো পর্যন্ত জ্বলছে সেখানে।

তাই ১০ ই এপ্রিল সকালে কারেন্ট চালু করে দিয়ে ক্যাম্যারেটকে ফোন করল সম্রাট। আগের মতই 'হ্যাঁ…না'…'ভালই তো' বলে হেসে উঠে লাইন ছেড়ে দিলেন ক্যাম্যারেট।

হিজ ম্যাজেস্টির সঙ্গে একটা রফা হয়েছে। হ্যারি কীলার কারেন্ট দেবে—বিনিময়ে শহরের কলকব্জা চালু রাখতে হবে। রাজী হয়েছেন ক্যাম্যারেট। ক্ষতি কিছু নেই এ রফায়।

কিন্তু যখন হ্যারি কীলার বন্দীদের ফেরৎ চাইল, তখন তিনি সটান 'না' বলে দিলেন। হ্যারি কীলার তরল বাতাস চাইলে। চল্লিশটা হেলিপ্লেন অকেজো হয়ে রয়েছে। ক্যাম্যারেট না বলে দিলেন। তরল বাতাস এখন তার নিজেরই দরকার। ফলে, রেগে আগুন হয়ে হ্যারি কীলার হুমকি দিলে না খাইয়ে মারবে ফ্যাক্টরী শুদ্ধ লোককে। শুনে 'ভালোই তো' বলে হেসে উঠে লাইন ছেড়ে দিলেন ক্যাম্যারেট।

কিন্তু হাসতে পারলেন না তাঁর অতিথিরা। ফ্যাক্টরী অবরোধ করে বসে থাকলে সত্যিই তো একদিন খাবার ফুরোবে। তখন?

বারজাক জিজ্ঞেস করলেন ক্যাম্যারেটকে—"কদ্দিনের খাবার আছে আপনার?"

জবাবটা এড়িয়ে গেলেন ক্যাম্যারেট—"ঠিক জানি না। দুহপ্তা থেকে তিন হপ্তার মত।"

সর্বনাশ! এখন উপায়?

ক্যাম্যারেট বললেন—"অত ঘাবড়াবেন না, দুদিনের মধ্যে একটা হেলি-প্লেন তৈরী হয়ে যাবে। ১২ এপ্রিল রাত চারটের সময়ে আপনাদের চড়িয়ে মহড়া দোব। রাতের অন্ধকারে প্যালেস থেকে দেখতে পাবে না।"

সুখবর। কিন্তু একটা হেলিপ্লেনে করে ফ্যাক্টরী শুদ্ধ লোককে নিরাপদ জায়গায় চালান দেওয়া যাবে কি? কত লোক আছে ফ্যাক্টরীতে?...

"বাচ্চাকাচ্চা মেয়েছেলে মিলিয়ে মোট দেড়শ"—বললেন ক্যাম্যারেট। দশজনের জায়গা হবে হেলিপ্লেনে। এখান থেকে 'সায়' আকাশ-পথে দুশ মাইল, 'টিমবাকটু' সাড়ে চারশ মাইল। আকাশ টর্পেডোর খপ্পর থেকে বাঁচবার জন্যে রাত্রে হেলিপ্লেন চালিয়ে দেড়শ' লোককে 'সায়' পৌঁছে দিতে লাগবে পাঁচদিন। টিমবাকটুতে আটদিন।"

প্ল্যান মন্দ নয়। মনে ধরল সকলের।

কিন্তু এই দুটো দিন যেন আর কাটতে চায় না। এর মধ্যেই একদিন দেখা গেল রাতের অন্ধকারে গা ঢেকে বাগানের ফুলকপি, শাক, বাঁধাকপির মাপ নিচ্ছেন পঁসিঁ, আর হিসেব লিখেছেন খাতায়। চাতোন্নে আর ফ্লোরেন্স জিজ্ঞেস করে জানলেন, পরিসংখ্যানবিদ ভদ্রলোক অংক কষে দেখছেন সব্জী-গুলো যদি এইটুকু জায়গায় এতখানি বেড়ে ওঠে এবং এত ফসল ফলায়, তাহলে গোটা নাইজারে কত ফলন সম্ভব, তাহলে কত লোককে ঠাঁই দেওয়া যায়। হিসেবে পাওয়া গেছে এই হারে ফলন হলে প্রত্যেক দিন ১২,০১২,০০০ টন সব্জী ফলবে নাইজার বেণ্ডে। জন পিছু কত সব্জী লাগবে, সেই হিসেব থেকে বেরিয়ে যাবে কত লোককে রাখা যাবে নাইজার বেণ্ডে।

পঁসিঁ খুব গম্ভীরভাবেই বলে গেলেন। সরে এলেন চাতোন্নে আর ফ্লোরেন্স।

এর মধ্যে আর একটা ঘটনা ঘটল। পাম্প খারাপ হয়ে গেল। দ্বিতীয় দিন বিকেলে খবর এল, পাম্প যেন শূন্যে ঘুরছে—জলের বাধা পাচ্ছে না।

পিসটন টেনে তুলতে হুকুম দিলেন ক্যাম্যারেট—জখম হয়েছে কি না দেখার জন্যে চোঙার ফুটো ফিট করলেন না। সামান্য ব্যাপার। দুদিনেই মেরামত হয়ে যাবে।

পরের দিন ভোররাতে অবসান ঘটল দুঃসহ প্রতীক্ষার। বাগানে পৌঁছে অতিথিরা দেখলেন, কথা রেখেছেন ক্যাম্যারেট। হেলিপ্লেন তৈরী হয়ে গেছে। বাইরে এনে রেখেছে শ্রমিক-কর্মচারীরা।

প্ল্যাটফর্মে উঠে বসলেন ইঞ্জিনীয়ার। চালু করলেন :মোটর। মিনিট কয়েক পরেই অনায়াসে বাতাসে ভেসে উঠল হেলিপ্লেন। ডানা ঝাপটে উঠে গেল আরো উঁচুতে। বাগানে চক্কর দিয়ে নেমে পড়লেন ক্যাম্যারেট। দশ-জন লোক তুলে তিন পাক ঘুরে এলেন বাগানে। এক্সপেরিমেন্ট সফল হয়েছে।

বললেন—"আজ রাত নটায় প্রথম ফ্লাইট চালু হবে।" নেমে গেলেন প্ল্যাটফর্ম থেকে।

বুক থেকে পাষাণ ভার নেমে গেল যেন—উল্লাসে ফেটে পড়লেন অভিযাত্রীরা। এত কষ্ট, এত উদ্বেগ আর মনে রইল না। রাত হলেই পৌঁছে যাবেন টিমবাকটু—মুক্তি পাবেন দুশ্‌মনদের অবরোধ থেকে।

কিন্তু পাম্প সারাতে হবে তার আগে। ফ্যাক্টরীর রোজকার কাজকর্ম যেন বন্ধ না থাকে। দেখা গেল, পাম্প জখম হয়নি। তবু কেন বিগড়ে গিয়েছিল, বোঝা গেল না। যাই হোক, তক্ষুনি বসিয়ে দেওয়া হল পাম্পের পিস্‌টন।

রাত সাড়ে আটটার সময়ে অতিথিরা বাগানে গিয়ে দেখলেন অন্ধকারে গা ঢেকে সবাই হাজির। তাঁরা আটজন—সঙ্গে যাচ্ছে শ্রমিক কর্মচারীদের দুই স্ত্রী—মোট দশজন।

ক্যাম্যারেট হুকুম দিলেন। বারোজন কারিগর গিয়ে দরজা খুলে ধরল হেলিপ্লেন-ছাউনির···

বিপর্যয়টা ঘটল ঠিক তখুনি।

দরজা খুলে ধরার সঙ্গে সঙ্গে প্রলয়ংকর বিস্ফোরণে তাসের ঘরের মত ভেঙে পড়ল ছাউনি—রাবিশ ছাড়া আর কিছু রইল না।

কিছুক্ষণ ভ্যাবাচাকা খেয়ে দাঁড়িয়ে থাকার পর দল বেঁধে সবাই দৌড়ে গেলেন। কারিগরদের কেউ জখম হয়নি—অল্পের জন্যে বেঁচে গেছে। কিন্তু···

সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়েছে হেলিপ্লেন। টুকরো টুকরো হয়ে চাপা পড়েছে রাবিশের তলায়।

ক্যাম্যারেটের প্রশান্তিতে চিড় ধরল না।

বললেন—"রিগড, রাবিশ সরাও। কেন এমন হল, জানা দরকার।"

রাত এগারোটার সময়ে বেশ কিছু রাবিশ সরানোর পর দেখা গেল মাটিতে পেল্লায় এক ফুটো।

"ডিনামাইট," শীতল স্বরে বললেন ক্যাম্যারেট। "উড়ে আসেনি নিশ্চয়। দেখা যাক।"

রাবিশের গায়ে রক্তের দাগের মধ্যে তার প্রমাণ রয়েছে। মাঝ রাতে পাওয়া গেল নিগ্রোর ধড় থেকে ছিটকে আসা একটা হাত—আর এক-জায়গায় পাওয়া গেল দলা পাকানো মাংসপিণ্ডের সঙ্গে লাগানো মুণ্ডুটা।

সাংবাদিকের কাজটা ঠিক চালিয়ে যাচ্ছিলেন অ্যামিদী ফ্লোরেন্স। দাঁড়িয়ে ছিলেন কাছেই। মুণ্ডু দেখেই বললেন—"চৌমৌকি! বিশ্বাসঘাতক!"

ক্যাম্যারেটকে বললেন, চৌমৌকি কে, কি কাণ্ড করেছে এর আগে। এই ডিনামাইটও ফাটিয়েছে সে, কিন্তু ভেতরে ঢুকল কি ভাবে? সে যখন ঢুকেছে, অন্যেও তো ঢুকবে। চোরাপথ বার করতে না পারলে কারো রক্ষে নেই।

ক্যাম্যারেট ছিন্নবিচ্ছিন্ন দেহাংশগুলো পাঁচিল টপকিয়ে এসপ্ল্যানেডের দিকে ছুঁড়ে দিতে হুকুম দিলেন। দেখুক ওরা, কারখানায় ঢুকলে কি হাল হয়।

রাবিশ পরিষ্কারের কাজ কিন্তু থামেনি। কিছুক্ষণ পরে পাওয়া গেল আর একটা দেহ—শ্বেতকায়। কাঁধ চুরমার। কিন্তু দেহে এখনো প্রাণ আছে।

চাতোন্নে চিকিৎসা আরম্ভ করে দিলেন। পরের দিন সকালে পেট থেকে কথা বার করতে হবে। যদি বলে।

দাঁতে দাঁত পিষে ক্যাম্যারেট বললেন—"কি করে বলাতে হয়, আমি তা জানি।"

আরো কিছুক্ষণ পরে বেশ কিছু রাবিশ পরিষ্কার হয়ে গেল। বিদায় নিল শ্রমিক-কর্মচারীরা। ক্যাম্যারেট অতিথিদের নিয়ে এলেন কোয়ার্টারে।

যে-যার ঘরে যাচ্ছেন, এমন সময়ে ক্যাম্যারেটকে পেছন থেকে ডাকলেন অ্যামিদী ফ্লোরেন্স।

"এখন কি করবেন? হেলিপ্লেন তো আর নেই।"

"আর একটা বানিয়ে নেব।"

"কদ্দিনে ?"

"দুমাসে।"

আর কথা না বাড়িয়ে কি যেন ভাবতে ভাবতে নিজের ঘরে চলে গেলেন ফ্লোরেন্স।

দু'মাস!...এদিকে খাবার রয়েছে মাত্র আধমাসের।

তাই পরিত্রাণের পথ ভাবছেন রিপোর্টার মশায়।

১০ ॥ মতলব এসেছে রিপোর্টারের মাথায়

একদিনের মধ্যে কি বিরাট পরিবর্তন! গতকাল মহড়ার পর আনন্দে নাচতে বাকী রেখেছিলেন অভিযাত্রীরা। আর আজ? আশা নেই, আশা নেই—নিঃসীম নৈরাশ্য ছাড়া কিছু নেই। মনে মনে ভেঙ্গে পড়লেন সবাই।

বাকী রাতটা দুচোখের পাতা এক করতে পারলেন না অনেকেই। হাজার শলাপরামর্শ করেও দেশে ফিরে যাওয়ার নতুন পথ আবিষ্কার করতে পারলেন না।

দিশেহারা হলেন মারসেল ক্যাম্যারেট নিজেও। দু'মাস আগে নতুন হেলিপ্লেন তৈরী হচ্ছে না। এদিকে খাবার রয়েছে বড় জোর পনেরো দিনের। এখন উপায়?

খাবারের হিসাব নিয়ে দেখা গেল, অবস্থা আরো শোচনীয়। বাগানের সব্জী আর ভাঁড়ারের যা কিছু আছে, সব কুড়িয়ে বাড়িয়েও ন'দশ দিনের বেশী চলবে না! অর্থাৎ, এপ্রিল ফুরোনোর আগেই খাবার ফুরচ্ছে! সেই সঙ্গে আয়ু!

তাই ঠিক হল, রেশন করে খাওয়া হবে শেষ কটা দিন। এইভাবে আরও কদিন বেশী বাঁচা যাবে তো।

১৩ই এপ্রিল সকালে এই সব হিসেব নিকেশ করার পর বিকেল নাগাদ বন্দীকে নিয়ে পড়লেন সবাই।

ক্যাম্যারেট প্রথম প্রশ্ন করলেন—"কে আপনি?"

জবাব নেই। ফের জিজ্ঞেস করলেন ক্যাম্যারেট। কিন্তু বৃথাই।

নরম সুরে বললেন ক্যাম্যারেট—"সাবধান। আমি কিন্তু কথা বলিয়ে ছাড়ব।"

ব্যঙ্গের হাসি হাসল বন্দী। হুমকি যিনি দিচ্ছেন, তাঁর চেহারা দেখে ভয় পাওয়ারও কথা নয়।

পীড়াপীড়ি করলেন না ক্যাম্যারেট। বেয়ারা বন্দীর হাতের আর পায়ের বুড়ো আঙুলের তলায় চারটে ধাতুর পাত রাখলেন। পাতের সঙ্গে তার লাগিয়ে টেনে নিয়ে গিয়ে প্লাগে লাগালেন, তারপর একটা সুইচ টিপে দিলেন

সঙ্গে সঙ্গে ধনুষ্টঙ্কার রুগীর মত লোকটার সমস্ত দেহ:বারবার বেঁকে তেউড়ে যেতে লাগল। দড়ির মত ফুলে উঠল ঘাড়ের শিরা। টকটকে লাল মুখ দেখে বোঝা গেল, যন্ত্রণা আর সইতে পারছে না।

কয়েক সেকেণ্ড দেখলেন ক্যাম্যাষেট। সুইচ নেভালেন।

জিজ্ঞেস করলেন—"কথা বলবেন ?"

জবাব নেই।

আবার সুইচ টিপে দিলেন ক্যাম্যাবেট। এবার আরো ভয়ংকর ভাবে দুমড়ে মুচড়ে বেঁকে যেতে লাগল শরীর—মনে হল শিরদাঁড়া যেন মট করে ভেঙে যাবে উল্টো দিকে। চোখ ঠেলে বেরিয়ে এল বন্দীর, ঘাম দাঁড়িয়ে গেল কপালে। হাপরের মত উঠতে আর নামতে লাগল বুকের খাঁচা।

সুইচ নি ভয়ে জিজ্ঞেস করলেন ক্যাম্যারেট—"কথা বলবেন ?"

"হ্যাঁ...হ্যাঁ...বলব ?" দম ফুরিয়েছে শয়তানের।

"বাঃ! এই তো চাই! কি নাম আপনার ?"

"ফারগুস ডেভিড।"

"ওটা কি নাম হল ? ও তো দুটো ডাক নাম।"

"ঐ নামেই ব্ল্যাকল্যাণ্ডে ডাকা হয় আমাকে। আসল নাম কেউ জানে না।"

"আমি জানতে চাই।"

"ড্যানিয়েল ফ্রাসনে।"

"জাত ?"

"ইংরেজ।"

"ব্ল্যাকল্যাণ্ডে আপনার কাজ কি ?"

"কাউন্সিলর।"

"কাউন্সিলর মানে ?"

অবাক হল ফ্রাসনে—"হ্যারি কীলালের গভর্ণমেন্ট যারা চালায়, তাদের কাউন্সিলর বলা হয়।"

"আপনি ব্ল্যাকল্যাণ্ড গভর্ণমেন্টের একজন ?"

"হ্যাঁ।"

"কবে থেকে?"

"গোড়া থেকে।"

"হ্যারি কীলারকে তার আগে থেকে চেনেন?"

"চিনি।"

"কোথায় ছিলেন তাহলে?"

"ব্লেজনের বাহিনীতে।"

কেঁপে উঠলেন জেন। কি কপাল। পাওয়া গেল আর একজন সাক্ষী!

ক্যামারেট জেরা চালিয়ে গেলেন—"ব্লেজনের বাহিনীতে ছিলেন? কিন্তু আমি চিনতে পারছি না কেন?

"চেহারা পালটেছে বলে। আপনার সঙ্গেই ছিলাম।"

জেন ব্লেজন আর নিজেকে ধরে রাখতে পারলেন না—"মঁসিয়ে ক্যামারেট, আমি কিছু জিজ্ঞেস করতে চাই।"

"করুন না।"

জেন জিজ্ঞেস করলেন—"হ্যারি কীলার যখন ব্লেজনের দলে এল, তখন ছিলেন?"

"হ্যাঁ।"

"আপনি দেখেছিলেন?

"হ্যাঁ।"

"হ্যারি কীলারকে অত জামাই আদর করেছিলেন কেন ক্যাপ্টেন ব্লেজন?" .

"জানি না।"

"হ্যারি কীলার দলে এসেই সেইদিন থেকেই বাহিনীর :আসল কম্যাণ্ডার হয়ে বসেছিল যদি বলি, ভুল বলা হবে কী?"

"ঠিকই বলেছেন, "একটু অবাক হল ফ্রাসনে। এত পুরোনো কথা এ জানল কি করে?

"খুনজখম, লুঠতরাজ, গ্রামকে গ্রাম জ্বালানো—সব কিছু তাহলে হ্যারি কীলারের হুকুমে হয়েছিল?"

"নিশ্চয়।"

"ক্যাপ্টেন ব্লেজনের হাত ছিল না।"

"না।"

"জেন্টেলমেন" সঙ্গীদের দিকে :ফিরে বললেন জেন—"আপনারা শুনে

রাখুন।" তারপর ফিরলেন বন্দীর পানে—"হ্যারি কীলারকে কতৃত্ব ছেড়ে দিলেন কেন ক্যাপ্টেন ব্লেজন?"

"আমি কি করে জানবো? ফ্রাসনে এবার অধৈর্য।

"ক্যাপ্টেন ব্লেজন মারা গেলেন কি করে জানেন?"

"লড়তে লড়তে।"

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন জেন। এভাবে জেরা করে লাভ হবে না।

ক্যামারেট বললেন—"আপনি প্রশ্ন করুন। আমার হয়ে গেছে।"

সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন ধরার খেই তুলে নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন ক্যামারেট—"এ শহর নিগ্রোরা মেহনত করে বানিয়েছে। কোথায় পেলেন এত নিগ্রো?"

এ আবার কি প্রশ্ন? আহাম্মুকের মত একথা আবার কেউ জানতে চায়? চোখ কপালে তুলে তাই বললে" জখম দুশমন —"কোত্থেকে আবার—গ্রাম থেকে। ন্যাকামি করছেন কেন?"

"কিভাবে?"

"আবার ন্যাকামি! ···হিঁচড়ে টেনে নিয়ে এলাম—আবার কিভাবে!"

"ও!" দুহাতে রগ টিপে ধরলেন ক্যামারেট।

"গোড়ায় কোনো মেশিনপত্র ছিল না—পেলেন কোত্থেকে?"

"চাঁদ থেকে নিশ্চয় নয়!"

"ইউরোপ থেকে?"

"তাই তো মনে হয়!"

"কি ভাবে এল এখানে?"

"উড়ে আসেনি নিশ্চয়? মজা করছেন নাকি? জাহাজে এল··· জাহাজে।"

"জাহাজ থেকে মাল খালাস করলেন কোথায়?" ক্যামারেট প্রশান্ত।

"কোটোনৌতে।"

"কোটোনৌ থেকে ব্ল্যাকল্যাণ্ডে আনলেন কি করে? কে বয়ে আনল?"

"উট, ঘোড়া, নিগ্রো।" ফ্রাসনের ধৈর্য ফুরিয়ে আসছে, কথাগুলো বাঁকা বাঁকা হয়ে যাচ্ছে।

"পথ তো কম নয়। নিশ্চয় অনেক নিগ্রো মারা গেছে?"

"জন্মেছে যত, মরেছে তার বেশী! গুনে রাখিনি।"

"মেশিনের দাম দেওয়া হয়েছিল?"

"আচ্ছা মুস্কিল তো!"

"ব্ল্যাকল্যাণ্ডে তাহলে টাকা আছে ?"

"কখনো ফুরোয় না—এত আছে !"

"কোত্থেকে এল এত টাকা ?"

এবার ধৈর্য রাখতে পারল না ফ্রাসনে—"হেলিপ্লেনগুলো বানিয়েছিলেন কেন জানেন না ? ন্যাকামি করছেন কেন বুঝছি না। জানেন না হেলিপ্লেনে করে হ্যারি কীলার আমাদের নিয়ে বিশাগো আইল্যাণ্ডস-য়ে যেত ? জানেন না সেখান থেকে জাহাজে করে ইউরোপে গিয়ে ব্যাঙ্ক আর কিপটে বড়লোকদের টাকা নিয়ে আসতাম ? সব জানেন—সমস্ত জানেন। বিনা নেমন্তন্নে যেতাম—টাকার বাক্স নিয়ে জাহাজে চেপেই ফিরে আসতাম—বেশীর ভাগ হানা দিতাম ইংল্যাণ্ডে। কাকপক্ষীও টের পেত না কোথায় যাচ্ছি।"

লজ্জায় যেন চোখ তুলে তাকাতে পারলেন না ক্যামারেট— 'প্রায় যান ?"

"জ্বালালে দেখছি। ···বছরে তিন চারবার তো বটেই।"

"শেষ কবে গেছিলেন ?"

"চার মাস কি সাড়ে চার মাস আগে।"

"কার বাড়ী নেমন্তন্ন রেখে এলেন ?"

"বলতে পারব না। সেবার আমি যাইনি। শুনেছি একটা ব্যাঙ্কে।"

মারসেল ক্যাম্যারেট মাথা নিচু করে রইলেন কিছুক্ষণ। মনে হল যেন এক ধাক্কায় বয়স বেড়ে গেছে দশ বছর।

জিজ্ঞেস করলেন—"কত নিগ্রোকে খাটাচ্ছেন এখানে ?"

'চার হাজারেরও বেশী।"

"হাঁটিয়ে এনেছেন ?"

"না। এখন তো হেলিপ্লেন রয়েছে। তুলে নিয়ে আসি।"

নিঃশ্বেস ফেললেন ক্যাম্যারেট—"ফ্যাক্টরীতে ঢুকলেন কী করে ?"

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। দ্বিধায় পড়ল ফ্রাসনে। কিন্তু জবাব না দিয়েও পারল না —"রিজার্ভারের মধ্যে দিয়ে।"

"রিজার্ভারের মধ্যে দিয়ে ?" ক্যাম্যারেট অবাক।

"পরশুর আগের দিন নদীর ওয়াটার গেট বন্ধ করা ছিল। তাই পাম্প করে জল তুলতে পারেন নি। প্যালেসের রিজার্ভার খালি হয়ে যায়—ফ্যাক্টরীর রিজার্ভারও শুকিয়ে যায়—কেননা জল আসে প্যালেস রিজার্ভার থেকে এসপ্ল্যানেডের তলার জলনালি দিয়ে। এই জলনালির মধ্যে দিয়ে আসি আমি আর চৌমৌকি !"

ক্যামারেট এখন বুঝলেন চৌমৌকির টুকরো টাকরা লাশ ফিরে পেয়ে ভয়ের চোটে জল ছেড়ে দিয়েছে হ্যারি কীলার—তাই ফ্যাক্টরী পাম্প ঘণ্টা কয়েক আগে ফের চালু হয়েছে। ফ্যাক্টরীতে ঢুকলে যে কি হাল হতে পারে—চৌমৌকিই তার প্রমাণ।

"ঠিক আছে," আর প্রশ্ন করলেন না ক্যাম্যারেট।

চোদ্দ তারিখেও দেখা গেল ফ্যাক্টরী ঘিরে পাহারা দিচ্ছে মেরী ফেলোরা। গিজ গিজ করছে এসপ্ল্যানেড আর সার্কুলার রোডে। খাবার না ফুরোনো পর্যন্ত থাকবে, বোঝাই যাচ্ছে।

চোদ্দ তারিখে সন্ধ্যে নাগাদ একটা মতলব এল অ্যামিদী ফ্লোরেন্সের মাথায়। টোনগানের সঙ্গে আগে পরামর্শ করে নিলেন। তারপর সঙ্গীদের নিয়ে ক্যাম্যারেটের কাছে গেলেন। জরুরী আলোচনা আছে।

এই দুদিন ক্যাম্যারেটের টিকি দেখা যায় নি। ফ্রাসনেকে জেরা করে ঘরে চলে গিয়েছিলেন ভদ্রলোক—আর বেরোনান। গুম হয়ে দিনরাত একটা কথাই কেবল ভেবেছেন। ব্ল্যাকল্যাণ্ডের এই অনাচারের মূলে তিনিই রয়েছেন। তাঁকে দিয়ে হেলিপ্লেন বানিয়ে ইউরোপ আর আফ্রিকায় সন্ত্রাস সৃষ্টি করে চলেছে হ্যারি কীলার। তাঁর দৌলতেই আজ সে দোর্দণ্ড প্রতাপ। বারজাক মিশনকে গায়েব করেছে এই হ্যারি কীলার, ক্যাপ্টেন মেজনকেও খুন করেছে এই ডাকাত শিরোমণি। হাজার হাজার নিগ্রোকে দাস বানিয়ে রেখেছে মহাপাষণ্ড হ্যারি কীলার। মানুষের হাড়ের ওপর নির্মিত রয়েছে অজ্ঞাত কিন্তু পাপাচারের নগরী ব্ল্যাকল্যাণ্ড—তাঁরই বুদ্ধিবলে—অথচ তিনি কিছুই জানেন না। ধিক্কারে, গ্লানিতে তাই নিঃশেষ হয়ে গেছেন ক্যাম্যারেট। দুদিন আর্মচেয়ারে কাৎ হয়ে গুমরেছেন মনে মনে—খাওয়া দাওয়া কিছু করেননি।

অ্যামিদী ফ্লোরেন্স টোনগানেকে দিয়ে খাবার আনিয়ে আগে খাওয়ালেন ক্যাম্যারেটকে। সামান্য কিছু দাঁতে কাটলেন ক্যাম্যারেট—সরিয়ে রাখলেন প্লেট।

ফ্লোরেন্স বললেন—"এই পরিস্থিতি থেকে রেহাই পাওয়ার একটা মতলব আমার মাথায় এসেছে—তাই ডেকে নিয়ে এলাম সবাইকে। আমাদেরও মিত্র সৈন্য আছে।"

"মিত্র সৈন্য ?" এক সঙ্গে জিজ্ঞেস করলেন চাতোন্নে আর বারজাক।

"নিগ্রো দাস। পুরুষরা সংখ্যায় চার হাজার। মেয়েরা দেড় হাজার।

লড়াই লাগলে দু'জন মেয়ে একজন পুরুষের কাজ করবে। কম নয়।"

"লড়বে কি নিয়ে? অস্ত্র কোথায়? তাছাড়া ওরা জানেও না আমরা এখানে ইঁদুরের মত আটকে পড়েছি।" বললেন বারজাক।

"দুটোই সত্যি। তাই ওদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে—তারপর অস্ত্র চালান দিতে হবে।"

"মুখে বলা সোজা!"

"কাজেও সোজা।"

"তাই নাকি? অস্ত্রের কথা না হয় বাদই দিলাম—যোগাযোগটা করবেন কি করে?"

"আর একজন নিগ্রোকে দিয়ে—টোনগানে যাবে।"

"যাবে কি করে? মেরী ফেলোরা ফ্যাক্টরী ঘিরে রয়েছে। বুলেটে ঝাঁঝরা হয়ে যাবে বেরোনোর সঙ্গে সঙ্গে।"

"দরজা দিয়ে তো বেরোবে না। তাছাড়া, ফ্যাক্টরীর উল্টো দিকে সাদা চামড়ার লোকেদের কোয়ার্টার—ওকে যেতে হবে কালো চামড়ার মানুষদের কোয়ার্টারে। কাজেই যেভাবে এখানে এসেছিল ঠিক সেইভাবেই ও বাইরে গিয়ে নিগ্রোদের সঙ্গে ভিড়ে যাবে—তারপর টাউনে ঢুকবে।"

"তাহলেও তো সার্কুলার রোড আর পাঁচিল পেরোতে হবে?"

"তলা দিয়ে যাবে," বলে ক্যাম্যারেটের দিকে তাকালেন ফ্লোরেন্স।

ক্যাম্যারেট কিন্তু চিন্তায় ডুবে আছেন—শুনছেন বলে মনে হল না।

ফ্লোরেন্স বললেন— "মঁসিয়ে ক্যাম্যারেট, একটা সুড়ঙ্গ বানিয়ে দিতে পারবেন? ফ্যাক্টরী আর টাউনের পাঁচিলের তলা দিয়ে সার্কুলার রোড পেরিয়ে সুড়ঙ্গের মুখ উঠবে খোলা মাঠে?"

মাথা তুললেন ক্যাম্যারেট—"নিশ্চয় পারব।"

"কদ্দিনে?"

একটু ভাবলেন ক্যাম্যারেট বললেন—"এইমাত্র তাই ভাবছিলাম। মেশিন লাগালে বালি মাটিতে কাজ হবে তাড়াতাড়ি। মেশিনের নকশা বানিয়ে, মেশিন খাড়া করে সুড়ঙ্গ খুঁড়তে পনেরো দিন লাগবেই।"

"এই মাসের শেষাশেষি হয়ে যাবে?"

"নিশ্চয়।"

সমস্যার খোরাক পেয়েই ফের চাঙা হয়ে উঠেছে ক্যাম্যারেটের মস্তিস্ক। বয়স যেন ফের কমে আসছে।

ফ্লোরেন্স বললেন—"আর একটা কথা। সুড়ঙ্গ খুঁড়তে আপনার সব লোক দরকার?"

"অনেককে দরকার।"

"যাদের দরকার হবে না, তাদের দিয়ে পনেরো দিনেরো দিনের মধ্যে তিন চার হাজার অস্ত্র বানানো যাবে?"

"কি অস্ত্র? বন্দুক হবে না।"

"বল্লম, ছুরি, কুঠার, গদা?"

"হবে।"

"হ্যারি কীলারের চোখে ধুলো দিয়ে নিগ্রোদের কোয়ার্টারে এ অস্ত্র পাঠাতে পারবেন?"

"একটু শক্ত হবে," চুপ করে রইলেন ক্যাম্যারেট। তারপর ধীর স্বরে বললেন—"পারব। অন্ধকার রাতে পারব।"

স্বস্তির নিশ্বেস ফেলে ফ্লোরেন্স বললেন—"তাহলে বেঁচে গেলাম এ যাত্রা। শুনুন আমার প্ল্যান। টোনগানে এই সুড়ঙ্গ দিয়ে মাঠে বেরিয়ে যাবে। ভোর হলে নিগ্রোরা মাঠে নামবে—ও দলে ভিড়ে যাবে। এক সঙ্গে সেই রাতেই টাউনে ঢুকবে, নিগ্রোদের ক্ষেপিয়ে তুলবে—ওরা তেতেই আছে—বারুদে ফুলকি দিলেই বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠবে। আমাদের দায়িত্ব শুধু অস্ত্র পাঠিয়ে দেওয়া। মঁসিয়ে ক্যাম্যারেট আর দেরী করবেন না।"

"কাজ আরম্ভ হয়ে গেছে," সত্যিই ড্রইংবোর্ডে হেঁট হয়ে নক্সা আঁকতে আরম্ভ করে দিয়েছেন মারসেল ক্যামারেট।

উল্লসিত হয়ে বেরিয়ে এলেন অভিযাত্রীরা। জবর প্ল্যান বাতলেছেন ফ্লোরেন্স। নিগ্রোদের মিত্র সৈন্য বানিয়ে নিলেই কেল্লা ফতে।

পরের দিন সকাল থেকে হেলিপ্লেন তৈরী বন্ধ রইল। চার দলে ভাগ হয়ে কারখানার লোকেরা হাত দিল চার ধরনের কাজে। একদল তৈরী করতে লাগল বল্লম, ছুরি, কুঠার, গদা। আর একদল সুড়ঙ্গ, খুঁড়তে লাগল ফ্যাক্টরীর পাঁচিলের আড়ালে—যাতে প্যালেস থেকে দেখানো যায়। তৃতীয় দল হাত দিল নতুন মেশিন তৈরীর কাজে। চতুর্থ দল ক্যাম্যারেটের হুকুমে একটা গাছের গুঁড়ির ভেতর ফোঁপরা করতে লাগল কেন, কেউ বুঝতে পারল না। একুশে এপ্রিল তিরিশ ফুট গভীর কুঁয়ো খোঁড়া হয়ে গেল। এবার আরম্ভ হল অনুভূমিক সুড়ঙ্গ—জমির সঙ্গে সমান্তরাল অবস্থায় সুড়ঙ্গ এবার এগোবে পাঁচিল আর রাস্তার তলা দিয়ে। অদ্ভুত একটা মেশিন বানিয়েছেন ক্যাম্যা-

রেট এই সুড়ঙ্গ তৈরীর জন্যে। একটা ইস্পাতের শঙ্কু। পনেরো ফুট লম্বা, চারফুট চওড়া। ঠিক যেন অতিকায় স্ক্রু—ওপরে সেইভাবে খাঁজ কাটা প্যাঁচ। একটা মোটর বন্‌বন্‌ করে ঘোরাবে স্ক্রুটাকে—মাটি কেটে ভেতরে ঢুকবে স্ক্রু—আলগা মাটির শঙ্কুর মধ্যে ঢুকে বেরিয়ে আসবে পেছনে—সেখান থেকে বার করে দেওয়া হবে কুয়ো দিয়ে।

দানবিক স্ক্রু নামিয়ে দেওয়া হল কুয়োর তলায়—ঠিক পেছনেই পাওয়ার-ফুল স্ক্রু-জ্যাক দিয়ে ঠেলে দেওয়া হল একই সাইজের একটা ধাতুর চোঙা। স্ক্রু এগিয়ে যেতে লাগল পেছন পেছন—ফলে নির্মিত হল একটা ধাতুর সুড়ঙ্গ—দেড়শ গজ লম্বা।

শঙ্কুর মধ্যে ঢোকানো রইল আর একটা শঙ্কু—আকারে ছোট। দেড়শ ফুট সুড়ঙ্গ খোঁড়া হয়ে যাবার পর বড় শঙ্কুর সামনের অনেকগুলো ফুটোর একটার মধ্যে দিয়ে ওপর দিকে বেরিয়ে আসবে ছোট শঙ্কু—ঘুরতে থাকবে বন্‌বন্‌ করে—লম্বালম্বি ভাবে কুয়ো খোঁড়া হয়ে যাবে নিচ থেকে ভূপৃষ্ঠ পর্যন্ত।

এই কদিন ফের ডুব মেরেছিলেন ক্যামারেট। ঘর ছেড়ে বেরোননি। অনুতাপ অনুশোচনায় তিলে তিলে দগ্ধ হচ্ছিলেন ঘরে বসে। চাকর জ্যাক খাইয়ে দিত সকাল সন্ধ্যে—কিন্তু মুখ দেখাতেন না কাউকে।

কিন্তু যে প্ল্যান ছকে দিয়েছিলেন, হুবহু সেইমত টানেল খোঁড়া হয়ে গেল তিরিশ তারিখে। এবার কুয়ো খুঁড়ে নিচ থেকে উঠে আসতে হবে মাঠের মধ্যে। একাজ সারতে হবে রাতের অন্ধকারে।

তিনদিন আগে থেকেই খাবারে টান পড়েছিল। আধপেটা খাওয়ার মত-ও আর খাবার নেই।

পেটের জ্বালা বড় জ্বালা। পাথর-কঠিন বিশ্বাসেও চিড় ধরে, অটল মনও টলে যায়। মারসেল ক্যামারেটকে যারা দেবতা জ্ঞানে মেনে চলেছে, তাদের মনেও এখন সংশয় দেখা দিয়েছে। অতিমানুষই যদি তিনি হবেন তো ক্ষিদের জ্বালা থেকে বাঁচাতে পারছেন না কেন? কেন হ্যারি কীলার দেড়শ মানুষকে স্রেফ না খাইয়ে মারছে—সর্বশক্তিমান ক্যাম্যারেট ঘরে মুখ লুকিয়ে বসে আছেন? আসল শক্তি তাহলে কার? নিশ্চয় হ্যারি কীলারের।

কি দরকার ছিল বাপু এমন লোককে ঘাঁটানোর? হ্যারি কীলার ক্ষেপেছে শুধু একটা কারণে। জেন মেয়েটাকে তার পছন্দ—অথচ জেনের পছন্দ নয় তাকে। একটা মেয়ের জন্যে এতগুলো লোক বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে না খেয়ে মরবে? তার চাইতে জেন হ্যারির মন রাখলেই পারে?

কানঘুসো যে জেনের কোনেও পৌঁছায়নি তা নয়। হাবভাব, বাঁকা চাহনি, চাপা কথা শুনে জেনও বুঝেছিলেন ক্ষুধার্ত মানুষগুলো তাকেই দায়ী করেছে তাদের এই অবস্থার জন্যে।

জেন কাপুরুষ নন। মরতে পেছ-পা নন। হ্যারি কীলারকে ঘৃণা করেন ঠিকই, বিশেষ করে যে বদমাস তাঁর দাদাকে খুন করেছে—তাঁর খেয়াল চরিতার্থ করার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু তাঁর একার জন্যে এতগুলো লোক মরবে কেন? তার চেয়ে হ্যারি কীলারের কাছেই তাঁর যাওয়া উচিত।

একটু একটু করে এই চিন্তাটা তাঁর মনের মধ্যে ডালপালা মেলে এমনভাবে ছড়িয়ে পড়ল যে সঙ্গীদের কাছেও মনোভাব ব্যক্ত করতে কসুর করলেন না। শুনে হাউহাউ করে কেঁদে উঠলেন সেন্ট বেরেন। রেগে গিয়ে অ্যামিদী ফ্লোরেন্স বললেন—"আমাদের সবার গালে আপনি চুনকালি দেওয়ার কথা ভাবছেন। তাছাড়া পাষণ্ড হ্যারি কীলার আপনাকে পেয়েও আমাদের ছেড়ে দেবে না। তার কাছে আবার কথার দাম কী?" বারজাক, চাতোন্নে, পঁসিঁও যথাসাধ্য বোঝালেন। মন শক্ত করতে বললেন।

কিন্তু এখন আর এ প্রশ্নই ওঠে না। সুড়ঙ্গ খোঁড়া হয়ে গেছে। কয়েক ঘণ্টা পরেই টোনগানে চম্পট দেবে। পরের দিন সংকেত পাঠাবে। বিদ্রোহ শুরু হবে। অবরোধ ভেঙ্গে পড়বে। সবাই মুক্তি পাবে।

তিরিশে এপ্রিল সূর্য ডুবতেই শুরু হয়ে গেল নিচ থেকে কুয়ো খোঁড়া। ছোট শঙ্কু ঘুরতে লাগল বন্‌বন্‌ করে—মাটি কেটে স্ক্রু উঠে যেতে লাগল ভূপৃষ্ঠের দিকে। মাঝরাত নাগাদ পৌঁছে গেল মাঠের ওপর। তৎক্ষণাৎ টোনগানে ফাঁক দিয়ে মিলিয়ে গেল অন্ধকারে। শঙ্কু নামিয়ে নেওয়া হল নিচে। ঝুরঝুর করে বালি মাটি ঝরে ফুটো বন্ধ করে দিল আপনা থেকেই—ওপর থেকে দেখলে মনে হবে ফানেলের মত কেবল একটা দেবে যাওয়া গর্ত। ফ্যাক্টরী থেকে দেড়শগজ দূরে এ গর্তের সঙ্গে ফ্যাক্টরীর যোগসাজসের সম্ভাবনা কেউ ভাবতেও পারবে না।

ফ্যাক্টরীর এই কোণ থেকে দাস-কোয়ার্টার আর শ্বেতকায়দের কোয়ার্টার কাছেই। ঠিক হল দাস-কোয়ার্টারের এই কোণ থেকেই বিদ্রোহের সিগন্যাল জানাবে টোনগানে। ফ্যাক্টরীর সেই কোণেও শ্রমিককর্মচারীদের বাড়ীর ছাদে একটা মাচা বানিয়ে দিলেন ক্যাম্যারেট। দিনরাত পাহারা রইল সেখানে—চোখ রইল দাস কোয়ার্টারের দিকে—টোনগানের সিগন্যালের প্রতীক্ষায়।

. .

১লা মে ভোর থেকে আরম্ভ হল প্রতীক্ষা। দোসরা মে কোনো সিগন্যাল এল না। সবাই দমে গেলেন। কিন্তু আশা ছাড়লেন না। আকাশে চাঁদ রয়েছে বলেই হয়ত টোনগানে সিগন্যাল দিচ্ছে না। কিন্তু তেসরা মে মেঘ ছাওয়া আকাশের ঘুটঘুটে অন্ধকারেও যখন কোনো সিগন্যাল এল না, তখন আরম্ভ হল দুশ্চিন্তা। একে উপোষ, তার ওপর টোনগানের নীরবতা। তবে কি সে-ও চম্পট দিল? একা পালিয়ে বাঁচল? তাই ৪ঠা মে যেন আর কাটতে চায় না—অন্ধকার রাতে ফের সেই দুঃসহ প্রতীক্ষা। টোনগানের সাড়া নেই। ৫ই মে অবস্থা আরো শোচনীয় হল। দুদিন না খেয়ে থেকে কাহিল হয়ে পড়েছে ফ্যাক্টরীর প্রত্যেকে। বাচ্চারা কাঁদছে। মায়েরা তাদের নিয়ে ছুটোছুটি করছে। পুরুষরা জটলা করছে এখানে সেখানে, ওয়ার্কশপে কেউ নেই। কাজকর্ম শিকেয় উঠেছে। আর দুদিন এই অবস্থায় কাটলে আত্মসমর্পণ করা ছাড়া উপায় নেই। হ্যারি কীলার পিছ-মোড়া করে সবাইকে বেঁধে ডাল কুত্তা দিয়ে খাওয়াবে। যত নষ্টের মূল ঐ জেন মেয়েটা। কেন বাপু। হ্যারি কীলারের ইচ্ছেতে বাগড়া দেওয়ার কি দরকার ছিল? তোর জন্যে বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে আমরা মরব নাকি? একজন শ্রমিককর্মচারী গলা ফাটিয়ে চেঁচাতে লাগল—"আমার ছেলে দুদিন না খেয়ে আছে ঐ মেয়েটার গোঁয়াতুর্মির জন্যে।" শুনে আর এক শ্রমিক কর্মচারীর বউ বললে—"ছিঃ! ছিঃ! বলতে লজ্জা হল না আপনার? আমার বাচ্চাও না খেয়ে আছে। তাই বলে মেয়েটাকে ঐ শয়তানের খপ্পরে পাঠাতে হবে? মরলে সবাই মরব।" রেগে আগুন হয়ে অন্য লোকটা বললে—"আরে রাখুন ও সব তত্ত্বকথা। কাল পর্যন্ত দেখব। তারপর হেস্তনেস্ত করব।"

পাশ দিয়ে যেতে যেতে দাঁড়িয়ে গিয়ে সব শুনলেন জেন ব্রেজন। তাঁকে যে কেউ পছন্দ করছে না, আভাস ইঙ্গিতে টের পেয়েছিলেন। এখন নিজের কানে শুনলেন। কেউ তাঁকে দেখতে পেল না। মাথা নিচু করে আত্মধিক্কারে মাটিতে মিশে গিয়ে ঘরে চলে এলেন জেন।

৫ই মে সকাল থেকে সবাই চেয়ে রইলেন সিগন্যালের প্রতীক্ষায়। এক-একটা ঘণ্টা যেন আর কাটতে চায় না। সারাদিন গেল। এল রাত্রি। আকাশে ঘন মেঘ। আলকাতরার মত কালো অন্ধকার। কিন্তু কই, টোন-গানে তো সিগন্যাল দিচ্ছে না? রাত সাতটা বাজল। আটটা বাজল, সাড়ে আটটা বাজল।

আচমকা নিবিড় আঁধারে জ্বলে উঠল একটা টিমটিমে আলো। দাস

কোয়ার্টারের পাঁচিলে সিগন্যাল জ্বলছে। টোনগানে কথা রেখেছে! শিউরে উঠলেন সবাই আনন্দে, রোমাঞ্চে, হর্ষে।

তৎক্ষণাৎ একটা বিচিত্র কামান তোলা হল মাচায়। কামান—কিন্তু ইস্পাতের নয়—কাঠের। গাছের গুঁড়ি ফোঁপরা করে তৈরী। ভেতরে বিরাট একটা গোলা। চাকাহীন আশ্চর্য সেই কামান থেকে বিচিত্র গোলা নিক্ষেপ করা হল হাওয়ার চাপে। নিঃশব্দে শূন্যপথে দাস কোয়ার্টারের পাঁচিল লক্ষ্য করে উড়ে গেল গোলাটা—পেছনে টেনে নিয়ে গেল ছোট নোঙ্গর বাঁধা একজোড়া জাহাজি কাছি। নোঙর পাঁচিলের গায়ে আটকে গেলেই কেল্লা ফতে। দড়ির সেতু তৈরী হয়ে যাবে দাস কোয়ার্টার আর ফ্যাক্টরীর মধ্যে।

গোলা নিক্ষেপ করলেন মারসেল ক্যাম্যারেট নিজে। এ দায়িত্ব তিনি কাউকে দিতে পারলেন না। কত কোণ করে কতখানি হাওয়ার চাপে কত বেগে গোলা ছুঁড়লে তবে তা দাস কোয়ার্টারের পাঁচিল টপকে যাবে এবং নোঙর পাঁচিলে আটকে যাবে—এ হিসেব তাঁর। গোলা নিক্ষেপের ভারও নিলেন নিজে।

সব নির্ভর করছে নোঙর আটকানোর ওপর। কাছি টেনে দেখলেন নোঙর ধরেছে কিনা। মুখ উজ্জ্বল হল। কাছি সত্যিই টানটান হয়েছে। শূন্যপথে দড়ির সেতু তিনি বানিয়ে দিয়েছেন, এবার দায়িত্ব অ্যামিদী ফ্লোরেন্সের।

তৎক্ষণাৎ আগে এক বাণ্ডিল বারুদ পাঠানো হল দড়িতে ঝুলিয়ে। কপিকলের মধ্যে দিয়ে কাছি যাওয়ায় টানতে কোনো অসুবিধে হল না। তারপর গেল চার হাজার বল্লম, কুঠার, ছোরা। রাত এগারোটায় শেষ হল অস্ত্র পাচার।

এরপর তৈরী হলেন নিজেরা। মাচা থেকে নামলেন। যে যা অস্ত্র পেলেন, হাতে নিলেন। বড় দরজার সামনে জড়ো হলেন, মেয়েরাও বাদ গেল না। দরকার হলে তারাও হাত লাগাবে।

একজনকে কেবল দেখা গেল না মেয়েদের দলে।

জেন ব্লেজন।

সেন্ট বেরেন, অ্যামিদী ফ্লোরেন্স, বারজাক, চাতোন্নে কত ডাকলেন তাঁকে। সাড়া এল না। ধ্বনি আর প্রতিধ্বনি হারিয়ে গেল দূরে। তন্নতন্ন করে খুঁজেও পাওয়া গেল না ফ্যাক্টরীর কোথাও।

অদৃশ্য হয়েছেন জেন ব্লেজন।

১১ ॥ দরজার পেছনে যা ছিল

খুব সোজা পথে ফ্যাক্টরী থেকে বেরিয়ে গেলেন জেন ব্লেজন। সামনের খিল দেওয়া ছিল কেবল—তালা ছিল না। উনি খুলে বেরিয়ে গেলেন।

খোঁজ নিয়ে জানা গেল, সাইক্লোস্কোপে তাকে দেখা গেছে, কিন্তু চেনা যায়নি। বোলতা লেলিয়ে দেওয়া হয়নি হুকুম ছিল না বলে—অযথা রক্ত পাত যেন করা না হয়। তাছাড়া, ফ্যাক্টরীতে কেউ ঢুকছে না—বেরিয়ে যাচ্ছে। তাও মোটে একজন।

আরও দেখা গেছে, নদীর পাশ দিয়ে এসপ্ল্যানেডের কোণে কাণা গলিতে ঢুকছেন মিস ব্লেজন। কাণাগলির শেষে একটা লোহার দরজা আছে। চাবি থাকে কেবল হ্যারি কীলার আর মারসেল ক্যাম্যারেটের কাছে। প্যালেসে ঢোকবার সোজাপথ। জেন ব্লেজন যখন এই কানাগুলিতে ঢুকেছেন হতবাক মেরী ফেলোদের নাকের ডগা দিয়ে, তখন হ্যারি কীলারের কাছেই নিশ্চয় গেছেন তিনি—যা বলেছেন সঙ্গীদের, তাই করেছেন।

এতজনের নীরব এবং সরব অভিশাপ দগ্ধে মারছিল জেন ব্লেজনকে। তাঁর একার জন্যে এতগুলি মানুষ মরতে বসেছে, এ তিনি সহ্য করতে পারছিলেন না। দোনামোনা ভাবটা কেটে গেল টোনগানের সিগন্যাল দিতে দেরী হওয়ায়। একে ক্ষিদের জ্বালায় এবং অনাহারে শরীর দুর্বল—তার ওপর অনিশ্চয়তা। হঠাৎ মনস্থির করে ফেললেন জেন ব্লেজন। অশক্ত দেহ অসুস্থ মনকে একদিকেই টেনে নিয়ে গেল—নিজেকে আহুতি দেবেন তিনি—এটা তাঁর কর্তব্য।

চিরকাল তিনি একবোখা। সাহসের অভাবও নেই। যে মুহূর্তে টোনগানের সিগন্যাস এসে পৌঁছোলো—প্রায় তখনই তিনি নিঃশব্দে সবার অগোচরে দরজা খুলে বেরিয়ে গেলেন। এসপ্ল্যানেডের ঝলমলে আলোয় মেরী ফেলোরা তাঁকে দেখে এমন অবাক হল যে বাধা পর্যন্ত দিল না। প্যালেস-ফটক থেকে বিশ পা দূরে আসতেই রুখে দাঁড়াল দুজন। কিন্তু তারাও যখন দেখলে, সম্রাট হ্যারি কীলারের ভাবী বধূ চলেছেন প্রাসাদ অভিমুখে—সসম্মানে তাঁকে প্যালেসে ঢুকিয়ে পেছনে বন্ধ করে দিল দরজা। নিগ্রো ব্ল্যাকগার্ডরা তাঁকে চিনত। তারাও ভ্যাবাচাকা খেয়ে সম্মানে নিয়ে গেল সিংহাসন কক্ষে। হ্যারি কীলার তখন আট রত্নকে নিয়ে সেখানে মদ্যপানের

আসর বসিয়েছে। দোর গোড়ায় নারীমূর্তি দেখে ন'জনেই কিছুক্ষণ চোখ কুঁচকে চেয়ে রইল সেদিকে। এ আবার কি ব্যাপার!

হ্যারি কীলার চিনেছে জেন ব্লেজনকে। নিজের দুচোখকেও বিশ্বাস করতে পারল না প্রথমে। জেনের পেছনে পুরুষ সঙ্গীগুলো এসেছে কিনা দেখল। কিন্তু কাউকেই দেখা গেল না।

আটজন কাউন্সিলর এবার একযোগে লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠে বললে সম-স্বরে—"মিস মোরনাস"

ঝুঁকে পড়ে জড়িত কণ্ঠে হ্যারি কীলার বললে—"একলা দেখছি।"

"হ্যাঁ, একলাই এসেছি," জেনের তখন পা কাঁপছে গলা কাঁপছে। শরীর দুর্বল না খেয়ে, মন পৌঁচেছে উত্তেজনার চরমে। ন'জনের স্থির লোলুপ চাহনির সামনে দরজায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে সেই প্রথম উপলব্ধি করলেন, হঠকারিতার পরিণামটা ভাল হবে না।

"ফ্যাক্টরী থেকে এলেন?" হ্যারি কীলারের প্রশ্ন।

"হ্যাঁ।"

"কেন?" রুক্ষ কর্কশ স্বর সম্রাটের। জেন ব্লেজন হাড়ে হাড়ে বুঝলেন, আত্মাহুতির ফলেও সঙ্গীদের বাঁচানো যাবে না।

বললেন অবরুদ্ধ স্বরে—"নিজেকে সঁপে দিতে।"

"চমৎকার। বলে কাউন্সিলরদের দিকে ফিরল হ্যারি কীলার "তোমরা এখন যাও।"

টলতে টলতে নোংরা হাসি হেসে বেরিয়ে গেল আট দুশমন।

হ্যারি কীলার বললে—"চৌমৌকির অবস্থা চোখে দেখেছি। আর এক জনের কি করেছেন?

"তার চিকিৎসা হচ্ছে। চৌমৌকি নিজে মরেছে ডিনামাইট ফাটাতে গিয়ে।

"হেলিপ্লেন?"

"ধ্বংস হয়ে গেছে।"

"চমৎকার। ...আপনি এসেছেন নিজেকে সঁপে দিতে। কেন?

"অন্যদের বাঁচাতে।"

"অসম্ভব।...তার মানে সবার অবস্থা এখন কাহিল?" হাসছে হ্যারি কীলার।

"হ্যাঁ," চোখ নামিয়ে নিলেন জেন ব্লেজন।

বিরাট একটা গেলাস মদে ভরে নিয়ে এক চুমুকে শেষ করল হ্যারি কীলার। আনন্দ উপচে পড়ছে বীভৎস চোখে মুখে।

বলল—"তারপর?"

ব্লেজন বললেন—"কিছুদিন আগে আমাকে বিয়ে করতে চেয়েছিলেন! আমি রাজী। একটা সর্ত। সবাইকে ছেড়ে দিতে হবে।" বলতে বলতে লজ্জায় অপমানে মুখ লাল হয়ে গেল জেন ব্লেজনের।

"সর্ত আবার কী? না এলেও দুদিন বাদে ফ্যাক্টরীর সকটাকে জবাই করে আপনাকে টেনে আনতাম। আস্পা কত! সর্ত রেখে বিয়ে করতে চান!" বলতে বলতে উঠে দাঁড়াল হ্যারি কীলার। টলতে টলতে এগিয়ে এল জেন ব্লেজনের সামনে—"নিজে এসেছেন বলে কি পার পাবেন? কে বাঁচাবে এখন আপনাকে?"

কোণ ঠাসা হয়ে গেলেন জেন ব্লেজন। হ্যারি কীলারের নাক আর মুখ দিয়ে ভক ভক করে মদের দুর্গন্ধ এসে লাগল নাকে।

শান্ত স্বরে বললেন জেন ব্লেজন—'মরতে ভয় পাই না।"

"মরবেন!" দাঁড়িয়ে গেল হ্যারি কীলার। মদের নেশায় কেবল থরথর করে কাঁপতে লাগল দুই হাঁটু। জেন ব্লেজন যে মিথ্যে হুমকি দিচ্ছেন না তা মদের ঘোরেও বুঝলেন। চৈতন্য হল।

সরে এল। বলল—"ঠিক আছে। এ নিয়ে কালকে কথা বলা যাবে। আজকে আসুন ফূর্তি করা যাক।"

এসে বসল সিংহাসনে। ফের শুরু হল মদ্যপান। পনেরো মিনিটও গেল না—নাক ডাকতে লাগল সম্রাটের।

জেন ব্লেজন একবার ভাবলেন, এই তো সুযোগ। দাদার হত্যাকারীকে নিকেশ করার এই হল মোক্ষম সুযোগ। ছোরাটা তো পোশাকের মধ্যেই আছে। কিন্তু না। হ্যারি কীলারকে মারলে সমস্যা মিটবে না। তার চাইতে বরং আগে কিছু খেয়ে নেওয়া যাক। পাশের ঘরে গেলেন। টেবিল ভর্তি উচ্ছিষ্ট খাবার থেকে কিছু খেয়ে শরীর আর মনে বল ফিরিয়ে আনলেন। এলেন সিংহাসন ঘরে।

এই সময়ে নেশার ঘোরে নেতিরে পড়ল হ্যারি কীলার। ঠক্ করে কি যেন পড়ল মেঝের ওপর। একটা চাবি।

তৎক্ষণাৎ জেন ব্লেজনের মনে পড়ে গেল, পেছনের দরজার পেছনে রহস্যময় কাতরানি। এই চাবি দিয়ে ঢোকা যায় সেই অন্তঃপুরে।

দ্বিধা করলেন না জেন ব্লেজন। চাবি তুলে নিয়ে দরজা খুলে ঢুকলেন। প্রথমে একটা চাতাল—সিঁড়ি নেমে গেছে নিচে। দরজা ভেজিয়ে দিয়ে স্বল্পালোকিত সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলেন আর একটা চাতালে। সেখান থেকে আবার একটা সিঁড়ি বেয়ে পাতাল-অলিন্দে। একজন নিগ্রো বসেছিল সেখানে। ওঁকে দেখেই সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়াল। ভাবী সম্রাজ্ঞী যে। জেন ব্লেজন এগিয়ে গেলেন—বাধা পেলেন না। আবার একটা দরজা। একই চাবিতে খুলে গেল। একটা করিডোর। দুপাশে সারি সারি ঘর। সব ঘর খোলা—একটাতেই কেবল তালা দেওয়া। আবার চাবির কল্যাণে খুলে গেল পাল্লা। ভেতরে অন্ধকার। খাটে শুয়ে কে যেন নিঃশ্বাস ফেলছে ধীর ছন্দে—ঘুমোচ্ছে।

দরজার পাশেই সুইচ দেখলেন জেন ব্লেজন। টিপতেই আলো জ্বলে উঠল ঘরে।

হঠাৎ আলোর ঝলকালিকে ধড়মড়িয়ে খাটে উঠে বসল লোকটা। সাড়া মুখে আর দেহে অজস্র ক্ষতচিহ্ন। কংকালসার দেহ। দাড়িগোঁফে ঢাকা। চোখে বিপুল আতংক।

তা সত্ত্বেও কিন্তু চিনতে পারলেন জেন ব্লেজন।

লুই রবার্ট ব্লেজন। তাঁর মেজদা—পাঁচ মাস আগে ব্যাংক ডাকাতির পর যিনি নিরুদ্দেশ হয়েছিলেন।

"দাদা।"

"জেন।"

দুজনে দুজনকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেললেন হাউমাউ করে।

"দাদা, তুমি এখানে?"

"পাঁচ মাস আগে ব্যাংকে বসেছিলাম। সেদিন ৩০শে নভেম্বর। ঘাড়ে রদ্দা পড়ল। অজ্ঞান হয়ে গেলাম। জ্ঞান ফিরে পেয়ে দেখলাম একটা সিন্দুকের মধ্যে বন্দী। হাত-পা-মুখ বাঁধা। কত জায়গা দিয়ে আনা হল সিন্দুকটা। চার মাস ধরে আমাকে রোজ চাবুক মারছে···চিমটে দিয়ে মাংস খুবলে নিচ্ছে···আমি···আমি আর পারছি না···"

"দাদা···দাদা···কে···কে তোমাকে চাবুক মারে? কে তোমাকে চিমটে দিয়ে—"

লুই রবার্ট ব্লেজন ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইলেন জেনের পেছনে। মুখে কথা সরল না।

ঘুরে দাঁড়ালেন জেন।

দোরগোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছে লোলজিহ্ব, কদাকার, রক্তচক্ষু এক নর দানব—লালা গড়াচ্ছে কষ বেয়ে।

হ্যারি কীলার।

১২ ॥ হ্যারি কীলার

"হ্যারি কীলার।" আঁৎকে উঠলেন জেন।

"হ্যারি কীলার!" লুই রেজন ভ্যাবাচাকা খেয়ে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইলেন বোনের দিকে।

"খোদ হ্যারি কীলার।" পাথরে পাথর ঘষা কণ্ঠে বলল হ্যারি কীলার। এগিয়ে এল এক পা। দাঁড়াল দরজা জুড়ে—হেলান দিয়ে। পা টলছে আকণ্ঠ মদ খাওয়ায়।

কণ্ঠে ঘৃণার বিষ মিশিয়ে বললে তোৎলাতে তোৎলাতে—"তাই বলি··· এই জন্যেই শ্রীমতির আসা হয়েছে···হবু বরের চোখে ধুলো দিয়ে কাজ সারতে আসা হয়েছে।"

"জেনের বর।" লুই রেজন আরো বিমূঢ়।

ঘরে ঢুকল হ্যারি কীলার। লোমশ থাবা জেনের দিকে বাড়িয়ে বললে ভয়াল কণ্ঠে—"সুন্দরী, এত সহজে কি ধুলো দেওয়া যায় আমার চোখে?"

পোশাকের আড়াল থেকে ছোরা টেনে বার করলেন জেন। উঁচিয়ে ধরলেন, বললেন তীক্ষ্ণ কণ্ঠে—"কাছে এলেই মরবেন।"

"বটে। বটে। বোলতা সুন্দরীর হুলও আছে দেখছি।" শ্লেষ বঙ্কিম স্বর হ্যারি কীলারের।

কিন্তু, বিচক্ষণ বলেই তার কাছে এল না। চোখ রইল ছোরার ওপর।

সেই ফাঁকে মেজদাকে জড়িয়ে ধরে দরজার দিকে এগোলেন জেন।

বললেন কাঁপতে কাঁপতে—"হ্যাঁ, ছোরা নিয়েই এসেছি আমি। মামুলি ছোরা নয়। কৌবোতে একটা কবরের মধ্যে থেকে উদ্ধার করা ছোরা।"

"কৌবো।" লুই চমকে উঠলেন—"জর্জ যেখানে—"

"মারা গিয়েছিল," কথাটা শেষ করলেন জেন। "বন্দুকের গুলিতে কিন্তু

নয়—ছোরার মারে। এই সেই ছোরা। হাতলে নাম খোদাই করা আছে : কীলার।"

টলে উঠেছে হ্যারি কীলার। এক পা পেছিয়ে খাঁচার দেওয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে গেছে। মুখ ছাইয়ের মত ফ্যাকাশে। চোখে আতংক। ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে জেনের দিকে।

লুই বললেন—"কিন্তু হ্যারি কীলার তো ওর আসল নাম নয়···আসল নাম শুনলেই তুই চিনতে পারবি।"

"আসল নাম?"

"হ্যাঁ···হ্যাঁ। ও যখন চলে যায় আমাদের বাড়ী ছেড়ে, তখন তুই খুব ছোট্ট। তাই চিনতে পারছিস না। কিন্তু ওর নাম তুই শুনেছিস। মনে আছে বাবার সঙ্গে তোর মায়ের যখন বিয়ে হয়, তখন ওঁর একটা ছেলে ছিল? তোর সৎদাদা? এই সেই উইলিয়াম ফারনি!"

শুনেই প্রায় মূর্চ্ছা গেলেন জেন—কিন্তু ঘোর কাটিয়ে উঠল উইলিয়াম ফারনি। উধাও হল মাতলামি। ভাইবোনের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে অসীম ঘৃণা মিশোনো নিষ্ঠুর চোখে যেন দগ্ধ করে ফেলল দুজনকে।

বললেন দাঁত কিড়মিড় করে—"আ—চ্ছা! তুই তাহলে জেন ব্লেজন!··· জেন ব্লেজন!"

বলতে না বলতেই রাজ্যের শয়তানি যেন ভর করল চোখে মুখে। জিভ জড়িয়ে গেল—দ্রুত কথা বলার ফলে। বুক উঠতে নামতে লাগল ঘন ঘন। কাটা কাটা কথায় উদ্গার করে দিল এত বছর ধরে জমানো ঘৃণা, বিদ্বেষ, প্রতিহিংসা পরায়ণতা।

"ভালোই তো···খুব ভাল···কৌবো গেছিলিস তাহলে!···হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমিই খুন করেছি জর্জকে···তোর দাদা জর্জকে···ব্লেজন ফ্যামিলির চোখের মণি জর্জকে নিজের হাতে খুন করেছি আমি···হ্যাঁ···হ্যাঁ···আমি··· জর্জ বলতে অজ্ঞান ছিলি যে সবাই···এবার তোদের দুজনকে পেয়েছি মুঠোয়···জর্জকে যেমন পর পর দুবার খুন করেছি···প্রথমবার মরমে মেরেছি···দ্বিতীয়বার শরীরে ···তোদেরকেও খুন করব সেইভাবে···আগে ভাঙব মন···তারপর··· তারপর···!"

এখন আর মদ নয়, আনন্দে মাতাল হয়ে গিয়েছে উইলিয়াম ফারনি। ভাল বোঝাও যাচ্ছে না কি বলছে। উল্লাসে যেন ফেটে পড়ছে। তোৎলাচ্ছে। কথা জড়িয়ে যাচ্ছে।

"কি মজা!…কি মজা!…আমি তো চলে এলাম তোদের প্রাসাদ ছেড়ে…এখন ছাখ তোরাই মরতে এসেছিস আমার প্রাসাদে…হাঃ… হাঃ…হাঃ!"

এক পা এগিয়ে এল উইলিয়াম। পেছিয়ে গেল জেন আর লুই—কেউ কাউকে ছাড়েনি।

উইলিয়াম বলছে—"ভাবছিস সব জেনে গেছিস…অ্যাঁ? কিস্সু জানিস না…শোন…আমার মুখে শোন…সমস্ত শোন!…তোদের বাপ তো আমাকে খেদিয়ে দিল!…বড্ড ফুর্তি হয়েছিল তখন তোদের বাপের…না? আর আমার ফুর্তি হচ্ছে কেন জানিস?…তোদের বাপকে…মরবার আগে… জানিয়ে দিতে চাই…আমি…আমিই…তোদের…মরণ মার… মেরেছি… হাঃ…হাঃ…হাঃ… !"

আরও এগিয়ে এল উইলিয়াম। সাক্ষাৎ নরদানব যেন ফুঁসছে, ফুলছে। সিঁটিয়ে সরে গেলেন ভাইবোন।

"খেদিয়ে দিল বাড়ী থেকে!…কুকুরের মত তাড়িয়ে দিল আমাকে!… ভিক্ষে দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছিল যদ্দিন ছিলাম…চলে এসে কি করলাম জানিস? রোজগার করলমে…তাল তাল সোনা…কি করে জানিস?…তোরা যাকে বলিস জঘন্য অপরাধ…তাই করে…খুন…লুঠ…ডাকাতি… একটার পর একটা…হাঃ…হাঃ…হাঃ!"

"কিন্তু সোনা রোজগার-ই একমাত্র লক্ষ্য ছিল না…প্রতিহিংসা…শোধ নিতে চেয়েছিলাম…তাই জর্জের পেছন পেছন গেলাম…এমন ভান করলাম যেন অনুতাপে জ্বলে যাচ্ছি…গাধা জর্জ ভুলে গেল…আমার অভিনয়ে ভুলে গেল …একই তাঁবুতে থাকতে দিল…রোজ…একটু একটু করে খাবারে কি মিশিয়ে দিলাম জানিস?…আফিং…জর্জ ব্লেজন এসে গেল আমার মুঠোয়…হাঃ হাঃ হাঃ!

"আমিই লীডার হয়ে গেলাম সৈন্যবাহিনীর…ওর নামে হুকুম চালিয়ে গেলাম আমি…দেশ জুড়ে ঢি-ঢি পড়ে গেল কাগজে কাগজে…জর্জ ব্লেজন উন্মাদ…জর্জ ব্লেজন বিশ্বাসঘাতক…জর্জ ব্লেজন খুনী বিদ্রোহী…পড়ে শিউরে উঠলাম…আনন্দে…আনন্দে…তারপর একদিন সৈন্যরা এল…জর্জ ব্লেজনের প্রাণটাকে আমার এই হাত দিয়ে শূন্যে উড়িয়ে দিলাম…নইলে যে ফাঁস করে দিত…

"তারপর এলাম এখানে…এই শহরের পত্তন করলাম…একদিন যাকে

কুকুরের মত তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল···তার নিজের হাতে তৈরী হল ব্লাকল্যাণ্ড···আমিই এখানাকার প্রভু···এখানকার ভগবান···এখানকার সম্রাট ···আমার কথায় ওঠবোস করে এ দেশের সবাই···কিন্তু তাতেও মন ভরল না ···প্রতিশোধ চাই···প্রতিশোধ···তোদের বাবার যে আরো এক ছেলে এক মেয়ে আছে···তাই একটা ব্যাঙ্ক লুঠ করতে গেলাম···টাকার দরকার হয়েছিল ···লুইকে মাথায় ডাণ্ডা মেরে অজ্ঞান করলাম···মুখ হাত পা বেধে ট্রাঙ্কে ঢোকালাম···ট্রেনে, জাহাজে, হেলিপ্লেনে করে এখানে এনে ফেললাম···আমার রাজ্যে।···ওকেও আমি খুন করব···কিন্তু আস্তে আস্তে···তোদের বাবা কিন্তু জানে···লুই ব্যাংক লুঠ করে···পালিয়েছে···হাঃ হাঃ হাঃ। লর্ড ব্লেজনের দর্প চূর্ণ করেছি···বুক ভেঙেছি···আবো ভাঙব।

"এবার মেয়েটার পালা···আমার বোন...নিজেই এসেছিস...ফাঁদে পা দিয়েছিস···দুদিন আগে ভেবেছিলাম···ভেবেছিলাম বউ করব···এখন কি করব জানিস?...আমাব নয়···আমার সবচেয়ে জঘন্য দাস যে···ভয়ংকর নরকের কীটেব চাইতেও অধম যে নিগ্রো···তার বউ হবি! হাঃ···হাঃ··· হাঃ!

"লর্ড ব্লেজনের তাহলে আর রইল কি?···অ্যাঁ?···কি রইল? দুই ছেলের একজন বিশ্বাসঘাতক···একজন চোর···আর মেয়েটা? নিখোঁজ··· কেউ জানে না কোথায়···একলা থাকবে লর্ড ব্লেজন···মহান লর্ড ব্লেজন··· ভাঙা বুক নিয়ে হাহাকার কবে মরবে একদিন···শেষ হয়ে যাবে হাউস অফ গ্লেনর···ব্লেজন বংশে সলতে দেবার মত কেউ আর থাকবে না।"

হিংস্র নেকড়ের মত দাঁত খিঁচিয়ে গর্জে গেল উইলিয়াম যেন ক্ষুধিত শ্বাপদ —প্রতিহিংসা পাগল। মানুষ আর নয় সে—উন্মাদ—চোখ ঠেলে বেরিয়ে আসছে···কষ বেয়ে লাল গড়াচ্ছে···দুহাত বাড়িয়ে নখ দিয়ে যেন ছিঁড়ে ফেলতে চাইছে লুই আর জেনকে।

দম আটকে গিয়েছিল বলেই থেমেছিল নরদানব। আবার শুরু করল দাঁত কিড়মিড় করে:

"আজ রাতটাই কেবল একসঙ্গে থাক দুজনে···কাল—"

দূরে কি যেন ফাটল। প্রলয়ংকর বিস্ফোরণ নিশ্চয়—নইলে পাতাল কারাগারে আওয়াজ পৌঁছোতো না।

থমকে গেল উইলিয়াম। উদ্বগ্ন, বিস্মিত, চকিত, উৎকর্ণ।···

বিস্ফোরণের পর কয়েক মিনিট তার আওয়াজ নেই। তার পরেই একটা

গোলমাল শোনা গেল···চীৎকার, হট্টগোল। যেন পাগল জনতা গলা ফাটিয়ে চেঁচাচ্ছে···মাঝে মাঝে রাইফেল বা রিভলবারের নির্ঘোষ···

কান খাড়া করে শুনছে উইলিয়াম ফার্নি···মন দূরের সোরগোলে—জেন বা লুইয়ের কথা খেয়াল নেই।

কারাগার-প্রহরী ব্ল্যাকগার্ড নিগ্রো দৌড়ে এল। চোখ ঠেলে বেরিয়ে আসছে—"মাস্টার! শহরে আগুন লেগেছে।"

বিশ্রী গালাগাল দিল উইলিয়াম। জেন আর লুই দরজা জুড়ে দাঁড়াতে গিয়েছিলেন—ঠেলে ফেলে দিয়ে ছিটকে বেরিয়ে গেল বাইরে—ঝড়ের মত দৌড়ে গেল করিডর বেয়ে।

স্থানুর মত কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন ভাই বোন। মৃত্যুর মুখ থেকে যেন বাঁচিয়ে দিয়ে গেল দূরের ঐ বিস্ফোরণ···রহস্যজনক সোরগোল।

পর মুহূর্তেই ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন দুজনেই।

১৩ ॥ রক্তপাতের রাত্রি

ভয়াবহ অভিজ্ঞতা কাটিয়ে উঠতে কিছুক্ষণ সময় নিলেন জেন আর লুই। দুজনে দুজনকে জড়িয়ে রইলেন। তারপর প্রশমিত হল আবেগ। গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। ফিরে এলেন বাস্তব জগতে।

খটমট লাগল একটা ব্যাপারে। বাইরে—মানে, প্রাসাদের বাইরে—সাংঘাতিক হট্টগোল চলছে। ঘন ঘন বন্দুক ছোঁড়ার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। সোরগোল বেড়েই চলেছে।

কিন্তু প্রাসাদের ভেতরে কোনো শব্দ নেই। সাড়াশব্দ নেই। যেন কবরখানার নিস্তব্ধতা। করিডর ঝলমল করছে প্রখর বিদ্যুতবাতিতে। কিন্তু আওয়াজ নেই কোথাও। একটা অস্বাভাবিক নীরবতা। অস্বস্তিকর।

বাইরের জগতের দুর্বোধ হট্টগোল কান পেতে শুনছিলেন জেন। হঠাৎ যেন মানে বুঝতে পারলেন।

দাদাকে বললেন—"হাঁটতে পারবে?"

"চেষ্টা করব।"

"তবে এস।"

অতি কষ্টে মেজদাকে ধরে বাইরে নিয়ে এলেন জেন। চোখে দেখা যায় না সেই দৃশ্য। চার মাস একনাগাড়ে অত্যাচার সয়েছেন লুই ব্লেজন।: শরীরে

তার কিছু নেই। পা টেনে টেনে ভাইবোনে এলেন করিডরের শেষে। ব্ল্যাকগার্ড নিগ্রোটার থাকার কথা সেখানে। কিন্তু সে নেই।

সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে এলেন দুজনে। চাবি দিয়ে দরজা খুলে ঢুকলেন সিংহাসন ঘরে। এ ঘরও শূন্য। টেবিলে মদের বোতল আর গেলাস। ন'খানা চেয়ার অর্ধচন্দ্রাকারে সাজানো।

একটা চেয়ারে চলৎশক্তিহীন লুইকে বসিয়ে জেন একাই বেরোলেন রহস্যের কিনারা করতে। কেন প্রাসাদ এত নিস্তব্ধ? কেন কেউ কোথাও নেই?

পা টিপে টিপে দেখলেন একটার পর একটা তলা। দরজা জানলা সব হুহাট করে খোলা—শুধু বাইরের দরজাটা ছাড়া। সেটা বন্ধ। কিন্তু প্রাসাদের ভেতরে কোনো দরজাই বন্ধ নয়। রক্ষীবাহিনী যেন চম্পট দিয়েছে।

ঘাবড়ে গেলেন জেন। সব কটা তলায় একই দৃশ্য। বাকী রইল কেবল টাওয়ার আর ছাদ। একটু ভেবে নিলেন জেন। তারপর পা বাড়ালেন ছাদের দিকে।

সিঁড়ির মাথায় উঠতে না উঠতেই বুঝলেন প্রাসাদ শূন্য নয়। শুনলেন ছাদে কারা যেন কথা বলছে।

উঁকি দিলেন। দূরে ফ্যাক্টরীর আলো ছাদে এসে পড়েছে। সেই আলোয় দেখা যাচ্ছে প্রাসাদের সবাই জড়ো হয়েছে ছাদে। উইলিয়াম ফারনি। আটজন কাউন্সিলর, বেশ কিছু ব্ল্যাকগার্ড আর ন'জন নিগ্রোদাস। পাঁচিলে ভর দিয়ে সবাই আঙুল দিয়ে দূরে কি যেন দেখাচ্ছে। উত্তেজিতভাবে কথা বলছে। প্রত্যেকের কোমরে জোড়া রিভলবার—হাতে রাইফেল।

হঠাৎ ঘুরে দাঁড়াল উইলিয়াম ফারনি। গলা ফাটিয়ে কি যেন হুকুম দিল স্যাঙাতদের। সবাইকে নিয়ে এগুলো সিঁড়ির দিকে।

যে সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে রয়েছেন জেন, সেই সিঁড়ির দিকে। ছাদ থেকে নামবার সিঁড়ি এই একটাই। জেন দেখলেন, মহাবিপদ। এক্ষুনি ধরা পড়বেন। আর ভাববার সময় পেলেন না। লুকোবার জায়গা চোখে যখন পড়ল না—তখন লোহার দরজাটাই ঝন ঝনাৎ শব্দে টেনে বন্ধ করে দিলেন। শেষ ছিটকিনিটা লাগাতে না লাগাতে বিকট চেঁচিয়ে ডাকাতদল লাফিয়ে পড়ল দরজার ওপর। বন্দুকের বাঁট দিয়ে দমাদম মারতে লাগল পাল্লায়।

কিন্তু পাল্লা নড়ল না। কানের পর্দা ফাটানো ভীষণ হট্টগোলে ঘাবড়ে গেছিলেন জেন। সভয়ে চেয়েছিলেন পাল্লার দিকে—এই বুঝি ভেঙে পড়ল।

কিন্তু ভাঙল না। বুঝলেন জেন। এ প্রাসাদের সব দরজাই ইস্পাত দিয়ে তৈরী। গায়ের জোরে ভাঙা যায় না। উইলিয়াম ফার্নিও পারবে না। প্রাসাদ তো নয়, কেল্লা।

নিশ্চিন্ত হয়ে সিঁড়ি বেয়ে নামতে নামতে জেন দেখলেন ছাদ থেকে নিচের তলা পর্যন্ত এ রকম মোট পাঁচটা মজবুত দরজা রয়েছে। অনেকগুলো ভাগে ভাগ করা প্রাসাদ। একটা অংশ থেকে আর এক অংশে যাওয়া চাট্টিখানি কথা নয়—দরজা বন্ধ থাকলে প্রত্যেকটা অংশ এক একটা কেল্লা।

জেন একে একে সবকটা দরজা বন্ধ করলেন। তারপর ঘুরে ঘুরে প্রত্যেকটা জানলা বন্ধ করলেন। জানলায় লোহার গ্রীল ছাড়াও লোহার পাল্লা ছিল। দুর্বল হাতে এত ভারী ভারী পাল্লা বন্ধ করার শক্তি পেলেন স্রেফ মনের মধ্যে থেকে। সব বন্ধ করার পর যখন দেখলেন ইস্পাত আর পাথরের দুর্ভেদ্য কেল্লার ঠিক মাঝখানে তিনি সুরক্ষিত, তখন আর সামলাতে পারলেন না। হাত-পা শরীর কাঁপতে লাগল থর থর করে। দেওয়াল ধরে ধরে কোন মতে গেলেন মেজদার সামনে।

বোনের অবস্থা দেখে চমকে উঠলেন লুই—"কি হল? অমন করছিস কেন?"

জেন খুলে বললেন কি করে এলেন এতক্ষণ। উইলিয়াম ছাদে বন্দী—ভাইবোনের চুল ছোঁয়ার ক্ষমতাও তার নেই।

লুই যেন বিশ্বাস করতে পারলেন না—"ছাদ থেকে আসবার অন্য কোন সিঁড়ি নেই তো?"

"না।"

"বাইরে অত হট্টগোল কিসের?"

"সেইটাই তো বুঝতে পারছি না। চল যাই, দেখে আসি।"

ভাইবোনে এলেন ওপরে। একটা জানলার পাল্লা একটু ফাঁক করে বাইরে উঁকি দিতেই বোঝা গেল কেন অমন ভেঙে পড়েছে উইলিয়াম ফার্নি।

আগুন জ্বলছে রেড রিভারের ডান পাড়ে। এসপ্ল্যানেড অন্ধকার। কিন্তু লেলিহান অগ্নিশিখা নৃত্য করছে নিগ্রোদের প্রত্যেকটা কুঁড়ের মাথায়। টাউনের মাঝখানে যেন নরকের আগুন জ্বলছে দাউ দাউ করে।

আগুন ছড়িয়েছে সিভিল বডির কোয়ার্টারেও। মেরী ফেলোদের কোয়াটারের দিকেও আগুন এগোচ্ছে।

আগুন যেখানে পৌঁছোয়নি সেখানে শোনা যাচ্ছে ভীষণ হট্টগোল, চীৎকার, গালাগাল, প্রাণভিক্ষার কান্না, বিকট হুংকার—সব কিছু ছাপিয়ে ঘনঘন বন্দুক নির্ঘোষ।

নিঃশ্বেস নিয়ে জেন বললেন—"টোনগানের কীর্তি। নিগ্রো দাসরা বিদ্রোহ করেছে।"

"দাসরা বিদ্রোহ করেছে! টোনগানে?"

জেন তখন গোড়া থেকে সব খুলে বললেন। বড়দার নির্দোষিতা প্রতিপন্ন করার জন্যে কিভাবে তিনি সেন্ট বেরেনকে নিয়ে বারজাক মিশনের সঙ্গে বেরিয়ে নাস্তানাবুদ হয়েছেন হ্যারি কীলারের বদমায়েসিতে এবং শেষ পর্যন্ত সঙ্গীসাথী সমেত বন্দী হয়েছিলেন প্রাসাদে। তারপর পালালেন। না খেয়ে ফ্যাক্টরীর মধ্যে মরতে বসলেন। টোনগানে গেল বিদ্রোহের আগুন জ্বালাতে। তর সইল না জেনের। এলেন প্রাসাদে। ইতিমধ্যে টোনগানে নিশ্চয় কাজ হাসিল করেছে। অস্ত্রশস্ত্র পাচার হয়ে গেছে। তাই ক্ষেপেছে নিগ্রোরা। উইলিয়াম ফার্নি দলবল নিয়ে বিদ্রোহ দমন করতে যাচ্ছিল—মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে সে গুড়ে বালি দিয়েছেন জেন।

"এখন কি করবি?" প্রশ্ন করলেন লুই।

"কিছুই করার নেই। প্যালেস থেকে বেরোলে নিগ্রোরা আমাদের মেরে ফেলবে—চেনে না তো। তাছাড়া বন্দুক নেই যে ওদের সাহায্য করব।"

লুই তখন বললেন বন্দুক টন্দুক খুঁজে বার করার জন্যে। জেন ফের বেরোলেন প্যালেস টহল দিতে। খুব একটা সুবিধে হল না। কেননা সব অস্ত্রই ছাদের ওপরে টাওয়ারে রয়েছে। খুঁজে পেতে পেলেন একটা রাইফেল, দুটো রিভলবার আর কিছু কার্তুজ।

ফিরে এসে দেখলেন পরিস্থিতি পালটে গিয়েছে। রণমূর্তি নিগ্রোরা কাতারে কাতারে এসপ্ল্যানেডে জড়ো হচ্ছে। ব্ল্যাকগার্ডদের আস্তানা, চল্লিশটা হেলিপ্লেনের শেড দাউ দাউ করে জ্বলছে। অনেক যন্ত্রণা ওরা সয়েছে এত বছরে—শোধ তুলছে অ্যাদ্দিনে। কিছুই আর আস্ত রাখবে না। —জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ভেঙ্গে চুরে তছনছ করে ছাড়ছে। ব্ল্যাকগার্ডদের কচু কাটা করেছে আস্তানার মধ্যেই। এবার হাজারে হাজারে আক্রমণ করেছে প্যালেস। দমাদম আওয়াজ হচ্ছে দরজা জানলায়। ছাদ থেকে বন্দুক

ছুঁড়ছে উইলিয়াম ফার্নি আর স্যাঙাতরা। কিন্তু ভ্রূক্ষেপ নেই নিগ্রোদের।

এই সময়ে রেডরিভারের দিকে নতুন করে বন্দুকের আওয়াজ শোনা গেল। মেরী ফেলোরা আসছে। এতক্ষণে একজোট হতে পেরেছে তারা। বন্দুক ছুঁড়তে ছুঁড়তে ঢুকছে এসপ্ল্যানেডে। নিগ্রোরা শ'য়ে শ'য়ে লুটিয়ে পড়ছে। তবুও বর্ষা, কুঠার, ছোরা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ছে মেরী ফেলোদের ওপর। তারা বেয়োনেট দিয়ে এফোঁড় ওফোঁড় করছে নিগ্রোদের—সামনা সামনি গুলি চালিয়ে খতম করছে বিদ্রোহীদের।

এ অবস্থায় যুদ্ধের ফল যা হবার তাই হতে চলেছে। বন্দুকধারী, বনাম বর্শাধারীদের যুদ্ধে বন্দুকধারীই জিতছে। ভয় পেয়ে পেছিয়ে গেল নিগ্রোরা। এসপ্ল্যানেড ছেড়ে পালালো নদী পেরিয়ে। মেরী ফেলোরা তাড়া করল পেছন পেছন—মেরীফেলোদের যে আস্তানায় এখনো আগুন লাগেনি—ছুটে চলল সেইদিকে।

ঠিক এই সময়ে একটা প্রলংকর বিস্ফোরণ শোনা গেল।

সিভিল বডিদের কোয়ার্টারের সুদীর্ঘ পাঁচিলের একটা অংশ শূন্যে মিলিয়ে গেল—সেই সঙ্গে বেশ কিছু কোয়ার্টার।

রহস্যজনক বিস্ফোরণের মূলে কি তা বোঝবার তখন সময় নেই। পাঁচিল উড়ে যাওয়া মানেই খোলা মাঠের দিকে মুক্তির পথ পাওয়া। হাজার হাজার নিগ্রো সেই পথে ছুটে বেরিয়ে গেল বাইরে—লুকিয়ে পড়ল ঝোপঝাড়ে।

মেরী ফেলোরা ফিরে এল এসপ্ল্যানেডে। ভয়ে কাঁপছে ওরা। রহস্য জনক বিস্ফোরণ প্রত্যেকেরই ধাত আলাগা করে দিয়েছে। বিস্ফোরণ যেই ঘটাক, সে কিন্তু এলোপাতাড়ি কাজ করছে না—বেশ প্ল্যান মাফিক ঘড়ি ধরে একটার পর একটা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে চলেছে।

প্রথম বিস্ফোরণের পাঁচ মিনিট পরেই আরো দুটো বিস্ফোরণ ঘটল প্রথম ধ্বংসস্তূপের ডাইনে আর বাঁয়ে। পাঁচ মিনিট পরে পরে আরো দুটো বিস্ফোরণ শোনা গেল নদীর পাড়ে—সবই কিন্তু সিভিল বডির কোয়ার্টারে।

বিজয়োল্লাস মিলিয়ে গেল মেরী ফেলোদের। অসহায় দাসদের পেছন পেছন বন্দুক নিয়ে ধাওয়া করা ছেড়ে চোঁ-চাঁ দৌড় মারল এসপ্ল্যানেডের দিকে। বিস্ফোরণ কিন্তু বন্ধ হল না। এর পর থেকেই আধঘণ্টা অন্তর বিস্ফোরণ উড়িয়ে নিয়ে যেতে লাগল সিভিল বডি কোয়ার্টারের এক একটা অংশ।

ব্ল্যাকল্যাণ্ডের হোয়াইট মানুষরা এখন ভয়ে কাঁপছে। অনেক বেশী

শক্তিমান কে যেন তাদের চোখের সামনেই প্ল্যান মাফিক শহর ধ্বংস করছে। তাই ভয়ে তাদের প্রাণ উড়ে গেছে। নিরস্ত্র দাসদের গুলি করে মারার সময়ে খুব বীরত্ব যারা দেখিয়েছিল, তারাই এখন প্রাণের ভয়ে প্যালেসের ইস্পাত দরজা ঠেঙিয়ে ঢোকার চেষ্টা করছে। উইলিয়াম ফারনি কেন ছাদে পালিয়েছে, কেন তাদের সঙ্গত্যাগ করেছে—বুঝতে পারছে না। নিচ থেকে চেঁচাচ্ছে সম্রাটের উদ্দেশে—সম্রাট ওপর থেকে হাত নেড়ে গলা ফাটিয়ে কি যেন বলতে চাইছে—কিন্তু কেউ কারো কথা শুনতে পাচ্ছে না কানফাটানো হট্টগোলে।

এই ভাবেই রাত ভোর হল। ভয়াবহ দৃশ্য দেখা গেল এসপ্ল্যানেডে। কয়েকটা মড়া পড়ে সেখানে। সাদা মানুষ আর কালো মানুষের গাদা। নিগ্রোরা মরেছে কাতারে কাতারে, মরেছে শ্বেতকায়রাও। ব্ল্যাকল্যাণ্ডের আটশ সাদা চামড়ার প্রায় অর্ধেক বেঁচে আছে—বাকী অর্ধেক প্রাণ দিয়েছে কালো চামড়াদের হাতে।

জানলার পাল্লা খুলে জেন দেখলেন, কালো চামড়ারা পালাচ্ছে শহর ছেড়ে। শহরের বাইরে জড়ো হয়েছে দলে দলে, কেউ কেউ দল বেঁধে চলে যাচ্ছে পশ্চিম দিকে—সোজা নাইজার যাচ্ছে। বালির সমুদ্র পেরিয়ে কি পৌঁছোতে পারবে? জল নেই, খাবার নেই, অস্ত্র নেই। আর একদল নিরাপদ কিন্তু অনেক বেশী লম্বাপথ বেছে নিয়েছে। রেড রিভার বরাবর দক্ষিণ পশ্চিমে উধাও হচ্ছে।

কিন্তু বেশীর ভাগ নিগ্রো মনস্থির করতে পারছে না, শহর ছেড়ে যাবে কিনা। শহরের বাইরে ক্ষেতখামারে দল বেঁধে বসে উদাস ভাবে চেয়ে রয়েছে শহরের দিকে। শহর আর শহর নেই অবশ্য—ধ্বংসস্তূপ হয়ে আসছে এক-একটা বিস্ফোরণের প্রলয়ংকর আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে—ঘন কালো ধোঁয়া উঠছে চারদিক থেকে।

ঠিক এই সময়ে প্যালেস কেঁপে উঠল প্রচণ্ড বিস্ফোরণে। বিস্ফোরণ ঘটল ছাদের ওপরে। সঙ্গে সঙ্গে দমাদম ধাক্কা পড়তে লাগল দরজায়। হুড়মুড় করে প্রচণ্ড শব্দে কি যেন ভেঙ্গে পড়ল।

বোনের হাত চেপে ধরলেন লুই। চোখে আতংক।

জেন বুঝলেন কি ঘটে গেল। কিন্তু ভয় পেলেন না। শান্তস্বরে বললেন—"কামান দিয়ে ছাদের দরজা ভাঙল উইলিয়াম।"

"তাহলে তো এখুনি নেমে আসবে। আয়, তার আগেই মরি," বলে রিভলবার খামচে ধরলেন লুই।

হাত চেপে ধরলেন জেন—"না। আরও পাঁচটা দরজা ভাঙতে হবে। কিন্তু কামান নামানো যাবে না—বিশেষ করে শেষের তিনটে দরজা এমনভাবে তৈরী যে কামান দাগবার জায়গা নেই।"

জেন ঠিকই ধরেছেন। নতুন বিস্ফোরণের আওয়াজ আর শোনা গেল না। শুধু শোনা গেল ঘড়ঘড় শব্দ। কামান টেনে আনা হচ্ছে ছাদের ওপর দিয়ে। কিন্তু সিঁড়ি নামতে যেন হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে দুশমন।

বাধা পেল মাঝখানে। নতুন একটা ঘটনা ঘটল। জেন আর লুইও স্থির থাকতে পারলেন না।

আধঘণ্টা অন্তর রহস্যজনক সেই বিস্ফোরণ এবার নদীর পাড় বরাবর এগোচ্ছে। আচমকা অতি ভয়ংকর একটা বিস্ফোরণ ঘটল। আগের বিস্ফোরণগুলো সে তুলনায় কিছুই নয়। ফ্যাক্টরীর বাগানের মধ্যে। পাথর মাটি ছিটকে গেল আকাশে। ধোঁয়া পরিষ্কার হয়ে যাবার পর দেখা গেল বাগান ধ্বংস হয়েছে—ফ্যাক্টরীর খানিকটা অংশও মাটিতে মিশে গেছে।

বিস্ফোরণের ধুলো তখনও শূন্যে ভাসছে—এমন সময় দেখা গেল ফ্যাক্টরীর দুহাট করে খোলা দরজা দিয়ে একটা বিরাট জনতা এগোচ্ছে জেটির দিকে। দেখেই চিনলেন জেন। সঙ্গীরা রয়েছেন ভীড়ের মধ্যে। রয়েছে ক্যাম্যারেটের শ্রমিক কর্মচারীরা। মেয়ে আর বাচ্চাদের মাঝে রেখে দল বেঁধে এগোচ্ছে। কিন্তু কেন?

ফ্যাক্টরীর নিরাপদ আশ্রয় ছেড়ে কেন এঁরা বাঘের মুখে আসছেন? মেরী ফেলোরা এখনও দরজা ভাঙবার চেষ্টা করছে—ওঁরা আসছেন সেই দিকেই।

মেরী ফেলোরা ওঁদের দেখতে পায়নি এসপ্লানেডের পাঁচিলের আড়ালে থাকায়। উইলিয়াম ফারনি দেখেছে ওপর থেকে হাত নেড়ে দেখাচ্ছে। মেরী ফেলোরা বুঝতে পারছে না।

জেটির দিক থেকে এসপ্ল্যানেডে ঢুকছে জনতা।

সঙ্গে সঙ্গে দেখতে পেল মেরী ফেলোরা। অস্ত্র তুলে নিয়ে বিকট হুংকার ছেড়ে ধেয়ে গেল সেইদিকে।

কিন্তু এতো নিগ্রোদের পিটিয়ে মারা নয়। পাল্টা মারও খেতে হল। ফ্যাক্টরীর কেউ নিরস্ত্র নয়। লোহার ডাণ্ডা, কামারের হাতুড়ি, চিমটে—যে যা পেয়েছে বাগিয়ে নিয়ে বেরিয়েছে। চলল বেধড়ক মার। রক্তগঙ্গা বয়ে গেল এসপ্ল্যানেডে। লাশ পড়েছিল আগেই—এখন পড়ল আরো। মরণ

চীৎকারের পর চীৎকারে আকাশ যেন ফলাফালা হয়ে গেল।

এ দৃশ্য আর দেখতে পারলেন না জেন, দুহাতে চোখ ঢাকা দিলেন। যাদের লাশ লুটিয়ে পড়ছে, কে জানে তাদের মধ্যে বারজাক, ফ্লোরেন্স, চাতোন্নে অথবা সেন্ট বেরেনও আছেন কিনা।

কিন্তু আধুনিক অস্ত্রে বলীয়ান মেরী ফেলোরাই শেষ পর্যন্ত জিতে গেল। ফ্যাক্টরীর লোক দুভাগ হয়ে গেল। একটা দল লড়তে লড়তে পেছিয়ে গেল জেটি দিয়ে ফ্যাক্টরীর দিকে, আর একটা দল একটু একটু করে এগোতে লাগল প্যালেসের দিকে।

কিন্তু পালিয়ে তারা যাবে কোথায়? প্যালেসের দেওয়াল ঘেঁসে অসহায় ভাবে লড়ে গেল সামনে মেরী ফেলো আর মাথার ওপরে উইলিয়াম ফারনিদের সঙ্গে। দুপক্ষই গুলি চালাচ্ছে সমানে···

আচম্বিতে একটা আনন্দের অট্টরোল শোনা গেল। যে দরজায় পিঠ দিয়ে লড়ছিল এরা, আচমকা তা খুলে গেল দুহাট হয়ে। খোলা দরজায় দাঁড়িয়ে রিভলবার আর রাইফেল চালিয়ে মেরী ফেলোদের ঠেকিয়ে রাখলেন জেন আর লুই—সেই ফাঁকে এরা ঢুকে পড়ল প্যালেসে।

হকচকিয়ে গিয়েছিল মেরী ফেলোরা। তার পরেই নতুন উদ্যমে ঝাঁপিয়ে পড়ল শত্রুদের ওপর। ততক্ষণে ফের বন্ধ হয়ে গেছে ইস্পাতের কপাট।

১৪ ॥ ব্ল্যাকল্যাণ্ডের শেষ

দরজা বন্ধ হল। আহতদের শুশ্রূষা আরম্ভ করলেন জেন ব্লেজন। হাত লাগালেন বারজাক এবং ফ্লোরেন্সও। ফ্লোরেন্স নিজেও জখম হয়েছিলেন—সামান্যই।

প্রাথমিক শুশ্রূষার পড পেটের জ্বালা মিটোনোর ব্যবস্থা করতে হল। ফ্যাক্টরীতে এতদিন কেউ কিছু খাননি। অনাহারে নেতিয়ে পড়ছেন। জেন তাই একাই বেরোলেন খাবারের সন্ধানে। প্যালেসের সব ঘর খুঁজেপেতে খুদ কুঁড়ো যা পেলেন তাতে পেটের আগুন নিভল না—বরং বেড়ে গেল। খাবার আর কোথাও নেই।

এদিকে পরিস্থিতি ক্রমশঃ সঙ্গীন হচ্ছে। বড জোর আর কয়েক ঘন্টা টিঁকে থাকা যাবে। মাথার ওপরে সিঁডির দরজা ভাঙবার চেষ্টা করছে

উইলয়াম ফারনিরা—বাইরে দরজায় দমাদম ধাক্কা মেরে চলেছে মেরী ফেলোরা। কেউ কিছুই করতে পারছে না। আওয়াজ হচ্ছে কেবল। আস্তে আস্তে তাও সয়ে গেল। আশ্রিতরা বুঝলেন এ বড় জবর ঠাঁই। দুর্ভেদ্য। নিশ্চিন্তে থাকা যাবে। তাই আওয়াজে কান দিলেন না।

জেন সেই ফাঁকে বলে নিলেন প্যালেসে আসার পর কি কি ঘটেছে। শুনলেন আমিদী ফ্লোরেন্স। অবাক হলেন যখন শুনলেন, হ্যারি কালার ওরফে উইলিয়াম ফারনি জেন ব্লেজনের ভাই!

ফ্লোরেন্স তখন সংক্ষেপে বললেন, জেন চলে আসার পর কি-কি ঘটেছে ফ্যাক্টরীতে। রাত সাড়ে আটটা নাগাদ টোনগানের সংকেত পেয়েই মারসেল ক্যামারেট শূন্য পথে ব্ল্যাকল্যাণ্ডের অন্যান্য বাসিন্দাদের অলক্ষিতে বেশ কিছু ডিনামাইট, কার্তুজ আর অস্ত্র শস্ত্র মাঝের কোয়ার্টারে পাঠিয়ে দিলেন। এগারোটা নাগাদ সে পর্ব চুকল। ফ্যাক্টরীর বাসিন্দারা কোমর বাঁধলেন আসন্ন লড়াইয়ের জন্যে।

সবচেয়ে অধৈর্য হয়েছিলেন সেন্ট বেরেন। জেনের কাছে যাওয়ার জন্যে ছটফট করছিলেন উদ্বেগে।

অস্ত্র চালানোর আধঘন্টা পরেই একটা তুমুল বিস্ফোরণ শোনা গেল। কালো চামড়াদের কোয়ার্টারের একটা গেট উড়িয়ে দিল টোনগানে। শোনা গেল বন্দুক-নির্ঘোষ, হৈহল্লা, কান্নাকাটি। অর্থাৎ সিভিল বন্দিদের কচুকাটা করছে নিগ্রোদাসরা।

তারপর কি হয়েছে, জেন জানেন। এসপ্ল্যানেডে ঢুকল নিগ্রোরা। কিন্তু মেরী ফেলোদের তাড়া খেয়ে এত তাড়াতাড়ি পালালো যে সাহায্য করার সময় পর্যন্ত পেলেন না অভিযাত্রীরা। ফ্যাক্টরী থেকে বেরিয়ে দেখলেন ভোঁ-ভাঁ। এসপ্ল্যানেড ফাঁকা। বাধ্য হয়ে ফিরে গেলেন ফ্যাক্টরীতে।

বিষম উদ্বেগে রাত কাটালেন ফ্যাক্টরীর মধ্যে। দাস-বিদ্রোহ ব্ল্যাকল্যাণ্ডে হ্যারি কীলারের অপশাসনের অবসান ঘটাবে কিনা আঁচ করতে পারলেন না। শিউরে শিউরে উঠতে লাগলেন মুহুর্মুহু বিস্ফোরণের আওয়াজ শুনে। প্রথমটা ধরতে পারেননি, কে এমন ধ্বংস করছে। পরে বুঝলেন। স্রষ্টা স্বয়ং সংহারমূর্তি ধরছেন। মারসেল ক্যামারেট উন্মাদ হয়ে গেছেন। তিনিই হাতে গড়া শহর ধ্বংস করছেন নিজের হাতে।

মারসেল ক্যামারেট একটা উজ্জ্বল প্রতিভা। অসাধারণ আবিষ্কারক। কিন্তু তাঁর মনের ভারসাম্যে সমতা ছিল না কোনো দিনই। উন্মাদ ছিলেন

না—কিন্তু পুরোপুরি প্রকৃতিস্থও ছিলেন না। সুস্থ আর অসুস্থ অবস্থার মাঝামাঝি ছিলেন। গত এক মাসের অভাবনীয় বিপর্যয় তাঁকে ঠেলে দিয়েছে অসুস্থতার দিকে। আচার আচরণে অসামঞ্জস্য দেখেই বোঝা গিয়েছিল। তিনি কখনো প্রখর বিজ্ঞানী—অতুলনীয় ধীমান; আবার কখনো ভারসাম্যহীন অপ্রকৃতিস্থ। পর পর কয়েকটা ধাক্কা খেয়ে এখন তিনি পুরোপুরি অপ্রকৃতিস্থ।

প্রথম ধাক্কাটা আসে হ্যারি কীলারের বন্দীদের ফ্যাক্টরীতে ঠাঁই দেওয়ার সময়ে। আরো প্রচণ্ড দ্বিতীয় ধাক্কাটা পান ড্যানিয়েল ফ্রাসনের জবানি শুনে। তারপর থেকেই উনি ঘর ছেড়ে বেরোতেন না, খেতেন না, গুম হয়ে আকাশ পাতাল ভাবতেন নয়তো উদাস মনে কারখানায় পায়চারী করতেন।

তখন থেকেই কিন্তু উন্মাদ হচ্ছিলেন তিনি—টোনগানেকে অস্ত্র পাচার করাটাই তাঁর সুস্থ মস্তিষ্কের শেষ কীর্তি। তারপরেই যখন বিস্ফোরণ ঘটল এবং আগুন জ্বলল দাস আর সিভিল বস্তি কোয়ার্টারে, ফ্যাকাশে হয়ে গেল তাঁর মুখ। দুহাতে নিজের গলাই নিজে টিপে ধরে বিড়বিড় করে কেবল বলতে লাগলেন—"শেষ।...আমার সৃষ্টির শেষ।.."

মিনিট পনেরো এই রকম করে গেলেন মারসেল ক্যামারেট। অস্থিরভাবে মাথা নাড়তে লাগলেন ডাইনে বাঁয়ে। উদ্বিগ্ন চোখে চেয়ে রইলেন পাশের সবাই। তারপরেই তিনি দাঁড়িয়ে উঠলেন ছিলে ছেঁড়া ধনুকের মত। দুহাতে বুক চাপড়াতে চাপড়াতে চিৎকার করে উঠলেন পাগলের মত—"ঈশ্বরের শাপ লেগেছে ব্ল্যাকল্যাণ্ডে।..."

'ঈশ্বর' বলতে যে নিজেকে বোঝালেন, তা অঙ্গভঙ্গী থেকেই বোঝা গেল।

পাশের সবাই চেপে ধরবার আগেই ছিটকে গেলেন তফাতে। বেগে দৌড়োলেন টাওয়ারের দিকে। চেঁচিয়ে গেলেন তারস্বরে বিকৃত উন্মত্ত কণ্ঠে—"ঈশ্বরের শাপ লেগেছে ব্ল্যাকল্যাণ্ডে।...ঈশরের শাপ লেগেছে ব্ল্যাকল্যাণ্ডে।..."

প্যালেস-টাওয়ারের মত ফ্যাক্টরী-টাওয়ারেও দরজার পর দরজা বন্ধ করে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে গেলে কামান দেগেও পথ করে নেওয়া যায় না। ক্যামারেট 'ঈশরের শাপ লেগেছে ব্ল্যাকল্যাণ্ডে।'...'ঈশ্বরের শাপ লেগেছে ব্ল্যাকল্যাণ্ডে।' বলতে বলতে এই সব পেল্লায় ইস্পাত-কপাট বন্ধ করে তীরের মত উধাও হয়ে গেলেন টাওয়ারের ভেতরে—পেছনে ধাওয়া করেও তাঁকে ধরা গেল না।

প্রথম বিস্ফোরণটা শোনা গেল ঠিক এর পরেই।

রিগড শ্রমিক-কর্মচারীদের নিয়ে দৌড়ে গেলেন। ক্যাম্যারেটকে তিনি শ্রদ্ধা করতেন—পূজো করতেন বললেও চলে। না খেয়ে প্রত্যেকেই তখন ধুঁকছে। তা সত্ত্বেও ফ্যাক্টরীতে গেলেন। কারেন্ট বন্ধ করে দিলেন—যাতে টাওয়ারের কলকব্জা বিকল হয়ে যায়। কিন্তু টাওয়ারের নিজের জেনারেটর ছিল—তরল বাতাসের শক্তিতে চালু হয়ে গেল সেই জেনারেটর। অব্যাহত রইল বিস্ফোরণ। কারেন্ট বন্ধ হওয়ায় উড়ন্ত বোলতাবাহিনী কিন্তু আছড়ে পড়ল মাটিতে। বেগতিক দেখে কারেন্ট চালু করে দিলেন রিগড। ক্যাম্যারেট অপ্রকৃতিস্থ, কিন্তু নির্বোধ নন। যা কিছু করছেন, ভেবেচিন্তেই করেছেন। বোলতা-বাহিনীকে ফের চালু করে দিলেন—আবার ফ্যাক্টরী পরিক্রমা শুরু করল যান্ত্রিক রক্ষীবাহিনী।

সারারাত বিষম উদ্বেগে কাটল। সকালবেলা প্ল্যাটফর্মে আবির্ভূত হলেন ক্যাম্যারেট। দীর্ঘ বক্তৃতা দিলেন উঁচু মঞ্চ থেকে। দূর থেকে কয়েকটা কথাই কেবল শোনা গেল। 'ঈশ্বরের অভিশাপ'...'স্বর্গের আগুন'... 'একেবারে ধ্বংস'...এই ধরনের কয়েকটা বুকনি শুনেই বোঝা গেল মাথা একদম বিগড়েছে। বক্তৃতা শেষে আবার চেঁচিয়ে উঠলেন—"পালাও!... পালাও!... যে যেখানে আছো সব পালাও!" বিকট সেই চিৎকার এবার শুনতে পেল ফ্যাক্টরীর প্রত্যেকটি মানুষ। আবার টাওয়ারে অদৃশ্য হলেন ক্যাম্যারেট—আর বেরোননি।

ঠিক এর পর থেকেই বিস্ফোরণ শুরু হল বাঁ পাড়ে। ফ্যাক্টরীর মধ্যেই ঘটল প্রথম বিস্ফোরণ। আতংকে দিশেহারা হল সবাই। ভেতরে থাকলে মৃত্যু অনিবার্য। তার চাইতে বেরিয়ে পড়া যাক বাইরে।

বাইরে বেরোনোর পর কি হয়েছে, জেন দেখেছেন। মেরী ফেলোদের আক্রমণে দুভাগ হয়ে গেল শ্রমিক-কর্মচারীরা। একদল ফের আশ্রয় নিলে ফ্যাক্টরীতে। দরজা বন্ধ করেও কেউ নিশ্চিন্ত হতে পারল না। ফ্যাক্টরীর ভেতরে ঢোকা নিরাপদ নয়। ক্যাম্যারেট ধ্বংসকাণ্ড চালাচ্ছেন ধ্বংসদেবতা হয়ে। খোলা জায়গায় তাই পড়ে রইল প্রাণ হাতে নিয়ে। অনেকেই তলিয়ে পড়ল মাটিতে—বসবার ক্ষমতাও নেই খিদে আর পরিশ্রমে। আক্রমণের সম্ভাবনাও রয়েছে ফ্যাক্টরীর পেছন দিকের সার্কুলার রোড থেকে। অথবা নদীর অন্য পাড় থেকে, অথবা প্যালেসের ছাদের ওপর থেকে।

আর একদল লড়তে লড়তে পিঠ দিয়ে দাঁড়াল প্যালেসের দরজায়। জেন

তাদের ভেতরে টেনে নিলেন। হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন যখন দেখলেন ওদে' মধ্যেই রয়েছেন তাঁর প্রাণপ্রিয় পরিজন সেন্ট বেরেন এবং দুর্ভাগ্যের সঙ্গী অন্যান্য সহযাত্রীরা। কেউ মরেন নি।

আশ্বস্ত হতে না হতেই শুরু হল নতুন দুর্বিপাক। প্রচণ্ড আওয়াজ শোনা যেতে লাগল ছাদের সিঁড়িতে। উইলিয়াম ফার্নিরা না খেয়ে নেই নিশ্চয়—টাওয়ারের খাবারে পেট ভরিয়ে এবার দরজা উপড়ে আনার আয়োজন করেছে। দরজা ভাঙা যাবে না ঠিকই, কিন্তু আশপাশের পাথর খসিয়ে দরজা উপড়ে আনা যাবে।

করলও তাই। সন্ধ্যে ছটার একটু পরেই প্রবল শব্দে খসে পড়ল ছাদের দরজা। চারতলা ফাঁকা করে দুর্ভাগারা নেমে এলেন তার নিচের তলায়। লোহার দরজা এবারেও বন্ধ করলেন। কিন্তু কতক্ষণের জন্যে?

যতক্ষণের জন্যেই হোক, জেন এই ফাঁকে বারজাক আর ফ্লোরেন্সকে বললেন নিজের আর লুই ব্লেজনের আশ্চর্য কাহিনী। লুইকে কি ভাবে ব্যাংক ডাকাতরা কিডন্যাপ করে এখানে এনে তুলেছে এবং কি ভাবে জেন তাঁকে খুঁজে পেয়েছেন। হ্যারি কীলার তাঁরই ভাই। পই-পই করে বলেছিলেন, জেন যদি ইংল্যাণ্ডে ফিরতে নাও পারেন—বারজাক অথবা ফ্লোরেন্স ইংল্যাণ্ডে ফিরে দেশশুদ্ধ লোককে যেন জানিয়ে দেন—জর্জ আর লুই ব্লেজন নির্দোষ, নিরপরাধ।

সন্ধ্যে সাতটা নাগাদ তিনতলার কড়িকাঠ ভাঙতে আরম্ভ করল উইলিয়াম ফারনিরা। আশ্রিতরা নেমে এলেন নিচের তলায়—দরজা বন্ধ করে দিলেন আগের মতই। তিনতলায় কড়িকাঠ খসতে রাত দুটো বেজে গেল। প্রচণ্ড শব্দে দরজা খসিয়ে টানা বিশ্রাম নিল সম্রাট হ্যারি কীলার। এত ধকল কি সওয়া যায়?

ভোর চারটের সময়ে ফের আরম্ভ হল দমাদম আওয়াজ। এবার ভাঙা হচ্ছে দোতলার সিলিং। অভিযাত্রীরা আর দেরী করলেন না। একতলায় ঠাঁই নিলেন। দোতলার সিলিং ফুটো হওয়ার পর রাইফেলের নল ওঁদের দিকে তাগ করার আগেই হয় পালাবেন পাতাল কুঠরিতে—নয় বাইরে। যা থাকে কপালে। মরণ দুদিকেই।

বাইরে তখন রোদ উঠেছে। প্রলয়-লীলা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। ব্ল্যাক-ল্যাণ্ডের ঈশ্বর সুচারুভাবে ধ্বংস করেছেন ব্ল্যাকল্যাণ্ডকে। মাঠ করে ছেড়েছেন। নির্মেঘ আকাশের নিচে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছেন আশ্চর্য নগরী

ব্ল্যাকল্যাণ্ড! প্যালেসের ঠিক উল্টো দিকে মেরী ফেলোদের কোয়ার্টারে দুটো বাড়ী তখনও আস্ত ছিল—সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে সে দুটোও ভেঙে পড়ল। নদীর দক্ষিণ পাড়ে শ্মশান সৃষ্টি সম্পূর্ণ হল।

কিন্তু তাতেও পূর্ণ হল না পাগলা মহেশ্বরের ধ্বংসবাসনা। ধ্বংস তিনি করবেনই—যতক্ষণ তাঁর সৃষ্টির কণাটুকুও থাকবে—তার ওপরেই তিনি প্রলয়নাচন নাচবেন। তাই এবার বিস্ফোরণ শুরু হল আরও ঘনঘন, কিন্তু একটু একটু করে। একবারেই যেন বাঁ পাড়ের সব কিছু উড়িয়ে দিতে চান না। ধ্বংস-লীলা যেন তাঁকে অসীম আনন্দ দিচ্ছে—যেন এ দৃশ্য তিনি তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করছেন এমনিভাবে ফ্যাক্টরীর এক একটা অংশ অল্প অল্প করে ভেঙে গুঁড়িয়ে ছাড়খার করে দিতে লাগলেন। ধূলো করে দিলেন শ্রমিক কর্মচারীদের বাড়ী, ওয়ার্কশপ, ভাঁড়ার ঘর, গুদোম ঘর—বাদ দিয়ে গেলেন কেবল পাওয়ার হাউস—শক্তির উৎসস্থান—শক্তি দিয়ে তিনি তাঁর সংহার রূপ দেখাচ্ছেন—সংহার লীলা চালাচ্ছেন—প্রলয় বাদ্যি বাজাচ্ছেন।

বাঁ পাড়ে প্রথম বিস্ফোরণটা ঘটতেই ফের ক্ষেপে উঠল মেরী ফেলোরা। সারারাত তারা হাল ছেড়ে দিয়েছিল, সকাল হতেই আবার নতুন উদ্যমে হৈ-হৈ করে ঝাঁপিয়ে পড়ল প্যালেস-ফটকে। কেন? সব যাবার পরেও কেন এমন ছিনেজোঁক এরা? কি চায়?

দু'চারটে কথা শুনেই বোঝাগেল উদ্দেশ্যটা। সম্রাট হ্যারি কীলারের ওপর তাদের আর ভক্তি নেই। তাকে ফেলেই পালাতে চায় যে দিকে দুচোখ যায়। কিন্তু সঙ্গে নিয়ে যেতে চায় সম্রাটের কোষাগার। এই প্যালেসেই আছে সেই বিশাল ঐশ্বর্য।

হায়রে। অভিযাত্রীরা যদি জানতেন কোষাগারের ঠিকানা—নিজেরাই এনে দুহাতে ছড়িয়ে দিতেন লোলুপ মেরী ফেলোদের মাথায়। তাতেও যদি বাঁচা যায়। কিন্তু ঠিকানা তো জানেন না।

নটা পর্যন্ত চলল এই রকম বিস্ফোরণ আর দুমদাম শব্দ। বাইরে ব্ল্যাক-ল্যাণ্ডের ভগবান বাড়ীঘরদোর ভাঙছেন, মাথার ওপরে ব্ল্যাকল্যাণ্ডের সম্রাট দোতলার সিলিং ভাঙছে, আর বাইরে ব্ল্যাকল্যাণ্ডের সৈন্যসামন্ত দরজা ভাঙার চেষ্টা করছে।

নটা নাগাদ মেরী ফেলোরা অন্য পথ ধরল। দেখলে এ পাল্লা ভাঙা যায় না—কিন্তু দেওয়াল ভেঙে উপড়ে আনা যায়। সঙ্গে সঙ্গে পাথর খসিয়ে বারুদ ফুটিয়ে গর্ত বানিয়ে ফেলল তারা। নড়বড় করে উঠল দরজা। ফুটো দিয়ে

উঁকি দিল রাইফেলের নল।

অভিযাত্রীরা সরে গেলেন দূরে—প্যালেসের অন্য কোণে। দরজা এখনো ভাঙেনি—কিন্তু ভাঙতেও তার দেরী নেই। মেরী ফেলোরা আর একটা ফুটো করে তার মধ্যে বারুদ ঢুকিয়ে বিস্ফোরণের ব্যবস্থা করছে।

ঠিক এই সময়ে মড মড করে ভেঙে পড়ল দোতলার সিলিং। মাথার ওপর পায়ের আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে এখন। সম্রাট হ্যারি কালার এখন ভাঙবে আর একটা সিলিং—তাহলেই বন্দুকের সামনে পাবে অভিযাত্রীদের।

মেঝের ওপর চিৎপাত হয়ে শুয়ে পড়লেন অভিযাত্রীরা। আর বাঁচার পথ নেই। আসুক গুলি—উড়ুক খুলি—শেষ হোক এই বিষম উৎকণ্ঠার।

কিন্তু ঠিক এই সময়ে একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটল। সম্রাট আর তার সৈন্যসামন্তরা হঠাৎ দুমদাম আওয়াজ থামিয়ে চুপ মেরে গেল। কড়ি কাঠ ভাঙার আওয়াজও নেই—নেই প্যালেস দরজা উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা।

ব্যাপার কি বোঝবার আগেই শোনা গেল একটা নতুন বিস্ফোরণের আওয়াজ। নিয়মিত সময়ের ব্যবধানে মুহুর্মুহু যে বিস্ফোরণ ঘটছে—এ বিস্ফোরণ ঠিক সেরকম নয়। এর আওয়াজ ছড়িয়ে গেল শ্মশান ব্ল্যাকল্যাণ্ড নগরীর দিক হতে দিকে—প্রথম বিস্ফোরণের পরেই পরপর শোনা গেল আরও কয়েকটা গুরুগম্ভীর আওয়াজ—ঠিক যেন কামান বর্ষণ শুরু হয়েছে দূর থেকে।

পর মুহূর্তেই এসপ্ল্যানেড আর খোলামাঠের মাঝের পাঁচিল হুড়মুড় করে ধসে পড়ল মাটিতে।

সভয়ে সেই দিকে চেয়ে রইল মেরী ফেলোরা। কি দেখল কে জানে, ভয়ে বিস্ময়ে উত্তেজনায় চেঁচামেচি জুড়ল নিজেদের মধ্যে। হাত দিয়ে দূরে কি যেন দেখিয়ে হঠাৎ চোঁ-চাঁ দৌড় দিল এসপ্ল্যানেডের বাইরে।

কিন্তু বাইরে যাওয়ার আগেই একই সঙ্গে দুটো প্রচণ্ড বিস্ফোরণে উড়ে গেল গার্ডেন ব্রীজ আর কাস্‌ল্ ব্রীজ। মারা গেল জনা চল্লিশ দুর্বৃত্ত। ডান পাড়ের সঙ্গে যোগাযোগের আর কোনো পথ নেই দেখে শয়তানের দল ঊর্ধ্ব-শ্বাসে দৌড়ে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল জলে—সাঁতরে পেরিয়ে গেল নদী।

চক্ষের নিমেষে খালি হয়ে গেল এসপ্ল্যানেড। চারিদিকে নেমে এল অখণ্ড নিস্তব্ধতা। মধ্যে মধ্যে কেবল ধ্বনিত হল নিয়মিত সময়ের ব্যবধানে বিস্ফো-রণের আওয়াজ—ব্ল্যাকল্যাণ্ডের ভগবানের রোষ এখনো প্রশমিত হয়নি।

উইলিয়াম ফারনিরা দুপদাপ করে উঠে গেল ওপর তলায়। কড়িকাঠ

ভাঙার চেষ্টা ছেড়ে ছাদে কেন?

চারদিকের এই অস্বাভাবিক নীরবতার কারণ অন্বেষণ করার আগেই প্রচণ্ড শব্দে উড়ে গেল প্যালেসের একটা অংশ। ব্ল্যাকল্যাণ্ডের ভগবান এবার প্যালেসে হাত দিয়েছেন—শিলাময় স্তূপে পরিণত করবেন দুর্ভেদ্য এই দুর্গকে।

প্রাণ হাতে নিয়ে অভিযাত্রীরা বেরিয়ে এলেন এসপ্ল্যানেডে। মেরী ফেলোরা কেন এমন আতংকিত হয়ে পালিয়ে গেল দেখবার জন্যে ছুটে গেলেন ভাঙা পাঁচিলের দিকে। কাছে যাওয়ার আগেই দূর থেকে কানে ভেসে এল একটা সুপরিচিত শব্দ।

বিউগ্‌ল্ বাজছে!

বিউগ্‌ল্ বাজছে! মৈত্রী বাহিনী এসে পৌঁছেছে। কানকে বিশ্বাস করতে পারলেন না কেউ। তবুও দৌড়োতে দৌড়োতে ফ্যাক্টরীর ভেতর থেকে বেরিয়ে এলেন শ্রমিক-কর্মচারীরা।

এই অবস্থাতেই সবাইকে দেখতে পেলেন ক্যাপ্টেন মারসিনে। কামান ছুঁড়ে ইনিই সংকেত করেছিলেন, বিউগ্‌ল্ বাজিয়ে আশ্বাস জানিয়েছিলেন। এসপ্ল্যানেডে ঢুকে দেখলেন একপাল হতশ্রী মানুষ জড়াজড়ি করে দাঁড়িয়ে। অনাহারে শীর্ণ, রক্তে মাখামাখি, উদ্বেগে কম্পমান—ক্যাপ্টেন মারসিনের সৈন্য বাহিনী দেখে এরা এগিয়ে আসতে গিয়েও পারল না—ক্লান্তিতে, অবসাদে এবং শরীরে তিলমাত্র শক্তি না থাকায় অনেকেই অজ্ঞান হয়ে লুটিয়ে পড়ল মাটিতে।

ক্যাপ্টেন মারসিনে দেখলেন সেই শোচনীয় দৃশ্য। দেখলেন বিপুল এক নগরী ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে, দেখলেন যে দিকে দুচোখ যায় নীল আকাশের দিকে কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলি পাক খেয়ে উঠে যাচ্ছে; দেখলেন এই মহাশ্মশানের মাঝে এসপ্ল্যানেডের দুপাশে দুটি ইমারত এখনও অটুট অবস্থায় দুটো টাওয়ারকে শূন্যে উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

এদের মধ্যে খুঁজে পাবেন কি সেই মেয়েটিকে যার জন্যে দুস্তর পথ তিনি পেরিয়ে এসেছেন বিষম উৎকণ্ঠা নিয়ে? পাবেন কি তাকে জীবন্ত অবস্থায়?

পেলেন। ভূলুণ্ঠিতা হয়েও ক্যাপ্টেনকে দেখে নবীন উদ্যমে সহসা ছিটকে দাঁড়িয়ে উঠলেন জেন রেজন—দুহাত সামনে বাড়িয়ে ছুটে এলেন তাঁর পানে।

শিউরে উঠলেন ক্যাপ্টেন। মাত্র তিনমাস আগে প্রাণশক্তিতে ভরপুর অপরূপ সুন্দরী তেজস্বিনী মেয়েটিকে ছেড়ে যেতে হয়েছিল—আজ একি হাল তাঁর হয়েছে? মুখ নিরক্ত, গাল তুবড়ে গেছে, চোখ আরক্ত! অজ্ঞান

হয়ে মাটিতে আছড়ে পড়ছিলেন জেন—দুহাতে ধরে নিলেন ক্যাপ্টেন মারসিনে। সার্থক হল দুর্গমের অভিযান।

ঠিক এই সময়ে যুগপৎ দুটো প্রলয়ংকর বিস্ফোরণ ঘটল এসপ্ল্যানেডের দুপাশে—একই সঙ্গে রেণু রেণু হয়ে মাটিতে মিশে গেল ফ্যাক্টরী আর প্যালেস—ধ্বংসস্তূপের মাঝে অটল মহিমায় উন্নতশিরে দাঁড়িয়ে রইল টাওয়ার দুটো। এপাশে একটা, ওপাশে একটা।

প্যালেস টাওয়ারের শীর্ষে দেখা গেল তেইশজনকে। উইলিয়াম ফারনি দলবল নিয়ে ঝুঁকে পড়ে প্রাণভিক্ষা চাইছে।

কার কাছে?

ফ্যাক্টরী টাওয়ারে শীষে যিনি পায়চারী করছেন—তাঁর কাছে। তিনবার মঞ্চ প্রদক্ষিণ করে এলেন তিনি। তারপর দূর-দিগন্তের পানে তাকিয়ে দুহাত সামনে ছড়িয়ে উদাত্ত কণ্ঠে বক্তৃতা আরম্ভ করলেন। দূর থেকে ভেসে এল কেবল দু'একটা কথা—'অভিশপ্ত। ...অভিশপ্ত ব্ল্যাকল্যাণ্ড।"

উইলিয়াম ফারনিও নিশ্চয় শুনেছিল কথাগুলো। অকস্মাৎ যেন চণ্ডালের রাগ চাড়া দিল মাথায়। রাইফেল তুলে এলোপাতাড়ি গুলি বর্ষণ করল প্রায় চারশ গজ দূরে ফ্যাক্টরী-টাওয়ারের শীর্ষদেশ লক্ষ্য করে।

টিপ না করে ছুঁড়লেও হঠাৎ একটা গুলি নিশ্চয় বুকে বিঁধেছিল মারসেল ক্যামারেটের। খপাৎ করে বুক খামচে ধরে টলমলিয়ে উঠলেন তিনি—সেঁধিয়ে গেলেন টাওয়ারের ভেতরে—সঙ্গে সঙ্গে ঘটল কল্পনাতীত জোড়া বিস্ফোরণ। ধূলিস্যাৎ হয়ে গেল ফ্যাক্টরী-টাওয়ার আর প্যালেস-টাওয়ার। ধ্বংসস্তূপের তলায় চিরতরে হারিয়ে গেল মহাপাপিষ্ঠ সপারিষদ সম্রাট হ্যারি কীলার আর ব্ল্যাকল্যাণ্ডের স্রষ্টা অতি-মানব অতি-ধীমান আবিষ্কারক মারসেল ক্যামারেট।

শ্মশান-নৈঃশব্দ্য নেমে এল ধূ-ধূ প্রান্তরে—যেখানে এখন ভাঙ্গা কাঠ পাথর আর কুণ্ডলি পাকানো কালো ধোঁয়া ছাড়া কিছুই নেই। শোনার কিছু নেই. দেখার কিছু নেই। দুঃস্বপ্নের মতই মিলিয়ে গেছে দুঃস্বপ্নের নগরী—ব্ল্যাকল্যাণ্ড!

মহাপ্রলয় শেষ হল। আতংকে পাথরের মত দাঁড়িয়ে রইলেন অভিযাত্রীরা। প্রত্যক্ষ করলেন স্রষ্টার সংহার-লীলা!

১৫ ॥ উপসংহার

খতম, সব খতম! খতম হ্যারি কীলার, তার সাম্রাজ্য এবং সাম্রাজ্য স্রষ্টা স্বয়ং। আশ্চর্য মানুষটা তাঁর বিস্ময়কর প্রতিভার বৃহত্তম স্বাক্ষরকে নিজেই মুছে দিয়ে গেলেন নিপুণভাবে। সৃষ্টি করেছিলেন তিলে তিলে—সংহার করলেন প্রায় নিমেষ মধ্যে। বালি এসে তিল তিল করে গ্রাস করল আপন সাম্রাজ্য। সমাহিত হল বিশ্বের বিস্ময় দুঃস্বপ্নের নগরী ব্ল্যাকল্যাণ্ড। গাছপালা শুকিয়ে গেল। বৃষ্টির ধারা স্তব্ধ হল, রেড রিভার জলশূন্য হল—আবার সাহারার হাহাকার শোনা গেল দিকে দিকে—কোথাও আর কোনো চিহ্ন রইল না।

ক্যাপ্টেন মারসিনে ঝটপট এই মহাশ্মশান ছেড়ে সটকান দেওয়ার অনেক চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু হতাহতের ব্যবস্থা করতেই গেল একটা মাস। অত মানুষকে গোর দিতে হল। আহতদের চিকিৎসা করতে হল। ভয়ার্ত-নিগ্রোদের জড়ো করতে হল। ধ্বংসস্তূপের মধ্যে থেকে আর ক্ষেতখামার থেকে খাবার সংগ্রহ করতে হল। তারপর রওনা হলেন লোকালয় অভিমুখে।

শ্রমিক কর্মচারীদের বিশজন পুরুষ, তিনজন নারী আর দুটি বাচ্চা বালির মধ্যেই চির নিদ্রায় রয়ে গেল—দেশে ফেরা আর হল না। ব্ল্যাকল্যাণ্ড-দুর্বৃত্ত মেরী ফেলোদের রোষানল হরণ করেছিল তাদেয় আয়ু। শ্বেতকায় দুর্বৃত্ত-দের বেশ কয়েকজনকে বুলেটের দৌলতে গ্রেপ্তার করলেন ক্যাপ্টেন। তাদের নিয়ে চললেন সভ্যদেশের বিচারালয়ে। নিগ্রোদের নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দিলেন নাইজারে—ফিরে গেল তারা যে যার গ্রামে। ১০ই জুন ধ্বংসস্তূপ ছেড়ে রওনা হয়ে বহু পথকষ্ট সয়ে ক্যাপ্টেন ছহপ্তা পরে পৌঁছোলেন টিমবাকটুতে। দু'মাস পরে ইউরোপে। তারপর—কি ঘটল, তা দু-চার কথায় শেষ করা যাক।

পুরস্কার জুটল সবার কপালেই। পঁসিঁ ফিরে পেলেন মন্ত্রীসভার প্রাণপ্রিয় স্ট্যাটিসটিক্‌স্। ক্ষণে ক্ষণে "বিস্ময়কর" আবিষ্কার করে নিজে নিজেই চমকে উঠলেন। পৃথিবীর বিভিন্ন জাতের গড়পরতা চুলের সংখ্যা তাঁর সাম্প্রতিকতম গবেষণা। প্রতি সেকেণ্ডে, প্রতি মিনিটে, প্রতি ঘণ্টায়, প্রতি-মাসে, প্রতি বছরে মানুষের নখ কি হারে বাড়ছে—আশ্চর্য এই তথ্যও তিনি স্রেফ অংক কষে বার করে ফেললেন।

ডক্টর চাতোয়ে তাঁর রুগী নিয়ে পড়লেন। কিন্তু এমনই তাঁর হাতযশ যে রুগীদের রোগ হতে দেখা গেল না—তবুও রোগ সারাতে আসতেন স্রেফ রুগী হওয়ার বিলাসিতা নিয়ে—এমন একটা রোগের যম ডাক্তারের সান্নিধ্যে থাকার লোভে।

বারজাকের অভিনব প্রস্তাব শেষ পর্যন্ত শিকেয় তুলে রাখা হল। নিগ্রোদের ভোট দেওয়ার অধিকার আপাততঃ স্থগিত রইল বটে, কিন্তু দর বেড়ে গেল বারজাকের। দারুণ গুজব, এবার তিনি মন্ত্রী হবেন।

মালিক আর টোনগানে বিয়েই করে ফেলল দুজনে দুজনকে। আফ্রিকা ছেড়ে মনিবানির সঙ্গ নিয়ে গেল ইংল্যাণ্ডে।

সেন্ট বেরেন ফিরে পেলেন মাছধরা আর শিকারের সরঞ্জাম। কিন্তু এমনই ভুলো মন যে গুঁফো লোক দেখলেই 'ম্যাডাম' বলে ডাকা আর 'ম্যাডাম'দের 'মিস্টার' বলে ডাকার অভ্যাস ছাড়তে পারলেন না কিছুতেই।

ক্যাপ্টেন মারসিনের ছুটির দরখাস্ত এবার মঞ্জুর হল একবাক্যে। সুন্দরী সঙ্গীকে নিয়ে গেলেন তাঁর বাড়ী। যাওয়ার পথে বললেন, কিভাবে ইথারের মধ্যে দিয়ে বার্তা পৌঁচেছিল তাঁর কাছে। কিভাবে তাঁর অভিযানের প্রস্তাবে সমর্থন না পেয়ে ভেঙে পড়েছিলেন তিনি। কিন্তু কপাল ভাল। পরের দিন সকালেই লোক এল কর্ণেল সেন্ট অবানের কাছ থেকে। লেফটেন্যান্ট ল্যাকোর বলে কাউকে চিনি চেনেন না—কোনো হুকুমনামাও পাঠাননি। সব বোগাস। কাজেই এখুনি যেন মারসিনে সৈন্যসামন্ত নিয়ে বারজাক মিশনের সাহায্যে রওনা হন।

ক্যাপ্টেন মারসিনে কামান বন্দুক সৈন্যসামন্ত নিয়ে বলতে গেলে দিনরাত মার্চ করেছিলেন সেই থেকে। সঙ্গে ছিল দূরপাল্লার দূরবীন। তাই দূর থেকেই কালো ধোঁয়া দেখে কামান দেগে ছিলেন।

জেন ব্লেজন দুর্দিনের বন্ধুদের নিয়ে হাজির হলেন চুরানব্বই বছরের বৃদ্ধ বাবার সামনে। এঁরা শুধু তাঁর বন্ধু নন—দুই দাদার নির্দোষিতার সাক্ষীও বটে। কলমবাজ অ্যামিদা ফ্লোরেন্স তার আগেই বিশ্বের মানুষকে জানিয়ে দিয়েছিলেন সমস্ত ব্যাপার—ব্যাংকলুঠ আর গ্রামলুঠের মূলে একজনই—লুঠেরা হ্যারি কীলার। কিন্তু বৃদ্ধ লর্ড ব্লেজন কাগজে কি সে খবর পড়েছেন?

বাবার খাটের পাশে হাঁটু গেড়ে বসে একে একে সব ঘটনা নিবেদন করলেন জেন ব্লেজন। লর্ড ব্লেজনের মন তখনো পরিষ্কার—শুধু কথা বন্ধ হয়ে গেছিল। একদৃষ্টে সাহসিনী মেয়ের মুখের দিকে চেয়ে প্রতিটি কথা

শুনলেন। শুনলেন তাঁরই সৎ ভাই মানুষ পিশাচ উইলিয়াম ফারনির কুকীর্তি। শুনলেন তাঁর প্রাণ প্রিয় দুই পুত্র—সম্পূর্ণ নিরপরাধ, জানলেন ব্লেজন বংশ কলংকমুক্ত হয়েছে—দেশশুদ্ধ লোক তা জেনে গিয়েছে।

সব শোনার পর তাঁর সারা দেহ কাঁপতে লাগল প্রচণ্ড আবেগে। সমস্ত শক্তি দিয়ে কি যেন করতে চাইছেন। বলতে চাইছেন। বড় বড় চোখে মেয়ে চেয়ে রইল বাপের দিকে।

আশ্চর্য! এত বছর পরে সেই প্রথম কথা বললেন লর্ড ব্লেজন। কথা ফুটল তাঁর অসাড় জিহ্বায়। বিড়বিড় করে শুধু একটা কথাই বললেন—ধন্যবাদ জানালেন মেয়েকে। কাঁপতে কাঁপতে স্পর্শ করলেন তাঁকে।

সেই শেষ। চোখ মুদলেন। গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। আর দ্বিতীয়-বার নিঃশ্বেস ফেললেন না।:শান্তির আলোয় মহাপ্রস্থান করলেন লর্ড ব্লেজন। সঙ্গে নিয়ে গেলেন অনাবিল শান্তি।

লুই ব্লেজনের প্রোমোশন হয়ে গেল। সেন্ট্রাল ব্যাংকের পুরো দায়িত্ব নিতে হল তাঁকে।

কাহিনী কি শেষ হল? না।

একজনের কাহিনী এখনো বলা হয় নি। আমিদী ফ্লোরেন্সের। ভদ্র-লোক মানুষের মনস্তত্ব বোঝেন। সত্য ঘটনা সত্যির মত করে বললে পাঠক হাই তুলে ছুঁড়ে ফেলে দেবে, এই আশংকায় তা গল্পের মত করে লিখে ফেললেন। খবরের কাগজে প্রকাশিত রিপোর্টগুলো সাজিয়ে গুছিয়ে ঠিক যেন একটা নভেল লিখলেন এবং সেই নভেলই এইমাত্র আপনারা শেষ করলেন। উপন্যাস বলে কিন্তু অলীক মনে করবেন না যেন। এর সব কথাই সত্যি! □

মাইকেল ষ্ট্রগফ

রাশিয়ার রাজদূত

ভূমিকা

জুল ভের্ণ বিশ্ববিখ্যাত হয়েছেন ঔপন্যাসিক হিসেবে। কিন্তু তিনি নাট্যকারও ছিলেন। বেলুনে পাঁচ সপ্তাহ (ফাইভ উইক্স্ ইন এ বেলুন) লিখে এক লাফে খ্যাতির তুঙ্গে উঠে যাওয়ার বহু আগে তিনি বেশ কয়েকটা নাটক লিখেছিলেন। মৌলিকতা আর প্রতিভা ফুটে বেরিয়েছিল প্রতিটিতে। ওঁর বেশ কয়েকটা গল্প নিয়ে পরে নাটক করা হয়েছিল। আশী দিনে ভূ প্রদক্ষিণ (রাউণ্ড দ্য ওয়ার্ল্ড ইন এইটি ডেজ) য়ের মঞ্চসফল নাট্যরূপ তাঁকেএমনভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল যে পরবর্তীকালে বোধহয় থিয়েটারের দিকে নজর রেখেই গল্প উপন্যাস লিখে গেছেন।

মাইকেল স্ট্রগফ লিখে তিনি তাই বুঝি সাড়া ফেলেছিলেন প্যারি শহরে। মঞ্চ-সফল কাহিনী এই মাইকেল স্ট্রগফ। সব উপাদানই আছে বিচিত্র এই উপন্যাসে। ঘটনার ঘাত প্রতিঘাত বিস্ময়কর। নাটকীয় মুহূর্ত বিরামবিহীনভাবে যেন উপস্থিত। ছেলের জন্য মায়ের কান্না, প্রিয়তমের জন্য সুন্দরীর আত্মনিবেদন, একটি নিষ্ঠুর ভয়াবহ দৃশ্য—যা পো-য়ের কাহিনীতেই দেখা যায়, ভিলেনের কুটিল চক্রান্ত, হিরোর দুরন্ত সাহস, প্রচুর হৃদয়াবেগ, মোহিনী জিপসী আর রোমান্স। সার্থক নাটকে যা-যা দরকার, সব আছে এই মাইকেল স্ট্রগফে।

কাহিনী অবলম্বনে দুবার সিনেমাও হয়ে গেছে। রেডিও এবং টেলিভিশনেও বার বার অভিনীত হওয়ার মত যোগ্য কাহিনী এই মাইকেল স্ট্রগফ।

আশ্চর্য এই কাহিনীর মূলে সত্য ঘটনা আছে কিনা বোঝবার পথ কিন্তু রাখেন নি জুল ভের্ণ। জারের অথবা তাঁর ভাইয়ের নাম তিনি কোথাও

লেখেননি। কোন তারিখে এবং কবে কি ঘটেছিল লিখেছেন ঠিকই, কিন্তু কোন সালে আশ্চর্য এই ঘটনার শুরু—তা আশ্চর্যভাবেই যেন লিখতে ভুলে গেছেন। এ থেকেই বোঝা যায় কাহিনীটা স্রেফ মনগড়া। রাশিয়া এমন একটা দেশ যেখানে সব কিছুই সম্ভব—এই ধারণা নিয়েই যেন এই মহা কাহিনী লিখে গেছেন।

ওয়েলসের মত ভের্ণের মধ্যেও ভবিষ্য দর্শনের ক্ষমতা ছিল। মাঝে মাঝে এ ক্ষমতাকে মনে হয় যেন অতিপ্রাকৃত। যেমন রাশিয়ার যুদ্ধে শীতের ঠাণ্ডার সঙ্গে পোড়ামাটির নীতি অনুসরণ করে হিটলারকে যে শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল তার সঙ্গে এই উপন্যাসে বর্ণিত ফিওফার-খানের নাস্তানাবুদ হওয়ার যথেষ্ট মিল আছে। কিন্তু মনে হয় না এর মূলে তাঁর প্রাক-বিজ্ঞান দর্শন কাজ করেছে। কেননা, ভের্ণের জন্ম ১৮২৮ সালে এবং দ্রুত ছন্দের এই রুশীয় রাজ-দূতের কাহিনীটি প্রকাশ পায় ১৮৭৬ সালে। নেপোলিয়ন মস্কো থেকে পশ্চাদ-সরণ করেন ১৮১২ সালে। ইতিহাস পড়েই ভের্ণ বুঝেছিলেন রাশিয়া আক্রমণ চাট্টিখানি কথা নয়। ১৯৪৪ সালে হিটলার তা হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছিলেন।

মূল গ্রন্থে ভূগোলের কথা বড্ড বেশী থাকায় তা বাদ দিতে হল। আধুনিক পাঠক পাঠিকার কাছে সেকালের রাশিয়ার ভূগোল বর্ণনা মোটেই ভাল লাগবে না। ফলে কাহিনীর উত্তেজনা আরো বৃদ্ধি পেয়েছে।

১ ॥ নিউপ্যালেসে আনন্দোৎসব

রাত বারোটার পরের ঘটনা। রাজপ্রাসাদে নাচের আসর জমে উঠেছে পুরোমাত্রায়। ঘুরে ঘুরে নাচ চলেছে জোড়ায় জোড়ায়। উৎসবের আনন্দে সুসজ্জিত গ্র্যাণ্ড স্যালোন কক্ষ যেন ফেটে পড়তে চাইছে। পুরুষ এবং নারী প্রত্যেকেই হৃদয়ভরা ফূর্তি নিয়ে মশগুল বিরামবিহীন নাচের ছন্দে। কারো খেয়াল নেই ঠিক সেই মুহূর্তে কি ঘটনা ঘটতে চলেছে রাশিয়ার আর এক প্রান্তে।

দু'জন ছাড়া। একজন ইংরেজ সংবাদদাতা--হ্যারি ব্লাউন্ট। অপরজন ফরাসী রিপোর্টার—অ্যালসাইড জোলিভেট। দুজনেরই পেশা খবর খুঁজে বার করা এবং সেই কারণেই রেষারেষি লেগেই আছে দুজনের মধ্যে। পেশায় সাংবাদিক বলেই বোধহয় বিপদের খাঁড়া যে মাথার ওপর ঝুলছে—তা এঁরা টের পেয়েছেন। উৎসব চলছে চলুক—কিন্তু কোথায় যেন একটা তার ছিঁড়ে

গেছে, সুর কেটে যাচ্ছে—বিপদ আসছে, পা টিপে টিপে অতি সন্তর্পণে বিপদ আসছে।

দুই সাংবাদিকই মাথায় তালঢ্যাঙা—গায়ে এককণা বাড়তি মেদ নেই—হিলহিলে পাতলা চেহারা। তফাতের মধ্যে ইংরেজ ভদ্রলোক কামরাঙার মত লাল টকটকে। আর ফরাসী ভদ্রলোক একটু হলদেটে। ইংরেজ সাংবাদিক ঠাটবাট বজায় রেখে চলেন, কম কথা বলেন, গম্ভীর এবং নিরুত্তাপ। ফরাসী ভদ্রলোক ঠিক তার উল্টো। শুধু মুখ নয়—চোখ, হাত, ঠোঁট সব কিছুর মধ্যে দিয়েই কথা বলে চলেন যখন তখন—একের নম্বরের হাউড়ে। দুজনের দুরকমের গুণ। ফরাসী ভদ্রলোকের সবাঙ্গে যেন চোখ লাগানো। ভদ্রলোক একবার যা দেখেন—জীবনে আর তা ভোলেন না। ইংরেজ ভদ্রলোক ঠিক উল্টো। তিনি কান দিয়ে একবার যা শোনেন—জীবনে তা ভোলেন না। দুজনের দুরকম গুণ, দুরকম স্বভাব—অথচ কাজের বেলায় নিষ্ঠার কোনো তফাৎ নেই। ভয় পাওয়া কুষ্ঠিতে লেখেনি। দমে যাওয়া কাকে বলে দুজনের কেউই জানেন না। ইংরেজ ভদ্রলোক 'ডেলি টেলিগ্রাফে' চাকরী করেন। ফরাসী ভদ্রলোক যে কোন্ খবরের কাগজের মাইনে করা সাংবাদিক—তা তিনি ছাড়া কেউ জানে না। দুজনেই ভাল টাকা পান কর্তাদের কাছ থেকে এবং ফালতু খবরে কোনো আগ্রহ দেখান না। রাজনৈতিক অথবা সামরিক ব্যাপারের চাঞ্চল্যকর সংবাদ ছাড়া আর কোনো খবরে মন ওঠে না দুজনেরই।

সবচেয়ে মজা, নিউ প্যালেসের এই মহোৎসবে এইমাত্র আলাপ হয়েছে দুজনের। একজন চোখ দিয়ে আর একজন কান দিয়ে টের পেয়েছেন বিপদ ঘনিয়ে আসছে রাশিয়ার।

মধ্যরাতের ঘন্টা দুয়েক পরে জেনারেল কিসোফ এসে দাঁড়িয়েছিলেন উৎসবের হোতা সৈনিক অফিসারের পোশাক পরা এক দীর্ঘকায় সম্রান্ত ব্যক্তির সামনে।

সসম্মানে বলেছিলেন—"মহারাজ, নতুন চিঠি এসেছে।"

"কোত্থেকে?"

"টম্‌স্‌ক্ থেকে।"

"টম্‌স্‌কের ওদিকে কি তার কাটা?"

"আজ্ঞে হাঁা। গতকাল থেকে।"

"ঘন্টায় ঘন্টায় টেলিগ্রাম পাঠান টম্‌স্‌কে—খবর দিয়ে যান আমাকে।"

দীর্ঘকায় সম্ভ্রান্ত পুরুষের চোখেমুখে মনের উদ্বেগ প্রকাশ পেল না। নির্বিকার মুখে জেনারেল কিসোফকে নিয়ে গেলেন একপাশে—অভ্যাগতদের কারো সঙ্গে কথা বললেন না। খটকা লাগল কয়েকজন ঝুঁদে রাজনীতিবিদের—কিন্তু জিজ্ঞেস করার সাহস হল না।

এককোণে জেনারেলকে টেনে নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন সম্ভ্রান্ত পুরুষ—"আমরা তাহলে কাল থেকেই গ্র্যাণ্ডডিউকের খবর পাচ্ছি না?"

"আজ্ঞে না। শীগগিরই হয়ত সাইবেরিয়ার সীমান্ত পেরিয়ে খবর আসাও বন্ধ হয়ে যাবে।"

"ইরকুটস্ক-য়ের দিকে সৈন্য পাঠানোর হুকুম দেওয়া হয়েছে তো?"

"হয়েছে। বৈকাল লেকের ওদিকে সেই আমাদের শেষ টেলিগ্রাম।"

"অন্যান্য গভর্ণমেন্টের সঙ্গে যোগাযোগ রয়েছে?"

"রয়েছে। তাতার বাহিনী ইরতিশ আর ওবি খাই পেরোয়নি এখনো।"

"বিশ্বাসঘাতক আইভান ওগারেফের খবর পেয়েছেন?"

"না। সীমান্ত পেরিয়েছে কিনা এখনো জানা যায়নি।"

"আইভান ওগারেফের চেহারার বর্ণনা পাঠিয়ে দিন। এখনো যে কটা ঘাটিতে টেলিগ্রাম যাচ্ছে—সবজায়গায় পাঠান। মুখে চাবি দিয়ে থাকুন—কেউ যেন কিছু টের না পায়।"

বাতাসে মাথা ঠুকে অভিবাদন জানিয়ে বেরিয়ে গেলেন জেনারেল। সব লক্ষ্য করলেন দুই সাংবাদিক।

মাথা নিচু করে কিছুক্ষণ চিন্তামগ্ন রইলেন সম্ভ্রান্ত পুরুষ। তারপর ধীর চরণে মিশে গেলেন অভ্যাগতদের মাঝে। মুখ নিস্তরঙ্গ। প্রশান্ত।

সাংবাদিক দুজন কিন্তু আঁচ করলেন কিছু একটা ঘটতে চলেছে। নিরীহ মুখে এগিয়ে এলেন কাছাকাছি—উদ্দেশ্য পরস্পরকে বাজিয়ে দেখা।

"উৎসব সত্যিই জমেছে!" বললেন অ্যালসাইড। চোখে মুখে খুশী উপচে পড়ল।

প্রশান্ত স্বরে হ্যারি বললেন—"আমি তো টেলিগ্রাম পাঠালাম। অপূর্ব উৎসব।"

"ম্যাডেলিনকে আমিও লিখে দিলাম—"

"ম্যাডেলিন! সে কে?"

"আমার দূর সম্পর্কের বোন। চিঠিপত্র তাকেই লিখি। টাটকা খবর নইলে আবার তার চলে না। লিখে দিলাম, উৎসব জমজমাট। কিন্তু

মাথার ওপর মেঘ জমেছে।"

"দ্যুতিময় মেঘ বলুন।"

"মিস্টার ব্লাউন্ট, ১৮১২ সালে জাকারেটে কি ঘটেছিল মনে আছে?"

"বিলক্ষণ মনে আছে।"

"সেদিনও উৎসবের মাঝখানে সম্রাট আলেকজাণ্ডারের কাছে খবর এসেছিল ফরাসী সৈন্যবাহিনী নিয়ে নিয়েমেন অতিক্রম করেছেন দুর্ধর্ষ নেপোলিয়ন। শুনে একটুও ছটফট করেননি সম্রাট—উৎসব ছেড়ে এক পাও নড়েননি—অথচ সাম্রাজ্য হাত ছাড়া হবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।"

"জেনারেল কিসোফ অবশ্য বলে গেলেন এইমাত্র, ইরকুটস্ক আর সীমান্তের মাঝে টেলিগ্রাফের তার নেই।"

"নিকোলেভস্ক-য়ে সৈন্য জমায়েতের হুকুম গেছে—জানেন তাহলে?"

"অবশ্যই জানি। সেই সঙ্গে টেলিগ্রামও গেছে টোবোলস্কয়ের কশাকদের কাছে—সৈন্য জড়ো করা হোক অবিলম্বে।"

"কাজটা তাহলে ভালই পাওয়া গেল বলুন।"

"তা আর বলতে! এই কাজের পেছনেই ছুটব এখন থেকে।"

দুই সাংবাদিক সরে গেলেন দু'দিকে। দুজনেই জেনে গেলেন গোপন সংবাদের কে কতটা জেনেছেন।

ঠিক সেই সময়ে ফের ঘরে ঢুকলেন জেনারেল কিসোফ। অফিসারের পোশাক পরা সম্ভ্রান্ত পুরুষের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন।

"কি খবর?"

"টোমস্ক পর্যন্ত যাচ্ছে টেলিগ্রাম তার—ওদিকে নয়।"

"তাহলে রাজদূত পাঠান—এখুনি।"

হলঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসে ছোট একটা ঘরে ঢুকলেন সম্ভ্রান্ত পুরুষ। যেন বাতাসের অভাবে দম আটকে আসছে, এমনিভাবে দ্রুত হাতে একটা জানলা খুলে দিয়ে বেরিয়ে এলেন বারান্দায়।

চাঁদের আলোয় ভেসে যাচ্ছে সামনের দৃশ্য। উঁচু পাঁচিল দিয়ে সুরক্ষিত অঞ্চলের দুটো বড় গির্জে, তিনটে রাজপ্রাসাদ, আর একটা অস্ত্রাগার ঝকমক করছে চন্দ্রালোকে, ছোট্ট একটা নদীর জলে ঠিকরে যাচ্ছে চন্দ্রকিরণ।

নদীর নাম মাসকোয়া। শহরের নাম মস্কো। পাঁচিল দিয়ে সুরক্ষিত অঞ্চলটার নাম ক্রেমলিন। আর অফিসারের পোশাক পরা সম্ভ্রান্ত পুরুষ রাশিয়ার সম্রাট—স্বয়ং জার।

২ ॥ রাশিয়ান বনাম তাতার

বলরুম ছেড়ে অকারণে তড়িঘড়ি বেরিয়ে আসেননি জার। দারুণ ঘটনা ঘটছে উরালের অন্যদিকে। বিদ্রোহ। রাশিয়ার রাজার হাত থেকে সাই-বেরিয়ার জেলাগুলো ছিনিয়ে নেওয়ার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছে ভয়ংকর বিদ্রোহীরা।

সাইবেরিয়ার আরেক নাম এশিয়াটিক রাশিয়া। ক্ষেত্রফল সতেরো লক্ষ নব্বই হাজার দু'শ আট বর্গমাইল। বাসিন্দার সংখ্যা প্রায় বিশ লক্ষ। উরাল পর্বতমালা থেকে প্রশান্তের উপকূল পর্যন্ত বিস্তৃত বিরাট এই ভূখণ্ডে রাজ-নৈতিক বন্দী আর চোর ডাকাত খুনে গুণ্ডাদের নির্বাসন দেওয়া হয় শায়েস্তা করার জন্যে।

দু'জন গভর্ণর জেনারেল জারের প্রতিনিধি স্বরূপ শাসন করেন সাইবে-রিয়াকে। একজন থাকেন পশ্চিম সাইবেরিয়ার রাজধানী ইরকুটস্কে।

এতবড় দেশে কিন্তু রেলগাড়ীর বালাই নেই। গরমকালে তেলগা বা কিবিক, আর শীতকালে স্লেজ ছাড়া গাড়ী নেই।

খবর দেওয়া নেওয়ার জন্যে আছে একটা ইলেকট্রিক টেলিগ্রাফ। লম্বায় পাঁচ হাজার মাইলেরও বেশী। পশ্চিম সাইবেরিয়া আর পূর্ব সাইবেরিয়ার মধ্যে একমাত্র যোগসূত্র। এক একটা শব্দ পাঠাতে খরচ হয় এক পাউণ্ড। ইরকুটস্ক থেকে মঙ্গোলিয়ার সীমান্তে কিয়াটকা পর্যন্ত গেছে একটা শাখা লাইন। সেখান থেকে পিকিং পর্যন্ত চিঠিপত্র যায় লোক মারফৎ—খরচ পড়ে শব্দ পিছু আট পেনি। সময় লাগে পনেরো দিন।

ইলেকট্রিক টেলিগ্রাফের এই তার কেটে দেওয়া হয়েছে দু'জায়গায়। শুনেই জার হুকুম দিয়েছেন রাজদূত পাঠান এখুনি।

সেকেণ্ড কয়েক পরেই ফের খুলে গেল দরজা। পুলিশ চীফ এসেছেন।

"আসুন, জেনারেল! বলুন আইভান ওগারেফ সম্পর্কে কি কি জানেন।"

"অত্যন্ত বিপজ্জনক লোক।"

"আগে কর্ণেল ছিল আইভান? ইনটেলিজেন্ট অফিসার হিসেব সুনাম ছিল?"

"ছিল। সেই সঙ্গে ছিল উচ্চাশা। তাই জড়িয়ে পড়ে বেশ কিছু ষড়-যন্ত্রের মধ্যে। গ্র্যাণ্ড ডিউক তাকে বরখাস্ত করেন। সাইবেরিয়ায় নির্বা-

সন দেন।”

“কদ্দিন আগে?”

“দু’বছর আগে। নির্বাসন দণ্ডের ছ’মাস পরে আপনি তাকে ক্ষমা করেন। রাশিয়া ফিরে আসে আইভান।”

“তারপর আর সাইবেরিয়া যায় নি?”

“নিজের ইচ্ছেতে গেছে।” একটু থেমে বললেন পুলিশ প্রধান—“এক-কালে কিন্তু সাইবেরিয়ায় গেলে আর ফেরা যেত না।”

“আমি যদ্দিন বাঁচব, সাইবেরিয়া থেকেও ফেরা যাবে।”

কথাগুলো বেশ গর্বের সঙ্গে বললেন জার। তিনি যে দয়ালু বিচারক, ক্ষমা করতেও জানেন—প্রাণ পর্যন্ত ফিরিয়ে দেন—এ নজীর অনেক আছে। অহংকার সেই কারণেই।

কিন্তু পুলিশ-প্রধানের ইচ্ছে নয় সাইবেরিয়া থেকে নির্বাসিতরা ফিরে আসুক। জারের এই উদার নীতির সঙ্গে তিনি একমত নন। তাই কোনো জবাব দিলেন না।

জার জিজ্ঞেস করলেন—“রাশিয়ায় আর ফেরেনি আইভান? নাকি পুলিশ তার নাগাল ধরতে পারছেন না?”

“অপরাধ মাপ করে দেওয়ার পরেই অপরাধী আরো বিপজ্জনক হয়ে ওঠে বলেই পুলিশ তার খবর রাখে।”

ভুরু কুঁচকোলেন জার। কিন্তু তাঁর উদার নীতিকে খোঁচা মারার জবাব দেওয়ার প্রবৃত্তি হল না।

বললেন—“শেষ কোথায় আইভানকে দেখা গেছে?”

“পার্মে।”

“কি করছিল সেখানে?”

“বেকার বসেছিল। চলাফেরার মধ্যেও সন্দেহজনক কিছু দেখা যায়নি।”

“তার মানে পুলিশের নজরবন্দী ছিল না?”

“আজ্ঞে না।”

“পার্ম ছেড়েছে কবে?”

“মার্চ মাসে।”

“তারপর থেকে আইভানের আর কোনো খবর নেই?”

“আজ্ঞে না।”

“কিন্তু আমার কাছে আছে উড়ো খবর। কিন্তু অসত্য বলে মনে

হয় না।"

চমকে উঠলেন পুলিশ-প্রধান—"আপনি কি বলতে চান, তাতারদের এই বিদ্রোহে আইভানের হাতে আছে?"

"আছে। পার্ম থেকে বেরিয়ে আইভান সাইবেরিয়ায় ঢোকে—কিরঘিজ স্তেপে যায়—যেখানে শুধুই ফাঁকা মাঠ—গাছপালা একদম নেই। যাযাবরদের খেপিয়ে দেয়। তারপর যায় দক্ষিণে—তুর্কিস্তানকে মুক্ত করতে। সাইবেরিয়ায় তাতার বাহিনী ঢুকিয়ে দেওয়ার ষড়যন্ত্র করে তাতার-সর্দারদের সঙ্গে। বিদ্রোহ করেই সে ক্ষান্ত হয় নি—ওর লক্ষ্য প্রতিহিংসা নেওয়া—আমার ভাইকে প্রাণে মারা।"

মনে মনেই বললেন পুলিশ-প্রধান—"আইভানকে ক্ষমা করে উদারতা না দেখাতে গেলে এত কাণ্ডই ঘটত না।"

মুখে বললেন—"বিদ্রোহ দমনের ব্যবস্থা নিশ্চয় করেছেন হিজ ম্যাজেস্টি?"

"করেছি। টেলিগ্রামে হুকুম পাঠিয়েছি দু'দিক থেকে সৈন্য পাঠাতে; কিন্তু কয়েক হপ্তা যাবে তাতারদের উপর চড়াও হতে।"

"ইরকুটস্কে আপনার ভাই গ্র্যাণ্ড ডিউক তাহলে মস্কোর সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে আর পারছেন না?"

"না। তার কেটে দেওয়া হয়েছে।"

"তার কেটে দেওয়ার আগে নিশ্চয় উনি খবর পেয়েছেন যে আপনি সৈন্য পাঠাচ্ছেন?"

"পেয়েছেন। কিন্তু একটা খবর গ্র্যাণ্ড ডিউক জানেন না। আইভান ওগারেফ যে এখন বিদ্রোহী এবং গ্র্যাণ্ড ডিউকের পরম শত্রু, এ খবরটা উনি নিজেই জানেন না। আইভান প্ল্যান করেছে ছদ্মনামে ইরকুটস্ক গিয়ে গ্র্যাণ্ড ডিউকের কাজ নেবে। একটু একটু করে তাঁর আস্থাভাজন হবে। তাতাররা যখন শহর আক্রমণ করবে, আইভান ঠিক সেই মুহূর্তে বিশ্বাসঘাতকতা করবে—শহরের পতন ঘটাবে। গুপ্তচররা এ খবর এনে দিয়েছে আমাকে। গ্র্যাণ্ড ডিউক এখনো জানেন না—কিন্তু তাঁকে জানাতেই হবে।"

"চালাক চতুর রাজদূত পাঠালে—"

"কাজ হবে। ডেকে পাঠিয়েছি একজনকে। তার পথ চেয়েই রয়েছি।"

"শুধু চালাকচতুর হলেই হবে না। অভিযান করার মত শক্ত সমর্থ হওয়া চাই। সাইবেরিয়া বিদ্রোহীদের মনের মত জায়গা তো।"

কণ্ঠস্বর তীক্ষ্ণ হল জারের—"জেনারেল, আপনি কি তাহলে বলতে চান নির্বাসিত অপরাধীরাও হাত মিলিয়েছে বিদ্রোহীদের সঙ্গে?"

"হিজ ম্যাজেস্টি আমাকে ক্ষমা করবেন। তাতারদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে মস্কোর বিরুদ্ধে যাওয়ার মত দেশদ্রোহী কেউ হবেন বলে মনে হয় না।" আমতা আমতা করে বললেন পুলিশ-প্রধান।

একদিক দিয়ে জার ঠিক কথাই বলেছেন। নানান কারণে পুলিশ অনেককেই সাইবেরিয়ায় রেখে দেয় বটে—কিন্তু তাই বলে যে তারা দেশকে ভালবাসে না—তা তো নয়। তবে পরিস্থিতি এখন ঘোরালো। কিরঘিজ বাসিন্দাদের অনেকেই এই ডামাডোলের সুযোগ নিতে পারে।

প্রায় বিশলাখ মানুষ আছে কিরঘিজের চার লাখ তাঁবুতে। এদের বিদ্রোহ মানেই গোটা এশিয়াটিকে রাশিয়ার বিদ্রোহ—স্বতন্ত্র হয়ে যাবে পূব সাইবেরিয়া।

কিরঘিজের সবাই অবশ্য যুদ্ধে চোস্ত নয়—চুরিচামারিতে পোক্ত—লুঠপাটে সিদ্ধহস্ত। কিন্তু জলাভূতিতে ছাওয়া তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে ওদের কাছে যেতেও কয়েক সপ্তাহ লেগে যাবে সৈন্যবাহিনীর।

পশ্চিম সাইবেরিয়ার সৈন্যব্যূহও নিশ্চয় বিপদগ্রস্ত। কিরঘিজের দুশমন-দের শায়েস্তা করার জন্যেই এই সৈন্য মোতায়েন করা হয়েছিল। কিন্তু অনেকদিন ধরেই কিরঘিজের 'সুলতান'রা তাতারদের ভয়ে কাঠ হয়ে থেকেছে। কে জানে এখন তাদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে বসেছে কিনা। তুর্কি-স্তানের তাতারদের চিরকালের লক্ষ্য কিরঘিজকে মুঠোয় আনা। তুর্কিস্তানকে তারা দখল করেছে গায়ের জোরে। এখন ভয় দেখাচ্ছে রুশীয় সাম্রাজ্যকেও

তুর্কিস্তানে রাজত্ব করে বেশ কিছু খান্ সুলতান। এদের মধ্যে সবচেয়ে পরাক্রমশালী হল বোখারোর খান্। অতীতে বোখারোর সঙ্গে বহুবার যুদ্ধ হয়েছে রুশীয় সৈন্যবাহিনীর। বর্তমানে বোখারোর সুলতান ফিওফার-খান তে রাশিয়ার পয়লা নম্বর শত্রু।

বোখারোর রাজত্ব তিরিশ হাজার বর্গমাইল জুড়ে বিস্তৃত।—শান্তির সময়ে সৈন্যের সংখ্যা ষাটহাজার—যুদ্ধ লাগলে তার তিনগুণ। ঘোড়সওয়ার সৈন্যই আছে তিরিশ হাজার। দেশটা বেশ সমৃদ্ধ। উনিশটা শহর আছে। কোনো শহরেই চট করে ঢুকে পড়া সম্ভব নয়। গোটা বোখারোকে আগলাচ্ছে উঁচু উঁচু পাহাড় আর ফাঁকা মাঠ। ভয়াবহ এই সীমানা পেরিয়ে বোখারো জয় করতে যাওয়া চাট্টিখানি কথা নয়।

ফিওফাব-খান নিজে রীতিমত ভয়ংকর। নিষ্ঠুর, নির্মম। তার সঙ্গে হাত মিলিয়েছে অন্যান্য খান্ সুলতানরা। এদের সবার লক্ষ্য হামলা সৃষ্টি করা রুশীয় সাম্রাজ্যে—তাতারদের রক্তে যে বাসনা মিশে রয়েছে। এই রক্তেই আগুন ধরিয়েছে আইভান। সাইবেরিয়ার সঙ্গে যোগসূত্র ছিন্ন করেছে। রাশিয়াব রাজত্ব তছনছ করার উন্মাদ চক্রান্তে লিপ্ত হয়েছে।

লুঠপাট খুনজখম করতে করতে এগোচ্ছে বোখাবোব আমীর ফিওফার-খান। কিরঘিজে বইছে রক্তগঙ্গা। সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছে হারেম, বাঁদী আব অন্যান্য সুখ-সামগ্রী। আধুনিক চেঙ্গিস খান বললেও চলে। যোগসূত্র ছিন্ন হওয়ায় ইরকুটস্কে খবর পাঠানোও যাচ্ছে না—গ্র্যাণ্ড ডিউক জানেন না কি বিপদ এগিয়ে আসছে তাঁর দিকে।

এ অবস্থায় সাড়ে তিন হাজার মাইল পেরিয়ে খবর নিয়ে যেতে হবে এমন একজনকে যার বুকে বল আর মাথায় বুদ্ধি আছে। আছে কি সেরকম লোক? মনে মনে ভাবলেন জার।

৩ ॥ মাইকেল স্ট্রগফ

আবার দু'হাট হল দরজা। জেনারেল কিসোফ এসেছেন।

সাগ্রহে জিজ্ঞেস করলেন জার—"এসেছে রাজদূত?"

"আজ্ঞে, হ্যাঁ।"

"লোক কিরকম?"

"ব্যক্তিগত ভাবে এর সব খবরই আমি রাখি। অনেক কঠিন কাজও করে এসেছে সুষ্ঠুভাবে।"

"বিদেশে?"

"সাইবেরিয়াতেই।"

"বাড়ী কোথায়?'

"ওমস্ক। সাইবেরিয়ার মানুষ।"

"বুদ্ধি আর সাহস আছে তো? মাথা ঠাণ্ডা তো?"

"সব আছে। এ ধরনের কাজে যে সব গুণ থাকা দরকার। সব ওর আছে। তাই অন্য লোক যে কাজ পারে না—ও তা পারে।"

"বয়স কত?"

"তিরিশ।"

"শরীর? মজবুত তো?"

"ঠাণ্ডা, ক্ষিদে, তেষ্টা আর ক্লান্তি সইবার ক্ষমতা অপরিসীম।"

"লোহার মত মজবুত শরীর থাকা দরকার।"

"তা আছে।"

"হৃদয়?"

"সোনার।"

"নাম?"

"মাইকেল স্ট্রগফ।"

"এখুনি রওনা হতে পারবে?"

"হিজ ম্যাজেস্টির হুকুমের অপেক্ষায় এক পায়ে খাড়া।"

"ভেতরে ডাকুন।"

রাজকীয় পাঠাগারের ভেতরে এসে দাঁড়াল রাজদূর মাইকেল স্ট্রগফ।

লম্বা শক্ত সমর্থ চেহারা। প্রাণশক্তি যেন ঠিকরে বেরুচ্ছে। চওড়া কাঁধ, চওড়া বুক। ককেশীয়দের আকৃতি। গায়ের জোরের কাজের জন্যেই যেন পিটে তৈরী দেহখানা। চওড়া উঁচু কপালের ওপর ঝুলছে কোঁকড়া চুলের গোছা। নীল চোখে প্রাণখোলা টলটলে নির্মল চাহনি দৃঢ়। নিষ্কম্প। ভুরুজোড়া ঈষৎ গ্রন্থিল—বীরপুরুষের লক্ষণ। সুচারু নাক, প্রশস্ত নাসিকা গহ্বর। সুগঠিত মুখবিবর। ঠোঁট জোড়া একটু ঠেলে বার করা—দরাজ উদার মনের লক্ষণ।

পরনে আঁট সাঁট সামরিক পোশাক। বুকে ঝকমক করছে একটা ক্রশ আর খান কয়েক পদক। জারের বাছাই করা বিশেষ রাজদূত বাহিনীর মধ্যেও সে বিশেষ স্থান অধিকার করে রয়েছে। পদমর্যাদায় অফিসার। হুকুম তামিল করাই তার সব চাইতে বড গুণ।

সংক্ষেপে, দূরপথের এ-কাজ যদি কেউ পারে তো মাইকেল স্ট্রগফই পারবে।

সাইবেরিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলের ভাষা সে জানে। প্রতিটি বর্গ ইঞ্চি তার মুখস্থ। কারণ সাইবেরিয়াতেই তার জন্ম।

বাবার নাম পিটার স্ট্রগফ। মারা গেছেন দশ বছর আগে। ছেলে মাইকেলকে এমনভাবে মানুষ করেছিলেন যাতে সব রকম ধকল সইতে পারে। পেশায় ছিলেন শিকারী। সারা জীবনে ভালুক মেরেছেন উনচল্লিশটারও বেশী। মাত্র চোদ্দ বছর বয়েসে জীবনে সেই প্রথম ভালুক বধ করে মাইকেল

স্ট্রগফ। একা হাতে। তার চাইতেও বিস্ময়কর হল ছাল ছাড়িয়ে দানব ভালুকের বেজায় ভারী চামড়া টেনে নিয়ে আসে বাপের কাছে বহু মাইল বরফের ওপর দিয়ে। এই একটা ব্যাপারেই বোঝা গিয়েছিল ঐ টুকু বয়েসেই কি বিপুল শক্তির অধিকারী হয়েছে মাইকেল স্ট্রগফ।

এই ভাবেই কষ্ট সইতে শিখেছে সে। প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে ক্ষিদে, তেষ্টা, ক্লান্তি তাকে দমাতে পারেননি। ঠাণ্ডা-গরম কাহিল করতে পারেনি। ঈশ্বর প্রদত্ত অসাধারণ ক্ষমতা বলে অজানা অচেনা অঞ্চলেও পথ হারায়নি। অন্যে যেখানে দিশেহারা দিকভ্রান্ত, মাইকেল স্ট্রগফ আশ্চর্য ভাবে পথের নিশানা খুঁজে পেয়েছে সে সব জায়গাতেও।

মাইকেলের দুর্বলতা শুধু একজনের জন্যে। বুড়ি মাকে সে বড় ভালবাসে। মায়ের নাম মারফা। থাকে স্ট্রগফদের আদি নিবাস ওমস্কতে। মাইকেল এই বাড়ীতেই শৈশব কাটিয়েছে বাবা আর মায়ের সঙ্গে। বড় হয়ে বাড়ী ছেড়ে আসার সময়ে কথা দিয়েছিল সময় পেলেই দেখে যাবে মা-কে। সে কথা সে রাখে অবসর পেলেই।

কুড়ি বছর বয়েসে মাইকেলকে বাছাই করা হল জারের রাজদূত বাহিনীর জন্যে। ওরকম ঠাণ্ডা-মাথা দুর্জয় সাহসী আর ধাবালো-বুদ্ধি কঠোর পরিশ্রমী রাজদূত আর আর একজনও ছিল না বাহিনীতে। দু'দিনেই তাই কর্তাদের সুনজরে পড়েছে সে। এত বিচক্ষণতা কারো মধ্যেই যে দেখা যায় নি।

মর্মভেদী চাহনি দিয়ে মাইকেল স্ট্রগফের আপাদমস্তক দেখলেন জার। মাইকেল দাঁড়িয়ে একই ভাবে—একটুও নড়ল না—চোখের পাতাও ফেলল না! জারের চোখ মুখ দেখে মনে হল যেন সন্তুষ্ট হয়েছেন। লেখবার টেবিলে গিয়ে বসলেন। কয়েক লাইনের একটা চিঠি মুখে মুখে বলে গেলেন—লিখে নিল শ্রুতিলেখক।

নিজে একবার চিঠিটা পড়লেন জার। তারপর সই দিলেন তলায়। সেই সঙ্গে লিখে দিলেন রাশিয়ার সম্রাটদের সেই বিখ্যাত রাজাদেশ "Byt po Semou" মানে, 'তাই হোক।'

খামে ভরা হল চিঠি। সীলমোহর করা হল। ঠিকানা লেখা হল ওপরে।

বললেন জার—"মাইকেল স্ট্রগফ, এই চিঠি তুমি ইরকুটস্কে গ্র্যাণ্ড ডিউকের হাতে দেবে—আর কারো হাতে নয়। পথে বিদ্রোহীরা আছে—আর আছে বিশ্বাসঘাতক আইভান ওগারেফ। তারা চাইবে চিঠি তোমার কাছ থেকে

ছিনিয়ে নিতে।"

"আমি সাবধানে থাকব।"

"তুমি কি ওমস্ক হয়ে যাবে?"

"সেইটাই তো যাবার রাস্তা।"

"কিন্তু মায়ের সঙ্গে দেখা করতে যাবে না—লোকে চিনে ফেলতে পারে!'

মুহূর্তের দ্বিধায় পড়ে মাইকেল স্ট্রগফ।

"বেশ দেখা করব না মায়ের সঙ্গে।"

"কথা দাও কেউ যেন তোমাকে চিনতে না পারে—কোথায় যাচ্ছ যেন জানতে না পারে।"

"কথা দিচ্ছি।"

চিঠি বাড়িয়ে দিলেন জার—"মাইকেল স্ট্রগফ, খেয়াল রেখো, এই চিঠির ওপর নির্ভর করছে সাইবেরিয়ার নিরাপত্তা আর আমার ভাই গ্র্যাণ্ড ডিউকের জীবন।"

প্রশান্ত স্বরে মাইকেল বললেন—"হিজ হাইনেস গ্র্যাণ্ড ডিউকের হাতেই চিঠি দোব মহারাজ।"

জার খুশী হলেন তরুণ রাজদূতের সরল আর শান্ত প্রতিশ্রুতিতে;

বললেন—"যাও মাইকেল স্ট্রগফ, বেরিয়ে পড়ো। মনে রেখো এ কাজ ঈশ্বরের, রাশিয়ার, আমার ভাইয়ের এবং আমার নিজের।"

৪ ॥ মস্কো থেকে নিজনি-নোভগোরদ

মাইকেল স্ট্রগফ হাড়ে হাড়ে বুঝল, অনেক ঝক্কি ঝামেলার মধ্যে দিয়ে যেতে হবে তাকে রাশিয়ার পশ্চিম প্রান্ত থেকে পূর্ব প্রান্ত পর্যন্ত। রাজদূত হিসেবে গেলে কোনো অসুবিধে হত না—রাজার হালে যাওয়া যেত; কিন্তু তাকে যেতে হচ্ছে ইরকুটস্কের বণিকের ছদ্মবেশে—নিকোলাস কোরপানফ ছদ্মনামে। সঙ্গে থাকছে সামান্য 'পোদোরজ্জা'—যা কিনা সব সময়ে ব্যবহার করা চলবে না। রাশিয়ার বাইরে ইউরোপের মাটিতে যদি নেহাৎ প্রয়োজন হয় হয়—নিজের আসল পরিচয় গোপন রেখে এই বিশেষ পোদোরজ্জার সুবিধে সে গ্রহণ করতে পারে। দেশের মাটিতেও পোদোরজ্জা সে দেখাতে পারে—যদি দেখে রাজাদেশে কাউকে রাশিয়া ছেড়ে বেরোতে দেওয়া হচ্ছে না—তখন। পোদোরজ্জার বলে সে

এক বা একাধিক সঙ্গীও সঙ্গে নিতে পারে।

কিন্তু কারও সন্দেহের উদ্রেক করে জেনারেল কিশোফের দেওয়া এই পোদোরজ্ঞার ব্যবহার করা চলবে না। সাইবেরিয়ায় যানবাহনের অভাব হবে না। বণিকের ছদ্মবেশে আর পাঁচটা সাধারণ লোকের ভীড়ে মিশে গিয়ে রেলগাড়ীতে, ঘোড়ার গাড়ীতে, অথবা কলে চলা জাহাজে চেপে যেতে পারবে। পাঁচজনের মতই পথের কষ্ট মুখ বুজে সহ্য করতে হবে—কোনো বিশেষ সুবিধে পাবে না।

ষোলই জুলাই সকালবেলা রওনা হল মাইকেল স্ট্রগফ। পথ বড় কম নয়—বিশাল রাশিয়ার এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত। পাক্কা সাড়ে তিন হাজার মাইল। সে অনুপাতে অস্ত্রশস্ত্র বা মালপত্র সঙ্গে নিল না। অস্ত্র বলতে একটা রিভলবার আর একটা ইয়াতাঘান ছোরা—যা দিয়ে সাইবেরিয়ার শিকারীরা চক্ষের নিমেষে ভালুকের পেট ফাঁসিয়ে দেয় দামী চামড়ার দফারফা না করে। ছোরা আর রিভলবার লুকোনো রইল পকেট আর বেল্টের নিচে। বণিকের কাছে অস্ত্র রয়েছে দেখলে মনে সন্দেহ উঁকিঝুঁকি দিতে পারে।

পোশাক পরল সনাতনী কায়দায়। ঢিলে প্যান্ট, হাঁটুর কাছে টাইট গার্টার, মৌজিক বেল্ট, হাই বুট। পিঠে ন্যাপস্যাক ঝুলিয়ে এসে পৌঁছালো স্টেশনে প্রথম ট্রেন ধরবে বলে। দশঘন্টা থাকতে হবে ট্রেনে। পথের শেষ নিজনি-নোভগোরদে। সেখান থেকে স্থলপথে অথবা জলপথে যেতে হবে উরাল পর্বতমালায়।

গুটিসুটি মেরে বসে রইল কামরার এক কোণে। যেন ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানে না। কারো সাতে নেই পাঁচে নেই। ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিতে চায় দশ ঘন্টার যাত্রাপথ।

কিন্তু ঘুমকে ডাকলেই কি ছাই আসে? তাছাড়া, ঘুমোনোর ইচ্ছেও নেই মাইকেলের। কামরায় সে একা নয়। সুতরাং মটকা মেরে পড়ে থেকে শুনতে লাগল কে কি বলছে।

কিন্তু কথা যারা বলছে, তারাও গুপ্তচরের ভয়ে গলা ছেড়ে গল্প করতে পারছে না। কে জানে কোথায় কে কান খাড়া করে শুনছে। তাই তাতার আক্রমণের কাহিনী নিয়ে জমিয়ে আড্ডা মারতেও পারছে না।

কামরা বোঝাই বণিকের দল চলেছে নিজনি-নোভগোরদে নিজেদের ধান্দায়। ছত্রিশ জাতের বণিক। ইহুদী, তুর্কি, কসাক, রাশিয়ান, জর্জিয়ান এবং আরো অনেকে। এদের চিন্তা কেবল ব্যবসা নিয়ে। লড়াই নিয়ে

মাথা ব্যথা একদম নেই। কিন্তু সামরিক পোশাক পরা কাউকে দেখলেই বোবা মেরে যায় চক্ষের নিমেষে। ব্যবসাদারের জাত তো! এই মুহূর্তে ওরা নিশ্চিন্ত মনে কথা বলে চলেছে—কেন না মাইকেলকে সৈনিকপুরুষ বলে চেনে কার সাধ্য।

এক কোণে জড়ো হয়ে ধান্দাবাজ এই কারবারীরা আলোচনা করছে তাতারদের এই হামলাবাজির ফলে ব্যবসার কি-কি ক্ষতি হতে পারে—এই নিয়ে।

একজন বললে—"মিলিটারীরা সব ঘোড়া দখল করবে। সেন্ট্রাল এশিয়ার এক জেলা থেকে আরেক জেলায় খবর পাঠানো মুস্কিল হবে।"

পাশের লোকটা বললে—"কিরঘিজরাও নাকি হাত মিলিয়েছে তাতারদের সঙ্গে?"

"শুনছি তো সেই রকমই। কিন্তু কতটা সত্যি, তা কে জানে।"

"সীমান্তে সৈন্য জড়ো করা হয়েছে। বিদ্রোহী কিরঘিজদের মাঝপথে থামিয়ে দেওয়ার জন্যে ভলগা বরাবর ডন কসাকরা তাঁবু পেতেছে।"

"ইরতিশ দিয়ে কসাকরা নামলে ইরকুটস্ক কিন্তু আর নিরাপদ থাকবে না। পূব সাইবেরিয়াকে আলাদা করে ফেলবে তাতাররা।"

"ভাবনা তো সেই কারণেই। কারবার লাটে উঠবে দেখছি। ঘোড়ার পর দখল করবে নৌকো, গাড়ি—সব কিছু। যাতায়াত বন্ধ করে ছাড়বে।"

"নিজনি-নোভোগোরোদের অমন জমজমাট মেলা শেষ পর্যন্ত ভেঙে না যায়। তবে কি জানো, দেশের নিরাপত্তা আগে।"

খুব হুঁশিয়ার লোক বটে এই দু'জন। আড্ডার মধ্যেও সতর্ক। সরকারকে সমালোচনা করা তো দূরের কথা—গভর্ণমেন্টের সৎ উদ্দেশ্য সম্পর্কে তিলমাত্র সন্দেহ প্রকাশের ধার দিয়েও যাচ্ছে না।

কিন্তু কামরার সামনের দিকে চলেছে ঠিক এর উল্টো কাণ্ড। প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে যাচ্ছে এক যাত্রী—জবাব আসছে ধরি-মাছ-না-ছুঁই-পানি গোছের। সেই সব জবাবই ঝপাঝপ নোট বুকে লিখে নিচ্ছে লোকটা। খাতার পাতা বোঝাই হয়ে গেছে—তবুও লিখে যাচ্ছে।

সহযাত্রীরা জবাব এড়িয়ে যাচ্ছে তাকে গুপ্তচর সন্দেহ করেছে বলেই। সোজা প্রশ্নের সোজা জবাব কখনই দিচ্ছে না। তা সত্ত্বেও পরম উৎসাহে লিখছে প্রশ্নকর্তা। এত কথার মধ্যে থেকে নিশ্চয় মনের মত খবরটা ঠিক পাওয়া যাবে এবং দূর সম্পর্কের বোনকেও জানিয়ে দেওয়া যাবে। ভদ্র-

লোকের নাম অ্যালসাইড জোলিভেট—সাংবাদিক।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত হাল ছেড়ে দিতে হল এ-হেন ছিনে জোঁক সাংবাদিককেও। লিখলেন "বড হুঁশিয়ার যাত্রী। রাজনীতি নিয়ে কথা বলতে চায় না।"

ঠিক এই সময়ে অন্য কামরায় ছিনেজোঁকের মত সংবাদ শুষে নেওয়ার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন তার প্রতিদ্বন্দ্বী হ্যারি ব্লাউন্ট। মস্কো স্টেশনে কেউ কাউকে দেখেননি—কেউ জানে না অপর জন একই ট্রেনে উঠে বসে আছেন এবং চলেছেন যুদ্ধক্ষেত্র অভিমুখে।

তবে দুজনের সংবাদ সংগ্রহের কায়দা আলাদা। হাউড়ে অ্যালসাইড জোলিভেট রাশিরাশি প্রশ্ন বাণ করে সন্দেহের উদ্রেক করে ফেলায় সহযাত্রীরা মুখে চাব দিয়েছে। মুখচোরা হ্যারি ব্লাউন্ট মুখে চাবি দিয়ে বসে থেকে শুধু কানজোড়া খুলে রাখায় কেউ তাকে গুপ্তচর বলে ভাবতেও পারছে না। প্রাণ খুলে গুলতানি করছে নিজেদের মধ্যে। ব্লাউন্ট পরমানন্দে শুনছেন এবং ডেলী টেলিগ্রাফের পাঠক পাঠিকাদের জন্যে গরম গরম খবর জোগাড় করছেন। সেদিক দিয়ে জোলিভেটের দূরসম্পর্কের বোনের কপালে অশ্বডিম্ব লাভই সার হবে।

ব্লাউন্ট সব শুনে নোটবইয়ে লিখলেন, সহযাত্রীরা বিলক্ষণ উদ্বিগ্ন। ভল্‌গ আর ভিসতুলার মধ্যে লড়াই চলছে। জিভে আগল না রেখে তাই নিয়ে গুলতানি করছে।

পুলিশ এখনো আইভান ওগারেফের টিকি ধরতে পারেনি। জোর তল্লাশি চলছে। প্রত্যেকটা স্টেশনে ট্রেন থামলেই যাত্রীদের খুঁটিয়ে দেখে যাচ্ছে। সন্দেহ হলেই টেনে নিয়ে যাচ্ছে। ট্রেন ফের চলছে। পুলিশের বিশ্বাস বিশ্বাসঘাতক আইভান এখনো রাশিয়ার মাটি ছেড়ে চম্পট দিতে পারেনি—তাতার বাহিনীতে যোগ দিতে পারে নি।

মাইকেল স্ট্রগফের কাগজপত্তরের জোরে তাকে নিয়ে পুলিশ টানাটানি করছে না।

ভ্‌লাডিমির স্টেশনে আরও অনেক উঠল কামরায়। একটি মেয়েও উঠল। বসল মাইকেলের পাশে। না তাকিয়ে পারল না মাইকেল। কেননা মেয়েটি সুন্দরী এবং সৌন্দর্যের মধ্যে যেন একটা দুঃখ রয়েছে। বয়স বড জোর ষোল কি সতেরো। খুলির গড়ন স্ল্যাভোনিক টাইপের—নিখুঁত। আর দুদিন বাদেই দেখবার মত হয়ে দাঁড়াবে। এক মাথা সোনালী চুল রুমাল দিয়ে বাঁধা। বাদামী চোখে নরম দৃষ্টি। সরল নাক—নিটোল নাসিকা-

গহ্বর। ঠোঁট অপূর্ব—কিন্তু যেন হাসতে ভুলে গেছে। গাল রক্তহীন এবং বেশ পাতলা। তন্বী এবং দীর্ঘকায়া। কপালের গড়ন দেখে মনে হয় নীতিবোধ অত্যন্ত প্রখর—মানসিক শক্তির অভাব নেই। অতীত খুব কষ্টে কেটেছে—জীবন সংগ্রামে কিন্তু ভেঙে পড়েনি—ভেতরের শক্তি নিয়ে এখনো যুঝে চলেছে। আত্মসংযম আছে, আছে দুর্জয় প্রতিজ্ঞার শক্তি। দৃঢ় চরিত্রের মেয়ে। ছাঁচ খুব শক্ত।

বিস্মিত হল মাইকেল। মেয়েটির বয়স কম, কিন্তু রূপ আছে। দুঃখ দুর্দশার তাপে শুকিয়ে গেলেও রূপবতী। এ বয়েসে তাকে একলা ছাড়া উচিত হয় নি। বাপ অথবা ভায়ের সঙ্গে থাকা উচিত ছিল। কিন্তু সঙ্গে একটি মাত্র তালাচাবি দেওয়া চামড়ার ব্যাগ নিয়ে সে যে কোথায় চলেছে তাও বোঝা যাচ্ছে না। সামান্ত পেরিয়ে কি? বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজনের কাছে? কেউ কি তার পথ চেয়ে আছে?

মেয়েটি কিন্তু নিজের মধ্যেই ডুবে রয়েছে—নিজেকে আগলে নিয়ে যাবার ক্ষমতা নিয়েই যেন রাস্তায় নেমেছে। পরনে সাদামাটা পোশাক। গলায় নীল টাই দিয়ে পরিপাটি করে বাঁধা গাঢ়রঙের পিলীস—সিল্কের জামা। পিলাসের তলায় খাটো স্কার্ট ঝুলছে গোড়ালি পর্যন্ত লম্বা আলখাল্লার ওপর। আলখাল্লার গলায় ছুঁচের বাহারি কাজ। চামড়ার হাফবুট ধুলোকাদায় মলিন বহু পথ মাড়িয়ে জীর্ণ।

এ পোশাক লিভোনিয়ার—নিশ্চয় বাল্টিক জেলা থেকে আসছে সুন্দরী তরুণী।

কিন্তু যাচ্ছে কোথায়? কার কাছে?

মেয়েটির মুখে কথা নেই। চোখে সেই সরল সোজা চাহনি। পাশের সহযাত্রী বণিক ঢুলতে ঢুলতে বিরাট মাথা রাখছে তাঁর কাঁধে। অসুবিধে হচ্ছে—তবুও মুখে বিরক্তি প্রকাশ করছে না মেয়েটি।

মাইকেল দেখল। খোঁচা মেরে বণিককে সজাগ করে দিলে। চটকা ভেঙে যাওয়ায় তেড়ে উঠেছিল লোকটা। পরের ব্যাপারে নাক গলাতে আসা নিয়ে বাঁকা কথাও বলেছিল। কিন্তু মাইকেলের কঠোর চাউনি দেখে আর কথা না বাড়িয়ে অন্য দিকে মাথা হেলিয়ে ঢুলতে লাগল মেয়েটিকে আর না ঘাঁটিয়ে।

নীরবে মাইকেলের পানে চাইল সুন্দরী। কৃতজ্ঞ চাউনি। কিন্তু কোনো কথা নয়।

চাপা মেয়ে, কষ্ট সহিষ্ণু কিন্তু তেজী। দৃঢ় চরিত্রের আর একটা দিক প্রকাশ পেল এর ঠিক পরেই—আকস্মিক একটা ঘটনায়।

আচমকা দুলে উঠল ট্রেন। ঝাঁকুনি খেয়ে গড়িয়ে গেল বাঁধের ওপর দিয়ে। বাঁকের মুখেই এই কাণ্ড ঘটায় হাউমাউ করে চেঁচিয়ে কামরার লোকজন হুড়োহুড়ি করে চলন্ত ট্রেন থেকেই দরজা খুলে লাফিয়ে পড়তে লাগল বাইরে। ট্রেন সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে গেল ঠিকই—কিন্তু আতংক কমল না।

প্রচণ্ড হট্টগোলের মধ্যেও বেঞ্চি ছেড়ে নড়ল না মেয়েটি। বসে রইল নিষ্কম্প দেহে। শুধু যা আরও একটু ফ্যাকাশে হয়ে গেল গালের রঙ।

ঠিক পাশে মাইকেল বসেছিল এতটুকু বিচলিত না হয়ে। উন্মাদ আতংকের মধ্যে অবিচল প্রতিমাকে দেখে বিস্মিত হল। বললে মনে মনে—বড় কড়া ধাত। টলে যাওয়ার মত চরিত্র নয়।

ট্রেন থামলে বোঝা গেল ঝাঁকুনির কারণটা। দুটো লাগেজ ভ্যানের মধ্যে আংটার জোড় ছিঁড়ে গিয়েছিল। আর একটু দেরী হলেই বাঁধের ওপর থেকে নিচের পাঁকজমিতে গিয়ে পড়ত গোটা ট্রেনটা।

ফলে দেরী হল এক ঘন্টা। সন্ধ্যে নাগাদ নিজনি নোভোগোরদেতে পৌঁছালো ট্রেন।

কামরা থেকে কেউ নামবার আগেই পুলিশ উঠে এল ভেতরে। পরীক্ষা করল প্রত্যেক প্যাসেঞ্জারকে।

নিকোলাস কোরপানফের নাম লেখা পোদোরজ্বা দেখিয়ে পার হয়ে গেল মাইকেল। অন্যান্য যাত্রীরাও পাশ করে গেল পরীক্ষায়। মেয়েটি কিন্তু পাশপোর্টের বদলে বের করল বিশেষ ধরনের ছাপ মারা একটা পারমিট।

রাশিয়ার পাশপোর্টের আর দরকার হয় না! কিন্তু পারমিটটা কিসের?

পুলিশ ইন্সপেক্টর পারমিট দেখে কিছুক্ষণ চুলচেরা চোখে চেয়ে রইল মেয়েটির দিকে।

তারপর বলল—'রিগা থেকে আসছেন?"

"হ্যাঁ।"

"কোন রাস্তায় যাবেন?"

"পার্ম হয়ে।"

"নিজনি নিভোগোরোদের পুলিশ ষ্টেশনে ভিসা করিয়ে নেবেন।"

ঘাড় হেলিয়ে সম্মতি জানালো মেয়েটি।

অবাক হল মাইকেল। মায়াও হল। বিদ্রোহী অধ্যুষিত সাইবেরিয়ায় চলেছে এইটুকু মেয়ে? একাকিনী? যেতে পারবে তো?

মেয়েটির কাছে যাওয়ার আগেই সে নেমে গেল স্টেশনে—চক্ষের নিমেষে মিলিয়ে গেল ভীড়ে।

৫ ॥ দুটি রাজাজ্ঞা

নিজনি নেভোগোরোদের পর থেকে শুরু হবে পথকষ্ট। প্রথম দিকে গতি হবে শ্লথ—তারপর শুরু হবে বিপদ—পদে পদে।

শহরের ঠিক মাঝখান দিয়ে গেছে ভলগা নদী। প্রথমে স্টীমারের খোঁজ করল মাইকেল। ষ্টীমারের নাম ককেসাস। যাবে পার্ম, ছাড়বে পরের দিন দুপুর নাগাদ। অপেক্ষা করতেই হবে। অন্য কোনো গাড়ীতে স্টীমারের চেয়ে আগে পৌঁছোনো যাবে না।

সিটি অফ কন্সতানতিনোপল নামে একটা হোটেলে রাতে থাকার এবং খাওয়ার ব্যবস্থা করে নিল মাইকেল। খাওয়া মন্দ হল না। টক পুর ঠাসা পুরু ক্রীমে সন্তরমান রাজহংসী, সেই সঙ্গে রবের রুটি, দই আর ডালচিনি মিশোনো গুঁড়ো চিনি। সবশেষে ক্ভাস—রাশিয়ার মামুলি বীয়ার।

খিদেকে ঠাণ্ডা করে বেরোলো শহর পরিক্রমায়। গোধূলি আলো তখনো রয়েছে। মেলা উপলক্ষ্যে লোকজনের ভীড়ে গোটা শহর বেশ গমগম করছে। তবে একটু একটু করে রাস্তাঘাটে ফাঁকা হতে শুরু হয়েছে।

পেট ঠেসে খেয়ে বিছানায় টানটান হল না কেন মাইকেল? কিসের চিন্তা নিয়ে টোঁ-টোঁ করতে বেরোলো রাস্তায়? রেলগাড়ীর সেই আশ্চর্য মেয়েটির চিন্তা নয় তো?

ঠিক তাই। ওর মাথায় তখন ঘুরঘুর করছে মেয়েটার কথাই। বুকের পাটা আছে বটে। এতটুকু মেয়ে—তাতার দুশমনদেরও ভয় পায় না? কিন্তু কেন? কেন এত ঝুঁকি নেওয়া? মাইকেল না হয় যাচ্ছে জারের কাজ নিয়ে—প্রাণের পরোয়া না রেখে। কিন্তু মেয়েটি যাচ্ছে কার কাজে?

মাথার মধ্যে চিন্তার তুফান নিয়ে ঘন্টাখানেক এলোমেলো ভাবে পায়চারী করল মাইকেল। তারপর বসল একটা বেঞ্চিতে। এমন সময়ে খপ করে পেছন থেকে কাঁধ খামচে ধরে হেঁড়ে গলায় কে যেন বললে—"এখানে কি করা হচ্ছে?"

লোকটা তালঢ্যাঙা। মুঠোয় বেশ জোর আছে। কণ্ঠস্বরও কর্কশ।

ছোট করে জবাব দিল মাইকেল—"বিশ্রাম।"

'এদিকে এসো দিকি—দেখি মুখখানা।"

"না দেখলেই কি নয়?" চকিতে উঠে পড়ে কয়েক পা পেছিয়ে গেল মাইকেল। সাবধানের মার নেই। লোকটাকেও জিপসী বলে মনে হচ্ছে। মেলা-টেলা হলেই এদের দেখা যায়। কাছেই দাঁড়িয়ে একটা মস্ত ক্যারাভান, মানে, বসবাসের উপযুক্ত ঢাকা বড় বাড়ী। দু'পয়সার লোভে সারা রাশিয়ায় টোঁ-টোঁ করে চক্কর দেয় যারা—সেই বেদেদের গাড়ী। এ ধরনের লোকেদের সঙ্গে মারপিট করাটা সমীচীন নয়।

মাইকেলের কাট ছাঁট জবাবে কয়েক পা এগিয়ে এল তালঢ্যাঙা বেদে। ঠিক সেই সময়ে ক্যারাভানের মধ্যে থেকে নারী কণ্ঠ শোনা গেল। ভাষাটা মঙ্গোল আর সাইবেরিয়ানদের ভাষার জগাখিচুড়ি।

"আবার স্পাই। মরুকগে। চলে এসো—খাবার তৈরী।"

একই ভাষায়, কিন্তু অন্য রকম উচ্চারণে তালঢ্যাঙা জিপসী বললে—"যা বলেছো সানগারি। কালকেই যখন রওনা হচ্ছি—স্পাই নিয়ে হাত ময়লা করতে চাই না। ফাদারের হুকুমে যাচ্ছি—যেতেই হবে।"

হাসি পেল মাইকেলের। জিপসীরা ভেবেছে, এ ভাষা ও জানে না। অন্য ভাষায় কথা বললে ভাল করত।

ঘন্টাখানেক পরে হোটেলে ফিরে এসে ঘুমিয়ে পড়ল মাইকেল। ঘুম ভাঙল পরের দিন ভোরে।

হোটেলের বিল মিটিয়ে দিয়ে বেরোলো রাস্তায়। আগে গেল জাহাজ ঘাটায়। ককেসাস' রওনা হতে এখনো পাঁচ ঘন্টা। এই পাঁচটা ঘন্টা কাটানোর জন্যে ফেরী নৌকো সাজিয়ে তৈরী সেতু পেরিয়ে গেল ভলগার অপর পাড়ে—একটা চত্বরের ধারে। গত রাতে এইখানেই জিপসীর সঙ্গে টক্কর লেগেছিল।

জায়গাটা শহরের বাইরে। নিজনি-নোভোগোরোদের বিখ্যাত মেলা বসেছে সেখানে। গভর্ণর-জেনারেলের সাময়িক প্রাসাদও নির্মিত হয়েছে মেলার ওপর কড়া নজর রাখার জন্যে। কশাক অশ্বারোহী সেতু পাহারা দিচ্ছে। সৈন্যরাও এদিকে ওদিকে নজর রেখেছে। চারদিক কি রকম যেন থমথম করছে। রাশিয়ার সৈন্যরা মেলার ভীড়ে আর পাঁচজনের সঙ্গে মিশে যায়। কিন্তু আজ তাদের ওপর বিশেষ হুকুম আছে। তাই ব্যারাক ছেড়ে

কেউ বেরোয়নি—যেন যে কোনো মুহূর্তে রওনা হওয়ার হুকুম আসতে পারে।

মেলা কিন্তু সরগরম। সারি সারি চালাঘর চওড়া রাস্তার দুধারে। প্রায় তিন লক্ষ লোক যাতে রাস্তা দিয়ে যেতে পারে—সে ব্যবস্থা করা হয়েছে গোড়া থেকেই। দুধারের চালাঘরে কোথাও বিক্রী হচ্ছে লোহার সরঞ্জাম, কোথাও পশুচর্মের দোকান, কোথাও পশমের হাট, কোথাও কাঠের জিনিস-পত্র, কোথাও তাঁতদ্রব্য, কোথাও মাছের কারবার। চা, নুন মাখানো মাংস পর্যন্ত আছে। আমেরিকান ঢংয়ে ফলাও করা বিজ্ঞাপনও দেওয়া হচ্ছে।

হাজার হাজার লোক গুঁতোগুঁতি করছে এই সব চালাঘরে। এশিয়ার আর ইউরোপের প্রায় সব রকম মানুষই এসেছে কেনাবেচার এই বিরাট হাটে-বাজারে। কুলি, ঘোড়া, উট, গাধা, নৌকো, ক্যারাভানের সে এক বিচিত্র সমাবেশ। দামী পাথর, কাশ্মীরি শাল, তুর্কি কার্পেট, ককেসাসের অস্ত্রশস্ত্র, তিফলিসের বর্ম, ইস্পাহানের মিহি বস্ত্র, ইউরোপের ব্রোঞ্জ, সুইজারল্যাণ্ডের ঘড়ি, লিওন্সের মখমল আর রেশম, ইংল্যাণ্ডের সুতির কাপড়, উরালের খনিজদ্রব্য—ভারতবর্ষ—পারস্য—চীনদেশ থেকে, কাস্পিয়ান আর কৃষ্ণ সাগরের উপকূল থেকে, আমেরিকা আর ইউরোপ থেকে গন্ধদ্রব্য, ওষুধ, তরমুজ, মশলা এবং হাজারো বস্তু। এ এক আশ্চর্য মেলা—শুধু জিনিসের নয়—মানুষেরও বটে। মহামিলন ক্ষেত্র।

এরই মধ্যে জিপসীরা নাচগান চালাচ্ছে। বাজিকররা দড়ির খেলা দেখাচ্ছে। কেউ সেক্সপীয়রের নাটক অভিনয় করছে, আবার কেউ লোহা তাতিয়ে ঘোড়ার পিঠে ছাপ দিচ্ছে—হ্রেষারবে কান পাতা দায়। কেউ কয়েক কোপেকের বিনিময়ে কয়েকশ খাঁচার দরজা খুলে হাজার হাজার পাখীকে আকাশে উড়িয়ে দিচ্ছে। অট্টরোল আর কিচিরমিচিরে কানের পোকা পর্যন্ত বেরিয়ে যেতে বসেছে।

এই ভীড়ে দেখা যাচ্ছে ফ্রান্স আর ইংল্যাণ্ডের দুই প্রতিনিধিকে। অ্যাল-সাইড জোলিভেট আর হ্যারি ব্লাউন্ট খবর সংগ্রহ করছেন নিজস্ব পদ্ধতিতে। প্রথমজন মেলাই মুখরোচক খাদ্য নিয়ে ব্যস্ত। দ্বিতীয়জন এই মেলার ওপরেই প্রবন্ধ রচনার চিন্তায় মশগুল।

মাইকেল স্ট্রগফ পকেটে হাত ঢুকিয়ে দাঁতে চেরী পাইপ কামড়ে ধরে পাইচারী করতে করতে দেখলে এত বেচাকেনা দরদামের হাঁকডাকের মধ্যেও কোথায় যেন একটা সুর নেই। বিশেষ করে এশিয়াবাসীরা বেশ উদ্বিগ্ন। গভর্ণর-জেনারেলের প্যালেসে ডাক পড়েছে পুলিশ-প্রধানের। ঘন ঘন

টেলিফোন লেনদেন চলেছে মস্কো আর সেন্ট পিটার্সবার্গের মধ্যে।

তারপরেই বেরিয়ে এল পুলিশ-প্রধান স্বয়ং। সঙ্গে সঙ্গে থেমে গেল চেঁচামেচি। ছুঁচ পড়লেও শব্দ শোনা যায়, এমনি নিস্তব্ধতার মাঝে চড়া গলায় হুটো রাজাজ্ঞা পড়ে শোনালো পুলিশ-চীফ।

"নিজনি-নোভোগোরোদের গভর্ণরের আদেশ।

"প্রথম : কোনো অছিলাতেই জেলা ছেড়ে বেরোতে পারবে না কোনো রাশিয়ান।

"দ্বিতীয় : চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে জেলা ছেড়ে যেতে হবে এশিয়া-বাসীদের।"

৬ ॥ ভাই আর বোন

উপযুক্ত ব্যবস্থাই নিয়েছে কর্তৃপক্ষ। খুবই যুক্তিসঙ্গত।

আইভান ওগারেফকে রাশিয়ার মাটি ছেড়ে চম্পট দেওয়ার পথ বন্ধ করা হচ্ছে। ফিওফার খানের দলে ভিড়ে যেন তার সেনাপতি হয়ে বসতে না পারে বিশ্বাসঘাতক। তাই রাশিয়ানরা থাকবে দেশের মাটিতে—এশিয়া-বাসীরা পত্রপাঠ বিদায় হবে দেশের বাইরে।

তার মানে জিপসীদেরও যেতে হবে। সেন্ট্রাল এশিয়ার বাসিন্দা তারা। তাতার আর মোঙ্গলদের সঙ্গে খাঁতাত একটু বেশী। কাজেই বিদায় হও দেশ ছেড়ে।

চমৎকার ব্যবস্থা। কিন্তু মাইকেলের মনে একটা খটকা লাগল গত রাতের ঘটনাটা মনে পড়ায়। তালঢ্যাঙা চোয়াড়ে সেই জিপসীটা বলেছিল —ফাদারের হুকুমে আজ তাদের রওনা হতেই হবে। ফাদার মানে তো জার—রাশিয়ার সম্রাট। সেই হুকুমই এসেছে এখন। কিন্তু জিপসীটা কাল রাতে তা জানল কি ভাবে? এ হুকুমে তো তার সুবিধেই হচ্ছে—ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাচ্ছে বিনা বাধায়!

অন্য চিন্তা মনে আসায় এ নিয়ে আর বেশীক্ষণ ভাবতে পারল না মাই-কেল। ট্রেনের সেই মেয়েটা কোথায়? একই পথের পথিক সে-ও। কিন্তু এখন তো সীমান্ত পেরোনো আর সম্ভব নয় তার পক্ষে।

মাইকেল তাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে পারে স্রেফ নিজের স্বার্থে। সাইবে-

রিয়ার স্তেপ একা পেরোনো মানেই লোকের সন্দেহকে খুঁচিয়ে জাগিয়ে দেওয়া—কিন্তু সঙ্গে সুন্দরী সঙ্গিনী নিয়ে হাঁটলে কেউ দেখেও দেখবে না।

তাই মেয়েটিকে খুঁজতে বেরোলো মাইকেল। তখন নটা বাজে। বারো-টায় ছাড়বে স্টীমার। সমস্ত চত্বর জুড়ে তখন হট্টগোল চলছে। প্রথম দিকে খেপে গিয়েছিল হাটের লোকজন। ফাজলামি নাকি? চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে তাঁবু গুটিয়ে মালপত্র নিয়ে দেশ ছেড়ে যেতে হবে? হাতুড়ে ডাক্তারদের হাজার মাইল পথ পাড়ি দিতে গিয়ে জান কয়লা হয়ে যাবে না?

কিন্তু কশাক সৈন্য আর পুলিশের গুঁতোয় দেখতে দেখতে ঠাণ্ডা হয়ে এল হাটুরেদের গরম মেজাজ। তাড়াতাড়ি চালাঘর ছেড়ে, তাঁবু ফেলে, ক্যারা-ভানে ঘোড়া জুতে তৈরী হওয়ার হিড়িক আরম্ভ হল। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দেশ ছেড়ে বেরোতে না পারলে পুলিশের ধকল তো কম নয়।

তাই থিয়েটার পত্তন হল, বাজিকরের খেলা শিকেয় উঠল। নাচগান থেমে গেল—পালাও পালাও রব উঠল সমস্ত চত্বর জুড়ে।

এর মাঝে হন্যে হয়ে মেয়েটাকে খুঁজতে লাগল মাইকেল। পেল না। সেতু পেরিয়ে এল ভল্গার এপাড়ে। এগারোটা যখন বাজল, অথচ মেয়েটার ছায়া পর্যন্ত দেখা গেল না—তখন পুলিশ অফিসে যাওয়াই মনস্থ করল মাইকেল। কাগজপত্র দেখিয়ে নিজের রওনা হওয়ার পথটা পরিষ্কার করা যাক। কাতারে কাতারে লোক গুঁতোগুঁতি করছে পুলিশ অফিসে। দেশ ছেড়ে যাব বললেই তো হয় না—ছাড়পত্র নিয়ে যেতে হবে তো। নইলে পথে আছে পুলিশী অত্যাচার। কণুইয়ের গুঁতোয় পথ করে নিয়ে পুলিশ এজেন্টকে কয়েক রুবল্ ঘুষ দিয়ে দপ্তরে পৌঁছে গেল মাইকেল।

গিয়ে দেখল একটা বেঞ্চিতে মুখ কালো করে বসে সেই মেয়েটা। সীমান্ত যে বন্ধ, সে খবর না রেখেই এসেছিল ছাড়পত্র নিতে। এখন শুনেছে যাওয়া আর হবে না। তাই ভেঙ্গে পড়েছে।

মাইকেলকে দেখেই উঠে দাঁড়াল সে। চিনতে পেরেছে। আশায় উজ্জ্বল হল। এগিয়ে আসছে—তার আগেই এজেন্ট এসে মাইকেলকে ডেকে নিয়ে গেল পুলিশ প্রধানের ঘরে।

বেরিয়ে এল তিন মিনিট পরে। মাইকেল একা। মেয়েটির সামনে গিয়ে বললে নরম সুরে—"বোন, ইরকুটস্ক যাওয়ার অনুমতি পেয়েছি। আসবে তো এসো।"

"চলো দাদা!" মাইকেলের হাত ধরে স্টেশন ছেড়ে বেরিয়ে এল মেয়েটি।

৭ ॥ ভলগার ওপর দিয়ে

দুপুর ঠিক বারোটায় ঘণ্টা বাজিয়ে রওনা হল ককেসাস জাহাজ। পুলিশ সজাগ দৃষ্টি রেখেছিল এতক্ষণ। ছাড়পত্র না নিয়ে কাউকে উঠতে দেয়নি। যারা উঠেছে, তারা সমানে গজগজ করে যাচ্ছে পুলিশের অত্যাচার সম্পর্কে। কিন্তু জোর গলায় নয়—সে সাহস কারো নেই। পুলিশে ছুঁলে আঠারো ঘা।

মেয়েটি যাতে যখন খুশী ঘুমোতে পারে তাই ফার্স্ট ক্লাস কেবিন ভাড়া করেছিল মাইকেল। অথচ মেয়েটির সঙ্গে একটি কথাও এখনো বলেনি। নামশুদ্ধ জানতে চায়নি।

ঘণ্টা দুয়েক পরে মেয়েটি বললে—"দাদা, তুমি কি কি ইরকুটস্ক যাচ্ছো?"

"হ্যাঁ, বোন। একই পথের পথিক দুজনেই।"

"কাল তোমায় বলব কেন বালটিক ছেড়ে বেরিয়েছি উরালের ওদিকে যাবো বলে।"

"জানতে তো চাইনি।"

"তাহলেও বলব। দাদার কাছে বোন কি কথা লুকোয়? আজ বড় ক্লান্ত, নইলে আজকেই বলতাম।"

"যাও না। কেবিনে গিয়ে বিশ্রাম নাও।"

"যাই। কাল দেখা হবে।"

"এসো—" বলে থেমে গেল মাইকেল। মেয়েটার নাম তো জানে না।

"নাদিয়া," বলল মেয়েটি।

"এসো, নাদিয়া!"

উঠে গেল নাদিয়া। ডেকে ফিরে এল মাইকেল। খবরের সন্ধানে ঘুর ঘুর করতে লাগল ডেকে। এক জায়গায় দেখল অস্পষ্ট উচ্চারণে দুজন বিদেশী রাশিয়ান ভাষায় ঝগড়া করছে।

"একী! এখানেও পেছনে পেছনে এসেছেন?"

"আগে আগে চলেছি বলুন।"

"পাশাপাশি গেলেই তো হয়।"

"ক্ষতি কী?"

"পার্ম যাচ্ছেন নিশ্চয়?"

"বলা বাহুল্য।"

"তারপর উরাল পেরোবেন?"

"খুব সম্ভব।"

"সীমান্ত পেরিয়েই সাইবেরিয়ায়? যুদ্ধের মাঝখানে?"

"নিশ্চয়।"

"হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করলে হয় না?"

"আপত্তি কী?"

"কিন্তু আমি যা দেখব, তা আপনাকে বলব না।"

"আমিও যা শুনব, তা আপনাকে বলব না।"

"তাহলে রাজী?"

"আলবৎ রাজী।"

"হাত বাড়ান।"

"এই বাড়ালাম।"

প্রথম জন দ্বিতীয় জনের আড়ষ্ট দুটো আঙুল ধরে সজোরে নেড়ে দিয়ে বললে, "দশটা সতেরোয় দূর সম্পর্কের বোনটিকে টেলিগ্রামে খবর পাঠালাম।"

"আমি পাঠালাম দশটা তেরো মিনিটে—ডেলা টেলিগ্রাফে।"

"ব্র্যাভো, মিঃ ব্লাউন্ট!"

"ভেরী গুড মঁসিয়ে জোলিভেট।"

"এরপর থেকে দেখি কে আগে খবর পাঠায়।"

"দেখা যাক।"

ফুর্তি উচ্ছল ভঙ্গিমায় ইংলিশম্যানকে স্যালুট করল ফ্রেঞ্চম্যান। আড়ষ্ট ভাবে অভিবাদন ফিরিয়ে দিল ইংলিশম্যান। দুজনে সরে গেল দু'দিকে। মাইকেলও সরে পড়ল অন্যত্র। খবর সংগ্রহ যাদের পেশা, তাদের ছায়া মাড়ানো বিপজ্জনক।

ডিনার খেতে বসেও নাদিয়াকে দেখল না মাইকেল। ডাকাডাকিও করল না। বড্ড ধকল গেছে। ঘুমোক একটানা।

খাওয়া দাওয়ার পর অন্ধকার গাঢ় হতেই যে যেখানে পারল শুয়ে পড়ল। নিজনি নোভোগোরোদ থেকে পার্ম ষাট ঘণ্টার পথ। এই ভাবেই কাটাতে হবে ষাটটা ঘণ্টা।

মাইকেল কিন্তু উদ্বেগের জন্যে দু'চোখ এক করতে পারল না। ঘুর ঘুর করতে লাগল স্টিমারের সর্বত্র। গাঁটরি, মেঝে, বেঞ্চির কোথাও খালি নেই।

সব জায়গাতেই লম্বমান যাত্রীরা।

ইঞ্জিন ঘর পেরিয়ে ফক্‌স্‌লে পৌছোলো মাইকেল। বাণিজ্য জাহাজের সামনের দিকে পাটাতনের নিচে নাবিকদের থাকবার জায়গা থাকে যই। বেয়ে ওপরে উঠছে, এমন সময়ে শুনল অদ্ভুত উচ্চারণে কথা বলছে একজন নারী আরেকজন পুরুষের সঙ্গে। মেলা চত্বরে ঠিক এই উচ্চারণে কথা শুনেছিল বলেই দাঁড়িয়ে গেল তৎক্ষণাৎ। অন্ধকারে গা ঢেকে কানখাড়া করে শুনল কথাগুলো। প্রথম দিকের কথাবার্তা মামুলি—তাকে নিয়ে নয়। কিন্তু তারপরেই যা শুনল, তা ভাববার মত।

তাতার ভাষায় বলল নারীকণ্ঠ---"শুনছি মস্কো থেকে রাজদূত পাঠানো হয়েছে ইরকুটস্কে।"

"আমিও শুনেছি, সাংগারি। তবে সে রাজদূত হয় আমাদের পরে পৌছোবে অথবা আদৌ পৌছোবেই না।"

চমকে উঠল মাইকেল। এ যে তাকে নিয়ে আলোচনা। কথাটা কে বললে, তা দেখাও সম্ভব নয়। অন্ধকারে কিসসু দেখা যাচ্ছে না।

পা টিপে টিপে ওপরে উঠে এল মাইকেল। হাতে মুখ ঢেকে এমনভাবে বসে রইল যেন ঘুমিয়ে পড়েছে।

কিন্তু সে ঘুমোয়নি। ঘুমোনোর কথাও ভাবছিল না। ভাবছিল—আমার এই একান্ত গোপন অভিযানের খবর নিয়ে এত মাথাব্যথা কার? কি জন্যে?

৮ ॥ কামা

পরের দিন ভোরে 'কামা' পৌছে গেল 'কেমাস'।

ডেক থেকে না নেমেই অনেক খবর পেল মাইকেল। কামার জেটি থেকে নতুন যাত্রী উঠল স্টীমারে। তাদের চাপা উত্তেজনা আর কথাবার্তা জানল, বিদ্রোহীরা আরও এগিয়েছে। মস্কো আর সাইবেরিয়ার মধ্যে যোগাযোগ প্রায় ছিন্ন হতে বসেছে।

ফলে উদ্বেগ আরো বাড়ল ছদ্মবেশী রাজদূতের। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব উরাল পেরিয়ে যাওয়া দরকার এখন।

চিন্তাসূত্র ছিঁড়ে গেল একদল জিপসীর ওপর চোখ পড়ায়। স্টীমার থেকে জাহাজ ঘাটায় নামছে একজন বুড়ো জিগানে জিপসী—সঙ্গে একজন

বছর তিরিশ বয়েসের মেয়ে জিপসী। সোনালী চুল, কালো চোখ, চেহারায় ছিরিছাঁদ নেই। বুড়োর রকম সকম দেখেই কিন্তু খটকা লাগল মাইকেলের।

সঙ্গে আরও জন বিশেক নাচিয়ে আর গাইয়ে সঙ্গী নিয়ে বুড়ো নামছে জেটিতে। কিন্তু অন্যান্য জিপসীদের মত নিজেকে মেলে ধরতে চাইছে না—বরং যেন আড়াল করে রাখছে। অদ্ভুত ব্যাপার তো। জিপসীরা সব সময়ে লোকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেই পথ চলে। তাদের সাজপোশাক কথাবার্তা চলাফেরা সব সময়ে আশপাশের নজর কেড়ে নেয়। কিন্তু এই থুত্থুরে বুড়োটা ময়লা টুপি দিয়ে মুখ ঢেকে রেখেছে, আলখাল্লা দিয়ে এই গরমেও আপাদমস্তক মুড়ে রেখেছে। মুখ দেখা যাচ্ছে না—চেহারাও দেখা যাচ্ছে না। মেয়ে জিপসীটা তাকে আগলে নিয়ে নেমে যাচ্ছে স্টীমার থেকে। নামবার সময়ে তীক্ষ্ণ চোখে দেখে গেল মাইকেলকে—যেন মনের পর্দায় ওর চেহারাটা বেশ ভাল করেই এঁকে নিয়ে গেল।

খটকা লাগল মাইকেলের। নিজনি নোভোগোরোদের মেলা চত্বরে আগের রাত্রে জিপসী ক্যারাভানের যে মেয়েটি তালঢ্যাঙা পুরুষটিকে ডেকে নিয়েছিল—এ সেই মেয়ে। দলবল নিয়ে সারাদিন নিশ্চয় স্টীমারের খোলে কাটিয়েছে রাত্রেও ফক্‌স্‌লে পাটাতনের তলায় ঘুমিয়েছে চুপিসাবে।

কিন্তু কেন এই গোপনতা? জিপসীদের পক্ষে এত লুকোচুরি তো একেবারেই বেমানান।

ঘোর সন্দেহ হল মাইকেলের। প্রবল ইচ্ছে হল পাছু নেওয়ার। কিন্তু পরক্ষণেই সামলে নিল নিজেকে। সন্দেহ দেখাতে গিয়ে নিজেকে ধরিয়ে ফেলা এখন সমীচীন হবে না—আসল কাজ তাতে শিকেয় উঠবে। ওরা যাচ্ছে যাক।—যাবে তো জিপসী ক্যারাভানে। মাইকেল রাশিয়ান ঘোড়ায় টানা তারানতাসে চেপে তার আগেই পৌঁছে যাবে ইরকুটস্কে।

কামা থেকে ইরকুটস্ক যাওয়ার দুটো রাস্তা আছে। কামাকে এই কারণেই বলা হয় এশিয়ার ফটক। একটা পথ অন্যটার চাইতে একটু বেশি লম্বা—কিন্তু পথের ধারে ধারে ঘোড়ার ঘাঁটি আছে, গ্রাম আছে অনেক। সরকারী সুবিধে আছে। রাস্তাও ভাল। জিপসীরা অন্য রাস্তা ধরলেও ভাল রাস্তায় ভাল ঘোড়ায় চেপে অনেক আগেই ইরকুটস্ক পৌঁছোবে মাইকেল।

জাহাজ যখন ছাড়তে যাচ্ছে, জেটি থেকে একটু সরেও এসেছে, এমন সময়ে ঝড়ের মত দৌড়োতে দৌড়োতে এসে সার্কাসের সঙের মত বিরাট এক লাফ মেরে, একেবারে জেটি থেকে হ্যারি ব্লাউন্টের দু'হাতের মধ্যে ঝাঁপিয়ে

পড়লেন অ্যালসাইড জোলিভেট!

"ব্যাপার কী?" ব্লাউন্ট তো অবাক। "জাহাজ তো আপনাকে না নিয়েই চলে যেত এখুনি।"

"গেলেও ভার্স্ট পিছু বিশ কোপেক খরচ করে ঘোড়ায় চেপে পরের জেটিতে পৌঁছে যেতাম। এখনও সেই খরচ করেই টেলিগ্রাফ অফিসে ঘুরে এলাম।" হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন ফরাসী সাংবাদিক।

"তার মানে?" ভুরু কুঁচকে গেল ইংরেজ সাংবাদিকের। "খবর পাঠিয়ে এলেন নাকি?"

"নিশ্চয়। ফিওফার খান তাতার বাহিনী নিয়ে সেমিপোলাটিনস্ক ছাড়িয়ে ইরতিশ বরাবর মার্চ আরম্ভ করে দিয়েছে। খবর পেয়েই পাঠিয়ে দিলাম আমার দূর সম্পর্কের বোনকে।"

ঠোঁট কামড়ালেন ইংরেজ সাংবাদিক। নবাগত যাত্রীদের পেট থেকে নিশ্চয় খবরটা টেনে বার করেছেন জোলিভেট। এতবড় একটা খবর থেকে বঞ্চিত হল ডেলী টেলিগ্রাফ। স্রেফ নিজের দোষে ছিঃ। ছিঃ। ছিঃ!

দশটা নাগাদ ডেকে হাজির হল লিভোনিয়ার সেই তরুণী—নাদিয়া। মাইকেলের হাতে হাত রেখে বললে—"দাদা, মস্কো থেকে কদ্দুর এলাম?"

"ন'শ ভার্স্ট।"

"মোটে! এখনো ছ'হাজার একশ ভার্স্ট বাকি!"

ঠিক এই সময়ে ব্রেকফাস্টের ঘন্টা পড়ল। নাদিয়াকে নিয়ে খেতে গেল মাইকেল। খুব একটা খেতে পারল না নাদিয়া। বিশ মিনিট পরে গলুইতে ফিরে এল দুজনে।

গলা নামিয়ে নাদিয়া বললে—"দাদা, আমার বাবার নাম ওয়াসিলি ফেদোর। রিগার খুব নামী ডাক্তার। রাজনৈতিক কারণে বাবাকে দেড় বছর আগে নির্বাসন দেওয়া হয় ইরকুটস্কে। মাত্র এক মাস আগে আমার মা-ও মায়া কাটিয়েছে পৃথিবীর। আমি একা। নিঃসহায়। পথের ভিখিরি। পুলিশ তাই দয়া করে ছাড়পত্র দিয়েছে। ইরকুটস্কে গিয়ে বাবার কাছে থাকব এখন থেকে। তুমি না থাকলে রাস্তাতেই না খেয়ে মরতাম—ছাড়পত্র তো এখন বাতিল হয়ে গেল।"

"বোন, সাইবেরিয়ার স্তেপ একা পেরোনোর ঝুঁকি নিয়ে বেরোনো তোমার ঠিক হয়নি।"

"কিন্তু কর্তব্য যে করতেই হবে, দাদা।"

এই একটা কথার মধ্যেই নাদিয়ার অনমনীয় দৃঢ় চরিত্র ফুটে উঠল। মুগ্ধ হল মাইকেল স্ট্রগফ।

৯ ॥ তারানতাসে দিবারাত্র

পরের দিন, উনিশে জুলাই, পার্ম পৌঁছে গেল 'ককেসাস'।

ইউরোপ থেকে যারা এশিয়ায় যায়, এখান থেকে তারা গাড়ী কেনে গরমকালে. শীতকালে কেনে স্লেজ। স্তেপ পেরোতে কয়েক মাস তো লাগেই। উরাল পর্বতমালার মধ্য দিয়ে একটা ডাকগাড়ী যায়। এখন তা বন্ধ। তাছাড়া, অত শ্লথগতি গাড়ী নিলেও চলবে না মাইকেলের। কারও খেয়াল খুশীর ওপর নির্ভর করা এখন সম্ভব নয়। নিজস্ব গাড়ী হলে দিনরাত হাঁকানো যাবে ইম্‌স্‌চিকস্‌ অর্থাৎ গাড়োয়ানকে উপযুক্ত 'না ভোদকো' অর্থাৎ বখশিস দিয়ে।

কিন্তু গাড়ী কিনতে গিয়ে কালঘাম ছুটে গেল মাইকেলের। গাড়ী একদম নেই। পুলিশের গুঁতোয় দেশ ছেড়ে যাবার হিড়িকে আগে ভাগে যারা এ পথ দিয়ে গেছে, সব গাড়ী নিয়ে গেছে তারাই।

যাই হোক আতকষ্টে একটা তারানতাস গাড়ী জোগাড় করল মাইকেল, আর গাড়ী নেই পার্মে। তা সত্ত্বেও দরদাম করল ব্যবসাদারি চালে—তার ছদ্মবেশটাই যে তাই—ব্যবসাদার নিকোলাস কোরপানফ। ভেক ধরেছে ব্যবসাদারের—দরদাম তো করবেই।

তারানতাস গাড়ী চার চাকার ঠিকই—কিন্তু তেলগার চাইয়ে হাজার গুণ ভাল। তেলগাও চার চাকার। কিন্তু দড়ি দিয়ে বাঁধা। স্প্রিং কোনো গাড়ীতেই নেই। তবে পথের খানাখন্দে পড়ে বা বরফে চাকা গেঁথে গেলে তারানতাস আট ফুট ব্যবধানে লাগানো চাকা দিয়ে লাফিয়ে বেরিয়ে যায়—তেলগা পারে না। পেছনের অংশ দড়ি ছিঁড়ে কাদায় বা বরফে আটকে থাকে—সামনের অংশ নিয়ে ঘোড়া চালিয়ে গাড়োয়ান পৌঁছে যায় গন্তব্যস্থলে—জানতেও পারে না আরোহী পড়ে রইল পেছনে।

এ ছাড়াও তারানতাসে চাপার সুবিধে অনেক। তলা দিয়ে যাতে কাদা ছিটকে গায়ে না লাগে, তাই পাটাতন পাতা আছে। মাথায় আছে চামড়ার হুড—গরমকালে বা ঝড়ের সময়ে খুব কাজ দেয়।

এ হেন মজবুত এবং মোটামুটি আরামদায়ক সবেধন নীলমণি একটি মাত্র

তারানতাস জোগাড় করে নাদিয়াকে নিয়ে তৎক্ষণাৎ তাতে উঠে বসল মাইকেল। লোমশ তিনটে ঘোড়া জোড়া হল গাড়ীতে। একটা সামনে, দুটো দুপাশে পাদানির কাছে। ঘোড়া তো নয়—যেন লম্বা ঠ্যাংওলা লোমশ ভালুক। সাইবেরিয়ার ঘোড়া। ছোটে দারুণ।

নোংরা পোশাক পরা লম্বাচুলো ইম্‌স্‌চিক এসে তাচ্ছিল্যের চোখে দেখল দুই আরোহীকে। সঙ্গে মালপত্র নেই। থাকলে রাখার জায়গা হত না—তারানতাসে বসার জায়গা মাত্র দুজনের। ইম্‌স্‌চিক বসে একদম সামনে—অপ্রশস্ত আসনে।

দুই আরোহীর বাউণ্ডুলে চেহারা আর অবস্থা দেখে নাক কুঁচকে যেন আকাশকে উদ্দেশ করে বললে রাশিয়ার গেঁইয়া ভাষায়—"কাক কোথাকার! ভার্স্ট পিছু দু'কোপেক জুটলে হয়।"

মাইকেল এ ভাষার মানে জানে। তাই তৎক্ষণাৎ শুনিয়ে শুনিয়ে বললে—"নাহে, আমরা ঈগল। ভার্স্ট পিছু নকোপেক—সেই সঙ্গে মোটা বখশিস!"

জবাব এল চাবুকের শব্দে। সপাং করে আওয়াজ হতেই তিড়বিড়িয়ে লাফিয়ে উঠে পড়ি কি মরি করে দৌড়োলো ঘোড়া তিনটে।

রাশিয়ার গেঁইয়া ভাষায় 'কাক' মানে কিপটে যাত্রী—ঘোড়ার জন্যে ভার্স্ট পিছু দু'তিন কোপেকের বেশী খরচ করতে চায় না। আর 'ঈগল' মানে দরাজহস্ত যাত্রী—খরচ করতে জানে। বখশিস দিতে জানে।

মাইকেল তাই শুনিয়ে দিলে, বেশবাস তাদের ময়লা আর মামুলি হলেও, পাখীর রাজা ঈগল পাখীর মতই উড়তে তারা চায়—খরচ নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না।

ফলে, যেন সত্যিই উড়ে চলল তারানতাস। গর্ত-টর্ত মানলো না কাঠের গুঁড়ি, পাথরের চাঁই দেখে থামল না—দমদম শব্দে লাফাতে লাফাতে সব কিছুর ওপর দিয়ে ভয়ংকরভাবে ধুলো পাথর-কাদা ছিটকিয়ে ঘন্টায় প্রায় দশ থেকে বারো মাইল বেগে ধেয়ে চলল নক্ষত্রগতিতে।

চলল সারাদিন। মাঝে মাঝে ঘোড়ার ঘাঁটিতে থেমে নতুন ঘোড়া আর নতুন গাড়োয়ান নিল মাইকেল—সব পয়েন্টেই পয়সা ছড়িয়ে চলল দু'হাতে। একটা মিনিটও সময় নষ্ট করল না। প্রত্যেকটা পোস্ট-হাউসে শুনল, একটু আগেই দুজনযাত্রী কে নিয়ে একটা তেলগা গাড়ী গেছে এই পথ দিয়ে।

নাদিয়ার খুব কষ্ট হচ্ছিল গাড়ীর ঝাঁকুনিতে। কিন্তু শক্ত মেয়ে। মুখ

বুজে সয়ে গেল। মাইকেল কিন্তু নির্বিকার। এ পথে সে বার কুড়ি গেছে। পথের ধকল, বরফের ঠাণ্ডা, ঝড়ের বিপদ, গরমের হলকা—সব তার গা সওয়া।

সারারাত্রি গাড়ী ছুটল এইভাবে। পার্ম থেকে দিনরাত গাড়ী চালিয়েও আটচল্লিশ ঘণ্টা লাগবে উরাল পেরোতে। নাদিয়া ঘুমিয়ে পড়ল গাড়ীর মধ্যে। মাইকেল কিন্তু জেগে রইল। ইম্‌স্‌চিকদের বিশ্বাস নেই। ঘুমিয়ে পড়তে পারে। সময় নষ্ট করতে পারে।

ভোর হল। সেদিন বিশে জুলাই। দূরে দেখা গেল উরাল পর্বতমালা। আর একটা রাত যাবে এ পাহাড় পেরোতে।

সারাদিন কিন্তু মেঘলা হয়ে রইল আকাশ। আবহাওয়া সুবিধের নয়। ঝড় আসতে পারে। পাহাড়ের মাথায় বিদ্যুত চমকও দেখা যাচ্ছে।

এ অবস্থায় না এগোনোই মঙ্গল।

কিন্তু মাইকেলকে থামানোর সাধ্যি কারো নেই।

ইম্‌স্‌চিককে বললে—"সামনে একটা তেলগা যাচ্ছে না?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। একঘণ্টা আগেই গেছে।"

"চালাও পঙ্খী! ডবল বখশিস পাবে কাল ভোরেই একাটেনবার্গ পৌঁছোতে পারলে।"

১০ ॥ উরালে ঝড়

উরাল পর্বত এমন কিছু উঁচু নয়। আবহাওয়া পরিষ্কার থাকলে পেরোতে ঝামেলা নেই। কিন্তু আকাশে বাতাসে দামালি শুরু হলেই উরাল তখন করাল রূপ ধারণ করে।

রাত আটটা নাগাদ দ্যুতিময় মেঘে উরাল শীর্ষ ঢেকে রয়েছে দেখে প্রমাদ গুণল মাইকেল। মেঘ ক্রমশঃ এগুচ্ছে—ওদেরও গ্রাস করবে—যদি না বৃষ্টি হয়ে গলে যায়। মেঘের মধ্যে পড়া মানেই কুয়াশায় পথ হারানো এবং ঠিকবে পড়া।

এ ছাড়া আছে ঝড়ের ঝাপটা এবং রাত্রে পথ চলার ফলে প্রচণ্ড ঝাঁকুনি। খানাখন্দ তো দেখা যায় না। তাই নাদিয়ার যাতে তেমন কষ্ট না হয়, সেই ব্যবস্থা করল মাইকেল উরালে ঢোকবার আগে। ছই টেনে দিল। ভাল করে দড়ি দিয়ে বাঁধল যাতে উড়ে না যায়। চক্র নাভির বাক্সতে বেশ করে

খড় ঠেসে দিল যাতে চাকার ওপর ওজন পড়ে, এবং ঝাঁকুনি কমে। সামনের দিকে দুটো লাল লণ্ঠন জ্বালিয়ে নিল—রাস্তা আলোকিত না হলেও সামনের দিক থেকে অন্ধকারে অন্য কোনো গাড়ী যাতে সংঘর্ষ না বাধিয়ে বসে।

রাত আটটার সময়ে শুরু হল উরাল আরোহণ। গড়গড়িয়ে চড়াই বেয়ে ছুটল তারানতাস।

চারিদিক থমথমে নিস্তব্ধ। প্রকৃতি যেন রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছে আসন্ন তাণ্ডব নৃত্যের। আওয়াজ উঠছে গাড়ীর চাকা থেকে, ঘোড়ার পা থেকে। সেই সঙ্গে হ্রেষাধ্বনি। খুরের ঠোক্করে ফুলকি দিয়ে ছিটকে যাচ্ছে আলগা নুড়ি।

এগারোটা নাগাদ বিদ্যুৎ ঝলসে উঠল মেঘের মধ্যে। এতক্ষণ যা অন্ধকারে ঢাকা ছিল—এবার তার ওপর আকাশ দেবতারা যেন মশালের আলো তুলে ধরলেন। দেখা গেল গভীর খাদ আর ঝড়ে নুয়ে পড়া বড়বড় পাইন গাছ। সেইসঙ্গে আরম্ভ হল মেঘের মাদল। গুরুগুরু ধ্বনিতে কেঁপে কেঁপে উঠল দিক হতে দিগন্ত। চাপা পড়ে গেল চাকার আওয়াজ, ঘোড়ার নাকঝাড়ার আওয়াজ, চিঁহি চিঁহি আওয়াজ আর তৈলহীন চাকার ক্যাঁচ ক্যাঁচ আওয়াজ।

গলা চড়িয়ে ইম্‌সৃচিককে জিজ্ঞেস করল মাইকেল—"পাহাড়ের ওপরে পৌঁছোবো কখন?"

চাৎকার করে জবাব দিলে ইম্‌সৃচিক—"রাত একটায়—আদৌ যদি পৌঁছোতে পারি।"

"ঘাবড়ে গেছো দেখছি?"

"না বেরোলেই ভাল করতেন।"

"থেকে গেলে আরো খারাপ করতাম।"

"ছোট্‌রে পায়রা—জোরে ছোট্‌।" হেঁকে উঠল ইম্‌সৃচিক। কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। হুকুম তামিল করা তার কাজ।

ঠিক সেই সময়ে অনেকদূরে একটা ভীষণ আওয়াজ শোনা গেল। আকাশ বাতাস যেন চৌচির হয়ে গেল ভয়ংকর সেই শব্দে—সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ মশালের আগুন জ্বালিয়ে বাজ পড়ল আকাশ থেকে—লক্ষ করতালিতে যেন তালা লেগে গেল কানে। চকিতের দীপ্তিতেই দেখা গেল ঝড়ে নুয়ে পড়া পাইন গাছের অবস্থা। বাতাসে তীব্র শন্‌শন্‌ শব্দ। ঝড় অট্টহাসি হাসছে। শেকড় আলগা দুবল কিছু পাইনের ঝুঁটি খামচে ধরে উপড়ে এনে ছুঁড়ে দিয়েছে রাস্তার ওপর। গড়গড় গড়াম গুম শব্দে পাইনগুলো ডালপালাসমেত গড়াতে গড়াতে

এসে তারানতাসের দু'শ ফুট সামনে দিয়ে ঠিকরে গেল খাদের মধ্যে।

সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে গেল তিনটে ঘোড়াই।

"চলবে, পায়রা! ভয় কিসের!" মেঘ ডাকার তালে তাল মিলিয়ে বাতাসে চাবুক ঘোরাতে ঘোরাতে হাঁক দিলে ইম্‌স্‌চিক।

নাদিয়ার হাত ধরে মাইকেল বললে—"বোন, ঘুমোচ্ছো?"

"না, দাদা।"

"ঝড় আসছে।"

"আমি প্রস্তুত দাদা।"

ছইয়ের পর্দা টেনে দিল মাইকেল। ভেতরে যাতে হাওয়া আর ধুলো না আসে—তারই ব্যবস্থা। পর্দা টানতে না টানতেই এসে গেল ঝড়। যেন মাতাল হাতীর মতই লাফিয়ে পড়ল গাড়ীর ওপর। ঘোড়াগুলো শুধু দাঁড়িয়েই যায়নি—ঝড়ের ঝাপটায়, ঘনঘন বিদ্যুৎ চমকে আর কানের পর্দা ফাটানো বজ্রের হুংকারে ভয় পেয়ে চম্পট দেওয়ার তালে পিছু হটছিল। এ অবস্থায় ঘোড়াদের মুখ ঝড়ের দিকে করে লাগাম চেপে ধরা দরকার। তারানতাস ঝড়ের দিকে আড়াআড়িভাবে রয়েছে। রাস্তার ঠিক মোড়ে ঝড় আছড়ে পড়ছে গাড়ীর ওপর। এখুনি উল্টে গিয়ে খাদে পড়তে পারে। সুবোধ বচন এবং চাবুকের শাসনেও ঘোড়াদের বাগে আনতে পারছে না ইম্‌স্‌চিক।

লাফ দিয়ে নেমে পড়ল মাইকেল। নামল ইম্‌স্‌চিকও। দুজনে দুপাশ থেকে সামাল দিল ভয়ার্ত ঘোড়াগুলোকে। নইলে লাগাম ছিঁড়ে পালাবে এখুনি।

হাঁপাতে হাঁপাতে ঝড় আর বজ্রপাতের হুংকারের ওপর গলা চড়িয়ে ইম্‌স্‌চিক বললে—"এখানে দাঁড়ালে কিন্তু পাহাড়ের তলায় ঠিকরে পড়বে।"

"কাওয়ার্ড!" ধমক দিল মাইকেল। "সামলাও ওদিকের ঘোড়া।"

পুরো গাড়ীটা ততক্ষণে দুজনের গায়ের জোর সত্ত্বেও পিছু হটছে হাঁ-করা খাদের দিকে। ভাগ্যিস একটা উপড়োনো গাছের গুঁড়ি পড়েছিল রাস্তায়—চাকা দুটোকে গিয়ে দাঁড়িয়ে গেল তক্ষুনি—নইলে খাদে পতন আটকানো যেত না।

"নাদিয়া ভয় পেলে নাকি?" চীৎকার করে শুধোয় মাইকেল।

"না দাদা!" সত্যিই শান্ত স্বর নাদিয়ার—ভয় ডরের লেশমাত্র নেই।

বাজের হুংকার ক্ষণেকের জন্যে বিরতি দিয়েছে। গুড়গুড় গুমগাম শব্দ খাদের মধ্যে গড়িয়ে গড়িয়ে চলে যাচ্ছে দূর হতে দূরে।

"হুজুর কি এবার ফিরবেন?" শুধোয় ইম্‌স্‌চিক।

"মোটেই না। মোড় ঘুরলেই মাথা গোঁজার ঠাঁই মিলবে। এগোও সামনে।"

"কিন্তু ঘোড়া তো এগোচ্ছে না!"

"টেনে নিয়ে চলো।"

"ঝড় কিন্তু আবার আসবে!"

"কথা শুনবে কিনা?"

"হুকুম নাকি?"

"ফাদারের হুকুম!" চীৎকার করে উঠল মাইকেল। এই প্রথম নাম নিল সর্বশক্তিমান সম্রাটের। কাজ হল ম্যাজিকের মত।

হেঁকে উঠে চাবুক হাঁকড়াল ইমস্‌চিক—"উড়ে যারে সোয়ালো! ডানা মেলে উড়ে যা।"

কিন্তু উড়ে যা বললেই তো আর উড়ে যাওয়া যায় না। মাত্র আধ ভার্স্ট পথ পেরোতেই কালঘাম ছুটে গেল জোয়ান ঘোড়া দুটোর। মাঝের ঘোড়াটা ঠিকই ছিল—বেয়াদবি করেনি। কিন্তু হিমসিম খাইয়ে দিল দুপাশের ঘোড়া দুটো। দুজনে দুদিক থেকে ধরে হিড় হিড় করে গায়ের জোরে টেনে নিতে গিয়েও ঝড়ের ঝাপটায় বার বার হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল মুখ থুবড়ে। তিন পা এগোয় তো এক পা পেছোয়। যে কোনো মুহূর্তে গড়গড়িয়ে খাদে গিয়ে পড়ত পেছনে সেই গুঁড়িটা পড়ে না থাকলে। বিপদ শুধু খাদে পড়ার নয়—শূন্যপথে ঠিকরে আসা পাথর আর গাছের ডালের সংঘর্ষেও মাথা উড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ষোল আনা।

আচমকা দপ করে জ্বলে উঠল বিদ্যুৎ। ঝকঝকে আলোয় চকিতের জন্যে দেখা গেল বিশাল একটা পাথরের স্তূপ ঝড়ের ধাক্কায় খসে পড়েছে ওদের দিকে—আর কয়েক ফুট এগোতে না পারলে নাদিয়া সমেত ভাবানভাস ছাতু হয়ে যাবে এখুনি।

আর সময় নেই। ভয়ে বিকট চেঁচিয়ে উঠল ইম্‌স্‌চিক। পাগলের মত গাড়ীর পেছনে গিয়ে স্রেফ আসুরিক শক্তি বলে অত বড় গাড়ীটাকে হ্যাঁচকা টান দিয়ে কয়েক ফুট সামনে ঠেলে ফেলে দিল মাইকেল। সঙ্গে সঙ্গে বুক ঘেঁসে পাথরের স্তূপটা আছড়ে পড়ল মাটিতে—গুঁড়ো হয়ে গিয়ে প্রচণ্ড শব্দে ঠিকরে গেল খাদের মধ্যে। ঠিক যেন কামানের গোলা বেরিয়ে গেল বুক ঘেঁসে।

বিদ্যুতের আলোয় ভয়াবহ সেই দৃশ্য দেখে আঁতকে উঠল নাদিয়া—"দাদা।"

"ভয় কি বোন!"

"ভয় আমার জন্যে নয় দাদা!"

"ভগবান আছেন সঙ্গে, কোনো ভয় নেই!"

"আছেন দাদা, আছেন। ভগবান তাঁকে পাঠিয়ে দিয়েছেন আমাকে আগলে নিয়ে যাওয়ার জন্যে।"

এতক্ষণ যে গাড়ীর চাকা গড়াতে চাইছিল না—মাইকেলের আসুরিক ঠেলায় এখন তা ঠিকরে যাওয়ায় ঘোড়াগুলো দ্বিগুণ উদ্যমে পড়ি কি মড়ি করে ছুটে চলল সামনে। দুজনে দুপাশ থেকে আদরের সম্বোধন আর গায়ের জোর দিয়ে টেনে নিয়ে চলল তাদের ওপর দিকে। কিছু উঠতেই একটা খাঁজ পাওয়া গেল পাহাড়ের গায়ে। সঙ্কীর্ণ হলেও ঝড়ের ঝাপটায় আর গড়িয়ে যেতে হবে না। তবে সামনেই একটা ঘূর্ণিঝড় ঘুরছে বন্ বন্ করে। শেকড় আলগা ফার গাছকে উপড়ে টেনে নিয়ে হা-হা করে হাসতে হাসতে তাণ্ডব নাচ নেচে ছুটে চলেছে পথের ওপর দিয়ে।

অথচ ঝড় এখনো তুঙ্গে পৌঁছোয়নি। এই তো শুরু। উরাল এখনো করাল রূপ ধারণ করেনি। এখন শুধু ঘন ঘন তালি বাজাচ্ছে আকাশের বাজ, পায়ের তলায় মাটি কাঁপছে থর থরিয়ে ভূমিকম্পের মত। যেন উরালের সব কটা পাহাড় জমি ছেড়ে শূন্যে ঠিকরে যেতে চাইছে। পাহাড়ের খাঁজে গাড়ীসমেত আশ্রয় না নিলে ঘূর্ণি ঝড়ের পাকসাটে তারানতাস ঠিকরে যেত খাদের মধ্যে সামন্য একটুকরো খড়ের মতই।

গাড়ী থেকে নেমে এল নাদিয়া।

ঠিক সেই সময়ে, রাত একটার সময়ে, আকাশ ভেঙে নামল বৃষ্টি। একে ঐ ঝড়, তারপর তুমুলধারে বাদল—অজস্র স্রোত নেমে এল পাহাড়ের গা বেয়ে। আকাশের জল কিন্তু বিদ্যুতের মশালকে না নিভিয়ে যেন লকলকে শিখাকে বাড়িয়ে দিল শতগুণে।

প্রমাদ গুণল মাইকেল। এখন থেকে ঢাল বেয়ে নামার পালা। কিন্তু পথের মধ্যেই অগুন্তি স্রোতস্বিনী হৈ-হৈ করে ছুটে চলেছে ঝড় আর বৃষ্টির সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে উন্মত্তের মত।

"অপেক্ষাই করা যাক," বললে মাইকেল! "যে ভাবে ঝড় বৃষ্টি হচ্ছে থেমে যাবে এখুনি। তিনটে নাগাদ আলো ফুটলে এগোনো যাবে।"

"দাদা, আমার জন্যে ভেবোনা।"

"নাদিয়া, ভাবনা কি শুধু তোমার জন্যে? কর্তব্য অসম্পূর্ণ থেকে যাবে এখন যদি বেরোই।"

"কর্তব্য!" মনে মনেই বলল নাদিয়া।

ঠিক এই সময়ে আচমকা ভীষণ শব্দে বাজ পড়ল সামনে। গন্ধকের গন্ধে বাতাস ভরে উঠল। দপ করে জ্বলে উঠল বিশাল উঁচু কয়েকটা পাইন মাত্র বিশ ফুট দূরে। যেন দানবিক মশাল জ্বলতে লাগল দাউ দাউ করে।

ছিটকে গিয়ে মুখ থুবড়ে পড়েছিল ইম্‌সৃচিক। তড়াক করে লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠল গুরু গুরু বাজের আওয়াজ গড়গড়িয়ে দূরে মিলিয়ে যেতেই।

নাদিয়ার হাত ধরে চাপা গলায় কানে কানে বললে মাইকেল—"কারা যেন ডাকছে, তাই না নাদিয়া?"

১১ ॥ বিপদগ্রস্ত পর্যটক

ঝড়ের গোঁ-গোঁ গজরানি মুহূর্তের জন্যে দূরে মিলিয়ে যেতেই দম-আটকানো নীরবতা নামল চারপাশে। মাইকেল নিজেও যেন জোরে কথা বলতে ভয় পেল সেই শ্বাসরোধী স্তব্ধতার মধ্যে।

এবার স্পষ্ট শোনা গেল। অনেক দূরে কারা যেন 'বাঁচাও, বাঁচাও' করে চেঁচাচ্ছে। খুব দূরে নয়—কাছেই। বিপদে পড়েছে কোনো পর্যটক। ভ্রমণে বেরিয়ে প্রাণটাই বেরিয়ে যেতে বসেছে প্রলয়ংকর ঝড়ের খপ্পড়ে পড়ে।

মাইকেল সজাগ হল। নাদিয়া বললে—"দাদা, নিশ্চয় কেউ বিপদে পড়েছে।"

তাড়াতাড়ি ইম্‌সৃচিক বললে—"পড়ুক। আমরা যেতে পারব না।"

"আলবৎ যাবো!" হেঁকে উঠল মাইকেল।

"ঘোড়া আর গাড়ী জলাঞ্জলি দিয়ে?"

"হেঁটে যাব।—নাদিয়া, তুমি থাক এখানে। ইম্‌সৃচিককে একলা রেখে যেতে চাই না।"

"রইলাম, দাদা।"

ছিটকে সামনে ধেয়ে গেল মাইকেল। দেখতে দেখতে মিলিয়ে গেল অন্ধকারে।

বিড়বিড় করে ইম্‌সৃচিক শুধু বলল—"খুব ভুল করল কিন্তু আপনার

দাদা।"

নাদিয়া শুধু বললে—"ঠিকই করেছে।"

রাস্তার মোড়ে ঝড় তখন পাকসাট খেয়ে বিপজ্জনক ঘূর্ণিঝড়ের চেহারা নিয়েছে। বৃষ্টি থেমেছে ঠিকই, কিন্তু ভয়াবহ সেই ঘূর্ণিঝড়ে পা পর্যন্ত মাটিতে রাখা যাচ্ছে না—উড়িয়ে নিয়ে যেতে চাইছে মাইকেলের মত বলবান মানুষকেও। কি কষ্টে যে দু'পা মাটিতে রেখে হাঁটতে হল মাইকেলকে, তা শুধু সে-ই জানে।

বেশী দূর যেতে হল না। অন্ধকারের মধ্যেই আবার শোনা গেল সেই চীৎকার। খুব দূরে নয়। কাছেই কোথাও আটকা পড়েছে জনা দুই পর্যটক। তাদের কথাবার্তাও শোনা যাচ্ছে—শুধু দেখা যাচ্ছে না চেহারা-গুলো।

সংলাপ শুনে চক্ষুস্থির হয়ে গেল মাইকেলের। এ আবার কী?

"আরে এই মাথামোটা! ফিরে আসবি কি না বল্।"

"আয় না ফিরে! চাবকে ছাল তুলে দেব।"

"শয়তানের বাচ্চা গাড়োয়ান। হুঁশিয়ার! নিচে চোখ থাকে যেন।"

"কাণ্ডটা দেখেছেন। এ দেশের গাড়ীগুলোর ব্যবহারটা দেখেছেন।"

"এর নাম তেলগা গাড়ী!"

"রাস্কেল গাড়োয়ানটাকেও বলি হারি যাই। আমরা যে পড়ে রইলাম, তা না দেখেই ঘোড়া হাঁকিয়ে চলে গেল।"

"আমার মত একটা ইংরেজের চোখেও ধুলো দিয়ে গেল! মামলা করব তবে ছাড়বো—রাস্কেলকে ফাঁসির দড়িতে ঝোলাবো।"

কথাটা বলা হল রেগেমেগে—কিন্তু জবাবটা এল অট্টহাসির মধ্য দিয়ে—"চমৎকার! চমৎকার! একেই বলে রসের কথা।"

"হাসছেন? আপনি হাসছেন?" তেলেবেগুনে জ্বলে উঠল ইংরেজ।

"হাসির কথা বললে হাসবো না? ভায়ার প্রাণে রসও আছে বটে।"

ঠিক সেই সময়ে কড কড কড়াৎ শব্দে বাজ পড়ল ধারে কাছে। পাহাড়ের চূড়ায় চূড়ায় ধাক্কা খেয়ে বাজের আওয়াজ হাজার ঢাক পিটতে পিটতে মিলিয়ে গেল দূরে। গজরানি ক্ষীণ হয়ে আসতেই আবার শোনা গেল ফুর্তিবাজের কণ্ঠস্বর "গাড়ী বটে একখানা! নিশ্চয় ফ্রান্স থেকে আসে নি এমন খাসা গাড়ী!"

"ইংল্যাণ্ড থেকেও নয়।"

আবার বিদ্যুৎ লকলকিয়ে উঠল মাথার ওপর। বিশ গজ দূরে রাস্তার ওপর একটা তেলগা গাড়ীর পেছনের আধখানা দেখা গেল। রাস্তার গর্তে বেশ ভাল করেই চাকা আটকে গেছে। বিচিত্র যানের ওপর পাশাপাশি বসে দুজন পর্যটক।

আকর্ণ হাসি নিয়ে এগোলো মাইকেল। কাছে আসতেই চিনতে পারল দুই মক্কেলকে। খবরের কাগজের সেই দুই সাংবাদিক—অহি-নকুল সম্পর্ক যাদের মধ্যে।

ওকে দেখেই সোল্লাসে বললে ফরাসী সাংবাদিক—"আসুন। অত্যন্ত খুশী হলাম আপনাকে দেখে। ইনি আমার প্রাণের শত্রু, মিঃ ব্লাউন্ট।"

সামাজিক রীতি অনুযায়ী মিঃ ব্লাউন্টও পরিচয় দিতে যাচ্ছেন ফরাসী সহচরের, তার আগেই বাধা দিয়ে মাইকেল বললে—"পরিচয়ের দরকার নেই। আপনাদের চিনি। ভলগায় স্টীমারে দেখেছিলাম।"

"আরে তাই তো। মিস্টার—"

"নিকোলাস কোরপানফ—ইরকুটস্কের ব্যবসাদার। কিন্তু ব্যাপার কি বলুন তো? আপনার সঙ্গী ভদ্রলোক তো দেখছি রেগে লাল হয়ে আছেন।"

"মিস্টার কোরপানফ," পরম উল্লাসে বললেন অ্যালসাইড—"ব্যাপার খুব মজার। আমাদের তেলগা গাড়ীর গাড়োয়ান মহাশয় ঘোড়া আর গাড়ীর সামনের আধখানা নিয়ে রওনা হয়েছেন—আমাদের রেখে গেছেন পেছনের আধখানায়—ঘোড়া ছাড়াই। মজার ব্যাপার নয় কি?"

"মোটেই মজার ব্যাপার নয়।" কাঠস্বরে বললেন ইংরেজ।

"দূর মশায়, সবকিছুর মধ্যেই মজাটাকে দেখতে পান না কেন?"

"বটে! এতই যদি মজা তো বলুন এ গাড়ী নিয়ে এখন যাই কি করে?" ব্লাউন্ট সত্যিই খেপেছেন।

"খুব সহজে," চোখ নাচিয়ে বললেন অ্যালসাইড। "আপনি গাড়ী টানবেন—ঘোড়ার বদলে—আমি লাগাম ধরে হাঁকবো—'চলরে ছোট্ট পায়রা। উড়ে যা পতপতিয়ে।"

"মিস্টার জোলিভেট। ইয়ার্কিটা কিন্তু এবার সত্যি সত্যিই গাড়োয়ানি ইয়ার্কি হয়ে দাঁড়াচ্ছে।"

"কিছুদূর গিয়ে আমি যাবো আপনার জায়গায়। ছিপটি শন শনিয়ে লাগাম ঝাঁকিয়ে আপনি তখন হেঁকে যাবেন—'যা যা বেটা ডানা ভাঙা শামুক, বিটলে বামন কচ্ছপ'।"

মাইকেল আর হাসি চাপতে পারল না। রগড় করতে জানে বটে অ্যাল-সাইড জোলিভেট।

বললে হাসতে হাসতে—"শুনুন, শুনুন, আমি বুদ্ধি বাৎলাচ্ছি। চড়াই বেয়ে ওঠার পালা শেষ হয়েছে—এবার নামার পালা ঢালু রাস্তায়। আমার তিনটে ঘোড়ার একটা দিচ্ছি আপনাদের। আধখানা তেলগায় লাগিয়ে নিন। কাল সকালেই পৌঁছে যাবেন একাটেরেনবার্গে।'

"আপনি সত্যিই দয়ার অবতার, মিস্টার কোরপানফ," অ্যালসাইড বললে রসিকজনের মতই।

মাইকেল বললে—"আমার তারানতাসেই তুলে নিতাম আপনাদের সঙ্গে আমার বোন না থাকলে—গাড়ীতে আর জায়গা নেই।"

হ্যারি ব্লাউন্ট বলে উঠল—"আপনার সাহায্যের জন্যে কৃতজ্ঞ রইলাম। কিন্তু ঐ বেটা ইম্‌সৃচিককে যদি পাই—"

"শুধুমুধু রাগ করছেন," বললে মাইকেল—"এ রকম দুর্ঘটনা এর আগেও ঘটেছে উরালে।"

"তবে ফিরে আসছে না কেন?'

"জানলে তো ফিরে আসবে? জানবে একাটেরেনবার্গে পৌঁছোনোর পর। দেখবে শুধু সামনেটাই পৌঁছেছে—পেছনটা নিশ্চয় উবালে পড়ে আছে।'

"মজা তো সেইটাই," সোল্লাসে ফের বললেন জোলিভেট।

"চলুন" ঘুরে দাঁড়ালো মাইকেল।

"তেলগা এইখানেই থাকবে?" ব্লাউন্ট যেন দ্বিধায় পড়লেন।

আবার কলকলিয়ে উঠলেন জোলিভেট—"ভায়া, আপনার তেলগা মাটিতে এমন চমৎকার শেকড় চালিয়ে বসে আছে যে কাল পর্যন্ত ফেলে রাখতে পারলে দেখবেন গাছ হয়ে ফুল ফোটাতে আরম্ভ করে দিয়েছে।"

অদ্ভুত রসিক লোক বটে জোলিভেট। মুখ গোমড়া করে ব্লাউন্ট পা বাড়ালেন মাইকেলের পেছনে। অ্যালসাইড জোলিভেট চললেন সচল রসের কলসীর মত। হাসি আর মজা উপচে পড়তে লাগল প্রতিটি কথার মধ্যে।

বললেন—"মিস্টার কোরপানফ, আপনার সঙ্গে এই তেপান্তরের স্তেপে আবার দেখা হবেই মনে হচ্ছে।"

অর্থাৎ মাইকেলের গন্তব্যস্থানটা সুকৌশলে জেনে নিতে চান অ্যালসাইড।

হুঁশিয়ার হয়ে গেল মাইকেল।

বললে—"আমি যাচ্ছি ওম্‌স্কে।"

"আর আমরা যাচ্ছি যেখানে বিপদ আছে. আর আছে খবর।"

"লড়াই চলছে যেখানে?" উৎসুক হল মাইকেল।

"হ্যাঁ।"

"আমি কিন্তু ছাপোষা ব্যবসাদার। কামানের গোলা আর বর্শার ফলাকে সইতে পারি না। লড়াই যেখানে তার ধারে কাছেও থাকি না।"

"তাহলে তো আপনার মত উপকারী বন্ধুকে পথে পেয়েও হারাবো। কিন্তু একাটেরেনবার্গ থেকে দিন কয়েক এক সঙ্গে যাওয়া যাবে না?"

"ওমস্ক পর্যন্ত?"

"জানলে তো ছাই বলব। ইচিম পর্যন্ত জানি যাচ্ছি। তারপর অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা।"

"তাহলে ইচিম পর্যন্তই একসঙ্গে যাব 'খন।"

মাইকেলের ইচ্ছে নয় কারো সঙ্গে যাওয়া। কিন্তু কিছুটা পথ একসঙ্গে গেলে মন্দ হয় না।

হঠাৎ শুধোলো নিরীহ গলায়—"তাতারদের খবর রাখেন?"

"নিশ্চয় রাখি। ফিওফার খানের তাতার বাহিনী সেমিপোলাটিনস্ক আক্রমণ করেছে। এখন ইরতিশ বরাবর এগোচ্ছে। ওমস্ক যদি যেতে চান তো চটপট চলুন।"

"তাই তো যাচ্ছি।"

"আরও খবর আছে। কর্ণেল ওগারেফ সীমান্ত পেরিয়ে গেছে ছদ্মবেশে—তাতার বাহিনীতে গিয়ে ভিড়বে শীগগিরই।"

শুনেই যেন ঘুম থেকে জেগে উঠলেন হ্যারি ব্লাউন্ট—"সে খবরও রাখেন?"

"আলবৎ রাখি।"

"জানেন কি ছদ্মবেশটা ছিল জিপসীর?"

"জিপসীর।" চমকে ওঠে মাইকেল। হঠাৎ মনে পড়ে যায় নিজনি-নোভোগোরোদের সেই বুড়ো জিপসীর আলখাল্লামোড়া চেহারাটা।

খুশী খুশী গলায় অ্যালসাইড বললেন—"তাও জানি। খবরটা আমার দূর সম্পর্কের বোনকেও জানিয়ে দিয়েছি।"

"কাসানে নেমে বেশ কিছু কাজ সেরেছেন দেখছি," ব্লাউন্টের গলা এবার একেবারেই কাঠখোট্টা।

"তা পেরেছি। 'ককেসাস' যখন কয়লা তুলেছে, আমি তখন খবর পাচার করেছি।"

ফের শুরু হয়ে গেল কথার তরজা। মাইকেলের মন ছিল না সেদিকে। ভাবছিল জিপসীদের কথা। জিগানা জিপসীবুড়োর মুখটা সে দেখতে পায়নি। কিন্তু জিগানী মেয়েটা তাকে ভাল করেই দেখে গেছে। অদ্ভুত-ভাবে তার আপাদমস্তকে চোখবুলিয়ে গেছে। কেন?

চিন্তার সুতো ছিঁড়ে গেল পিস্তলের আওয়াজে।

তারানতাসের দিক থেকে ভেসে এল শব্দটা।

চক্ষের নিমেষে শব্দ লক্ষ্য করে ধেয়ে গেল মাইকেল।

দেখে তাজ্জব হলেন অ্যালনাইড। মনে মনেই বললেন—"অবাক কাণ্ড তো! কামানের গোলা আর বর্শার ফলাকে যে ভয় পায়, পিস্তলের আওয়াজ শুনে সেইদিকেই সে ছুটে যায় কেন?"

ভাবতে ভাবতেই ব্লাউন্টকে নিয়ে দৌড়োলেন মাইকেলের পেছনে। এসে পৌঁছোলেন মস্ত পাথরটার এদিকে—যার ওদিকে সুরক্ষিত রয়েছে তারানতাস।

আচমকা শোনা গেল গর্ গর্ গজরানি। ক্রুদ্ধকণ্ঠে চেঁচাচ্ছে ভালুক। সঙ্গে সঙ্গে আবার শোনা গেল পিস্তল নির্ঘোষ।

"নাদিয়া! নাদিয়া!" চক্ষের নিমেষে ছোরা বার করে পাথরকে পাক দিয়ে ধেয়ে গেল মাইকেল।

জ্বলন্ত পাইনের আগুনের আভায় দেখা গেল নাদিয়া পিস্তল হাতে দাঁড়িয়ে —সামনেই দাঁড়িয়ে থাবা তুলেছে বিরাট একটা ভালুক। ঝড়ের দাপটে নিশ্চয় বেরিয়ে এসেছে জঙ্গল ছেড়ে। দেখেই ভয়ের চোটে লাগাম ছিঁড়ে পালিয়েছে দুটো ঘোড়া। ইমসচিক দৌড়েছে ঘোড়ার পেছন পেছন। তৃতীয় ঘোড়াটার দিকে ভালুক মশায় এগিয়েছিল নখের ধার পরখ করার মতলবে—ঘোড়া খতম হলে বিষম বিপদ বুঝতে পেরে নাদিয়া দৌড়ে গিয়ে গাড়ী থেকে মাইকেলের পিস্তল তুলে নিয়ে গুলি করেছে ভালুকের কাঁধে। পুঁচকে একটা মেয়ের এত স্পর্ধা দেখি রেগে তিনটে হয়ে চেঁচাতে চেঁচাতে ঘোড়া ছেড়ে দু'পেয়ে জীবটাকেই থাবার ঘায়ে শোয়াতে এসেছিল বনের রাজা। কিন্তু দু'পেয়েটা দোনলা পিস্তলের শেষ গুলিটাও তার মুখের ওপর এইমাত্র ছুঁড়েছে। অগত্যা মরণ মার মারবার জন্য থাবা তুলেছে ভালুক—

এমন সময়ে ছোরা নিয়ে দুজনের মাঝে হাজির হল মাইকেল এবং চোখের

পলক ফেলার আগেই পাকা হাতে ছোরা মারল নিচ থেকে ওপর দিকে—ভুঁড়ি ফেঁসে চিৎপাত হয়ে পড়ল বনের রাজা।

এই সেই বিখ্যাত সাইবেরিয়ান শিকারীদের ছুরি-চালনা—চামড়া নষ্ট না করে ভালুক বধের আশ্চর্য কৌশল।

"নাদিয়া! চোট লাগেনি তো?"

"না, দাদা।" গলা পর্যন্ত কাঁপল না নাদিয়ার।

হাঁপাতে হাঁপাতে কাছে এলেন দুই সাংবাদিক। সোল্লাসে চেঁচিয়ে বললেন অ্যালসাইড—"সাবাস মিঃ কোরপানফ! কিসের কারবার করেন মশাই আপনি? ছোরা চালালেন তো পাকা শিকারীর মত।"

"ছোটবেলা থেকেই শিখতে হয় প্রত্যেককেই," ছোট করে জবাব দিল মাইকেল।

কিন্তু জবাবটা কি মনে ধরল সাংবাদিক দুজনের? নিশ্চয় নয়। আগুনের লাল আভায় প্রদীপ্ত রক্তঝরা ছোরা হাতে মরা ভালুকের ওপর এক পা তুলে দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা বীরোচিত তেজোদৃপ্ত পুরুষসিংহের মত মাইকেলের মূর্তির পানে তাকিয়ে নিজের মনেই বললেন অ্যালসাইড—"বড় ভয়ংকর লোক দেখছি!"

বলেই এগোলেন নাদিয়ার পানে। অভিবাদন জানালেন।

এগিয়ে এলেন হ্যারি ব্লাউন্টও। অভিবাদন জানালেন নাদিয়াকে। বাতাসে মাথা ঠুকে অভিবাদন ফিরিয়ে দিলেন নাদিয়া।

ফুর্তি উচ্ছল কণ্ঠে বললেন অ্যালসাইড—"যেমনি দাদা তেমনি বোন। ভালুক বেটার মগজ মোটা বলেই ঘাঁটাতে এসেছিল আপনাকে।"

ঠিক এই সময়ে পলাতক ঘোড়া দুটোকে টানতে টানতে ফিরে এল ইমস্চিক। লম্বমান ভল্লুকটাকে দেখে একটু যেন দুঃখিতই হল। ভাবখানা—আহারে। এমন খাসা চামড়াটা ফেলে যেতে হয় হবে শকুন-শেয়ালের জন্যে!

মাইকেল বুঝিয়ে দিলে এখন কি করণীয়। একটা ঘোড়া টেনে নিয়ে যাবে আধখানা তেলেগাকে।

"কিন্তু একটার জায়গায় যে দুটো গাড়ী হয়ে গেল।" ইমস্চিক চলে এল দরদামের মধ্যে।

তৎক্ষণাৎ জবাব দিয়ে দিলেন অ্যালসাইড—"টাকাও পাবে ডবল।"

বাস! টাকার গন্ধ পেয়েই মুখ চুল বদলিয়ে উঠল ইমস্চিকের—"চল রে কচ্ছপকা বাচ্চা—পায়রার রাণী! ছুটে চল! ডবল টাকা!"

নাদিয়া বসল তারানতাসে। বাকী সবাই হেঁটে চলল আধখানা তেলগার দিকে। পৌঁছালো দিনের আলো পূবের আকাশে দেখা যাওয়ার সময়ে। একটা ঘোড়া ভাঙ্গা গাড়ীতে লাগানো হল। তারপর দুটো গাড়ী গড়গড়িয়ে নেমে চলল পাহাড়ি রাস্তা বেয়ে।

সবচেয়ে মজা হল একাটেরেনবার্গে পৌঁছানোর পর। ঘোড়াশালায় প্রশান্ত মুখে দাঁড়িয়েছিল তেলগার গাড়োয়ান আধখানা তেলগার ফিরে আসার পথ চেয়ে। দুই সাংবাদিককে দেখেই হাত বাড়িয়ে চাইল বখশিস্।

আর যায় কোথায়! সময় মত পেছিয়ে গেল বলেই রক্ষে পেয়ে গেল বেচারা গাড়োয়ান—নইলে 'না ভোডকো'র বদলে ব্লাউন্টের বক্সিং জুটতো বরাতে। এক ঘুসিতেই ঠিকরে যেত মাটিতে।

হা-হা করে হেসে উঠলেন অ্যালসাইড—"মিঃ ব্লাউন্ট। এ কিন্তু অন্যায়। ওর দোষ কি বলুন? এই নাও বাপু।" বলে, পকেট থেকে এক খামচা কোপেক বার করে গুঁজে দিলেন নির্বিকার ইমসৃচিকের হাতে।

ফলে আরো ক্ষেপে গেলেন ব্লাউন্ট। তেলগার মালিককে পর্যন্ত আদালতে টেনে আনার হুমকি দিলেন। তিড়িংমিড়িং করে লাফাতে লাফাতে বললেন, ছাড়বেন না তিনি—কাউকে ছাড়বেন না—নাকের জলে, চোখের জলে করে ছাড়বেন সবাইকে।

হাসতে হাসতে অ্যালসাইড বললে—"রাশিয়ায় মামলা শুরু করলে কি হয় জানেন?"

"কি আবার হয়?"

"গল্পটা জানেন না?"

"কিসের গল্প?"

"আঁতুড়ে ছেলেকে বারোমাস দুধ খাইয়ে টাকা চেয়েছিল এক দাইমা! মামলার যখন নিষ্পত্তি হল আঁতুড়ের ছেলে তখন কোথায় জানেন?"

"কোথায়?"

"ইম্পিরিয়েল গার্ডের কর্ণেল।"

হো-হো করে উঠলেন এবার প্রত্যেকেই।

অ্যালসাইড নিজেও মনের সুখে হাসলেন নিজের রসিকতায়। তারপর নোটবইয়ে তেলগার নতুন সংজ্ঞা লিখলেন রাশিয়ান আর ইংলিশ ডিক্সনারীর উন্নতি কল্পে।

লিখলেন—"তেলগা একটা রাশিয়ান গাড়ী। যাত্রা শুরুতে চারটে চাকা থাকে—যাত্রা শেষে দুটো।"

১২ ॥ মাইকেল চাবুক খেল

একাটেরেনবার্গে আসবার সময়ে ঘোড়া আর গাড়ী পাওয়া নিয়ে অনেক সমস্যা হয়েছিল—কিন্তু পৌঁছোনোর পর নতুন গাড়ী জোটানো নিয়ে কোনো ঝামেলাই হল না। কারণ সাইবেরিয়ার ধু-ধূ পথে পা বাড়াতে কেউ চায়না।

কাজেই পোয়াবারো হল মাইকেল এবং সাংবাদিক দুজনের। ব্লাউন্ট আর জোলিভেট ভাঙা তেলগা পালটে নিয়ে নিল একটা মজবুত তেলগা। মাইকেল কিন্তু তারানতাস ছাড়ল না। শুধু নিল তিনটে তাজা ঘোড়া।

ঠিক বারোটার সময়ে সূর্যকে মাথায় নিয়ে একাটেরেনবার্গ ছেড়ে রাস্তা কাঁপিয়ে বেরিয়ে পড়ল দু'দুটো গাড়ী।

নাদিয়ার মনের অবস্থা এখন কি রকম ? বাবার চিন্তা কি এখনো মন জুড়ে আছে ? না। সব দুশ্চিন্তার অবসান ঘটিয়েছে মাইকেল। মাইকেলের মধ্যে সে পেয়েছে এমন এক মানুষকে যে বড় ভাইয়ের মতই তাকে শত বিপদের মধ্যে বুক দিয়ে আগলে রাখছে। নাদিয়া বুঝেছে তার আর কোনো ভয় নেই। ভগবান পাঠিয়ে দিয়েছেন মাইকেলের মত পুরুষ সিংহকে। সবার কাছে সে পেঁাছোবেই—শুধু যা একটু সময় লাগবে। পথ তো কম নয়।

আর মাইকেল কি ভাবছে ? তার দুশ্চিন্তা একদিকে যেমন বেড়েছে, আর একদিক দিয়ে তেমনি মনটা আনন্দে ভরে উঠেছে। বারবার ঈশ্বরের জয়গান গাইছে নাদিয়ার মত মিষ্টি একটি বোনকে পথের মধ্যে পাইয়ে দেওয়ার জন্যে। মেয়েটা শুধু সুন্দরী নয়, অসম্ভব সাহসিনী। নাদিয়াকে মাইকেল তাই স্নেহ যতটা না করে, তার চাইতেই বেশী করে সম্মান।

দুশ্চিন্তা আরম্ভ হয়েছে সাইবেরিয়ায় পা দেওয়ার পর থেকেই। বিশ্বাস-ঘাতক আইভান ওগারেফও সাইবেরিয়ায় ঢুকে পড়েছে জিপসীদের ছদ্মবেশে—মাইকেলের চোখের সামনে দিয়ে। সন্দেহও হয়নি। কিন্তু এখন যদি তাতার গুপ্তচর অধ্যুষিত সাইবেরিয়ায় ঘুণাক্ষরেও কেউ জেনে ফেলে যে নিকোলাসের ছদ্মবেশে রাশিয়ার রাজদূত চলেছে গুপ্ত খবর নিয়ে—তাহলে প্রাণটাই রেখে যেতে হবে সাইবেরিয়ার প্রান্তরে। আইভান ওগারেফ নিশ্চয় নিজের মৃত্যুর পরোয়ানা নিয়ে মাইকেলকে জ্যান্ত পেঁাছোতে দেবে না

ইরকুটস্কে। মাইকেলের কর্তব্য এখন তাই দ্বিগুণ। জারের চিঠি যেন কারো হাতে না পড়ে এবং নিজের প্রাণটাও যেন শেষ পর্যন্ত ধড়ে থেকে যায়।

অ্যালসাইড রঙ্গ রসিকতা চালিয়ে যাচ্ছেন আগের মতই—কিন্তু নাদিয়া যে তাঁর মনে সাড়া ফেলেছে, তাও বোঝা যাচ্ছে টুকরো-টাকরা কথার মধ্যে থেকে। যে মেয়ে পথের এত ধকল মুখ বুঁজে সহ্য করে সে সামান্য মেয়ে নয়—প্রশংসাও করছেন শত মুখে।

কিন্তু বলিহারি যাই তাঁর সাংবাদিক সহচরকে। নাদিয়া নিয়ে কোনো মাথাব্যথাই নেই তাঁর। কথা বলতেও নারাজ। অ্যালসাইড পর্যন্ত ক্ষেপে গেলেন শেষকালে।

ব্লাউন্ট জিজ্ঞেস করেছিলেন মেয়েটাকে কি রকম মনে হয়?

"কোন মেয়েটাকে?"

"নিকোলাস কোরপানফের বোনকে।"

"ওঁর বোন নাকি?"

"তবে কি ঠাকুমা?" ঝাঁঝিয়ে উঠলেন অ্যালসাইড।

"কত বয়স বলুন তো মেয়েটার?"

"জন্মের সময়ে হাজির থাকলে বলতে পারতাম," কাট ছাঁট জবাব দিয়ে অ্যালসাইডের মেজাজ তিরিক্ষে করে ছাড়লেন ব্লাউন্ট।

প্রায় মরু অঞ্চলের ওপর দিয়ে তখন ছুটে চলেছে পর-পর দুখানা গাড়ী। তাতার বাহিনী আসছে খবর পেয়েই চম্পট দিয়েছে গাঁয়ের বাসিন্দারা। ক্ষেত খামারেও খুব একটা কাউকে দেখা যাচ্ছে না। লম্বা রাস্তা বলেও চেনা যেত না পথের ধুলো না থাকলে—গাড়ীর চাকায় মেঘের মত ধুলো উড়ছে বলেই ধূ-ধূ তেপান্তরের মধ্যে রাস্তার অস্তিত্ব ঠাহর করা যাচ্ছে। আর দেখা যাচ্ছে টেলিগ্রাফের খুঁটির পর খুঁটি। লম্বা তার হাওয়ায় কাঁপছে আর সন্ সন্ করে বাজনা বাজিয়ে চলেছে। ঘোড়াশালায় ঘোড়াও মিলছে। টেলিগ্রাফের ঘাঁটি থেকে খবর পাঠানোও যাচ্ছে। এ সব ব্যাপারে এখনো পর্যন্ত বেকায়-দায় পড়তে হয়নি মাইকেলকে অথবা ছিনেজোঁক সাংবাদিক দুজনকে। 'না ভোদকো'র কৃপায় ইমস্চিকরাও গাড়ী দুটোকে যেন উড়িয়ে নিয়ে চলেছে পক্ষীরাজের বেগে।

২৩শে জুলাই সামনে অনেক দূরে দেখা গেল একটা ঘোড়ার গাড়ী। ধুলোর মেঘ উড়িয়ে ছুটে চলেছে নক্ষত্র বেগে। গাড়ীটা তেলগা নয়,

তারানতাসও নয়—পোস্ট বার্লিন। ঘোড়া দুটো দীর্ঘ পথ একনাগাড়ে ছুটে আর ছিপটির বেদম প্রহারে ছুটতে আর পারছে না—তবুও পড়ি কি মরি করে ছুটছে প্রাণের মায়ায়। ধুলোর পুরু স্তরে ঢাকা গোটা গাড়ীটা—যেন আসছে বহুদূর থেকে।

তেলগা আর তারানতাস দেখতে দেখতে নাগাল ধরে ফেলল পোস্ট বার্লিনের। এদের ঘোড়া তাজা, ফলে চোখের পলকে সাঁৎ সাঁৎ করে বেরিয়ে গেল পোস্ট বার্লিনের পাশ দিয়ে।

ঠিক সেই সময়ে একটা মুণ্ড বেরিয়ে এল পোস্ট বার্লিনের ছইয়ের ভেতর থেকে। মুখটা ভাল করে দেখা গেল না ধুলোর মেঘের মধ্যে দিয়ে—কিন্তু শোনা গেল পুরুষ কণ্ঠের জবরদস্ত হুকুম :

"দাঁড়াও।"

কিন্তু কোনো গাড়ীটাই দাঁড়ালো না। দেখতে দেখতে পেছনে পড়ল পোস্ট বার্লিন। তেলগা আর তারানতাসের ঘোড়াদের দৌড় দেখে নবীন প্রেরণায় পোস্ট বার্লিনের ঘোড়া দুটোও টগবগিয়ে ছুটল তাদের নাগাল ধরবার জন্যে—সেই সঙ্গে সপাং সপাং শব্দে চাবুক পড়তে লাগল পিঠে—আকাশ যেন ফালা-ফালা হয়ে গেল গাড়োয়ানের অশ্রাব্য গালিগালাজে। কিন্তু পারবে কেন তাজা ঘোড়াদের সঙ্গে? পোস্ট বার্লিন পেছিয়ে গেল আরও পেছনে—শেষকালে হারিয়ে গেল দিগন্তে।

রাত আটটায় ইচিমের ঘোড়াশালায় এসে পৌঁছোলো গাড়ী দুটো। ভাগ্য ভাল পোস্ট বার্লিনকে পেছনে ফেলে এসেছিল মাইকেল। কেননা, ঘোড়াশালায় তাজা ঘোড়া রয়েছে মাত্র তিনটে—বাকী সব পথশ্রমে ক্লান্ত। সাংবাদিক দুজন ইচিমে থাকবেন—কাজেই তিনটে ঘোড়াকেই তারানতাসে ঝটপট জুততে হুকুম দিল মাইকেল। ইচিমে আর একদণ্ডও নয়। কেননা, তাতাররা এসে পড়ল বলে—শহর কর্তৃপক্ষ পালিয়েছে শহর ছেড়ে। ওদিকে পোস্ট বার্লিনও এসে পড়ল বলে। এসেই তো তাজা ঘোড়া চাইবে—ঝগড়া লাগবেই মাইকেলের সঙ্গে।

শুনে অ্যালসাইড টিপ্পনী কাটলেন—"পোস্ট বার্লিনের ভয়ে পালাচ্ছেন?"

"ভয়ে নয়—ঝামেলা এড়াতে চাইছি।" কথাটা সত্যি। নাহক কোনো ঝঞ্ঝাটে নিজেকে জড়াতে চায় না মাইকেল।

কিন্তু রাম না চাইলেও রহিম চায় ঝগড়া বাঁধাতে। হলও তাই। মাইকেলের মুখের কথা খসতে না খসতেই হুড়মুড় করে একটা গাড়ী এসে

দাঁড়াল ঘোড়াশালার সামনে। লাফ দিয়ে নামল আরোহী। দড়াম করে দরজা খুলে ঢুকল ভেতরে।

চালচলন চেহারাচরণে লোকটা খাস মিলিটারী বলেই মনে হল। বছর চল্লিশ বয়স। তালঢ্যাঙা। দশাসই বপু। ইয়া চওড়া কাঁধ। মাথা তো নয়—যেন একটা বুলেট। পুরু গোঁফ গিয়ে মিশেছে লাল গালপাট্টায়। মামুলি ইউনিফর্ম। কোমরে অশ্বারোহীদের তলোয়ার। এক হাতে একটা ছোট হাতলওয়ালা চাবুক।

ঘরে ঢুকেই হুকুম ছাড়লেন বাজখাঁই গলায়—"ঘোড়া লাগান।"

"ঘোড়া নেই," বলল পোস্ট মাস্টার।

"যেখান থেকে হোক জোগাড় করুন।"

"অসম্ভব।"

"দোরগোড়ায় ঘোড়া তিনটে কার?"

"এই ভদ্রলোকের।"

"খুলে নিন—লাগান আমার গাড়ীতে।"

এক পা এগিয়ে মাইকেল বললে—"ঘোড়া তিনটে আমার।"

"তাতে কি এসে গেল? ও ঘোড়া আমি চাই। তাড়াতাড়ি করুন—হাতে একদম সময় নেই।"

"আমারও সময় নেই।" অতি কষ্টে সংযত রইল মাইকেল।

"থাক, থাক, ঢের হয়েছে।" বলেই পোস্ট মাস্টারের দিকে ফিরে কর্তৃত্বব্যঞ্জক গলায় মারমুখো ভঙ্গিমায় বলল মিলিটারী পুরুষ—"তারানতাস থেকে খুলে নিয়ে বার্লিনে লাগিয়ে দিন ঘোড়াগুলো।"

মহা ফাঁপরে পড়ল বেচারী পোস্ট মাস্টার। একবার চাইল মাইকেলের দিকে—আর একবার উদ্ধত লোকটার দিকে। কি করবে তা ভেবে পেল না।

পোদোরজ্ঞা বার করে বিবাদের ফয়সালা করে নিতে পারত মাইকেল—কিন্তু তাহলেই তো নিজেকে জাহির করা হয়। বিদেশ বিভূঁয়ে নতুন ঝঞ্ঝাট ডেকে লাভ কী?

তাই বললে শান্ত গলায়—"ঘোড়া তারানতাসেই থাকবে।"

"দেবেন না ঘোড়া?" কর্কশ গলায় হুংকার ছাড়ল দশাসই বপু।

"না।"

"তাহলে লড়ে নেব।" বলেই খপ্ করে তলোয়ার টেনে বার করল

খাপ থেকে—"চলে আসুন—যদি বাঁচতে চান !"

চক্ষের নিমেষে দুজনের মাঝে এসে দাঁড়াল নাদিয়া। এগিয়ে এলেন ব্লাউন্ট এবং গোলিভেটভ।

বুকের ওপর দুহাত ভাঁজ করে রেখে মাইকেল শুধু বললে "আমি তো লড়ব না।"

"লড়বেন না ?"

"না।"

"এর পরেও না ?" বলেই চাবুকের হাতল দিয়ে খটাং করে মারল মাইকেলের কাঁধে।

নিমেষে মড়ার মত ফ্যাকাশে হয়ে গেল মাইকেলের মুখ। থরথরিয়ে কেঁপে উঠল সবশরীর।

দ্বন্দ্বযুদ্ধের আহ্বান। এ হেন অপমানের নিষ্পত্তি দ্বন্দ্বযুদ্ধেই হয়। কিন্তু মাইকেল তো দ্বন্দ্বযুদ্ধে নামতে পারে না এখন। ব্যক্তিগত মানঅপমানের চেয়ে অনেক বড় রাজকার্য কর্তব্য। যে কাজ নিয়ে বেরিয়েছে, তা পণ্ড হবে তরবারি যুদ্ধে নামলেই।

তাই দাঁতে ঠোঁট কামড়ে সামলে নিল নিজেকে।

"কাওয়ার্ড !" আতাব্র ঘৃণায় যেন হিসহিসিয়ে উঠল উদ্ধত পুরুষ। "ঘোড়া লাগান এখুনি।"

তাচ্ছিল্য আর অনুকম্পার চোখে মাইকেলকে দেখে নিয়ে বেরিয়ে গেল পোস্ট মাস্টার। পেছনে চাবুক হাতে লোকটা। একটু পরেই গড় গড় করে উধাও হল পোস্ট বার্লিন।

স্তম্ভিতের মত এতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল সাংবাদিক দুজন। নিজেদের চোখকেই যেন বিশ্বাস করতে পারছিল না। এও কি সম্ভব ? দুর্দান্ত দাপটে যে যুবাপুরুষ উরালের কাল গিরিপথে ভয়ংকর ভালুককে ছোরার এককোপে যমালয়ে পাঠাতে পারে—প্রাণে যার এতটুকু ভয় নেই—সে কিনা এমন অপমানের পরেও দ্বন্দ্বযুদ্ধে নামতে ভয় পায় ?

নিষ্কম্প চরণে নাদিয়া এগিয়ে এল কম্পমান মাইকেলের সামনে। এক হাতে ধরল দাদার হাত—আর এক হাতে মুছিয়ে দিল চোখের এক ফোঁটা জল।

১৩ ॥ কর্তব্য আগে

পোস্ট মাস্টার অবজ্ঞার চোখে তাকিয়ে ছিল মাইকেলের পানে। সাইবেরিয়ার বুড়ো তো. কোনো জোয়ান মানুষ যে এই অপমান মুখ বুঁজে সইতে পারে স্রেফ প্রাণের মায়ায়—তা তার কল্পনারও অতীত।

রেগে গেল মাইকেল—"আপনার সাহস তো কম নয়? কি ভাবছেন আমার সম্বন্ধে?"

"ভাবছি অনেক অপমান ব্যবসাদারও সয় না—ফিরিয়ে দেয়।"

"ঘুসির জোরে?"

"হ্যাঁ, ঘুসির জোরে। আমার বয়স হয়েছে. ঘুসির জোর এখনো কমেনি বলেই বললাম কথাটা।"

এগিয়ে গেল মাইকেল। বলিষ্ঠ দুই মুষ্টি রাখল বৃদ্ধের কাঁধে। বললে বজ্রগর্ভ দ্রিমিদ্রিমি কণ্ঠে—"সবে পড়ুন। বকাবেন না—পোকার মত টিপে মেরে ফেলতে পারি বুঝছেন না?"

চেয়ে রইলেন বৃদ্ধ। বললে নিজের মনে—"এই তো চাই।"

মাইকেল কিন্তু অস্থির হয়ে রইল সমস্ত রাত। কাঁধের যেখানে চাবুকের হাতল পড়েছিল. অপমানের জ্বালায় সে জায়গায় ব্যথা যেন গিয়েও যাচ্ছিল না। এ জ্বালা যাবারও নয়। শোবার আগে ভগবানকে ডাকল কিছুক্ষণ।

প্রার্থনার শেষে শুধু বললে—"ঈশ্বর. এ সবই তোমার জন্যে. দেশের জন্যে, ফাদারের জন্যে।"

নাদিয়া কিন্তু বুঝেছিল ডাকাবুকো মাইকেল কেন সয়ে গেল এত বড় অপমান। সে তার নিজের প্রভু নয়। নিজের ইচ্ছেতে সে চলছে না। কর্তব্য তাকে চালাচ্ছে—ব্যক্তিগত অপমানকে তাই রেখেছে পায়ের তলায়। শ্রদ্ধায় মাথা নুয়ে এল নাদিয়ার।

পরদিন সকাল আটটায় তিনটে তেজী ঘোড়া নিয়ে টগবগিয়ে ইচিম ছেড়ে রওনা হল তারানতাস- তিক্ত স্মৃতির শহর পড়ে রইল পেছনে। উদ্ধত লোকটার মুখচ্ছবি কিন্তু চিরকালের জন্যে ছাপা হয়ে গেল মাইকেলের মনের পটে। জাগ্রত হল তীব্র কৌতূহল। লোকটা কে, কোত্থেকে আসছে, কোথায় যাচ্ছে—সব জানতে হবে।

বিকেল চারটের সময়ে তারানতাস এল আবাট্স্কেইয়া'তে। এখানে

ইচিম পেরোতে হবে খেয়া নৌকোতে। ঘন্টা দুয়েক সময় নষ্ট হল সেই ব্যবস্থা করতে। ছটফট করতে লাগল মাইকেল। অনেক খারাপ খবরও কানে এল। ইচিমের দুপাড়েই ফিওফার-খানের স্কাউট পৌঁছে গেছে। ওমস্ক আর নিরাপদ নয়। তাতারদের সঙ্গে রাশিয়ান সৈন্যবাহিনীর একচোট লড়াইও হয়েছে—হেরে গিয়ে পেছিয়ে গেছে রাশিয়ার ফৌজ। চাষীরা ক্ষেত-খামার ফেলে পালাচ্ছে। নিদারুণ অত্যাচার চালাচ্ছে বিজয়ী তাতার বাহিনী। বাড়ী ঘরদোরে আগুন লাগিয়ে দিচ্ছে, লুঠপাট খুনজখমের মোচ্ছব আরম্ভ হয়ে গেছে।

খরস্রোতা ইচিমের দক্ষিণ পাড়ে পৌছোলো খেয়া নৌকো। আবার শুরু হল যাত্রা। তারানতাস ছুটছে ধুলোর মেঘ তুলে। মাইকেল কিন্তু নীরব।

নাদিয়া বললে—"দাদা, তাতাররা ওমস্কে ঢুকলে তোমার মায়ের প্রাণ নিয়ে টানাটানি পড়বে। খবর পেয়েছো মায়ের?"

"না, নাদিয়া। ওমস্কে মা হয়ত এখন নেইও।"

"যদি থাকে, তোমার উচিত গিয়ে দেখা করা। ঘন্টাখানেক থেকে যাও।"

"না, নাদিয়া।"

"না? কি বলছো দাদা? ওমস্কে যাবে, অথচ মায়ের সঙ্গে দেখা করবে না?"

'নাদিয়া!' চোখ মুখের চেহারা অন্যরকম হয়ে গেল মাইকেলের। স্বর শুনে চমকে উঠল নাদিয়া—"নাদিয়া, ঠিক যে কারণে আমার সহ্যশক্তিকে কাপুরুষের ভীরুতা মনে হয়েছিল শয়তান লোকটার, ঠিক সেই কারণেই—"

বলেই নিজেকে সামলে নিল মাইকেল। চাবি দিল মুখে।

মৃদু কণ্ঠে নাদিয়া শুধু বললে—"দাদা, আমি কিছুই জানি না—শুধু টের পেয়েছি। একটা মহান্ কর্তব্য তোমাকে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। সে কর্তব্য ছেলে-মায়ের সম্পর্কের চাইতেও পবিত্র।"

হু-হু করে ছুটে চলল তারানতাস। পরের দিন বিকেলেই পৌঁছে গেল ইরতিশের পাড়ে। ওমস্ক এখান থেকে মোটে কুড়ি ভার্স্ট।

ইরতিশ নদী নেহাত ছোটখাটো নয়—বেশ চওড়া। পারাপারের জন্যে মাঝিকে জোগাড় করে তারানতাস আর ঘোড়া তিনটেকে নৌকোয় তুলতেই গেল আধঘন্টা। লগি ঠেলে নৌকোকে তীর থেকে গভীর জলে নিয়ে এল মাঝি। জলের ঘূর্ণি কাটাতে গিয়ে একেবারে মাঝ-জলে পড়তেই হল বিপত্তি। লগি আর জলের তলায় ঠেকল না—জল সেখানে অত্যন্ত গভীর।

যাওয়ার কথা স্রোত ঠেলে উজানে—কিন্তু লগি তল না পেতেই স্রোতের টানে ভেসে চলল নৌকোটা এককুটো খড়ের মত।

উদ্বেগে মুখ কালো হয়ে গেল নাদিয়ার। মাইকেল নিজে লগি নিল হাতে। অনেক কসরৎ করে তীরের কাছে নিয়ে এল নৌকো।

পরক্ষণেই একলাফে দাঁড়িয়ে উঠল নৌকোয়। আঙুল দেখালো দূরে।

স্রোতের টানে আর ঝপাঝপ দাঁড়ের ঘায়ে ভীমবেগে ছুটে আসছে একটা নৌকো।

নৌকোয় বসে তাতার সৈন্যরা!

"তাতার! তাতার!"

নিঃসীম আতংকে চেঁচিয়ে উঠে ঝপ করে হাতের লগি জলে ফেলে দিল দুজন মাঝিই।

খেঁকিয়ে উঠল মাইকেল—"কাপুরুষ কোথাকায়। ভয় কিসের? মারো লগি।"

সাহস পেল মাঝিরা। প্রাণের ভয়ে লগি মেরে ভারী নৌকোকে ঠেলে নিয়ে চলল তীরের দিকে। আর সামান্য পথ। তীরে একবার পৌঁছোতে পারলে আর তারানতাস নামাতে পারলে লক্ষবেগে উধাও হবে মাইকেল। নৌকার ত'তার হানাদারদের ঘোড়া নেই—মাইকেলের আছে।

কিন্তু সে সুযোগ আর পাওয়া গেল না। আরো কাছে এসে গেল তাতার আতংকরা। শোনা গেল তাদের রক্ত-জল-করা রণহুংকার—

"সারিন না কিটচো।"

এর জবাব দিতে হয় সটান লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ে অর্থাৎ দণ্ডবৎ হয়ে। কিন্তু মাইকেল বা মাঝিরা ভ্রূক্ষেপ করল না। ফলে এক ঝাঁক গুলি ছুটে এল নৌকো লক্ষ্য করে—। দুটো ঘোড়া জখম হল মারাত্মক ভাবে। পরমুহূর্তেই প্রচণ্ড ভাবে কেঁপে উঠল নৌকো। তাতারদের নৌকো আছড়ে পড়েছে খেয়া নৌকোয়।

"নাদিয়া! চলে এসো!" বলেই নাদিয়াকে নিয়ে জলে ঝাঁপ দিতে গেল মাইকেল।

তার আগেই বর্শার খোঁচায় নিজেই ছিটকে গেল জলে। দুরন্ত জলস্রোত দেখতে দেখতে ভেসে গেল দূরে। বারেকের জন্যে দুটো হাত কেবল দেখা গেল জলের ওপর—তারপর তাও গেল তলিয়ে।

হাহাকার করে উঠল নাদিয়া। কিন্তু চক্ষের নিমেষে মাঝি দুজনকে খুন করে নাদিয়াকে টেনে হিঁচড়ে নিজেদের নৌকায় নিয়ে গিয়ে তুলল তাতার লুঠেরারা।

১৪ ॥ মা আর ছেলে

আইভান ওগারেফ ধুরন্ধর, আইভান ওগারেফ নিষ্ঠুর। তাতারদের মতই সে বর্বর এবং প্রকৃতিতে পিশাচ। মায়ের দিক দিয়ে মঙ্গোল রক্ত যার ধমনীতে বইছে সে তো কুচুটে হবেই। বুদ্ধিতে সে শৃগালের মত। স্বভাবে জল্লাদ—এককালে জল্লাদের কাজও করেছে পরমানন্দে।

মাইকেল স্ট্রগফ যখন ইরতিশে, আইভান ওগারেফ তখন ওমস্কের বেশ কিছু পথ পেরিয়ে এসেছে প্রভঞ্জন গতিতে। তার লক্ষ্য টোমস্ক। তাতার বাহিনী জড়ো হয়েছে সেইখানেই। সেইখান থেকেই ফিওফার খানের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কুচকাওয়াজ করে যাবে ইরকুটস্ক দখল করতে। ইরকুটস্কের পতন ঘটাতে পারলেই পুরো এশিয়াটিক সাইবেরিয়ার পতন ঘটবেই। তাতারদের জয় তখন সুনিশ্চিত।

কিন্তু প্ল্যানটা তার অভিনব শয়তানি পরিকল্পনা। গ্র্যাণ্ড ডিউকের আস্থা-ভাজন হবে সে ছদ্মনামে। তারপর শহরের পতন ঘটাবে ভেতর থেকে—সেই সঙ্গে প্রাণ হরণ করবে স্বয়ং ডিউকের।

তার এই গোপন অভিসন্ধির বৃত্তান্ত জানেন কেবল জার। তিনি গ্র্যাণ্ড ডিউককে সচেতন করতে চান। সেই চিঠিই নিয়ে চলেছে মাইকেল—ছদ্মনামে, ছদ্মবেশে।

তাতার বর্শার খোঁচায় জলে ছিটকে পড়লেও মারাত্মক জখম হয়নি সে। শুধু সংজ্ঞা হারিয়েছিল। স্রোত তাকে টেনে নিয়ে আছড়ে ফেলেছে ডান পাড়েই। একজন চাষা সংজ্ঞাহীন দেহটা তুলে নিয়ে গিয়ে সেবা করেছে, জ্ঞান ফিরিয়ে এনেছে। তার মুখেই মাইকেল শুনল, কি ভাবে কশাই তাতা-ররা তারানতাস লুঠ করেছে। মাঝিদের জবাই করেছে।

"মেয়েটাকে?" উদ্বিগ্ন স্বরে জিজ্ঞেস করেছে মাইকেল।

"মারেনি। নৌকোয় তুলে নিয়ে গেছে—টোমস্কে অন্যান্য কয়েদীদের সঙ্গে রাখবে।"

হাঁফ ছেড়ে বাঁচল মাইকেল। চকিতে হাত দিল গোপন পকেটে—চিঠি আছে এখনো। খোয়া যায়নি।

উঠে বসল। বলল—'আমাকে মারল কি দিয়ে?"

"বর্শা দিয়ে। মারাত্মক চোট নয়—দিন কয়েক বিশ্রাম নিলেই চাঙা

হয়ে উঠবেন।"

"ওমস্ক এখন থেকে কদ্দুর?"

"পাঁচ ভার্স্ট।"

"আমি কদ্দিন অজ্ঞান ছিলাম?"

"তিনদিন।"

"তাহলে আর এক মুহূর্তও নয়। একটা ঘোড়া দেবে? দাম দেব।"

"তাতাররা যেখান দিয়ে যায়—সেখানে ঘোড়া থাকে না।"

"তাহলে হেঁটেই যাবো।"

"ঘন্টা কয়েক জিরিয়ে যান।"

"এক সেকেণ্ড আর নয়।"

"তাহলে আমি আপনাকে এগিয়ে দেব। তাতাররা চারদিকে ছড়িয়ে আছে—আমি না থাকলে ধরা পড়বেন।"

"বন্ধু, এর জন্যে পুরস্কার পাবে।"

"পুরস্কার। মূর্খরা পুরস্কারের প্রত্যাশা করে। চলুন।"

পথে নেমেই মাথা ঘুরে গেল মাইকেলের। শরীরে আর শক্তি যেন নেই। চোট লেগেছিল মাথায়। তাই ধোঁয়া দেখল চোখে। কিন্তু খোলা হাওয়ায় একটু একটু করে ফিরে পেল হারানো শক্তি। লক্ষ্য তার একটাই—ইরকুটস্ক। পৌঁছোতে হবেই। কিন্তু কেউ যেন টের না পায় ওমস্ক পেরিয়ে যেতে এই ভাবেই—কেউ বুঝতেও পারবে না রাশিয়ার রাজদূত গুপ্ত সমাচার নিয়ে চলে গেল তাতারদের বুকের ওপর দিয়ে।

ওমস্কের যে তল্লাটে ব্যবসাদারদের ঘাঁটি, সেখানে ঢুকতে কোনো অসুবিধেই হল না। তাতার ফৌজে ছেয়ে গেছে এদিক। দল বেঁধে ঘুরছে তারা—একক থাকলেই অতর্কিত আক্রমণে ঘায়েল হবার সম্ভাবনা আছে বলে।

শহরের মূল অঞ্চলে কিন্তু এখনো উড়ছে রাশিয়ার পতাকা—সে দিকে তাতাররা সুবিধে করতে পারেনি। চাষী বন্ধু এবং মাইকেল স্ট্রগফ দুজনেই সসম্ভ্রমে অভিবাদন জানালো উড়ন্ত পতাকাকে।

তাতারদের ঘোড়াগুলোর সাজ কিন্তু নামানো হয়নি। যে কোনো মুহূর্তে যেন রওনা হওয়ার হুকুম আসতে পারে। তাতার ফৌজও যেন কারও শাসনের দাপটে উচ্ছৃঙ্খল নয়—নিয়মশৃঙ্খলার নিগড়ে বেশ সংযত।

ঘোড়াশালার দিকে যেতে যেতে আচমকা সাঁৎ করে একটা দেওয়ালের আড়ালে সরে গেল মাইকেল।

চাষী বন্ধু চমকে উঠে বললে—"কি হল ?"

আঙুল তুলে নীরবে দেখাল মাইকেল। রাস্তা জুড়ে আসছে বিশজন অশ্বারোহীকে নিয়ে একজন সাদামাটা পোশাক পরা মিলিটারী পুরুষ। বর্শার খোঁচায় দেখতে দেখতে সাফ হয়ে গেল পথ।

জাঁদরেল চেহারার লোকটাকে দেখিয়ে ফিসফিস করে মাইকেল বললে —"ও কে ?"

দাঁতে দাঁত পিষে ঘৃণায় নাক কুঁচকে চাষী বন্ধু বললে—"বিশ্বাসঘাতক আইভান ওগারেফ !"

আইভান ওগারেফ। কিন্তু এ যে সেই দাম্ভিক উদ্ধত মিলিটারী—ইচিমের ঘোড়াশালায় যে চাবুক পেটা করে মাইকেলের ঘোড়া নিয়ে গেছে !

শুধু তাই নয়। সেই মুহূর্তেই আরও একটা ঘটনা মনে পড়ে গেল মাইকেলের। নিজনি নোভোগোরোদের বাজারে এক বুড়ো জিনগারে জিপসীর কথা শুনেছিল সে। এ সেই লোক নিঃসন্দেহে।

ভুল মাইকেলের হয়নি। নির্মম-প্রকৃতি রুক্ষ-দর্শন এই লোকই আইভান ওগারেফ। বিশ্বাসঘাতক আইভান ওগারেফ। জিনগারে জিপসীদের দলে ভিড়ে তাদেরই সাজপোশাকে ভোল পালটে পেরিয়ে এসেছে সীমান্ত। সাঙ্গারে আর অন্যান্য জিনগারেরা তারই মাইনে করা স্পাই। আইভানের কথায় ওঠবোস করে, এত অনুরক্ত।

পোস্টিং হাউসে এল চাষী বন্ধু আর মাইকেল। লোকে গিজগিজ করছে ঘোড়াশালায়। খোঁজ খবর নিয়ে জানা গেল রাতের অন্ধকারে ওমস্ক ছেড়ে লম্বা দেওয়া খুব মুস্কিল হবে না। মুস্কিল শুধু গাড়ী পাওয়া নিয়ে। পয়সা ছড়িয়েও তা মিলবে না। তবে একটা ঘোড়া পাওয়া যেতে পারে—তাও বেশী দামে। তাতেই রাজী হয়ে গেল মাইকেল।

পোস্টিং হাউসে প্রায় কুড়িজন মেয়ে পুরুষ তখন বক বক করে চলেছে। দারুণ উত্তেজিত প্রত্যেকেই। মাইকেল জানে এদের মধ্যে স্পাইও আছে সাদা পোশাকে। তাই নিজে কোন কথার মধ্যে গেল না। শুধু কান খাড়া করে শুনে গেল কে কি বলছে।

হঠাৎ একটা কাণ্ড ঘটল।

পেছন থেকে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে কে যেন চেঁচিয়ে উঠল আবেগ বিহ্বল স্বরে— "মাইকেল। বাবা মাইকেল।"

সচমকে ঘুরে দাঁড়াল মাইকেল। মা ডাকছে। মারফা—বুড়ি মারফা

স্ট্রগফ দুহাত বাড়িয়ে এগিয়ে আসছে ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ধরার জন্যে।

আর একটু হলেই মায়ের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ত মাইকেল স্ট্রগফ। সামলে নিল মুহূর্তের মধ্যে। সর্বনাশ হয়ে যাবে যদি মা আর ছেলের সম্পর্ক ফাঁস হয়ে যায় এতগুলো মানুষের সামনে। এদের মধ্যে স্পাই আছে। চোখের পলকে জানাজানি হয়ে যাবে, মারফার ছেলে রাশিয়ার রাজদূত তাতারদের মধ্যে ঘুরছে ছদ্মবেশে—ছদ্মনামে!

তাই পলকের মধ্যে মনস্থির করে ফেলল মাইকেল। চোখের পাতা বা মুখের পেশী একটুকুও না কাঁপিয়ে চেয়ে রইল শীতল চোখে।

"মাইকেল!"

অসামান্য মনোবল সত্ত্বেও গলা কেঁপে গেল মাইকেলের জবাব দিতে গিয়ে—"কে আপনি?"

"আমি কে? মাকে চিনতে পারছিস না?"

"ভুল করছেন। আপনার ছেলের মতই হয়ত দেখতে আমাকে—কিন্তু আমি আপনার ছেলে নই।"

এক পা এগিয়ে এল বুড়ি। মাইকেলের চোখে চোখ রেখে বললে—"পিটার স্ট্রগফের ছেলে তুমি নও?"

"না। কি বলছেন বুঝতেও পারছি না।"

"মাইকেল।"

"মাইকেল আমার নাম নয়। আপনার ছেলেও আমি নই আমি নিকোলাস কোরপানফ—ইরকুটস্কের ব্যবসারদার।"

"মাইকেল। বাবা মাইকেল!"

মাইকেল তৎক্ষণে বাইরে। ধপ করে বেঞ্চিতে বসে পড়ল বুড়ি মারফা। সেকেণ্ড কয়েক নিঝুম হয়ে বসে রইল, পরক্ষণেই খটকা লাগল।

মাইকেলকেই সে দেখেছে। মাইকেলও মাকে চিনেছে। চিনেও চেনা না দিয়ে পালিয়ে গেল। কেন? নিশ্চয় কারণ আছে। চেনা দিতে চায় না বিপদ হতে পারে বলে। কাজেই মা হয়ে সে ছেলেকে বিপদের মধ্যে ঠেলে দেবে না। কখনোই না।

আচমকা খপাৎ করে কাঁধ চেপে ধরল একজন তাতার সৈন্য—"এদিকে এসো।"

সেকেণ্ড কয়েক পরেই আইভান ওগারেফের সামনে এসে দাঁড়াল মারফা।

তীব্র চোখে বুড়ির আপাদ মস্তক দেখে নিয়ে আইভান বললে—"লোকটা

কে ?"

"চিনি না।"

"তোমার ছেলে না ?"

"ভুল করেছিলাম।"

"ভুল করেছিলে ?" গর্জে উঠল আইভান। "মাইকেল স্ট্রগফকে চিনতে পারোনি বলছো ?"

"মাইকেল স্ট্রগফ ওর নাম নয়। এই নিয়ে দশবার হল ভুল করলাম। গণ্ডগোলে মাথার ঠিক নেই। যাকেই দেখছি তাকেই মাইকেল বলে মনে হচ্ছে !

"বুড়ি, পেট থেকে কথা কি করে বার করতে হয় আমি জানি।"

চোখে চোখ রেখে মারফা বললে—"এর বেশী আর কোনো কথা থাকলে তো বার করবেন।"

"আ—চ্ছা !" মারফার ভেতর পর্যন্ত যেন ফুঁড়ে দেখে নিল আইভান। অন্তর দিয়ে বুঝল, মাইকেলকে ঠিকই চিনেছে মারফা। মাইকেলও চিনেছে মাকে। কিন্তু দুজনেই না চেনার ভান করছে। বুড়ি প্রথমে চিনতে পেরেও এখন যখন 'চিনি-না' বলছে, তখন নিশ্চয়ই গুরুতর কারণেই মাইকেল ছদ্ম-পরিচয়ে ওমস্কে এসেছে।

পৈশাচিক চোখে তাই বুড়িকে কিছুক্ষণ নিরীক্ষণ করল আইভান ওগারেফ। অনুচরদের ডেকে হুকুম দিলে এখুনি যেখান থেকেই হোক ধরে আনা হোক নিকোলাস নামধারী ছদ্মবেশী রাশিয়ার রাজদূতকে।

তারপর বললে—"এই বুড়িকেও নিয়ে চলো টোমস্কে।"

টানতে টানতে যখন মারফাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে বাইরে, তখন পেছন থেকে দাঁতে দাঁত পিষে গর্জে উঠল ওগারেফ।

"ডাইনি কোথাকার ! ঠিক সময়ে দেখবি পেটে লাথি মেরে কথা টেনে বার করব !"

১৫ ॥ বারাবা-র জলাভূমি

২৯শে জুলাই রাত আটটার সময়ে ওমস্ক ছেড়ে পালিয়ে এল মাইকেল। রাত বারোটার মধ্যেই পুরোদমে ঘোড়া ছুটিয়ে পেরিয়ে এল সত্তর ভার্স্ট। মাঝে মাঝে ঘোড়া থামিয়ে মাটিতে কান পেতে শুনতে লাগল তাতাররা পেছন

ধরেছে কিনা। কিন্তু কোনো শব্দ না পেয়ে নিশ্চিন্ত হল খানিকটা।

কিন্তু পুরোপুরি নয়। আইভান ওগারেফ যে খবর পেয়ে গেছে নিকোলাস কোরপানফের ছদ্মবেশে রাশিয়ার রাজদূত চলেছে ইরকুটস্ক অভিমুখে—মাইকেল তা বুঝেছে। কিন্তু একটা খবর সে জানে না—জানার সম্ভাবনাও ছিল না। নির্মম আইভানের খপ্পরে পড়েছে তার বুড়ি মা এবং শাগগিরই যে অমানুষিক নির্যাতন শুরু হবে তার ওপর—মর্মান্তিক এই খবরটা মাইকেল জানতে পারে নি।

তাই এক নাগাড়ে ছুটে চলেছে সে। ঘোড়া বেদম হয়ে পড়লে দাঁড়াচ্ছে এক ঘন্টা, কি বড় জোর দু'ঘন্টা। নিজে না জিরিয়ে ঘোড়ার সেবা করছে। জলাভূমির অগুন্তি মশা আর পোকার কামড়ে ক্ষত বিক্ষত ঘোড়ার গায়ে চর্বি মালিশ করছে। চর্বি পাচ্ছে গ্রাম থেকে। গ্রামের লোকেরা ভয়াবহ এই পোকা মাকড়কে দূরে সরিয়ে রাখে কাঁচা ডালপালা পুড়িয়ে ধোঁয়ার আবরণ সৃষ্টি করে। তা সত্ত্বেও তাদের মুখ কালচে মেরে গেছে মশা আর পোকার কামড়ে। চামড়া শক্ত হয়ে গেছে।

ভয়ংকর এই জলাভূমির মাঝ দিয়ে এঁকেবেঁকে পথ গিয়েছে ইরকুটস্কের দিকে। মাঝে মাঝে কাদা আর পাঁক জমিয়ে ব্রীজের মত করা হয়েছে। দুর্গন্ধে টেঁকা দায়। সেই সঙ্গে পোকার কামড়। ঘোড়ার বালামচি দিয়ে মুখোশ তৈরী করে পথ চলার রেওয়াজ এখানে। কিন্তু মাইকেলের সে সব নেই। ভ্রূক্ষেপও নেই। লক্ষ্য কেবল সামনের দিকে। চলো, চলো, সামনে চলো—তাড়াতাড়ি পথের শেষ করো। বিরাট লম্বা ঘাসবন ঢেকে রাখছে তাকে আর তার ঘোড়াকে। দূর থেকে কেবল দেখা যাচ্ছে অগুন্তি জলার পাখী চেঁচাতে চেঁচাতে উড়ে যাচ্ছে আকাশে। তবুও ছুটেছে মাইকেল। চলো সামনে! চলো সামনে। চলো সামনে।

তিরিশে জুলাই বিকেলে পৌঁছোলো ইলামস্কে। পরের দিন আবার ঢুকল জলাভূমিতে। জানতেও পারলো না তাতার অশ্বারোহীরা ওর দশ ভার্স্ট পেছনেই আসছে টগবগিয়ে আইভানের হুকুম তামিল করতে।

পয়লা আগস্ট দুপুরে মাইকেল এল স্পাসকো-তে। দুটোর সময়ে পোক্রোসকো-তে পৌঁছে রাত কাটাতে বাধ্য হল সেখানে—ঘোড়া আর পারছে না বলে।

পরের দিন পঁচাত্তর ভার্স্ট ঘোড়া ছুটিয়ে পৌঁছোলো কামস্কেতে। পরের দিন ভোর ছটায় বেরিয়ে ওবিনস্কে পৌঁছে এক রাতের জন্যে জিরেন দিল

বেদম ঘোড়া বেচারীকে।

তার পরের দিন কাক ডাকা ভোরে রওনা হয়ে রাত নটায় পৌঁছোলো আইকোলস্কো-তে।

চৌঠা আগস্ট বিকেল সাড়ে তিনটে নাগাদ পেরিয়ে এল বারাবা র ভয়াবহ জলাভূমি অঞ্চল। এতদিন নরম কাদা আর পাঁকের ওপর দিয়ে কখনো লাফিয়ে কখনো হোঁচট খেয়ে ঘোড়া চালিয়ে এই প্রথম শক্ত জমিতে পৌঁছোলো মাইকেল স্ট্রগফ।

মস্কো থেকে রওনা হয়েছিল কুড়িদিন আগে।

ইরকুটস্ক পৌঁছোতে আর কদিন? এখনো তো দেড় হাজার ভার্স্ট পথ পেরোতে হবে মাইকেল স্ট্রগফকে!

পারবে তো?

১৬ ॥ শেষ চেষ্টা

দূর দিগন্তে ধোঁয়া দেখেই সতর্ক হল মাইকেল। গ্রাম পুড়ছে! কুঁড়ে পুড়ছে। তাতার বাহিনী নিশ্চয় তাণ্ডব নাচ নাচতে নাচতে গিয়েছে ঐ পথ দিয়ে।

কাছে গিয়ে দেখল একটা কুঁড়ে ঘর থেকে তখনও ধোঁয়া বেরুচ্ছে। সামনে এক বুড়োকে গোল হয়ে ঘিরে কান্নাকাটি করছে একপাল ছেলেমেয়ে। বাচ্চাদের মা—নিশ্চয় বুড়োর মেয়ে—মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসে একদৃষ্টে চেয়ে রয়েছে ছাই-হয়ে-যাওয়া কুঁড়ের দিকে। চারপাশে একই দৃশ্য। ধ্বংসস্তূপের পর ধ্বংসস্তূপ।

মাইকেল শুধোলো—"তাতাররা এদিক দিয়ে গেছে বুঝি?"

"নইলে আমার ঘর জ্বলবে কেন।"

"পুরো একটা ফৌজ, না কয়েকজন?"

"ফৌজ। আমার নিজে কম্যাণ্ডার।"

"ফিওফার খান কি টোমস্কে ঢুকেছে?"

"ঢুকেছে। কিন্তু কোলিভানে এখনো পৌঁছোয়নি।"

"ধন্যবাদ। আমার দ্বারা কোনো উপকার কি হবে?"

"কিছু না।"

"আসি।"

"আসুন।"

পকেট থেকে পঁচিশটা রুবল্ নিয়ে মেয়েটির হাতে গুঁজে দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে উধাও হল মাইকেল। টোমস্ক যাওয়া এখন আর চলবে না। তাতাররা পৌঁছেছে সেখানে। যাবে কোলিভানে। তাতাররা যায়নি সেখানে। সেখান থেকেই পথশ্রমে অকেজো এই ঘোড়া পালটে নতুন ঘোড়া জোগাড় করতে হবে আরও দূর পথে যাওয়ার জন্যে।

নতুন পথে যেতে হলে ওবি নদীর বাঁ পাড় বরাবর যাওয়াই সঙ্গত। চল্লিশ ভার্স্ট যেতে হবে—তবেই মিলবে নদীর তীর।

রাত হল। তবুও ছুটল ঘোড়া চারপায়ে ধুলো উড়িয়ে। মাঝরাতে চারদিক যখন নিস্তব্দ, তখন নির্জন স্তেপে জাগ্রত রইল কেবল মাইকেলের ঘোড়ার টগবগ টগবগ আওয়াজ। মাঝে মাঝে ঘোড়ার কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে আদর করে কথা বলছে মাইকেল—যাতে আরো উৎসাহ, আরো প্রেরণা পায় বেদম প্রাণীটা। অন্ধকারে এ ছাড়া উপায় নেই। ঘোড়ার ওপর বিশ্বাস রাখতেই হবে। পথ ছেড়ে একটু সরে গেলেই পুকুর বা ওবি নদীর কোনো শাখায় ডুবে মরতে হবে। এ ছাড়াও রয়েছে মাইকেলের সদাসতর্ক চক্ষুর শাণিত দৃষ্টি। অন্ধকার ফুঁড়ে যেন দেখতে পাচ্ছে বহুদূরের বাধাবিঘ্ন।

এক জায়গায় এসে ঘোড়া থেকে নামল মাইকেল। পথের নিশানা নইলে ঠাহর করা যাচ্ছে না।

ঠিক সেই সময়ে নিস্তব্দ রাতে ওর কানে ভেসে এল অনেক ঘোড়া এগিয়ে আসার টগবগ টগবগ আওয়াজ। ওমস্কের দিক থেকে যেন একদল ঘোড়া আসছে এইদিকেই, নিস্তব্দ রাতে সেই শব্দই ছাড়িয়ে যাচ্ছে দূর হতে দূরে।

দুশ্চিন্তায় পড়ল মাইকেল স্ট্রগফ। কারা আসছে? রাশিয়ান ফৌজ যদি হয়—দলে ভিড়ে যাবে। তাতার হলে পগ্নাকার দিতে হবে। যারাই আসুক, তারা আসছে কিন্তু উল্কাবেগে। মিনিট দশেকের মধ্যেই এসে যাবে মনে হচ্ছে। তার আগেই গা-ঢাকা দিতে হবে মাইকেলকে।

রাস্তার বাঁদিকে কিছুদূরে গাছপালার একটা জটলার ঝুপসি অন্ধকারে গিয়ে দাঁড়াল মাইকেল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে মশালের আলো দেখা গেল দূরে। দেখতে দেখতে কাছে এল মশালবাহী ঘোড়সওয়াররা। প্রায় পঞ্চাশ জনের একটা দল। জন বারোর হাতে জ্বলছে মশাল। হুঁশিয়ার পার্টি। মোড়ে মোড়ে মশালের আলো ফেলে দেখছে কেউ কোথাও লুকিয়ে আছে কিনা।

নদীর পাড়ে সরে গেল মাইকেল ঘোড়ার লাগাম ধরে। বেগতিক দেখলাম ঝাঁপ দেবে জলে।

জঙ্গলে পৌঁছেই থামল ঘোড় সওয়ারের দল।

তোড়জোর দেখে মনে হল ঝোপজঙ্গলে ঢোকার কোনো অভিপ্রায় নেই ঘোড় সওয়ারদের। রাত কাটাতে চায় খোলা জায়গায়—তাঁবু না খাটিয়ে জিরেন দিতে চায় ঘোড়াদের। ওমস্কের উজবেক অশ্বারোহী এরা। রীতিমত সশস্ত্র। কাঁধে চকমকি বন্দুক আর ঢাল। কোমরে বাঁকানো তরবারি আর লম্বা ছোরা।

ঘোড়াদের ঘাস জমিতে ছেড়ে দিয়ে নিজেরা লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল পথের পাশে ঘাসের ওপর। খাবার দাবার বার করে খাওয়ার আয়োজনও হল। সেই সময়ে যে কথাবার্তা হল নিজেদের মধ্যে, লার্চ গাছের আড়াল থেকে কান খাড়া করে তা শুনল মাইকেল। লোম খাড়া হয়ে গেল শোনবার পর।

"রাজদূত বেশী দূরে যায় নেই। বারোবা'র এ বাদা ছাড়া আসবার পথও নেই।"

"সাইবেরিয়ান বুড়িটার জেদ কি। বলে কিনা রাজদূত আমার ছেলে নয়।"

বুক ধড়াস ধড়াস করতে লাগল মাইকেলের।

"বললেই কি পার পাবে? কর্ণেল ওগারেফ ঠিক ধরেছেন। রাজদূতেরই মা ঐ বুড়ি। ঐ জন্যেই তো বললেন কর্ণেল—সময় হলেই পেটে লাথি মেরে কথা বার করবেন ডাইনীর মুখ থেকে।"

মাইকেল যে রাশিয়ার রাজদূত, তাহলে জানাজানি হয়ে গেছে। উজবেক ঘোড় সওয়াররা বেরিয়েছে তাকেই ধরে নিয়ে যেতে। মা কেও নির্যাতন করবে ঠিক করেছে শয়তান আইভান ওগারেফ। মা অবশ্য ফাঁস কথা বলবে না, মেরে ফেললেও ছেলের সর্বনাশ করবে না। কিন্তু…

উজবেকরা শুয়ে বসে গল্প চালিয়ে যাচ্ছে। মাইকেলের কানে আরো অনেক কথা ভেসে এল। কোলিভানেও রাশিয়ান ফৌজের সঙ্গে তাতার বাহিনীর টক্কর আসন্ন। ফিওফার খানের মূল ফৌজের সঙ্গে পারবে না মাত্র দুহাজার রাশিয়ান ফৌজ। হেরে ভূত হবে। ইরকুটস্কের রাস্তা সাফ হয়ে যাবে।

আরো ভয়ংকর কথা কানে এল মাইকেলের। উজবেকদের ওপর হুকুম হয়েছে জীবিত অথবা মৃত অবস্থায় নিয়ে যেতে হবে রাশিয়ার রাজদূতকে —নিদেন পক্ষে মুণ্ডটা পেলেই চলবে কর্ণেল ওগারেফের। মোটা পুরস্কার

ঘোষণা করা হয়েছে তার মাথার জন্যে।

প্রমাদ গণল মাইকেল। হাড়ে হাড়ে বুঝল, উজবেকদের হাত থেকে নিজের মাথা বাঁচাতে হলে এখুনি পলায়ন করা দরকার এখান থেকে। অন্ধকার থাকতে না থাকতেই চম্পট দিতে হবে।

আর দেরী করা যায় না। উজবেকদের ঘোড়াগুলো ঘাস খেতে খেতে জঙ্গলের মাঝখানেই চলে আসছে। মাইকেল বেশীক্ষণ থাকতে পারবে না লার্চ গাছের আড়ালে।

উজবেকদেরই একটা ঘোড়া নিয়ে পালালে কেমন হয়? না মাইকেলের নিজের ঘোড়া ক্লান্ত হলেও উজবেকদের ঘোড়ার মত অতটা ক্লান্ত নয়। এতটা পথ যে প্রাণীটা বিশ্বাসী বন্ধুর মত তাকে বয়ে এনেছে, তাকেই বিশ্বাস করা যাক।

মাইকেলের ঘোড়া শুয়েছিল অন্ধকারে। ঘাসের মধ্যে দিয়ে বুকে হেঁটে কাছে গেল মাইকেল। কানে কানে কথা বলে গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দাঁড় করালো চার পায়ে। শিক্ষিত ঘোড়া—খুব বোঝে। এতটুকু হ্রেষাধ্বনি বেরোলো না গলা দিয়ে।

ডান হাতে রিভলবার নিয়ে ঘোড়ার লাগাম ধরল মাইকেল। নিঃশব্দে এগিয়ে চলল জঙ্গলের কোণের দিকে। ঐখানেই রাস্তা।

কিন্তু কপাল মন্দ। জঙ্গল থেকে ঠিক বেরোনোর সময়ে ওদের গায়ের গন্ধেই বোধ হয় হ্রেষাধ্বনি করে উঠল উজবেকদের একটা ঘোড়া। টগবগিয়ে ছুটতে লাগল রাস্তা দিয়ে।

ঘোড়ার মালিক দৌড়োলো পেছন পেছন। মশালগুলো তখন নিভু নিভু। আবছা আলোয় দুটো ছায়া নড়তে দেখেই 'কে যায়' 'কে যায়' করে হেঁকে উঠল বাজখাঁই গলায়।

ঘাসের ওপর যারা গড়াচ্ছিল, হাঁক শুনেই তারা তড়াক করে লাফিয়ে উঠে দৌড়োলো যে-যার ঘোড়ার দিকে।

এক লাফে নিজের ঘোড়ায় উঠে বসল মাইকেল। ছিটকে গেল সামনে।

বন্দুক নির্ঘোষ শোনা গেল পেছনে। শন্ শন্ করে গুলি বেরিয়ে গেল মাইকেলের জামা ফুটো করে।

উজবেকদের ঘোড়ায় সাজ চাপাতে একটু সময় গেল। তার মধ্যেই বেশ খানিকটা এগিয়ে গেল মাইকেল। তার পরেই শুনল অনেকগুলো ঘোড়া ধেয়ে আসার শব্দ। সেই সঙ্গে বর্বর উজবেকদের হুংকার আর গুলির

আওয়াজ। দমাদম গুলি ছুটে যাচ্ছে আশপাশ দিয়ে। নক্ষত্রবেগে ছুটছে মাইকেলের ঘোড়া। দম ক্রমশঃ ফুরিয়ে আসছে। বেশীক্ষণ এভাবে যেতে পারবে না।

একজন ঘোড়সওয়ার খুব কাছে চলে এসেছিল। বেগ না কমিয়ে লাগাম থেকে হাত না সরিয়ে রিভলবার তুলে গুলি করল মাইকেল। ঘোড়ার পিঠ থেকে ছিটকে গেল উজবেক। আবার ছুটে এল ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি।

মাইকেল ঘোড়ার পিঠে শুয়ে পড়ে কানে কানে কানে কথা বলছে বিশ্বাসী কিন্তু বেদম বাহনের সঙ্গে। ইতর প্রাণী হলেও সে বুঝেছে এ দৌড় জীবন মরণের দৌড়। পেছিয়ে পড়লেই মনিবের মৃত্যু। তাই ছুটছে প্রাণটা গলার কাছে এসে ঠেকলেও।

মাঝে মাঝে রিভলবার তুলে নির্ভুল লক্ষ্যে গুলি চালাচ্ছে মাইকেল। প্রতিবারেই এক-একজন ঠিকরে যাচ্ছে ভূমিশয্যায়—আর উঠছে না। ঝাঁকে ঝাঁকে গুলির একটাও কিন্তু মাইকেলকে স্পর্শ করছে না।

আধ ঘন্টা চলল এইভাবে প্রাণান্তকর ভয়ংকর উত্তেজনাময় ঘোড় দৌড়। তার পরেই দেখা গেল সামনে গাছপালার আড়ালে জলের রেখা। ওবি নদী। নদীর দুকূল ছাপিয়ে জলরাশি বয়ে চলেছে। জমি আর জল সমান সমান।

দেখতে দেখতে তীরে পৌঁছে গেল মাইকেল। মুখ শুকিয়ে গেল নদী পারাপারের কোনো ব্যবস্থা নেই দেখে। নৌকো নেই—সেতুও নেই।

এখন উপায়?

চিন্তা করার সময় নেই। স্রোতের টান প্রচণ্ড। খরস্রোতা সেই নদীর মধ্যেই ঘোড়াশুদ্ধ লাফিয়ে পড়ল মাইকেল। ঘোড়ার পিঠেই নদী পেরোতে হবে তাকে।

তীর থেকে টিপ করে গাদাবন্দুক ছুঁড়ল একজন উজবেক। গুলি লাগল মাইকেলের ঘোড়ার পাঁজরে। গুলিবিদ্ধ ঘোড়া স্রোতের টানে ভেসে যেতেই স্টিরাপ থেকে নিজেকে খসিয়ে অপর পাড়ের দিকে সাঁতরে চলল ডাকাবুকো মাইকেল স্ট্রগফ। গুলির পর গুলি এসে পড়ল আশেপাশে। কিন্তু ঈশ্বর তার সহায়। তাই ঝপাঝপ হাত চালিয়ে আধ ভার্স্ট চওড়া নদী পেরিয়ে এসে পাড়ে উঠে তীর বেগে মিলিয়ে গেল ঝোপ জঙ্গলের মধ্যে।

১৭ ॥ প্রতিদ্বন্দ্বীরা

মাইকেল এখন অনেকটা নিরাপদ। যদিও ইরকুটস্ক এখান থেকে বহুদূরে এবং পথ ছেয়ে রয়েছে তাতার হানাদারে। দুস্তর এই পথ পায়ে হেঁটেই যেতে হবে মাইকেলকে।

কিন্তু উপায় একটা হবেই। ভগবানের নাম নিয়ে ওবির পাড় বরাবর তু'ভার্স্ট পথ হেঁটে গেল মাইকেল। উজবেকরা ঘোড়া নিয়ে নদী পেরিয়ে কোলিভানে পৌঁছোনোর আগেই সে যদি পৌঁছোতে পারে কোনো ঘোড়াশালায়—ব্যবস্থা একটা হবেই।

শ্রান্ত, ক্লান্ত, ক্ষুধার্ত রাশিয়ার রাজদূত স্রেফ মনের জোরে ছুটে চলল কোলিভান অভিমুখে। কিছুক্ষণ পরেই কামান আর বন্দুকের আওয়াজ শোনা গেল সামনের দিকে। নিশ্চয় লড়াই চলছে তাতার আর রাশিয়ান ফৌজের মধ্যে। আর একটু পরেই ডান দিকে দেখা গেল তাতার বাহিনীকে। চুপিসাড়ে গাছের আড়ালে আড়ালে এগিয়ে চলল মাইকেল। হঠাৎ আগুন আর ধোঁয়া দেখা গেল দূরে। একটা গির্জের উঁচু চুড়ো ঢেকে গেল লকলকে আগুনে। দেখতে দেখতে আগুন ছড়িয়ে পড়ল কোলিভানের বাঁ দিকেও। শহরের বেশ খানিকটা আগুনের কবলে পড়েছে দেখে শংকিত হল মাইকেল।

এই সময়ে গাছপালার আড়ালে একটা নিরালা বাড়ী চোখে পড়ল মাইকেলের। একটু খাবার জলের আশায় ধুঁকতে ধুঁকতে সেই দিকেই ছুটে গেল ক্লান্ত রাজদূত। কাছে যেতেই দেখল বাড়ীটা কোনো গেরস্তর বাড়ী নয়—টেলিগ্রাফ অফিস। খুঁটির ওপর তার চলে গেছে পূবে আর পশ্চিমে।

টলতে টলতে ভেতরে ঢুকল মাইকেল। একজনই বসে রয়েছে তারবার্তা পাঠানোর ঘরে।

শান্ত চোখে সে তাকাল মাইকেলের পানে। বাইরে যে রক্তগঙ্গা বইছে, তা যেন সে জানে না। কানে কোনো শব্দও যেন ভেসে আসছে না। মহাপ্রলয়ের মধ্যেও যেন এরকম নির্বিকার নিষ্কম্পভাবে জনগণের সেবার জন্যে সে প্রস্তুত।

অদ্ভুত লোক বটে। মাইকেল তখন কথা বলতে পারছে না। হাঁপাতে হাঁপাতে ভাঙা গলায় বললে—"কিছু খবর জানেন?"

স্মিতমুখে বললে কেরানা ভদ্রলোক—"কিস্সু না।"

"রাশিয়ান ফৌজের সঙ্গে কি লড়াই চলছে তাতারদের ?"

"সেই রকমই তো শুনছি।"

"জিতল কে ?"

"জানি না।"

আশ্চর্য! এত হট্টগোলের মধ্যে এহেন প্রশান্তি আর ঔদাসিন্য সত্যিই বিস্ময়কর! চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না।

"তার কি কাটা ?" ফের শুধোয় মাইকেল।

"কোলিভান আর ক্রাসনয়আর্সকের মধ্যে কাটা, কিন্তু কোলিভান আর রাশিয়ান সীমান্তের মধ্যে তার এখনো অটুট।"

"সরকারী খবরের জন্যে ?"

"সরকারী খবরের জন্যে বিনামূল্যে—বেসরকারী খবরের জন্যে শব্দ পিছু দশ কোপেক—কোথায় খবর পাঠাবেন বলুন ?"

বিচিত্র কেরানীর হাবভাবে হতবাক মাইকেল কি বলবে তা ভাববার আগেই হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকল দুই পুরুষ। শত্রুসৈন্য ভেবে ধাঁ করে জানলার দিকে ছুটে গেল মাইকেল চম্পট দেওয়ার জন্যে—পরক্ষণেই দেখল আগন্তুক দু'জনের সঙ্গে তাতার সৈন্যদের কোনো মিলই নেই।

দুজনের একজন একটা তারবার্তা একহাতে বাড়িয়ে ধরে তিনলাফে পৌঁছোলো কাঠের রেলিংয়ের ছোট ফোকরটার সামনে। গ্যাঁট হয়ে জায়গা দখল করে অস্থির চরণ ঠুকতে লাগল প্রচণ্ড উত্তেজনায়। পেছনে পেছনে এসেও ব্যক্তিটি কাউন্টার দখল করতে পারল না—অসহায় অবস্থায় সে চেয়ে রইল প্রথম জনের দিকে।

হ্যারি ব্লাউন্ট আর অ্যালসাইড জোলিভেট। ইচিম থেকে মাইকেলের কয়েক ঘন্টা আগে রওনা হয়ে কোলিভান পৌঁছেছেন তার আগেই। রওনা হয়েছিলেন বন্ধুভাবে—কিন্তু রণক্ষেত্রে পৌঁছেই দুজনে এখন দুজনের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী। খবর আগে যে পাঠাবে—তার কাগজের সুনাম বাড়বে অন্যের কাগজের চেয়ে। তাই এত দৌড়োদৌড়ি আর কাউন্টার দখল করা।

মাইকেল এক কোণে দাঁড়িয়ে রইল শুধু রগড় দেখার জন্যে নয়—খবর শোনার আশায়।

ফোকর দিয়ে হাত বাড়িয়ে তারবার্তা নিয়ে স্মিত মুখে অবিচল কেরানী বললে—"শব্দপিছু দশ কোপেক।"

পকেট থেকে একমুঠো রুবল বার করে ফোকরের মুখে ঢেলে দিলেন

ব্লাউন্ট।

আরও প্রকট হল বেচারী জোলিভেটের অসহায় অবস্থা।

সঙ্গে সঙ্গে টকাটক টকাটক করে খবর পাঠাতে আরম্ভ করল কেরানী। এমন নিশ্চিন্ত মনে টরে টক্কা করে চলল যেন দুনিয়ার কোথাও কোনো গণ্ডগোল নেই—কানের পাশেও কামানের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে না—জানলার বাইরে আগুনের শিখা দেখা যাচ্ছে না।

খবরটা এই :

"ডেলী টেলিগ্রাফ, লণ্ডন।

"সাইবেরিয়ার ওমস্ক অঞ্চলের কোলিভান থেকে, ৬ই আগস্ট।

"লড়াই চলছে রাশিয়ান আর তাতার বাহিনীর মধ্যে। রাশিয়ানরা পরাজিত হয়েছে—অনেক সৈন্য মারা গেছে। তাতাররা আজ কোলিভানে প্রবেশ করেছে।"

খবর শেষ।

সঙ্গে সঙ্গে চিলের মত চেঁচিয়ে বললে জোলিভেট—"এবার আমার পালা।"

প্রশান্ত স্বরে পা নাচাতে নাচাতে ফোকর দখল রেখে ব্লাউন্ট বললেন—"এখনো শেষ হয়নি আমার।" বলেই আর একটা তারবার্তা ঢুকিয়ে দিল ফোকর দিয়ে।

খবরটা এই :

"জন গিলপিন একজন নাগরিক..."

মোদ্দা কথা এই—হ্যারি ব্লাউন্ট ছলেবলে কৌশলে ফোকর ছেড়ে নড়বেন না, প্রতিদ্বন্দ্বী অ্যালসাইড জোলিভেটকে কোনো সুযোগই দেবেন না—একাই খবর পাঠিয়ে যাবেন ডেলী টেলিগ্রাফে। তাই টেলিগ্রাফ মেশিন আটকে রাখার জন্যে কাউপারের বিখ্যাত কবিতা আবৃত্তি করে চলেছেন এবং কাঁড়ি কাঁড়ি টাকার বিনিময়ে সুবিখ্যাত সেই কবিতাই পাঠাচ্ছেন ডেলী টেলিগ্রাফকে।

এ অবস্থা অ্যালসাইড সহ্য করেন কি করে? জোর করে নিজের কাগজের জন্য লেখা খবরটা গুঁজে দিতে গেলেন কেরানীর হাতে।

কিন্তু আশ্চর্য শান্তকণ্ঠে শেষোক্ত ভদ্রলোক বললে—"দেখুন মশায়, উনি টাকা দিয়ে খবর পাঠাচ্ছেন—ওঁর পালা তো এখনো ফুরোয়নি।"

বলে, নির্বিকার নিরুদ্বিগ্নভাবে কাউপারের কবিতাটাকে টরে টক্কা করে পাঠাতে লাগল ডেলী টেলিগ্রাফের উদ্দেশে।

ফুঁসতে লাগলেন অ্যালসাইড জোলিভেট!

প্রতিদ্বন্দ্বীকে জব্দ করে হ্যারি ব্লাউন্ট সেই ফাঁকে দূরবীন নিয়ে দাঁড়ালেন জানলায়। তন্ময় হয়ে দেখতে লাগলেন লড়াইয়ের চেহারা। তারপর ফিরে এসে নতুন খবর নিলেন কেরানীটিকে :

"দুটো গির্জেতে আগুন লেগেছে। আগুন ডানদিকেও ছড়িয়েছে।

"জন গিলপিনকে বললেন তাঁর গৃহিনী..."

অ্যালসাইড জোলিভেটের সেই মুহূর্তে প্রবল ইচ্ছে হল ডেলী টেলিগ্রাফের সংবাদদাতার কণ্ঠনিষ্পেষণের। হামলা জুড়লেন কেরানীর ওপরে। বিচিত্র কেরানী অবিচল স্বরে শুধু বললেন—"ওঁর পালা তো এখনো ফুরোয়নি। শব্দ পিছু দশ কোপেক দিয়ে খবব পাঠাচ্ছেন খেয়াল রাখবেন।"

ব্লাউন্ট ততক্ষণে হাতে গুঁজে দিয়েছেন নতুন একটা খবর :

"রাশিয়ারা পালাচ্ছে শহব ছেড়ে।

"গিলপিন চলে গেলেন......"

অ্যালসাইড জোলিভেট প্রায় নৃত্য জুড়ে দিলেন ঘরময়।

ব্লাউন্ট আবার গিয়ে দাঁড়ালেন জানলায়। এবার একটু বেশীক্ষণই দাঁড়ালেন। কেরানীকে দেওয়া খবর ফুরিয়ে যেতেই নিঃশব্দে ফোকর দখল করলেন অ্যালসাইড। নিজের খবর গুঁজে দিলেন কেরানীর হাতে :

"ম্যাডেলিন জোলিভেট, ১০ ফবর্গ মঁমাত্রে, প্যারি।

"সাইবেরিয়ার ওমস্ক অঞ্চলের কোলিভান থেকে জানাচ্ছি।

"৬ই আগস্ট। শহর ছেড়ে পালাচ্ছে পলাতকরা। হেরে গেছে রাশিয়ান ফৌজ। তাতার অশ্বারোহীরা তাড়া করেছে মার মার করে।"

ব্লাউন্ট ফিরে এসে দেখলেন, তাঁকে বিদ্রূপ করার জন্যেই জোলিভেট বেরানজারের গান গাইছেন সুর করে।

"ব্যাপার কী?" ভ্রূকুটি করলেন ব্লাউন্ট।

"ঠিক যেরকমটি হওয়া দরকার" জোলিভেট চোখ নাচালেন।

ঠিক সেই সময়ে থর থর করে কেঁপে উঠল গোটা টেলিগ্রাফ ভবন। মনে হল যেন ভিত পর্যন্ত নড়ে উঠল। ছাদ ফুটো করে টুপ করে খসে পড়ল একটা কামানের গোলা। ধুলোয় ভরে গেল ঘর।

গান থামিয়ে দু'হাতে গোলাটা লুফে নিয়েই জানলা দিয়ে বাইরে ছুঁড়ে দিলেন জোলিভেট। পাঁচ সেকেণ্ড পরেই কানের পরদা ফাটানো শব্দে গোলাটার বিস্ফোরণ ঘটল বাইরে।

অ্যালসাইড খেই তুলে নিলেন আবারতার :

"এই মাত্র একটা ছ'ইঞ্চি গোলা এসে পড়েছিল টেলিগ্রাফ-ভবনের চাল ফুটো করে। আরও কয়েকটার প্রতীক্ষায় আছি।"

খুব কাছেই দমাদম গুলির আওয়াজ শোনা গেল এবার। জানলার কাঁচ ঝনঝন করে ভেঙে পড়ল একঝাঁক বুলেটে।

একটা বুলেট বিঁধল ব্লাউন্টের কাঁধে। মুখ থুবড়ে পড়ে গেলেন তিনি।

পুনশ্চ দিয়ে অ্যালসাইড বলে গেলেন :

"ডেলী টেলিগ্রাফের সংবাদদাতা অ্যালসাইড জোলিভেট কাঁধে গুলিবিদ্ধ হয়ে এইমাত্র পড়ে গেলেন আমার পাশে। ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি আসছে জানলা দিয়ে—"

উঠে দাঁড়াল প্রশান্ত-চিত্ত কেরানী—"স্যার, তার কেটে গেছে।" বলে ধীরে সুস্থে টুপি তুলে নিয়ে ধুলো-টুলো ঝেড়ে মাথায় পড়ে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

দৌড়ে গিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বী ব্লাউন্টকে কাঁধে তুলে নিলেন জোলিভেট। নিরাপদ আশ্রয়ে কিন্তু আর যাওয়া হল না—বন্দী হলেন তাতারদের হাতে।

জানলা দিয়ে লাফিয়ে পালাতে গিয়েও পারল না মাইকেল স্ট্রগফ—সে-ও ধরা পড়ল তাতারদের হাতে।

এরপর ?

১৮ ॥ তাতার শিবির

কোলিভান থেকে কয়েক ভার্স্ট দূরে একটা তেপান্তরের মাঠ আছে। ধূ-ধূ মাঠ। মাঝে মাঝে এক-আধটা দানবিক গাছ। কোলিভান থেকে কুচকাওয়াজ করে গেলে একদিন লাগে সেখানে পৌঁছোতে।

৭ই আগস্ট মাইকেল এবং সাংবাদিক দুজনকে টেনে আনা হল সেই প্রান্তরে। প্রান্তর বলে এখন চেনা যায় না। ছেয়ে গেছে তাতারদের তাঁবুতে। বোখারার ভয়ানক আমীর ফিওফার খান স্বয়ং সৈন্যসামন্ত নিয়ে আস্তানা নিয়েছে ধূ-ধূ প্রান্তরে।

মাইকেল এখনও জীবিত। জারের গোপন পত্রও রয়েছে তার পকেটে। অগনিত বন্দীদের ভিড়ে মিশে থাকার ফলে কেউ তার দিকে বিশেষ নজরও দিচ্ছে না। তার ছদ্মবেশ এখনো ধরা পড়েনি। গরু ছাগলের মতই বন্দীদের

হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে চলেছে তাতাররা যে দিকে—মাইকেলও যেতে চায় সেই দিকে—ইরকুটস্কের দিকে। কাজেই বন্দীদের ভিড়ে যতটা এগিয়ে যাওয়া যায় যাক না কেন। কিন্তু সুযোগ পেলেই লম্বা দিতে হবে। মুক্তি তাকে পেতেই হবে—যে ভাবেই হোক।

আরও একটা কারণে পরম স্বস্তিকে আছে মাইকেল। আইভান ওগারেফ কিন্তু এখন পেছিয়ে পড়েছে—মাইকেল চলেছে আগে আগে।

ফিওফার খানের তাঁবু-নগরীতে এসে দেখল এক অপূর্ব দৃশ্য। দেখল প্রায় দেড়লাখ পদাতিক আর অশ্বারোহী অসংখ্য তাঁবু খাটিয়ে অধীর আগ্রহে অপেক্ষায় রয়েছে আরও এগিয়ে যাওয়ার। তাঁবুগুলোর চামড়া ফেল্ট আর সিল্ক দিয়ে তৈরী। রোদ্দুরে চকচক করছে। শংকুর মত চুড়োর ওপরে পত পত করে উড়ছে রকমারি পতাকা। কোনোটা চওড়ার চাইতে লম্বায় বেধড়ক বেশী; কোনোটা ব্যানারের মত ঝুলছে নিচের দিকে। সব কিছুর মাথায় লম্বালম্বা পালকের বাহারি গুচ্ছ। বিশেষ শিবিরগুলোর সাজ সজ্জা দেখেই বোঝা যায় তাতার দলপতিদের আস্তানা সেখানে। লাল আর সাদা শিক বিনুনির মত পাকিয়ে শীর্ষদেশে ঘোড়ার ল্যাজ লাগিয়ে সাজানো হয়েছে গোটা শিবিরটাকে। কিছু দূরে উটেদের পিঠে বয়ে আনা তুর্কদের হাজার হাজার তাঁবু।

ছত্রিশ জাতের যোদ্ধারা ঠাঁই নিয়েছে এই সব শিবিরে। দীর্ঘদেহী শ্বেতকায় কৃষ্ণ চক্ষু কৃষ্ণকেশ তাদজিকরাই তাতার ফৌজের মধ্যে সংখ্যায় বেশী। তুর্কিস্থানের অন্যান্য বাসিন্দারাও রয়েছে এদের মধ্যে। রয়েছে লাল দাড়ি খর্বকায় উজবেক; চ্যাপ্টা মুখ কিরঘিজ—এদের কারো গায়ে বর্মা, কারো হাতে বল্লম আর তীর ধনুক, কারো কোমরে টাঙি বা তরবারি, কারো কাঁধে চকমকি বন্দুক; রয়েছে শূওরের ল্যাজের মত বিনুনিওলা কালো চুলো খর্বকায় মঙ্গোল—মুখ এদের গোল, গায়ের রঙ কালচে, চোখ কোটরে বসা, দাড়ি প্রায় নেই বললেই চলে, পরনের নীলচে-বাদামী নানকিন কাপড়ের তৈরী পোশাক থেকে পশম মখমলের ঝালর ঝুলছে, চামড়ার বেল্ট থেকে তরবারির খাপ ঝুলছে—চকচক করছে রুপোর তৈরী বাক্‌ল্। শুঁড়তোলা বাহারি বুট দেখবার মত। মাথায় সিল্কের টুপিতে লোমওলা পশুর চামড়ার কাজ—মাথার পেছনে ঝুলছে তিনটে ফিতে। বাদামী-চামড়া আফগানদেরও দেখা যাবে কাতারে কাতারে সৈন্যদের মধ্যে। দেখা যাবে তুর্ক আর আরবদেরও—ধমনীতে সুদর্শন সেমিটিক প্রজাতির রক্ত নিয়ে যারা প্রকৃতই সুপুরুষ।

আমীরের পতাকাতলে এরা সবাই সমবেত হয়েছে একটাই মাত্র উদ্দেশ্য নিয়ে—ধ্বংস আর নরহত্যার নারকীয় উল্লাসে মত্ত হতে।

এরা সবাই মুক্ত ফৌজ। এদের মধ্যে কিছু দাস ফৌজও আছে। মূলতঃ এরা পারস্যবাসী। ফিওকার খানের সেনাবাহিনীতে এদের স্থান অনেক নিচে।

এ ছাড়াও আছে ছিন্নবস্ত্রের ওপর চিতাবাঘের চাল চাপানো ক্যালেণ্ডার নামধারী ধর্মীয় চিকিৎসকের দল। আর ইহুদী চাকরবাকর। কোমরে দড়ির ফাঁস—দেখেই বোঝা যায় চাকর। মাথায় গাঢ় রঙের টুপি—পাগড়ী পরা বারণ বলে।

পঞ্চাশ হাজার ঘোড়াদের মধ্যেও ছত্রিশ জাতের বাহার দেখলে সত্যিই তাক লেগে যায়। সমান্তরাল দুটো দড়িতে দশটা করে বাঁধা, ল্যাজে গিঁট দেওয়া, মাথার ওপর চন্দ্রাতপের মতন কালো সিল্কের জাল খাটানো ঘোড়াগুলো তুর্ক ঘোড়া। এদের দেহ লম্বা, পা খাটো, চুল চকচকে, চেহারা খানদানী। উজবেক ঘোড়াদের চেহারার মধ্যে খুঁত আবিষ্কার করা মুস্কিল। খোখানদিয়ান ঘোড়ারা প্রভু ছাড়াও পিঠে বহন করে একজোড়া তাঁবু আর রান্নার সরঞ্জাম। কিরঘিজ ঘোড়াদের গায়ের চেকনাই দেখবার মত। এমবা নদীর তীর থেকে তাতার ল্যাসোর ফাঁসে ধরতে হয় এদের। এছাড়াও আছে নিচু জাতের পাঁচমিশেলী বহু ঘোড়া।

মালবওয়া প্রাণীগুলোও সংখ্যাও বেশ কয়েক হাজার। উটগুলো আকারে ছোটগুলো কি হবে, মাল বইতে জুড়ি নেই। লম্বা কেশর ঘাড়ের ওপর দিয়ে ঝুলছে অনেক নিচে। মাল বইতে পোক্ত গাধারাও। এদের মাংসও সুখাদ্য। তাতারদের অত্যন্ত প্রিয়।

পাইন আর দেবদারুর ছায়ায় দেখা যাচ্ছে তাঁবুর পর তাঁবু আর পশু। গাছ যেখানেই নেই—রোদ্দুরে ঝলমল করছে সেখানে।

কোলিভান থেকে ধরে আনা বন্দীরা এসে পৌঁছোতেই কাড়ানাকাড়া তুরী ভেরীর জগঝম্প শোনা গেল—সেই সঙ্গে কামান আর গাদাবন্দুকের নির্ঘোষ। ফিওফার খানের শিবিরে সবই মিলিটারী আয়োজন—হারেম রয়েছে টোমস্কে।

খান সাহেবের শিবির খাটানো হয়েছে প্রান্তরের মাঝামাঝি জায়গায়—পাইন আর বার্চ গাছের গা জুড়োনো ছায়ায়। বিরাট শিবির। অন্য সব শিবিরের মাথা ছাড়িয়ে উঠেছে। ঝকমকে সিল্কের কাপড় দিয়ে তৈরী।

সোনালী দড়ি আর ঝুমকোর সঙ্গে লাগানো পালক দিয়ে সাজানো। শিবিরের সামনেই চকচকে কালো কলাই করা একটা টেবিল। দামী দামী মণি-মাণিক্যের কাজ কলাইয়ের ওপর। পবিত্র কোরাণ রয়েছে এই টেবিলে—পাতাগুলো পাতলা সোনার পাত দিয়ে তৈরী। মাথায় উড়ছে আমীরের কুল চিহ্ন আঁকা পতাকা।

চত্বরের ঠিক সামনেই আধখানা চাঁদের আকারে সাজানো আমীরের যারা ডান হাত—তাদের শিবির। যেমন, আমীরের সঙ্গে সর্বত্র যেতে হয় যাকে—সেই আস্তাবল অধিকর্তার শিবির। বাজপাখী যার দখলে—তার শিবির। রাজকীয় সীলমোহর বয়ে নিয়ে যায় যে—তার শিবির, গোলন্দাজবাহিনীর অধিপতি যে—তার শিবির। এ ছাড়াও আছে উল্লেমার বিরাট শিবির—আমীরের অবর্তমানে আল্লার বিধান অনুযায়ী সৈন্যসামন্তর বিবাদ মিটিয়ে যায় যে। আর আছে জ্যোতিষীদের শিবির—যাদের পরামর্শ না নিয়ে কখনোই রণনীতি স্থির করেন না সর্বশক্তিমান ফিওফার খান।

বন্দীদের কপাল ভাল যে তাদের দেখতে পাষণ্ড ফিওফার খান শিবিরের বাইরে আসে নি। এলেই তো খেয়াল হত কোতল করার। বিনা অপরাধে কত বেচারীদের মুণ্ডু গড়াগড়ি যেত তেপান্তরের মাঠে। প্রাচ্যের রাজ-রাজাদের কাণ্ডই আলাদা। প্রজাদের সামনে অষ্টপ্রহর হাজির থাকে না বলেই তো প্রজারা অত যমের মত ভয় পায় তাদের।

কুকুর ছাগলের মত সারাদিন গুঁতো খেয়ে খেয়ে কোলিভান থেকে এসে বন্দীরা তাই বলির পাঁঠার মত ঠক ঠক করে কাঁপতে লাগল মহামান্য মহা-পাষণ্ড ফিওফার খানের বেরিয়ে আসার প্রতীক্ষায়।

এদের মধ্যে সবচেয়ে নির্বিকার মাইকেল স্ট্রগফ। যেদিকে সে যেতে চায়, তাতাররা তাকে সেই দিকেই নিয়ে চলেছে। টোমস্কে একবার পৌঁছোতে পারলে হল—তারপর চম্পট দেওয়া যাবে 'খন ইরকুটস্ক অভিমুখে। দুশ্চিন্তা কেবল দুটি ব্যাপারে। মায়ের কি হাল হল, জানা যায় নি। শয়তান আইভান ওগারেফ কি উৎপীড়ন করছে তার ওপর? দ্বিতীয় দুশ্চিন্তা এই আইভানকে নিয়েই। যে কোনো মুহূর্তে নিজের সৈন্যসামন্ত সমেত এসে যেতে পারে এখানে। ফিওফার খানের মূল ফৌজের সঙ্গে মিলিত হয়ে এগোবে পূর্ব সাইবেরিয়ার রাজধানী দখল অভিযানে। তার চোখেই ধরা পড়ে যেতে পারে মাইকেল। তখন যে কি হবে, ভাবতেই রক্ত ঠাণ্ডা হয়ে আসছে মাইকেলের।

হ্যারি ব্লাউন্টকে ধরে ধরে কোলিভান থেকে নিয়ে এসেছিলেন অ্যালসাইড জোলিভেট। শিবির-নগরীতে পৌঁছেই আগে পরীক্ষা করলেন কাঁধের ক্ষত-স্থান। হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন যখন দেখলেন, গুলি ভেতরে ঢোকেনি—কাঁধের মাংস খাবলে নিয়ে বেরিয়ে গেছে।

নিজের হাতে কুয়োর জলে রুমাল ভিজিয়ে ক্ষতস্থান ধুইয়ে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিলেন অ্যালসাইড। শুকনো পাতার বিছানায় বন্ধুকে শুইয়ে দিয়ে বললেন —"একটু ঘুমোন—চাঙা হয়ে যাবেন।"

"মঁসিয়ে জোলিভেট, আমার ঘুমোনোর ইচ্ছে নেই—তাতারদের শিবিরে অনির্দিষ্টকাল বন্দীদশায় থাকতেও রাজী নই।"

"সে ইচ্ছে আমারও নেই।"

"মুক্তিটা তাহলে দেবে কে? ফিওফার খান?"

"ওটা তো একটা নরপশু। মুক্তি দেবে আইভান ওগারেফ। বিশ্বাস-ঘাতক হলেও সে রাশিয়ান। অন্য দেশের মানুষদের অযথা বন্দী করে রাখার পাত্র নয়। সে আসছে ফিওফার খানের সঙ্গে নিজের সৈন্য মিলিয়ে একসঙ্গে বেরিয়ে পড়ার জন্যে।"

"মুক্তি পাওয়ার পর কি করব?"

"আবার সংবাদ সংগ্রহ করব। আপনি তখন হয়েছেন ডেলী টেলিগ্রাফের সেবায়। আমি এখনও হয়নি। কিন্তু—যাচ্চলে। ঘুমিয়ে পড়েছে দেখছি। আশ্চর্য ধাত বটে ইংরেজদের। ঘণ্টা কয়েক ঘুমোলেই ফের চাঙা হয়ে উঠবে'খন।"

তখন বন্ধুকে ঘুম পাড়িয়ে অ্যালসাইড নোটবই খুলে খবর লিখতে বসলেন। ব্লাউন্ট এখন আর প্রতিদ্বন্দ্বী নন—দোস্ত। সুস্থ হলে খবরের ভাগ তাকেও দেবেন।

এই ভাবেই কাটল চারটে দিন। খোলা আকাশের তলায় কখনো রোদে ভাজা ভাজা হল, কখনো বৃষ্টিতে ভিজে একসা হল বন্দীর দল। খাওয়ার ব্যবস্থাও অকথ্য। ছাগলের নাড়ীভুঁড়ী পোড়া আর ইউ'র দুধ থেকে তৈরী 'ক্লাউট' চীজ। কখনো-সখনো মাদী ঘোড়ার দুধে ডোবানো কিরঘিজ খানা 'কৌমিস'। রোদে জলে অর্ধাহারা বেশ কিছু মেয়ে আর বাচ্চা মারা গেল। তাতাররা তাদের গোর দেওয়ার ব্যবস্থা করছে না দেখেই বন্দীরাই সে ব্যবস্থা করলে সবাই মিলে হাত লাগিয়ে। অ্যালসাইড আর মাইকেল নিজেদের এখতিয়ারে এই সব নিয়েই ব্যস্ত রইল চারদিন।

১২ই আগস্ট ফের বেজে উঠল তুরী ভেরী কাড়া নাকাড়া—সেই সঙ্গে কামানের বুক কাঁপানো নির্ঘোষ। কোলিভানের ধুলোর মেঘ উড়িয়ে কয়েক হাজার স্যাঙাত নিয়ে তাতার শিবিরে প্রবেশ করল বিশ্বাসঘাতক আইভান ওগারেফ।

১৯ ॥ বিপদগ্রস্ত সাংবাদিক

আইভান ওগারেফের বাহিনীর সঙ্গেই এল কয়েক হাজার বন্দী। পুষ্টিকর খাবার না খেয়ে, রোদে জলে পুড়ে আর ভিজে প্রত্যেকেই তখন আধমরা। সবার পেছনে ভিখিরি আর জিপসীদের দল—সব সৈন্যবাহিনীর পেছনে যা থাকে।

জিগানে জিপসীদের মধ্যে সানগারেও এল। আইভান ওগারেফের ডান হাত এই সানগারে একবার বিষম বিপদে পড়েছিল। ফৌজের অফিসার আইভান তাকে বাঁচায়। সেই ঋণ এখনো শোধ করে চলেছে সানগারে। বিশ্বাসঘাতক হওয়ার পর আইভান তার মাধ্যমেই খবর সংগ্রহ করে। সাইবেরিয়ার সবত্র তার স্পাইরা ছড়িয়ে পড়েছে। খবর আসছে হাজার হাজার চোখ আর কানের মধ্যে দিয়ে।

উচ্চপদস্থ কয়েকজন অফিসার উজবেক ঘোড়সওয়ারদের নিয়ে খাতির করে নিয়ে এল আইভানকে। উদ্ধত আইভান কিন্তু কাউকে পাত্তা দিল না। ঔদ্ধত্য তার চূড়ান্ত বলেই বিশ্বাসঘাতক হয়েও শ্রীঅংগ থেকে রাশিয়ান ফৌজী অফিসারের পোশাক এখনো নামায়নি। এ বেশেই হন হন করে ঢুকল ফিওফার খানের শিবিরে। মন্ত্রী পরিষদ নিয়ে বোখারোর কার্পেট বিছানো দরবারে বসেছিল ফিওফার খান। ভয়াবহ মুখচ্ছবি তার। বয়স প্রায় চল্লিশ। দুই চোখে যেন নরকের আগুন। কালো কোঁকড়া দাড়ি ঝুলছে বুকের ওপর। মাথায় হীরে বসানো উষ্ণীষ, গায়ে সোনা আর রুপোর বর্ম, হীরে মানিক বসানো ক্রশ বেল্ট, ঝকমকে বাঁকানো তরবারিতেও রত্নের কারুকাজ, জুতোয় সোনার অলংকার। প্রজাদের দণ্ডমুণ্ডের কর্তাই বটে—খেয়ালী, নির্মম এবং নরপিশাচ।

ওগারেফ রাজসভায় ঢুকতেই মন্ত্রীরা বসে রইল যে যার সোনার আসনে—স্বর্ণ সিংহাসন ছেড়ে উঠে দাঁড়াল একা ফিওফার খান। এগিয়ে এসে চুমু খেল আইভানের গালে।

অর্থাৎ সাময়িকভাবে মন্ত্রীদেরও ওপরের পদে অভিষিক্ত করা হল আই-ভান ওগারেফকে।

"আইভান" বললে ফিওফার খান—"বলো, এখন কি করতে চাও!"

"ইরকুটস্ক যেতে চাই। জারের ভাই রয়েছে সেখানে। পূর্ব অঞ্চলের রাজধানী আর জারের ভাইকে আপনার পায়ের তলায় এনে ফেলতে চাই।"

"তাই হোক, আইভান। আজই সদর দপ্তর নিয়ে যাও টোমস্কে।"

আমীরের হুকুম তামিল করার জন্যে বেরিয়ে এল আইভান। ঘোড়ায় চড়তে যাচ্ছে, এমন সময়ে কানে ভেসে এল বন্দীদের দিক থেকে ভীষণ চেঁচামেচি। দুচারটে বন্দুকও গর্জে উঠল দমাদম শব্দে। বোধহয় প্রহরীদের চোখে ধুলো দিতে চেয়েছে কেউ। অথবা বিদ্রোহী হয়েছে বন্দীরা। এখুনি কড়া হাতের শাসন দরকার।

একজন তাতার অফিসারকে নিয়ে এগিয়ে গেল আইভান। দুজন বন্দীকে কিছুতেই ধরে রাখতে পারছে না প্রহরীরা। ইংগিত করল অফিসার। বন্দী দুজনের মুণ্ড কাটবার জন্যে মাথার ওপর তরবারি তুলে ধরল দুজন প্রহরী।

আর এক সেকেণ্ড—এখুনি ধুলোয় গড়িয়ে যাবে দু'দুটো টাটকা নরমুণ্ড।

হঠাৎ থমকে উঠল আইভান ওগারেফ। তরবারি নামিয়ে নিল প্রহরী দুজন।

ঠিক চিনেছে আইভান। বন্দীরা এদেশী নয়—বিদেশী।

সামনে এসে দাঁড়ালেন হ্যারি ব্লাউন্ট আর অ্যালসাইড জোলিভেট।

ভুরু কুঁচকে চেয়ে রইল আইভান। বিদেশী দুজনকে সে দেখেছে ইচিমের ঘোড়াশালায় মাইকেলকে পেটানোর সময়ে—কিন্তু পরিচয় জানে না।

আইভানকে দেখেই কিন্তু চমকে উঠলেন ব্লাউন্ট আর জোলিভেট। আই-ভান ওগারেফ শিবিরে এসেছে শুনেই প্রহরীদের হাত ছাড়িয়ে ছুটে আসতে গিয়ে এই বিপত্তি। গুলি খেতে খেতে বেঁচে গেছে কপালজোরে। কিন্তু ইচিমের সেই চোয়াড়ে বদমাসটাই যে আইভান ওগারেফ—তা কে জানত।

ব্লাউন্টের কানে কানে ফিসফিস করে বললেন জোলিভেট—"যান যা বলবার বলুন। ওর মুখ দেখলে আমার ঘেন্না হচ্ছে।"

উদ্ধত ভঙ্গিমায় ব্লাউন্ট নিজেদের পরিচয় পত্র তুলে দিলেন আইভানের হাতে। আইভান খুঁটিয়ে দেখল।

বললে—"আমাদের সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে যেতে চান?"

"আমরা মুক্তি চাই।" নীরস কণ্ঠস্বর ব্লাউন্টের।

"আপনারা মুক্ত। ডেলী টেলিগ্রাফে আপনার খবর পড়ার ইচ্ছে রইল।"

"ছ পেনি দাম প্রতি সংখ্যার—ডাক খরচ ওর মধ্যেই," বলেই ফরাসী বন্ধুর পানে ফিরে চাইলেন ইংরেজ সাংবাদিক। সায় এল ফরাসী তরফ থেকেও।

ভ্রূকুটি করল না আইভান। উঠে পড়ল ঘোড়ায়। মিলিয়ে গেল ধুলোর মেঝের মধ্যে।

মুক্ত হলেন দুই সাংবাদিক। ঠিক করলেন, এখন থেকে দুজনে এক সঙ্গে থাকবেন, এক খবর সংগ্রহ করবেন, একসাথে পাঠাবেন।

মাইকেল কি করছিল এই সময়ে?

পালাবার মতলব আঁটছিল। আইভানকে দেখেই প্রমাদ গুনেছিল সে। ধরা পড়তে পারে যে কোন মুহূর্তে।

তারপর যখন শুনল ফিওফার খানকে নিয়ে আইভান ওগারেফ রওনা হয়েছে টোমস্ক অভিমুখে এবং বন্দীদের এই দেড়শ ভার্স্ট পথ তিনদিন ধরে হাঁটিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে সেই দিকেই—তখন ঠিক করলে—না, বন্দীদের ভিড়ে মিশেই থাকা যাক। এখন পালালে অগণিত স্কাউটদের হাতে ধরা পড়ার সম্ভাবনা আছে। টোমস্ক পৌঁছে চম্পট দেওয়া যাবে'খন।

আইভান ওগারেফ যে সব বন্দীদের মারতে মারতে টেনে এনেছে রাস্তার ওপর দিয়ে ঘোড়ার সঙ্গে বেঁধে হিড়হিড় করে টানতে টানতে—তাদের মধ্যে একজন বুড়ির সহ্যশক্তি সত্যিই দেখবার মত। মুখে টুঁ শব্দটি নেই।

প্রায় নাতনীর বয়সী একটি মেয়ে না থাকলে কিন্তু বুড়ির অবস্থা শোচনীয় হয়ে দাঁড়াত। মেয়েটি প্রকৃত সুন্দরী। বুড়ি তাকে চেনে না। তার সাহায্য কখনো চায়নি। মেয়েটি তবুও বুড়ির খাবার ফুরিয়ে গেলে নিজের খাবার থেকে বুড়িকে খাইয়েছে। প্রহরীদের কাকুতি মিনতি করে ঘোড়ার সঙ্গে বুড়িকে বাঁধতে দেয়নি এবং হাজার রকমভাবে অযাচিত ভাবে সেবা করে চলেছে বুড়ির। যেন নিজের ঠাকুমা।

শেষকালে নরম হয়েছে বুড়ির শক্ত মনও। ছলছল চোখে বলছে—"মা, ভগবান তোমার মঙ্গল করবেন।"

বুড়ি কিন্তু হুঁশিয়ার। এর বেশী একটা কথাও বলেনি। পাছে ছেলের বিপদ হয়, তাই কখনো বলেনি তার নাম মারফা স্ট্রগফ। মেয়েটিও গায়ে পড়ে বলেনি তার নাম নাদিয়া।

কিন্তু একদিন মনের দুঃখে দুজনেই দুজনের মনের কথা বলল। নাদিয়া

বলছিল নিকোলাস কোরপানফের কাহিনী। লাডিমির থেকে পরিচয়—জন্মের মত ছাড়াছাড়ি নিকোলাসের মৃত্যুর পর। বলতে বলতে কেঁদে ফেলল নাদিয়া। অমন বীরত্ব অমন দুর্জয় সাহস সে আর দেখেনি।

শুনেই ভুরু কুঁচকে গেল বুড়ির—"নিকোলাস কোরপানফ। আসল নাম তো?"

"আসল ছাড়া নকল হতে যাবে কেন?"

"সে যে আমার ছেলে।...নাম ভাঁড়িয়ে নিকোলাস হয়েছে।"

"আপনার ছেলে।"

"হ্যাঁ.. হ্যাঁ...হ্যাঁ। আমার ছেলে। ইচিমে খুব অপমানিত হয়েছিল, না রে?"

'হ্যাঁ, মা। কিন্তু মুখ বুঁজে সয়ে গেছিল—শুধু একটা গোপন কাজে যেতে হচ্ছে বলে। কাজটা খুবই গোপন—'

"মায়ের কথা কখনো বলেনি?"

"হাজার বার বলত।"

"মাইকেল। ...মাইকেল...। ওমস্কে গিয়ে মাকে দেখবে বলেছিল?"

"না।"

"না। না কি বলছিস?"

"ঠিকই বলছি মা। খুব গোপন কাজ নিয়ে যাচ্ছিল বলেই বোধহয় আপনার সঙ্গেও দেখা করবে না ঠিক করেছিল। কাজটা কি, জানিনা।"

"কর্তব্য ছাড়া সে যে কিছুই বোঝে না। সে যে আমারই ছেলে—মায়ের কাছেও আসতে চায় না। বেশ, তার গোপন কাজের কথা যখন তোকেও বলেনি—আমিও কাউকে বলব না সে আমার ছেলে—কাউকে না।"

২০ ॥ আঘাতের পর আঘাত

পশুর মত তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হল বন্দীদের। বাচ্চাদের ঝুলিয়ে দেওয়া হল ঘোড়ার জিনের সামনে উঁচু পামেল থেকে। হাতকড়ি বেঁধে পুরুষদের লম্বা শেকলে টেনে হিঁচড়ে আনা হল ধুলোর ওপর দিয়ে। মেয়েরাও বাদ গেল না।

মাইকেল কিন্তু ঘুণাক্ষরেও জানতে পারেনি—বন্দীদের মধ্যে রয়েছে তার

মা আর নাদিয়া। মাইকেলের উপস্থিতিও জানে না এবা দু'জন।

নাদিয়া যেমন বুড়ি মারফাকে ধরে ধরে নিয়ে যেতে গিয়ে হরবখৎ তাতার বল্লমের খোঁচা খাচ্ছে, মাইকেলও তেমনি আশপাশের কাহিল বন্দীদের সাহায্য করতে গিয়ে হয় বল্লমের খোঁচা, নয় ঘোড়ার চাবুক খেয়ে মরছে।

পনেরো তারিখে রাত্রে বন্দীরা থামল টম নদীর পাড়ে—টোমস্ক এখান থেকে তিরিশ ভার্স্ট। রাত এখানেই কাটাতে হবে। কেননা, ফিওফার খান সৈন্যসামন্ত নিয়ে টোমস্কের বাইরে তাঁবু গেড়েছে। ধুমধাম করে তাকে শহরে ঢোকানোর ব্যবস্থা হচ্ছে। হাজার হোক বিজয়ী তো—কত তোপ দাগা হবে, কত নর্তকী নেচে যাবে, কত বাজি পুড়বে, কত হৈ হল্লা হবে। দুম করে ঢুকে পড়লে কি চলে?

তাই বন্দীদেরও খোলা জায়গায় রাত কাটাতে হবে। এর আগেই পথের মাঠে ঘাটে শুয়ে থেকে অনেকেই শেষ নিঃশ্বেস ফেলেছে। তাতারা তাদের মড়া ফেলে চলে এসেছে ক্ষুধার্ত নেকড়েদের পেটের জ্বালা মিটোনোর সুযোগ দিয়ে।

টম নদীর পাড়ে মারফাকে ধরে ধরে নিয়ে গেল নাদিয়া। চোখে মুখে জল ছিটিয়ে অনেকটা চাঙা করে তুলল। তারপরেই চেঁচিয়ে উঠল অস্ফুট কণ্ঠে।

হাত কয়েক দূরেই দাঁড়িয়ে মাইকেল।

কে অমন চাপা গলায় চেঁচিয়ে উঠেই থেমে গেল দেখবার জন্যে মুখ ফিরিয়ে কাঠ হয়ে গেল মাইকেল। মা আর নাদিয়া। নাদিয়া তাকে চিনতে পেরেছে। সে যে বেঁচে আছে জেনে ফেলেছে। অথচ কাছে ছুটে আসছে না। তার মানে, সে জানে কি খবরের গোপন কাজে ছদ্মবেশ নিয়েছে মাইকেল। মা পর্যন্ত মুখখানা নির্বিকার করে রয়েছে। মাও তাহলে জানে।

অতি কষ্টে নিজেকে সামলে নিয়ে মুখ ঘুরিয়ে হন হন করে ভীড়ের মধ্যে মিলিয়ে গেল মাইকেল।

নাদিয়াকে ধরে রেখে দিয়েছিল মারফা নিজে। ছেলে মানুষ—আবেগে কাঁপতে কাঁপতে মাইকেলের পেছনে ছুটে গেলেই যে সর্বনাশ।

কিন্তু একজন অনেকদিন ধরেই বন্দীদের মধ্যে লুকিয়ে থেকে নজরে রেখেছিল মারফার ওপর। যেদিন থেকে বুড়িকে ধরা হয়েছে সেইদিন থেকেই তার প্রতিটি গতিবিধি তার খরশান্ দৃষ্টির সামনেই ঘটেছে।

গুপ্তচরী এই মেয়েটাই সানগারে—জিপসী সানগারে।

নাদিয়া আর মারফাব চমকে ওঠা সে দেখে ফেলল কিন্তু দেখতে পেল না মাইকেল।

পনেরো মিনিট পরেই সানগারেকে দেখা গেল আইভান ওগাবেফের দরবারে। টোমস্ক থেকে সে এসে গিয়েছিল ফিওফার খানের সঙ্গে শলা-পরামর্শের জন্যে।

"কি ব্যাপাব, সানগাবে ?"

"মাবফা স্ট্রগফেব ছেলে বয়েছে এখানে।"

"বন্দী অবস্থায় ?"

"হ্যাঁ।"

"তাহলে তো ধবে ফেলবই।'

"পাববেন না। আপনি তাকে চেনেন না।"

"তুমি তো চেন ?"

"না। আমি দেখিনি। কিন্তু মাবফাব মুখ চোখ দেখেই বুঝেছি।"

"কিন্তু হাজাব হাজাব বন্দীদেব মধ্যে মাইকেলকে চিনবে কি কবে ?'

'ওব মা চিনে বাব কববে।'

' আ। ঠিক আছে, কাল কথা বলাবো বুড়িকে।"

সারাবাত বুড়ি আব নাদিযাকে চোখে চোখে বাখল সানগাবে। উত্তেজনায় ওদেব দুজনেব চোখেও ঘুম নেই।

পবেব দিন ষোল তাবিখে সকাল দশটায তুর্যনিনাদের সঙ্গে সঙ্গে অস্ত্র নিয়ে তৈবী হয়ে গেল তাতাব ফৌজ।

তাতাব আকসাব পবিবৃত হযে এসে পৌঁছোলো আইভান ওগাবেফ। মুখ তাব মেঘাচ্ছন্ন। দেখেই শংকিত হল মাইকেল। আইভানেব কুটিলললাটে পুঞ্জীভূত ক্রোধ যে অকাবণে নয়, শিগগিবই মহা সর্বনাশ ঘটতে চলেছে, তা আঁচ করল ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় দিয়ে।

বন্দীদেব ঠিক মাঝখানে ঘোড়ায় চেপে এসে দাড়াল আইভান, অফিসাববা ঘিবে দাঁড়াল চাবদিকে। বন্দীদেব বর্শাব খোঁচা মেরে চারপাশে এনে দাঁড কবালো প্রহবীবা। শাস্ত্রীবা ঘিবে বইল এমনভাবে যাতে কেউ পালাতে না পাবে।

নৈঃশব্দ্য।

পায়ে পায়ে মাবফার দিকে এগিয়ে গেল সানগারে। মারফা বুঝল কি

ঘটতে চলেছে। চোখের পাতা না কাঁপিয়ে সামান্য পাশে হেলে নাদিয়াকে বললে চাপা গলায়—"যাই ঘটুক না কেন—তুমি মুখ খুলবে না। মনে রেখো আমি উপলক্ষ্য মাত্র—ওদের দরকার আমার ছেলেকে।"

সানগারে এসে দাঁড়াল সামনে। কিছুক্ষণ নির্নিমেষে চেয়ে রইল চোখের পানে তারপর কাঁধ ধরে বুড়িকে টেনে নিয়ে গিয়ে দাঁড় করাল অশ্বারূঢ় আইভানের সামনে।

ক্রুর দুই চোখে বিশ্বের ঘৃণা জমিয়ে বুড়ির দিকে চেয়ে রইল আইভান। তার দরকার মাইকেলকে—এই বুড়িকে দিয়ে চেনাতে হবে তাকে। মাইকেলের পকেটে চিঠিখানাই হলে শুধু চলবে না—বন্দীদের সবার দেহ তল্লাস করে চিঠি বার করতে গেলে হয়ত চিঠি নষ্ট করে ফেলতে পারে মাইকেল। তখন কেউ তাকে চিনতেও পারবে না। ছদ্মনামে ইরকুটস্ক পৌঁছে যাবে সে—ফাঁস হবে আইভানের সব ষড়যন্ত্র। কাজেই মাইকেলকে চিনিয়ে দেওয়াতে হবে মাইকেলেরই মা-কে দিয়ে। ছেলের সামনে মাকে চাবুক হাঁকড়ালেই ছেলের মুখ শুকিয়ে যাবেই—তখন চিনতে অসুবিধে হবে না।

কড়া গলায় তাই বললে আইভান—"তোমার নাম মারফা স্ট্রগফ?"

"হ্যাঁ।"

"তোমার ছেলে, রাশিয়ার রাজদূত ওমস্কে এসেছিল?"

"জানি না।"

"যাকে তুমি ছেলে বলে চিনেছিলে, সে তোমার ছেলে নয়?"

"না।"

"চিনিয়ে দিলে চিনতে পারবে?"

"না।"

গুঞ্জন ধ্বনি শোনা গেল চারদিকে। বুড়ি বড় শক্ত। প্রাণ দেবে তবুও ছেলেকে চিনিয়ে দেবে না।

সানগারে শুধু বললে—"নাউট।"

"হ্যাঁ, লাগাও নাউট।" বজ্রকণ্ঠে যেন ফেটে পড়ল আইভান।

নাউট একগোছা চামড়ার চাবুক—প্রত্যেকটা চাবুকের ডগায় বাঁকানো লোহার তার। নাউটের একশ ঘা মানেই মৃত্যু।

সঙ্গে সঙ্গে নাউট নিয়ে একজন তাতার এসে দাঁড়াল সামনে। আর একজন বুড়িকে ঘাড় ধরে হেঁট করে বসিয়ে বুকের তলায় ধরল বাঁকানো নগ্ন

তরবারি—ছিঁড়ে দিল পিঠের জামা। নাউটের ঘা খেয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়লেই বুক হবে দু'টুকরো।

আইভানের ইংগিত পেয়েই মাথায় এক পাক ঘুরিয়ে নাউট নামিয়ে আনল জল্লাদ

কিন্তু মারফাব পিঠে পড়াব আগেই ভীড়ের মধ্যে একজন দীর্ঘকায় থেকে পুরুষ বিদ্যুৎবেগে দৌড়ে এসে হাত থেকে ছিনিয়ে নিল কালান্তক নাউট।

"মাইকেল স্ট্রগফ।" সহর্ষে বললে আইভান।

"হ্যাঁ, আমিই মাইকেল স্ট্রগফ।" বলেই ইচিমেব ঘোড়াশালায় মাব খেয়ে মার হজম করার অপমান তুলে নিল সুদে আসলে। দেহের সমস্ত শক্তি দিয়ে সপাং করে নাউট দিয়ে আঘাত হানল আইভানেব মুখে।

বললে তীব্র কণ্ঠে—"বদলা নিলাম।"

"শোধবোধ।" কে যেন সোল্লাসে বলে উঠল ভীড়ের মধ্যে থেকে।

ঝাঁপিয়ে পড়ল বিশজন তাতাব সৈন্য। ছিনিয়ে নিল নাউট মাইকেলেব হাত থেকে। আব একটু হলেও মাইকেলের মুণ্ড গড়িয়ে যেত ধুলোয়—

বাধা দিল আইভান। নাউটেব মরণ-মারে যন্ত্রণায় ককিয়ে উঠেও ধমক দিয়ে থামিয়ে দিল মাবমুখো তাতারদেব।

"খবরদার। বন্দী করো—মাববে না। এব বিচাব করবেন আমীব নিজে। দেহতল্লাস করে দেখো কিছু পাওয়া যায় কিনা।"

মাইকেলেব বুকের কাছে লুকোনো গোপন পকেট থেকে বেবোলো চিঠিটা। মুখ থেকে তখনো টপটপ করে বক্ত ঝবছিল আইভানের—সেই অবস্থাতেই সীলমোহব ভেঙে খাম ছিঁড়ে পড়ল চিঠিটা—একবাব—দুবাব—তিনবাব চিঠিব প্রত্যেকটা শব্দ যেন গেঁথে নিল মনেব পটে।

তাবপর হুকুম দিল বন্দীদেব নিয়ে তিরিশ ভার্স্ট দূরে আমীবেব শিবিবে যাওয়াব।

নাউটেব মাব খেয়ে আইভান ওগারেফ যখন কাতবে উঠেছে, ঠিক সেই সময়ে শোধবোধ বলে উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠেছিল দুজন পুরুষ। ইচিমেব ঘোড়াশালায় নাহক অপমানেব শোধ যে বীবপুরুষ এইভাবে নিতে পাবে মৃত্যু সম্মুখীন জেনেও, তার এত বড় বীবত্ব প্রত্যক্ষ করে সাবাস না জানিয়ে পাবেনি এই দুই ব্যক্তি।

তাবপরেই চৈতন্য হল দুজনের। শলাপরামর্শ করে দেখল, মাইকেল স্ট্রগফকে এই নর পিশাচদের খপ্পর থেকে প্রাণ নিয়ে আর বেরোতে হবে না।

নাউট হাঁকড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে তার বিধিলিপিও সুস্পষ্ট হয়ে গেছে। মরতে হবে তার মা আর নাদিয়া বলে ঐ মেয়েটাকেও। কিছু করা যাবে না— হাজার চেষ্টা করেও এদের প্রাণ রক্ষা করা যাবে না।

তাই মন মরা হয়ে দুজনে ঠিক করল নিষ্ঠুর বর্বর তাতারদের সান্নিধ্য ত্যাগ করে যাবে সময় আর সুযোগ হলেই—যাবে রাশিয়ান ফৌজের কাছে। তাতারদের বর্বরতা দু'চোখ দিয়ে আর দেখা যাচ্ছে না।

হ্যাঁ, এদের নাম অ্যালসাইড জোলিভেট আর হ্যারি ব্লাউন্ট—অকুতোভয় সাংবাদিকদ্বয়।

মনে একটা আপশোষই রইল কেবল। চিঠিটার বয়ান জানতে পারলে নিজের নিজের কাগজে আজকের এই ঘটনাকে আরো খোলতাই করে লেখা যেত।

২১ ॥ বিজয়ীদের শহর-প্রবেশ

টোমস্ক শহরটার পত্তন ঘটে ১৬০৪ সালে। এশিয়াটিক রাশিয়ায় যত শহর আছে, তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল এই টোমস্ক। সাইবেরিয়া জেলার ঠিক মাঝখানে বড় সুন্দর করে গড়ে তোলা হয়েছিল শহরটিকে। কিন্তু তাতারদের আক্রমণের ফলে এখন তা হতশ্রী কুৎসিত।

মাত্র কয়েক ব্যাটেলিয়ন কশাক দিয়ে তাতারদের ঐ বন্যার জলের মত বাহিনীকে আটকানো যায়? তোপের মুখে তাই উড়ে গেছে টোমস্ক। শহরে কিছু তাতার থাকত। তারাই হৈ-চৈ করে বেরিয়ে এসে মহাসমাদরে অভ্যর্থনা জানিয়েছে বিজয়ী তাতার বাহিনীকে। টোমস্ক তখন যেন বোখারা অথবা খোখান্দের রূপ নিয়েছে।

নাচ গান উৎসবের মাধ্যমে বিধ্বস্ত এই শহরেই এখন অভ্যর্থনা জানানো হবে বিজয়ী ফিওফার খানকে। উৎসবের আয়োজন হয়েছে মস্ত একটা মাঠে। একপাশে পেল্লায় একটা প্রাসাদও তৈরী হয়েছে। চোখ ঠিকরে যাবে বিচিত্র সেই ইমারতের বাহার দেখলে। ছাদের মিনার আর চারপাশের বড় বড় গাছগুলোর ওপর দিয়ে উড়ছে বোখারা থেকে আনা হাজার হাজার সাদা সারস। ছাদটা সংরক্ষিত করা হয়েছে শুধু আমীরের দরবার, খানেদের সভা আর হারেমের সুলতানাদের জন্যে।

সুলতানাদের বেশীর ভাগকেই কেনা হয়েছে বাঁদী হিসেবে পারস্য বা ট্রান্স

ককেশিয়ার বাজার থেকে। কারও মুখ বোরখায় ঢাকা, কারও মুখে ফিন-ফিনে ওড়না। দারুণ জমকালো পোশাক প্রত্যেকের পরনে। পায়ের নখের ডগা থেকে মাথার চুল পর্যন্ত দামী দামী মণিমুক্তোয় মোড়া। তারই মধ্যে দিয়ে দেখা যাচ্ছে হেনা দিয়ে রঞ্জিত নখ। সিল্ক, ব্রোকেড, মসলিন, মখমলের কাপড়ে তৈরী পোশাকের দিকেও তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে যায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা। তারপর যদি ওড়না আর ঘোমটার আড়ালে চোখের দিকে নজর পড়ে, তাহলে তো আর কথাই নেই। চোখ কপালে উঠে যাবে সুর্মাটানা ঢল ঢল জোড়া জোড়া আঁখি আর আঁখি পল্লবের অপূর্ব সৌন্দর্য দেখে।

প্রাসাদের তলায় বাঁকানো তরবারি খাপ থেকে টেনে হাতে রেখে টহল দিচ্ছে আমীরের জল্লাদ মার্কা প্রহরীরা।

বিরাট মাঠের সর্বত্র কেবল মানুষ আর মানুষ। গোটা সেন্ট্রাল এশিয়ার সব রকমের মানুষ জুটেছে সেখানে। উজবেক থেকে আরম্ভ করে মাঞ্চু পর্যন্ত —কেউ বাদ নেই। রোদ্দুরে যেমন লাল দাড়ি উজবেকদের কালো ভেড়ার চামড়ার টুপী চেকনাই ছড়াচ্ছে, ঠিক সেই ভাবেই উটের লোম দিয়ে তৈরী ঝকঝকে চড়া রঙের তুর্ক-পোশাক থেকে যেন রামধনু রঙ ঠিকরে যাচ্ছে। ছাগলের চুল দিয়ে বিনুনী লম্বা করে বেঁধেছে জবরজঙ রঙের পোশাক পরা তুর্ক মেয়েরা, দাড়ি কামিয়ে মাথায় সোনার পিন দিয়ে উদ্ভট সাজ আটকে ঘুরঘুর করছে মাঞ্চুরা। আশে পাশে অট্টরোলের হটগোলে আকাশ বাতাস ফালা ফালা করে ছাড়ছে মঙ্গোল, বোখারিয়ান, পার্সিয়ান, তুর্কি আর চাই-নিজরা।

এই ভীড়ে নেই কেবল সাইবেরিয়ানরা। যারা পালাতে পারেনি—তারা যে যার বাড়ীতে বসে ইষ্টমন্ত্র জপ করছে।

চারটের সময়ে প্রাঙ্গণে এল আমীর। বাজল তুরী ভেরী কাড়ানাকাড়া। ধোঁয়ার রেখা টেনে শূন্যে ছুটে গেল কামানের গোলা বন্দুকের গুলি। অসংখ্য হীরে দিয়ে সাজানো নিজের প্রিয় ঘোড়ায় চড়ে এল আমীর। পাশে হেঁটে এল উজীর, ওমরাহ এবং উচ্চপদস্থ ব্যক্তিরা।

একই সময়ে প্রাসাদের ছাদে এসে দাঁড়াল ফিওফার খানের পাটরাণী—বোখারার পয়লা নম্বর সুলতানা। বাঁদী অথবা বেগম যাই হোক না কেন—মেয়েটিকে যেন কুবেরের ঐশ্বর্য দিয়ে মুড়ে দেওয়া হয়েছে। মুসলমানদের প্রথা মেয়েদের মুখ বোরখায় ঢেকে রাখা। কিন্তু আমীরের খেয়াল হয়েছে, প্রথা মানবে না—তাই পয়লা নম্বর সুলতানার মুখে ঘোমটা নেই। অনিন্দ্য-

সুন্দর মুখের চাইতে বেশী ঝকমক করছে কিন্তু মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত মালার আকারে গাঁথা অজস্র হীরে মুক্তো চুনী পান্না মরকত নীলা পদ্মরাগ কৌস্তুভ মণি। সুলতানার মূল্যবান পোশাক পর্যন্ত দামী পাথর দিয়ে তৈরী। কোটি কোটি রুবলের রত্ন মোড়া পাটরাণী এসে ছাদে দাঁড়াতেই যেন লক্ষ লক্ষ সূর্য ঠিকরে গেল তার গা থেকে, মাথা থেকে, পা থেকে, হাত থেকে।

ঘোড়া থেকে নামল আমীর। খান আর উজীর ওমরাহদের নিয়ে ঢুকল সুদৃশ্য একটা তাঁবুতে। তাঁবুর সামনেই যথারীতি কালো কলাই করা রত্ন খচিত টেবিলের ওপর বসানো সোনার পৃষ্ঠাওলা কোরান।

তাতার অফিসারের পোশাক পরে এসে ঘোড়া থেকে আমীরের সামনে নামল আইভান ওগারেফ। তার মুখের ওপর দগদগে ক্ষত চিহ্নটা দেখে শিউরে উঠছেন প্রত্যেকেই।

ফিসফিস করে শলাপরামর্শ করে নিলেন ব্লাউন্ট আর জোলিভেট। ফিওফার খানকে কি রকম বিজয় অভ্যর্থনা জানানো হয়, তা দেখে নিজের নিজের খবরের কাগজের জন্যে গল্প তৈরী করতে করতে দুজনেই চম্পট দেবেন রাশিয়ান ফৌজের সন্ধানে।

কিন্তু উৎসবের শুরু তো নাচ গান দিয়ে হবে না—হবে বন্দীদের অবমাননা করে। এইটাই নিয়ম। দাসত্বের শুরু হেনস্তা দিয়ে। এইজন্যেই বন্দীদের মারতে মারতে টেনে আনা অ্যাদ্দুর। এখন তাদেরকে লাইন দিয়ে দাঁড় করান হল আমীরের সামনে। প্রথম দলে রইল মাইকেল, নাদিয়া, মারফা।

এক একজন বন্দীকে টেনে আনা হল আমীরের সামনে—ধুলোয় মাথা ঘসে সেলাম জানিয়ে গেল আমীরকে। শক্ত মহিমায় মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে রইল আমীর।

টেনে আনা হল হল মারফাকে। কিন্তু তার ঘাড় হেঁট করানো গেল না। জোর করেও কিছু হল না।

হেঁকে উঠল আইভান—"ওকে সামনে রাখো—নিয়ে যেও না।"

দাঁড়িয়ে রইল বুড়ি! নির্বাক, নিষ্কম্প।

এল মাইকেল। দুজন সৈন্য জোর করে তার ঘাড় নোয়াতে গেল—কিন্তু দুজনেই মাইকেলের জোড়া ঘুসিতে চিৎপাত হয়ে ছিটকে পড়ল মাটিতে।

এগিয়ে এল আইভান—"মরবে তুমি!"

"হ্যাঁ মরব। কিন্তু তোমার মত বিশ্বাসঘাতকের মুখের ঐ দাগ

তাতে মিলোবে না।" দাঁত কিড়মিড় করে বললে মাইকেল।

মুখ লাল হয়ে গেল আইভানের।

গুরু গম্ভীর গলায় বললে আমীর--"লোকটা কে?"

"রাশিয়ার গুপ্তচর," এক কথাতেই অনেক কথা বলে দিল আইভান ওগাবেফ।

সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ হয়ে উঠল আমীরের মুখের চেহারা। ঈঙ্গিতে কোরান আনতে বলল কাছে। পাতা উল্টে দিয়ে আঙুল রাখতে বলল যেখানে খুশী। সেন্ট্রাল এশিয়ার দণ্ডদানের এই ধর্মীয় প্রথাকে বলা হয় 'ফাল'। আল্লার নির্দেশেই শাস্তি পাবে অপরাধী—আঙুল গিয়ে পড়বে সঠিক শ্লোকে।

এগিয়ে এল উলেমাদের প্রধান। শ্লোকটা পড়ে শোনালো উচ্চকণ্ঠে—"পৃথিবীর কিছুই আর সে দেখতে পাবে না।'

"রাশিয়ার গুপ্তচর।" দাঁতে দাঁত পিষে ভয়াল কণ্ঠে গর্জে উঠল ফিওফার খান—"এসেছিলি তাতার শিবিরের কাণ্ডকারখানা দেখতে—দেখে নে যতক্ষণ পারিস।"

২২ ॥ 'দেখে নে যতক্ষণ পারিস!'

আমিরের সিংহাসনের সামনে দাঁড়িয়ে রইল মাইকেল। দু হাত বাঁধা পেছনে। মা লুটিয়ে পড়েছে মাটিতে। শ্রান্ত, ক্লান্ত, মূর্চ্ছিত প্রায়। শরীর আর মনের ওপর দিয়ে কম ধকল তো যাচ্ছে না।

তর্জনী তুলে মাইকেলকে দেখিয়ে ফের ক্রুদ্ধ সাপের মত হিস্‌হিসিয়ে উঠল ফিওফার খান—'দেখে নে যতক্ষণ পারিস।"

তাতারদের নিয়মকানুন জানে আইভান ওগাবেফ। 'দেখে নে যতক্ষণ পারিস কথাটার মানে সে বুঝেছে। ঘৃণা আর অবজ্ঞায় তাই বেঁকে গেছে দুই ঠোঁট।

মাইকেলকে অন্ধ করা হবে। তার আগে তাকে দেখিয়ে দেওয়া হবে এই পৃথিবীর নাচ-গান-হল্লা।

চেয়ে রইল মাইকেল। তাকে দেখতে বলা হয়েছে! তাই সে দেখে গেল নিষ্ঠুর তাতারদের কাণ্ডকারখানা। প্রথমেই নেচে গেল পারস্যের মেয়েরা। দোতারা, বাঁশি আর খঞ্জনি বাজিয়ে যে নাচ নাচল, তার মধ্যে মিশরীয় মেয়েদের উন্মত্ততা নেই, আছে ভারতীয় মেয়েদের সংযম। মাথার

ওপর উড়তে লাগল এক ডজন ঘুড়ি। বারোটা ঘুড়ি শুধু উড়ছে না— অদ্ভুত আকাশ বাজনা বাজিয়ে চলেছে। স্বর্গ আর মর্ত্য একসঙ্গে যেন সুর নিয়ে মেতেছে।

শেষ হল পারস্যের মেয়েদের নৃত্য। মাইকেলের ঠিক পেছনে দাঁড়িয়ে হাতে খোলা বাঁকা তলোয়ার নিয়ে ভয়াল কণ্ঠে গর্জে উঠল একজন দীর্ঘকায় তাতার—'দেখে নে যতক্ষণ পারিস।"

দেখা গেল তেপায়ার ওপর একটা কড়া বয়ে আনছে তাতার প্রহরীরা। জ্বলন্ত অঙ্গার রয়েছে কড়ায়। ধোঁয়া উঠছে না। কিন্তু সুগন্ধ ছড়াচ্ছে নিশ্চয় সুগন্ধি দেওয়া আছে অঙ্গারে।

আবার শুরু হল নাচ। এবার জিপসী নাচ। সবার আগে সানগারে— পেছনে সঙ্গিনী মেয়েরা। হাতে খঞ্জনি আর ট্যাম্বুরিন। উদ্দাম নাচে পাগল করে দিল দর্শকদের। মুঠো মুঠো মোহর ছুঁড়ে দিল আমীর।

নাচ শেষ হতেই মাইকেলের কানের কাছে আবার ধ্বনিত হল তাতার জল্লাদের ভয়াল কণ্ঠস্বর—"দেখে নে যতক্ষণ পারিস!"

জল্লাদের হাতে এবাব কিন্তু সেই বাঁকা তলোয়ার নেই।

আবার শুরু হল নাচ। এবার তাতার সৈন্যদের যুদ্ধনৃত্য। তখন আকাশের আলো নিভে আসছে। তাই ঘুড়িগুলোয় লণ্ঠন ঝুলিয়ে তুলে দেওয়া হল আকাশে। একই সঙ্গে আলোক বিতরণ এবং বাজনা বাজিয়ে চলল বারোখানা ঘুড়ি। সৈন্যরা দোতারা, ট্যাম্বুরিন আর বাঁশির বাজনার তালে তালে পিস্তল ছুঁড়তে লাগল আকাশ লক্ষ্য করে—সেই সঙ্গে পুড়তে লাগল আতস বাজি। ফাটতে লাগল পটকা। কখন কখন লাল-নীল-হলুদ রঙের ফুলঝুরি ছুঁড়ে দিল আকাশ লক্ষ্য করে। সাপের মত কিলবিলিয়ে রঙিন আলো ধেয়ে গেল শূন্যে।

অপরূপ সেই নৃত্য, আলোর মেলা আর সুরের খেলা দেখে আর শুনে ভীড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে বাহ্‌বা বাহ্‌বা করে উঠলেন অ্যালসাইড জোলিভেট আর হ্যারি ব্লাউন্ট।

এ নাচও শেষ হল। মাইকেলের কানের কাছে আবার ধ্বনিত হল সেই মৃত্যু ভয়াল কণ্ঠস্বর—"দেখে নে যতক্ষণ পারিস্!"

তাতার জল্লাদের হাতে এবার আবার সেই বাঁকা তলোয়ার। এতক্ষণ ছিল কড়ার মধ্যে জ্বলন্ত অঙ্গারে—তাই তেতে সাদা হয়ে গিয়েছে।

মাইকেল বুঝল কি হতে চলেছে এবার। তাতার পদ্ধতি অনুযায়ী আগুন-

রাঙা ঐ তরবারির ফলা টেনে নিয়ে যাওয়া হবে তার চোখের সামনে দিয়ে—ভীষণ উত্তাপে পুড়ে যাবে চোখের মণি—উধাও হবে দৃষ্টিশক্তি।

তবুও চেয়ে রইল সে। নির্ভীক, নিষ্কম্প।

কিন্তু চেয়ে থাকতে পারলেন না জোলিভেট আর ব্লাউন্ট। এ দৃশ্য দেখা যায় না। পাষণ্ডদের হাত থেকে মাইকেলকে বাঁচানোর ক্ষমতাও তাঁদের নেই। তাই সেই দণ্ডেই চলে এলেন শহরে। সেখান থেকে ইরকুটস্কের রাস্তায়।

মাইকেলকে ততক্ষণে টেনে আনা হয়েছে খোলা চত্বরে। আমীরের নির্দেশে আগুন-রাঙা তরবারি হাতে পায়ে পায়ে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে জল্লাদ।

গুরুগম্ভীর কণ্ঠে বললে ফিওফার খান—"গুপ্তচর। তাতার শিবিরের দৃশ্য দেখতে এসেছিলি—দেখিয়ে দিয়েছি। এবার সব দৃশ্যই মুছে যাক তোর চোখের সামনে থেকে।"

তরবারি তুলে এগিয়ে এল জল্লাদ।

মাইকেল চেয়ে রইল মায়ের দিকে। সেই মা, যে তাকে গর্ভে ধরেছে, এতটুকু বয়স থেকে এতবড় করেছে। আপনজন বলতে পৃথিবীতে সে ছাড়া আর কেউ নেই। নির্নিমেষে সজল চোখে সেই মায়ের দিকে চেয়ে রইল মাইকেল স্ট্রগফ। মা কাছে আসতে গিয়েছিল। আইভান তাকে দূরে ঠেকিয়ে রেখেছে। কয়েক পা দূরেই দাঁড়িয়ে ছেলের পানে মা-ও চেয়ে রয়েছে নিমেষহীন চোখে—সেই ছেলে যে মরতে ভয় পায় না, মৃত্যু সামনে দেখেও কাঁদে না, অন্ধ হতে চলেছে জেনেও যে দুচোখ খুলে মনের সাধ মিটিয়ে দেখে নিচ্ছে মাকে ইহজন্মের মত।

মাইকেলের চোখ যখন ঝাপসা, ঠিক তখনি চোখের সামনে আগুন-টকটকে তরবারি টেনে নিয়ে গেল জল্লাদ। বুক ফাটা হাহাকার করে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল মা—আর নড়ল না।

আদেশ পালিত হয়েছে। দণ্ড দেওয়া হয়েছে। তাই দলবল নিয়ে বিদায় হল আমীর।

চত্বরে দাঁড়িয়ে রইল কেবল আইভান আর মাইকেল।

বুকপকেট থেকে জারের চিঠিখানা বার করে মাইকেলের চোখের সামনে মেলে ধরে নির্মম কণ্ঠে বললে আইভান—"নাও, পড়ে নাও, ইরকুটস্কে গিয়ে বলো—আসল রাজদূত এই আইভান ওগারেফ।"

চিঠি পকেটে পুরে চলে গেল আইভান।

মাইকেল দাঁড়িয়ে রইল অনেকক্ষণ। কান পেতে শুনল সব আওয়াজ মিলিয়ে যাচ্ছে দূরে। নিস্তব্ধ হয়ে আসছে চত্বর।

তারপর আন্দাজে সামনে হাত বাড়িয়ে হোঁচট খেতে খেতে গেল মা যেখানে পড়ে—সেইখানে। বুকে কান দিয়ে শুনল হৃদযন্ত্র চলছে মায়ের। বেঁচে আছে, মা বেঁচে আছে। কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে ফিস্ ফিস্ করে কি যেন বলল। কপালে চুমু খেয়ে যেই উঠে দাঁড়িয়েছে অমনি কার নরম হাত এসে ঠেকল দড়ি বাঁধা দুহাতে। ছুরি দিয়ে কে যেন বাঁধন কেটে দিল মাইকেলের।

"নাদিয়া!" অন্ধ মাইকেল হাতের ছোঁয়াতেই বুঝেছে কে এসেছে তার পাশে।

"হ্যাঁ, দাদা! তোমার চোখ ঘুমোচ্ছে কিন্তু আমার চোখ জেগে আছে। এখন থেকে এই চোখেই দেখবে সব কিছু। চলো আমি তোমায় নিয়ে যাবো ইরকুটস্কে।"

২৩ ॥ রাজপথে বন্ধু

আধঘন্টা পরে টোমস্কের বাইরে এসে পড়ল নাদিয়া আর মাইকেল।

নাদিয়ার মত অনেকেই সরে পড়েছে বন্দী শিবির থেকে। নাচ গান-হল্লার সুযোগ নিয়েছে বহু বন্দী। মদ খেয়ে বেহুঁশ হয়েছিল তাতাররা। উৎসবের প্রাঙ্গন থেকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল বন্দীদের। তারপর আর খেয়াল ছিল না কে কোথায় রয়েছে।

নাদিয়া ভীড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে দেখেছিল অন্ধ করা হচ্ছে মাইকেলকে। কিন্তু অসাধারণ মনোবল ছিল বলেই টুঁ শব্দ করেনি। মনে মনে কিন্তু ঠিক করেছিল আজ থেকে আমিই হব অন্ধের যষ্টি।

তাই সে ফিরে এসেছে মাইকেলের কাছে। মাইকেল তার হাত ধরে একরাতেই পেরিয়ে এল পঞ্চাশ ভার্স্ট পথ। নাদিয়া আর পারছে না হাঁটতে। মুখেও বলছে না। মাইকেল জিজ্ঞেস করলেও বলছে না।

পথে একটা শহর পড়ল। লোকজন কেউ নেই। পালিয়েছে। খুঁজে পেতে কিছু খাবার নিয়ে এল নাদিয়া। বসল মাইকেলের মুখোমুখি একটা পরিত্যক্ত খালি বাড়ীর মধ্যে। মাইকেলের চোখ দেখল নাদিয়া। চোখের পাতা আর ভুরু পুড়ে গেছে, চোখের মণি জ্বলে ফুলে উঠেছে। অন্তর্ভেদী

সেই চাউনি কিন্তু যেমন তেমনি রয়ে গেছে। দেখতে পাচ্ছে না কেবল রেটিনা আর চোখের স্নায়ু নষ্ট হয়ে গেছে বলে গনগনে ইস্পাতের ভয়ংকর উত্তাপে।

"নাদিয়া তুমি কোথায়?"

"এই যে মাইকেল, তোমার সামনে।"

"আমাকে ছেড়ে এগিয়ে যাও নাদিয়া।"

"তা হয় না, মাইকেল, আমিই তোমার চোখ এখন থেকে।"

দুজনে দুজনের অনেক কাছে চলে এসেছে একরাত্তিরেই। দাদা আর বোন বলে ডাকছে না—ডাকছে নাম ধরে।

আবার পথে নামল দুজনে। শ্রান্ত চরণ টেনে টেনে হেঁটে চলল ভার্স্টের পর ভার্স্ট। এক সময়ে দাঁড়িয়ে গেল মাইকেল।

"নাদিয়া।"

"মাইকেল।"

"পেছনে কেউ আসছে?"

"না তো।"

"কিন্তু আমি যে আওয়াজ শুনছি।"

দেখে এল নাদিয়া।

বললে—"হ্যাঁ, আসছে। ঘোড়ার লাগাম ধরে হাঁটিয়ে আনছে একজন জোয়ান পুরুষ। পাশে একটা কুকুর। গাড়ীটা কিবিটকা। তিনজনে বসা যায়। তিন ঘোড়ায় টানে। কিন্তু টানছে একটা ঘোড়াই।"

"শত্রু না মিত্র?"

সমস্যায় পড়ল মাইকেল। কিন্তু নাদিয়ার সে সমস্যা নেই। কাছে আসতেই সে দেখেছে, আগন্তুক একজন রাশিয়ান। ফূর্তিবাজ চেহারা। এদেরকে দেখেই গাড়ী দাঁড় করিয়ে হাসিমুখে জিজ্ঞেস করেছে—"কোথায় যাওয়া হচ্ছে?"

গলা শুনেই চমকে উঠল মাইকেল। এ কণ্ঠস্বর সে চেনে।

"ইরকুটস্ক।" বললে নাদিয়া।

"হেঁটে?"

"হ্যাঁ, হেঁটে," জবাব দিল মাইকেল। "এই আমার বোন।"

নাদিয়া বললে—"আমার দাদা কিন্তু অন্ধ।"

"তাই নাকি!" বিস্মিত হল আগন্তুক। "আমার নাম নিকোলাস

পিগাসফ। আমার গাড়ীতে তিনজনের বসার জায়গা হবে। কুকুরটা না হয় হেঁটেই যাবে। উঠে আসুন। সার্কো, চল পাশে পাশে।"

উঠে পড়ল সবাই গাড়ীতে। সার্কো চলল ঘোড়ার পাশে পাশে। গাড়ীর মধ্যেই খড়ের বিছানায় ঘুমিয়ে পড়ল নাদিয়া।

মাইকেল বললে—"আপনার গলা আমি চিনি, বন্ধু।"

"চেনেন? আমি তো কোলিভান থেকে আসছি।"

"হ্যাঁ, সেইখানেই শুনেছি আপনার গলা।"

"টেলিগ্রাফ অফিসের ক্লার্ক ছিলাম।"

"রুবল নিয়ে একজন ফরাসী আর ইংরেজ খবর পাঠানোর জন্যে যখন ঝগড়া করছিল, ইংরেজ ভদ্রলোক কবিতা পাঠাচ্ছিল টেলিগ্রাম করে—তখন শুনেছিলাম।"

"কবিতা পাঠাচ্ছিল?"

"জানেন না?"

"মনে রাখি না। আমার কাজই হল খবর ভুলে যাওয়া।"

এই হল নিকোলাসের চরিত্র।

এই ভাবেই পথ চলল তিনজনে। খাবার খেল তিনজনে ভাগ করে। নিকোলাস রাত্রে ঘুমিয়ে পড়লে নিজেই লাগাম ধরে জোর কদমে আন্দাজে ঘোড়া ছুটিয়ে নিয়ে যেত মাইকেল—নইলে দুঘণ্টা অন্তর একঘণ্টার মত জিরেন নিত ঘোড়া।

একদিন কথায় কথায় নিকোলাস বললে—"আইভান ওগারেফের নাম শুনেছেন?"

"শুনেছি", বলল মাইকেল।

"বিশ্বাসঘাতক। হাতের কাছে যেদিন পাব খুন করব।"

"জানি" ছোট্ট করে বলল মাইকেল।

২৫শে আগস্ট ক্রানয় আরস্ক শহরে পৌঁছোলো কিবিটকা। টোমস্ক থেকে বেরিয়ে আটদিন পথ চলার পর এই প্রথম তাতার-আতংক মুক্ত একটা শহরে পৌঁছোলো মাইকেলরা। এই শহরে আসবে বলেই রওনা হয়েছিল নিকোলাস। কিন্তু হতাশ হল শহরে ঢোকার পর। খাঁ খাঁ করছে চারিদিক। রাশিয়ানরা তাড়াহুড়ো করে এখান থেকে কিছু সৈন্য নিয়ে টোমস্ক দখল করতে গিয়েছিল। কিন্তু হটে এসেছে। এ সবের কিছুই অবশ্য জানে না মাইকেল। সে চলেছে তাতারদের আগে।

এ শহরে কিন্তু তাতার ফৌজ এখনো পৌঁছোয়নি। রাশিয়ানরাও সরকারের আদেশ পোড়ামাটি নীতি অবলম্বন করেছে—সব ছারখার করে দিয়ে সরে গেছে—যাতে তাতাররা এসে খাবারদাবার কিছু না পায়।

দেখেশুনে হায় হায় করে উঠল নিকোলাস। এখানে চাকরী পাবে, এই আশা নিয়েই এসেছিল। এখন উপায়?

উপায় বাতলে দিল নাদিয়া। বললে—"বন্ধু, চলুন ইরকুটস্ক আমাদের সঙ্গে।"

"ঠিক কথা। ওখানে এখনো টেলিগ্রাফের তার কাটা হয়নি। চলুন যাই এখুনি।"

"একদিন জিরিয়ে নিন।" বললে মাইকেল।

পরের দিন ভোর হতেই ইনেনিসি নদীর পাড়ে গেল তিনজনে গাড়ী, ঘোড়া আর কুকুর নিয়ে। কিন্তু নদী পেরোবে কি করে? ফেরী তো নেই? নৌকো না থাকলে বিরাট চওড়া আর খরস্রোতা এই নদী পেরোনো তো যাবে না। দেড় ভার্স্ট চওড়া এই নদী পেরোতে তিনঘন্টা লাগে নৌকোয় চেপে। নৌকো তো নেই।

মুখ শুকিয়ে গেল তিনজনের। রোদ উঠল। দেখা গেল প্রলয়ংকরী নদীর চেহারা। স্রোতের টানে কুটো দু'টুকরো হয়ে যায়, এমনি অবস্থা। মাঝে কয়েকটা দ্বীপ। দুপাশ দিয়ে ঘুরতে ঘুরতে বহু ঘূর্ণিপাকের সৃষ্টি করে ছুটছে ইয়েনিসি।

মাইকেল দমবার পাত্র নয়। সবাইকে নিয়ে খুঁজতে বেরোলো ভেলা বানানোর সরঞ্জামের সন্ধানে। এক জায়গায় দাঁড়িয়ে গেল নিজেই।

বললে—"এগুলো কী?" পা দিয়ে ছুঁয়ে দেখালো কয়েকটা চামড়ার বোতল।

নিকোলাস বললে—"চামড়ার বোতল। ছটা আছে।"

"কি আছে ওতে?"

"কৌমিস। কাজে লাগবে আমাদের।"

কৌমিস উট বা ঘোটকীর দুধ থেকে তৈরী। সুপেয় পানীয়।

"পাঁচটা খালি করুন। এক বোতল রেখে দাও খাবার জন্যে।"

"যো হুকুম।"

কিছুক্ষণের মধ্যেই মাইকেলের আরো হুকুম অনুযায়ী খালি বোতলগুলোতে হাওয়া ভর্তি করে বাঁধা হল গাড়ীর দুপাশে, তলায় আর সামনে। সবশুদ্ধ

গাড়ী নেমে গেল নদীর জলে। সার্কো কেবল সাঁতরে গেল পাশে। তিনজন-যাত্রীকে নিয়ে ভাসমান গাড়ীকে টেনে নিয়ে চলল ঘোড়া। হাওয়া ভর্তি বোতল ভাসিয়ে রাখল কাঠের গাড়ীকে।

এক জায়গায় হল বিপদ। ঘূর্ণিপাকে পড়ল গাড়ী। বেদম হল ঘোড়া। আর টানতে পারছে না। ডুবে মরতে হত আর একটু দেরী হলেই —কিন্তু তার আগেই জলে লাফিয়ে পড়ে লাগাম ধরে ঘোড়াশুদ্ধ গাড়ীকে ঘূর্ণিপাকের খপ্পর থেকে দূরে টেনে নিয়ে গেল মাইকেল।

অনেক কষ্টে একটা দ্বীপে উঠল ঘোড়া। স্রোতের টানে প্রায় ছ'ভার্স্ট সরে এসেছে গাড়ী। আবার জলে নামা হল দ্বীপের অপর দিকে। নদী এখানে সেরকম প্রচণ্ড নয়। তবুও হিমসিম খেতে হল ঘোড়াকে। স্রোতের টানে প্রায় পাঁচ ভার্স্ট সরে গিয়ে উঠল ইয়েনিসির অপর পাড়ে।

ভেসে এল মোট এগারো ভার্স্ট। হাঁপাতে হাঁপাতে নিকোলাস বললে—"ভাগ্যিস এত কষ্ট পেলাম। নইলে মজাটাই জমত না।"

২৫ ॥ খরগোস পেরোলো রাস্তা

যাক, ইরকুটস্কের রাস্তা তাহলে পরিষ্কার। তাতারদের ছাড়িয়ে আসতে পেরেছে মাইকেল।

এই প্রথম অস্বস্তি কমল মাইকেলের।

কিন্তু বেশিক্ষণের জন্যে নয়। রাস্তায় নেমেই দেখা গেল আবার সেই পোড়ামাটির নীতি। বাড়ী ঘরদোর জনমানবহীন। কুকুর ছাগল গরু ঘোড়া পর্যন্ত কোথাও নেই। সরকারের হুকুম অক্ষরে অক্ষরে তামিল করেছে বাসিন্দারা। যেগুলো নিয়ে যেতে পারেনি, তা ধ্বংস করে গেছে। পেছন থেকে তাতার বাহিনী এসে যেন খাবারদাবার কিছু না পায়।

২৮শে আগস্ট বালাইস্কে একই দৃশ্য দেখল নাদিয়া আর নিকোলাস—শোনালো মাইকেলকে।

২৯শে আগস্ট টিবনস্কিতেও সেই দৃশ্য। পরের দিন কামাস্কতেও।

৪ঠা সেপ্টেম্বর বিবিঔসিনস্ক পেরিয়ে এল কিবিৎকা। হঠাৎ চমকে উঠল নিকোলাস—"এই যাঃ।"

"কি হল?" শুধোলো মাইকেল।

"সর্বনাশ হল? একটা খরগোস পেরিয়ে গেল রাস্তা।"

"কই আমি তো দেখিনি," বললে নাদিয়া।

"দেখেন নি আপনার কপাল ভাল বলে, আমি দেখেছি আমার সর্বনাশ আসন্ন বলে," মুখ অন্ধকার হয়ে গেল নিকোলাসের।

রাশিয়ায় এ একটা বড় কুসংস্কার। পথিক যদি দেখে সামনে দিয়ে খরগোস চলে গেল রাস্তার এদিক থেকে ওদিকে—তাহলে বুঝতে হবে কপালে তার অনেক দুর্গতিই লেখা আছে।

নিকোলাসের ফুর্তি উবে গেল সেই থেকেই। মাইকেল সব বুঝল। নিকোলাসের মনের ভয় ভাঙানোর চেষ্টা করল। কিন্তু পারল না। নিকোলাসের মন থেকে আনন্দ চলে গেল।

নিজনি-ঔদিনস্ক তখনো পঁচাত্তর ভার্স্ট দূরে। পথেই দেখা গেল ধ্বংস-লীলার চিহ্ন। তাতার বাহিনী নিশ্চয়, তবে আমীরের ফৌজ নয়। দেখা গেল ঘোড়ার পায়ের ছাপ। বাড়ী ঘর দোরে লুঠপাটের চিহ্ন। কোথাও দেওয়ালে বুলেটের গর্ত, বাড়ী পুড়ে ছাই।

উদ্বেগ বাড়ছে মাইকেলের। তাতার নিশ্চয় সম্প্রতি এইপথ দিয়ে গেছে। কিন্তু কোথায়? এখন তারা কোথায়?

বিকেলের দিকে দেখা গেল নিজনি-ঔদিনস্ক শহর। মেঘ ভাসছে শহরের ওপর।

চীৎকার করে বললে নাদিয়া—"মেঘ নয়, মেঘ নয়—ধোঁয়া! তাতাররা শহরে আগুন দিয়েছে!"

আচমকা বন্দুক নির্ঘোষ শোনা গেল কাছেই। মাথায় গুলিবিদ্ধ হয়ে লুটিয়ে পড়ল ঘোড়াটা। হৈ-হৈ করে দৌড়ে এল একদল লুঠেরা তাতার। নিমেষ মধ্যে বন্দী হল নিকোলাস, মাইকেল আর নাদিয়া।

টেনে নিয়ে যাওয়া হল ওদের শহরে। সেখান থেকে ঘোড়ায় চাপিয়ে শহরের বাইরে। অন্ধ মাইকেলের ঘোড়া এদিক ওদিক যাচ্ছে দেখে নিষ্ঠুর তাতাররা মাতল এক মজার খেলায়। একটা অন্ধ ঘোড়ার পিঠে বসিয়ে দিল মাইকেলকে। অন্ধ ঘোড়া কখনো পড়ল নালায়, কখনো গাছের গায়ে, শেষ কালে একটা মস্ত গর্তের মধ্যে।

ভাগ্য ভাল, ঘোড়ার পিঠ থেকে লাফিয়ে পড়েছিল মাইকেল। তাই অক্ষত রইল। কিন্তু সামনের দুটো পা ভেঙে গেল ঘোড়াটার।

সেই অবস্থাতেই গর্তের মধ্যে ঘোড়া ফেলে মাইকেলকে দড়ি দিয়ে বেঁধে দেওয়া হল একজন তাতারের ঘোড়ার পেছনে। দৌড়ে চলল মাইকেল ঘোড়ার

সঙ্গে। হুমড়ি খেয়ে পড়লেই ঘোড়ার চাবুক পড়তে লাগল পিঠের ওপর। এতক্ষণ পর্যন্ত নাদিয়াকে কেউ অসম্মান করেনি। কিন্তু সেইদিন রাত্রে পথ-শ্রান্ত এবং পানোন্মত্ত একজন তাতার লাঞ্ছনা করল নাদিয়াকে।

মাইকেল দেখল না কি হয়ে গেল। দেখল নিকোলাস কোন কথা না বলে, অগ্রপশ্চাত বিবেচনা না করে, সোজা হেঁটে গেল উন্মত্ত তাতারের সামনে—তারই খাপ থেকে পিস্তলটা টেনে নিয়ে সটান গুলি করল মুখের ওপর।

সেই মুহূর্তেই টুকরো টুকরো হয়ে যেত নিকোলাস—সম্ভব হল না একজন তাতার অফিসারের জন্যে। তাকে বেঁধে তোলা হল ঘোড়ার পিঠে। নতুন করে শুরু হল যাত্রা।

দাঁত দিয়ে কামড়ে দড়ি ছিঁড়ে এনেছিল মাইকেল। হ্যাঁচকা টান মেরে ঘোড়া ছুটে যেতেই দড়ি গেল ছিঁড়ে—তাতার ঘোড়সওয়ার জানতেও পারল না অন্ধ বন্দী দাঁড়িয়ে রয়েছে রাস্তায়।

পাশেই দাঁড়িয়ে রইল নাদিয়াও।

২৬ ॥ স্তেপের উপর দিয়ে

পরের দিন রাত্রেই সেপ্টেম্বর আবার শুরু হল যাত্রা। এক অন্ধকে হাত ধরে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল একটি মেয়ে—মাইকেল আর নাদিয়া। পথ দীর্ঘ, কিন্তু বাধা অসংখ্য। ধুঁকতে ধুঁকতে তবুও এগিয়ে চলল নাদিয়া। সে যে মাইকেলের চক্ষু, অন্ধের যষ্টি, ভেঙে পড়লে তো চলবে না।

একবার শুধু জিজ্ঞেস করেছিল মাইকেলকে—"তোমার কাছে জারের চিঠি আর নেই। তবু কেন ইরকুটস্ক যেতে চাইছ মাইকেল?"

মাইকেল জবাব দেয়নি।

ফের জিজ্ঞেস করেছিল নাদিয়া—"চিঠিটা কি আগে পড়েছিলে?"

"না।"

"তাহলে কি আমাকে বাবার কাছে নিয়ে যাওয়ার জন্যেই ইরকুটস্ক যাচ্ছো?"

"না, নাদিয়া। ইরকুটস্ক যাচ্ছি কেবল কর্তব্য করতে। হুকুম ছিল যাওয়ার—তাই যাচ্ছি। এ আমার ডিউটি।"

"এখনও?"

"হ্যাঁ, এখনো। আইভান পৌঁছোনোর আগেই আমাকে পৌঁছাতে হবে ইরকুটস্কে।"

১৮ই সেপ্টেম্বর রাত দশটার সময়ে একটা করুণ কান্নার মত বিলাপ শোনা গেল। একটা কুকুর গুঙিয়ে চলেছে বিরামবিহীনভাবে। কখনো ডাকছে ঘেউ ঘেউ করে। তারপরেই কে যেন কাতরে উঠল মৃত্যুযন্ত্রণায়।

"নিকোলাস। নিকোলাস।" নাদিয়া ঠিক চিনেছে নিকোলাসের গলা।

কুকুরের ডাকটা সার্কোর।

ফের শোনা গেল গেল কুকুরের ডাক। পাগলের মত শব্দ লক্ষ্য করে অন্ধকারে পথ ছেড়ে বিপদে নেমে পড়ল মাইকেল।

হঠাৎ খচমচ করে দৌড়ে এল সার্কো—সারা গায়ে রক্ত।

ঠিক সেই সময়ে খুব কাছ থেকে ক্ষীণ কণ্ঠে শোনা গেল—"মাইকেল।"

আচমকা মাথার ওপর থেকে কি যেন ছোঁ মারল নীচের দিকে—লাফিয়ে গেল সার্কো। পরক্ষণেই ঠিকরে পড়ল নিস্পন্দ দেহে। খুলিতে প্রচণ্ড ঠোক্কর মেরেই শূন্যে ডানা ঝটপটিয়ে উড়ে গেল একটা বিশাল শকুনি।

এবং সেই মুহূর্তেই একটা ঢিবির ওপর হোঁচট খেয়ে পড়েই চিৎকার করে উঠল নাদিয়া—"এই তো নিকোলাস।"

নিকোলাসই বটে। মুখটুকু কেবল বেরিয়ে আছে একটা ঢিবির বাইরে—গোটা শরীরটা হাত-পা বাঁধা অবস্থায় পোঁতা রয়েছে ঢিবির মধ্যে। তাতাররা তাদের অমানুষিক শাস্তি দিয়ে গেছে প্রাণে না মেরে। তিনদিন আগে মুণ্ডু বাদে বাকী দেহ কবর দিয়েছে ঢিবিতে। দুরমুশ পিটিয়ে পাথরের মত শক্ত করে দিয়েছে ঢিবির মাটি। চাপে প্রায় দমবন্ধ হয়ে এসেছে নিকোলাসের—সেই সঙ্গে হানা দিয়েছে শকুন—মুণ্ডুর লোভে। অনাহারে অত্যাচারে মৃতপ্রায় প্রভুকে এই তিনদিন শকুনির থাবা থেকে বাঁচিয়ে রেখেছে সার্কো—হয়ত এরপর ক্ষুধার্ত নেকড়েও আসবে।

চোখ খুলল নিকোলাস—'নাদিয়া...মাইকেল...আমি চললাম।" বন্ধ হল চোখের পাতা। প্রাণটাও কি বেরিয়ে গেল সেই সঙ্গে?

উন্মাদের মত পাথরের মত শক্ত ঢিবির মাটি আলগা করে নিকোলাসকে বার করে আনল মাইকেল। কান পাতল বুকে। হৃদযন্ত্র নিস্পন্দ।

ঢিবির গর্তেই সার্কো আর নিকোলাসকে কবর দিল মাইকেল। কাজ শেষ হওয়ার আগেই শুনল ঘোড়ার পায়ের আওয়াজ। আমীরের আগুয়ান বাহিনী।

কিন্তু কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত থামল না। নইলে নেকড়ের পেটে যাবে বন্ধুর দেহ।

কবরে মাটি চাপা দিয়ে প্রার্থনা শেষ করে দুজনে মিলিয়ে গেল অন্ধকারে।

বারোদিন পর দোসরা অক্টোবর সন্ধ্যে ছটার সময়ে পৌঁছালো বৈকাল হ্রদের পাড়ে।

২৭ ॥ বৈকাল আর আঙ্গারা

বৈকাল হ্রদ সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে সতেরো শ ফুট উঁচু। কাজেই বেশ ঠাণ্ডা জায়গা। হাড়ে হাড়ে টের পাওয়া যাচ্ছে। তার ওপর অক্টোবর মাস। দিন ছোট হয়ে যাচ্ছে। বিকেল পাঁচটাতেই সন্ধ্যে নামছে। রাত্রি নেমে যাচ্ছে শূন্য তাপাঙ্কে।

হ্রদের পাড়ে ভেলা বানিয়ে ইরকুটস্ক অভিমুখে রওনা হওয়ার জন্যে বসে-ছিল একদল মেয়ে আর পুরুষ। নাদিয়া তাদের দেখেই স্বস্তির নিঃশেষ ফেলে মাথা রাখল মাইকেলের বুকে।

শত্রু নয়—মিত্র। রাশিয়ান। সব হারিয়ে দেবদারুর কাঠ দিয়ে ভেলা বানিয়ে যাচ্ছে ইরকুটস্কে ঠাঁই নিতে।

নাদিয়া আর মাইকেল উঠল সেই ভেলায়। তক্ষুনি রওনা হল ভেলা। দেরী করা সমীচীন নয়। ঠাণ্ডা বাড়লেই বৈকালের জল জমে বরফ হয়ে যাবে।

বরফ জমতে শুরু করেছে এর মধ্যেই। চাঁই চাঁই বরফকে ঠেলে দিতে হচ্ছে লগি দিয়ে। মাঝে মাঝে মাথা উঁচিয়ে রয়েছে গ্র্যানাইট পাথর। উষ্ণ জলের প্রস্রবণ থেকে ফুটন্ত জল তোড়ে উঠছে ফোয়ারার আকারে—পর মুহূর্তেই কনকনে ঠাণ্ডায় জমে গিয়ে অদ্ভুত আকারে ঝরে পড়ছে জলে। সব মিলিয়ে এ এক বিচিত্র দৃশ্য। হ্রদ থেকে বেরিয়ে আঙ্গারা নদীর ভেতরে ঢুকে দেখা গেল সেই একই দৃশ্য।

লিভেনিচনাইয়াতে ভেলা পৌঁছোলো। কিন্তু বন্দর শূন্য। লোকজন পালিয়েছে তাতারদের ভয়ে। ভেলা দেখেই কিন্তু দৌড়ে এল দুজন পুরুষ।

সোরগোল শুনে মাইকেল শুধালো—"কি হল নাদিয়া?"

"সেই লোক দুজন—পথে যাদের সঙ্গে দেখা হয়েছিল।"

"ইংরেজ আর ফরাসী?"

"হ্যাঁ।"

চমকে উঠল মাইকেল। ব্লাউন্ট আর জোলিভেটের কাছে মাইকেল স্ট্রগফ এখন আর নিছক বণিক নয়—রাশিয়ার রাজদূত। কথাটা জানাজানি

হলেই বিপদ।

বললে- "নাদিয়া, ওরা এলেই আমার কাছে ডেকে নিয়ে আসবে।"

একটু পরেই নাদিয়া দুজনকে নিয়ে এল মাইকেলের সামনে। যে মাই-কেল মরে ভূত হয়ে গেছে বলে ভেবেছিলেন সাংবাদিক দুজন, তাকে জীবন্ত বসে থাকতে দেখে বিষম চমকে উঠলেন দুজনেই।

মাইকেল কিন্তু একদম নড়েনি।

নাদিয়া বললে—"ওরা অন্ধ করে দিয়েছে আমার ভাইকে।"

অন্ধ। ভাল করে চেয়ে দেখলেন ব্লাউন্ট আর জোলিভেট।

মাইকেল বললে নিচু গলায়—"আমাকে কথা দিন—কাউকে বলবেন না আমি কে।"

"কথা দিচ্ছি।"

কিন্তু চিঠিই যখন হাতছাড়া, তখন মাইকেল ইরকুটস্ক যাচ্ছে কেন? এ প্রশ্নের কোনো জবাব দিল না মাইকেল।

শুনে নিল হালচাল এখন কি। ঘোড়া নিয়ে সাংবাদিক দুজন ইরকুটস্ক পর্যন্ত আর পৌঁছোতে পারেনি তাতারদের জ্বালায়। ইরকুটস্ক পর্যন্ত হাজির হয়েছে তাতাররা। ভেলা দেখে তাই দৌড়ে এসেছেন দুজনে।

জোলিভেট বললেন—"আইভান বিশ্বাসঘাতকের মুখে চাউটের দাগ আপনি দিয়েছেন। অনেকদিন তাই নিয়ে থাকতে হবে বেচারাকে।"

"বেশী দিন না," শান্তস্বরে বললে মাইকেল।

২৮॥ দুই পাড়ের মধ্যে

রাত আটটা নাগাদ ঘুটঘুটি অন্ধকার হয়ে গেল চারিদিক। নদীর দুপাড়ে এখন নিশ্চয় শিবির পেতেছে তাতার বাহিনী। কিন্তু অন্ধকার থাকায় দেখা যাচ্ছে না। নদীর মাঝখান দিয়ে ভেলাকেও ওরা দেখতে পাচ্ছে না। ভাসমান বরফের জন্যে চক্ষুভ্রম ঘটছে। বড় বরফের আড়ালে দিব্বি গা ঢাকা দিয়ে ভেসে যাচ্ছে ভেলাশুদ্ধ শ খানেক মেয়েপুরুষ বাচ্চা। বরফের গায়ে ভেলার ধাক্কা লাগলেই লগি বা হাতে করে ঠেলে সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। বরফের গায়ে বরফ আছড়ে পড়ার শব্দে সব শব্দ মিলে যাচ্ছে। এ ছাড়া কোথাও আর কোনো শব্দ নেই।

জোলিভেট আর ব্লাউন্ট তো মুগ্ধ হয়ে এই দৃশ্য দেখছেন এবং যে যার নিজের ধান্দায় আছেন। দুজনেই ভাবছেন আহারে এমন একটা নাটকীয় দৃশ্য নিয়ে লেখা রিপোর্ট যা জমবে না। তাক লেগে যাবে ডেলী টেলিগ্রাফের পাঠক পাঠিকা আর ভগ্নী ম্যাডেলিনের। রোমাঞ্চকর এই পরিবেশে কিন্তু একটা জিনিস দেখে দারুণ উদ্বেগে ভুগছেন দুজনেই। নদীর জলে হড়হড়ে খনিজ তেল ভাসছে। জোলিভেট খানিকটা হাতে করে নাকে শুঁকে তাজ্জব হয়ে গেছেন।

এ যে ন্যাপথা।

কোত্থেকে এল এই ন্যাপথা? সত্যিই খনিজ তেল স্বাভাবিক কারণে মৃত্তিকা থেকে বেরিয়ে এসে জলে ভাসছে, না, অন্যায়ভাবে সভ্য যুদ্ধের নিয়ম লঙ্ঘন করে তাতাররা জলে মিশিয়ে দিয়েছে ইরকুটস্ক পুড়িয়ে দেওয়ার জন্যে?

আসল কারণটা যখন জানা যাচ্ছে না তখন ব্যাপারটা পাঁচকান না করাই ভাল। সেন্ট্রাল এশিয়া মাটি স্পঞ্জের মত তরল হাইড্রোজেন শুষে রেখে দেয়। পারস্য দেশের সীমান্তে বাকু অঞ্চলে হাজার হাজার খনিজ তেলের ফোয়ারা তেল ছড়ায় মাটির ওপরে। নর্থ আমেরিকাতেও এমনি তেলের দেশ আছে। ধর্মীয় উৎসবের সময়ে অনেক আদিবাসীরা নদী বা সমুদ্রের জলে ন্যাপথা ঢেলে দেয়। রাত্রে তাতে আগুন লাগিয়ে দেয়। জলের ওপর ঢেউয়ের দোলায় লকলকে আগুন ছড়িয়ে পড়ে দিকে দিকে। বাকুতে এ জিনিস একটা মজার ব্যাপার—কিন্তু আঙ্গারাতে ঘটনা ঘটলে কেলেঙ্কারী ঘটবে। ভেলাশুদ্ধ লোক তো পুড়ে মরবেই—আগুন ছড়িয়ে যাবে নদীর পাড়েও।

ভেলায় কেউ আগুন জ্বালায় নি। কিন্তু আগুন জ্বলছে নদীর দুই পাড়ে তাতার শিবিরে। কেউ যদি একটা জ্বলন্ত খড়ও ফেলে নদীতে—তাহলে আর রক্ষে নেই।

বরফের চাঁইয়ের সংখ্যা এদিকে বেড়েই চলেছে। আচমকা অনেক দূরে অন্ধকারের মধ্যেই দেখা গেল কতকগুলো কালো ছায়া ভাসমান বরফ খণ্ডর ওপর দিয়ে লাফাতে লাফাতে ক্ষিপ্রগতিতে এগিয়ে আসছে ভেলার দিকে।

রাত তখন দশটা।

অ্যালসাইড জোলিভেট প্রথম দেখেছিল ধাবমান কৃষ্ণ মূর্তিগুলো। তাতার নাকি? যে বৃদ্ধ লগি ঠেলে ভেলা এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল, তাকে দেখালো

অ্যালসাইড। ভুরু কুঁচকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বুড়ো বললে—"তাতারদের চেয়েও যাদেরকে বেশী আদর করা যায়—এরা তারা—নেকড়ের দল। আসুন ঠেঙিয়ে তাড়াই ব্যাটাদের।"

শুরু হল ঠ্যাঙানো। মেয়ে আর বাচ্চাদের ভেলার মাঝখানে রেখে পুরুষরা সমানে ঠেঙিয়ে মারতে লাগল ক্ষুধার্ত নেকড়ের পালকে। কিন্তু শেষ নেই তাদের। এরা নিঃশব্দে ডাণ্ডা চালাচ্ছে। এমন কি অন্ধ মাইকেলও ছুরি খুলে বসে আছে—হাতের কাছ দিয়ে নেকড়ে গেলেই টুঁটি কেটে দু'টুকরো করে দিচ্ছে। নেকড়েরা কিন্তু চুপচাপ নেই। হিংস্র গর্জনে রক্ত জল করে ছাড়ছে। মরছে তারা পালে পালে, তবুও আসছে পালে পালে নদীর দক্ষিণ পাড় থেকে রক্তমাখা ছুরী চালাতে চালাতে অ্যালসাইড দেখল এ তো মহা বিপদ। কাঁহাতক এভাবে লড়া যায়। ওরা আসছে শ'য়ে শ'য়ে—এদিকে পলাতকদের হাতের জোর যে কমে আসছে।

আচমকা ভগবান মুখ তুলে চাইলেন। আধঘন্টা লড়াই করার পর নেকড়েরা পেছনে ফিরে চোঁ-চাঁ দৌড় দিল নদীর পাড় লক্ষ্য করে। মিলিয়ে গেল দেখতে দেখতে।

কারণটা বোঝা গেল তৎক্ষণাৎ।

আলোয় আলো হয়ে উঠছে নদী পথ। নেকড়েরা রাত্রে হানা দেয়—আলো দেখলে পালায়। সেই আলোই এখন দেখা দিল নদীর পাড়ে। দাউ দাউ করে জ্বলছে পোশাভস্ক শহর। তাতারদের হল্লাও শোনা গেল সেই সঙ্গে।

চরম বিপদের সম্মুখীন হল পলাতকরা। ভেলায় শুয়ে পড়েও রক্ষে নেই। আলোয় দেখা যাচ্ছে সব কিছু।

তখন রাত সাড়ে এগারোটা। শহরের আগুন জ্বলছে প্রায় দেড়শ জায়গায়। যেন দেড়শটা দানবিক মশাল আকাশ পর্যন্ত ছুঁতে চাইছে লাফ মেরে মেরে। লক্ষ লক্ষ স্ফুলিঙ্গ তাল তাল ধোঁয়ার সাথে ছিটকে যাচ্ছে পাঁচশ থেকে ছশ ফুট ওপর পর্যন্ত। দক্ষিণ পাড়ের গাছগুলোও মনে হচ্ছে যেন জ্বলছে। একটা স্ফুলিঙ্গও যদি ছিটকে এসে পড়ে নদীতে—তাহলেই প্রলয় নাচন শুরু হয়ে যাবে অগ্নিদেবের স্বয়ং বরুণদেবের মাথায়। প্রমাদ গুনলেন জোলিভেট এবং ব্লাউন্ট।

তবে হাওয়া বইছে উল্টো দিকে। শিখা হেলে পড়েছে জলের দিকে নয়—বিপরীত দিকে। তাই স্ফুলিঙ্গ ঠিকরে যাচ্ছে অন্য দিকে।

আস্তে আস্তে জলন্ত শহর পেছিয়ে গেল অনেক পেছনে—আবার কালো অন্ধকারে গা ঢাকা দিল ভেলা।

রাত তখন বারোটা।

বরফের চাঁই ক্রমশঃ বাড়ছে। যে কোনো মুহূর্তে ভেলা আটকে যেতে পারে বরফের বাধায়।

রাত দেড়টার সময়ে ঠিক তাই হল। ভেলা আর নড়ল না।

আর ঠিক তখুনি পলাতকদের বুক কাঁপিয়ে দিয়ে বন্দুকের আওয়াজ শোনা গেল দক্ষিণ পাড়ে। শন শন করে এক ঝাঁক গুলি ধেয়ে এল ভেলার দিকে। বন্দুক নির্ঘোষ শোনা গেল বাঁ পাড়েও। লক্ষ্য সেই ভেলা।

দুদিক থেকে বন্দুকের গুলি আসায় জখম হল বেশ কয়েকজন।

নাদিয়ার হাত ধরে উঠে দাঁড়াল মাইকেল। কেউ দেখতে পেল না দুজনে নেমে এল ভেলা থেকে বরফের চাঁইয়ের ওপর। নাদিয়া মাইকেলের হাত ধরে নিয়ে গেল এক চাঁই থেকে আরেক চাঁইয়ের ওপর। বাধা পেরিয়ে এসে একটা বরফের ওপর দুজনে বসতেই চাঁইটা ওদের ভারে খসে ভেসে গেল নদীতে। দমাদম বন্দুকের গুলি এসে পড়ল চারপাশে। দেখতে দেখতে বরফখণ্ড হারিয়ে গেল অন্ধকারে।

আধঘন্টা স্রোতের টানে ভেসে চলল বরফের চাঁইটা। ইরকুটস্ক আর মাত্র আধ ভার্স্ট দূরে।

আচমকা অস্ফুট চীৎকার করে উঠল নাদিয়া।

শুনেই বরফখণ্ডের ওপর সটান দাঁড়িয়ে উঠল মাইকেল। অদ্ভুত নীলচে আলোয় বীভৎস দেখালো তার মুখচ্ছবি। মনে হল খুলে গেছে দুচোখের পাতা।

বলল নিরুদ্ধ নিঃশ্বাসে—"হা ঈশ্বর! তুমিও শত্রু হলে?'

২৯ ॥ ইরকুটস্ক

রাজনৈতিক কাজে সেন্ট্রাল এশিয়ায় গেছিলেন গ্র্যাণ্ড ডিউক। ফিরে এসেই শুনলেন তাতাররা আসছে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি শহরের দু'হাজার কশাক সৈন্য আর পুলিশকে নিয়ে প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা শুরু করলেন। টেলিগ্রামের তার ছিন্ন হওয়ার আগেই কিছু তারবার্তা পেলেন এবং পাঠালেন। তারপরেই বাইরের জগৎ থেকে ছিন্ন হয়ে গেল ইরকুটস্ক।

ঠাণ্ডা মাথায় লড়াইয়ের তোড়জোড় করতে লাগলেন। খবর পেলেন,

ফিওফাব খান বিরাট তাতাব বাহিনী নিয়ে আসছে একটার পর একটা শহব জয় কবতে কবতে, একটা খববই শুধু তাঁব কানে এল না। আইভান ওগাবেফ যে বিদ্রোহী হয়েছে—তা জানতে পাবলেন না। আইভানকে তিনি চিনতেনও না।

শহবের লোকজনও হাত লাগাল সৈন্যবাহিনীব কাজে। বণিক, কৃষক, নির্বাসিত—প্রত্যেকেই এগিয়ে এল শহব বক্ষাব আয়োজনে।

২৫শে সেপ্টেম্বব ফিওফাব খানেব সমস্ত সৈন্য জড়ো হল ইবকুটস্ক শহবে কাছে—বিজিত শহবে যাবা বইল, তাবা বাদে। ইবকুটস্কেব সামনে দিয়ে আঙ্গাবা পেবোনো সম্ভব হবে না বুঝে আইভান ওগাবেফেব পবামর্শে নৌকো দিয়ে সেতু বানিয়ে বেশ কয়েক ভার্স্ট দূবে নদী পেবিয়ে এল তাতাব বাহিনী। কিন্তু তাতেও কাজ হল না। আইভানেব মতলব ছিল অতর্কিতে আক্রমণ কববে। কিন্তু তাতাবদেব শ্লথ অগ্রগতিতে তা সম্ভব হল না। তা ছাড়া, গ্র্যাণ্ড ডিউক যে এত তাড়াতাড়ি তৈবী হয়ে যাবেন, তাও ভাবতে পাবেনি আইভান।

তাই দু'দুবাব শহব দখল কবতে গিয়ে গিয়ে বেশ কিছু তাতাব প্রাণ হাবালো—কিন্তু ভেতবে ঢোকা গেল না। একবাব একটা ফটক জোব কবে খোলাব পবেও হাতাহাতি যুদ্ধে হেবে গেল তাতাববা। সে যুদ্ধে স্বয়ং ডিউক যোগ দিলেন অফিসাবদেব নিয়ে।

ধড়িবাজ আইভান তাই ডিউকেব প্রিয়পাত্র হওয়াব কূট চক্রান্তে লিপ্ত হল সেইদিন থেকেই। উসকানি দিল জিপসী সানগাবে। আব দেরী কবা সমীচীন হবে না। ইবকুটস্ক থেকে ছদিনেব মধ্যে বাশিয়ান ফৌজ এসে পড়বে। যা কববাব তাব আগেই কবতে হবে।

দোসবা অক্টোবব বাত্রে যুদ্ধ সভাব ডাক দিলেন ডিউক। সভা বসল তাঁব প্রাসাদে। সমস্ত নির্বাসিতদেব তিনি স্বাধীনতা দিলেন সেই বাতেই। তাদেব দিয়ে গঠিত হল বিশেষ এক সেনাদল। দলপতি হলেন ওয়াজিলি ফিওদোর —নাদিয়াব বাবা।

অভিভূত অন্তবে প্রাসাদ থেকে বেবিয়ে এলেন তিনি। ডিউক যাদেব ক্ষমা কবলেন—স্বয়ং জাবও যে তাদেব ক্ষমা কববেন, তাতে সন্দেহ নেই।

বাত দশটা নাগাদ সভাব শেষ কবতে যাচ্ছেন ডিউক এমন সময়ে সোর-গোল শোনা গেল বাইবে।

ছুটতে ছুটতে এসে খবর দিল একজন—"হুজুব, রাশিয়াব রাজদূত এসেছেন জাবের কাছ থেকে।"

৩০ ॥ জার প্রেরিত রাশিয়ার রাজদূত

ঘরে ঢুকল পথশ্রমে নিদারুণ ক্লান্ত এক ব্যক্তি। পরনে শতচ্ছিন্ন সাইবেরিয়া কৃষকের পোশাক। বন্দুকের গুলির ছেঁদাও রয়েছে জামাপ্যান্টে। পায়ে জুতো নেই—হেঁটে এসেছে। মাথায় মস্কো টুপি।

ঢুকেই বললে—"হিজ হাইনেস গ্র্যাণ্ড ডিউকের সঙ্গে কথা বলতে চাই।"

এগিয়ে এলেন ডিউক—"জার পাঠিয়েছেন আপনাকে? রাজদূত?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"মস্কো থেকে?"

"হ্যাঁ, মস্কো থেকে।"

"কবে বেরিয়েছিলেন?"

"১৫ই জুলাই।"

"নাম?"

"মাইকেল স্ট্রগফ।"

আইভান ওগারেফ এসেছে রাজদূতের ছদ্মবেশে ইরকুটস্কের কেউ তাকে চেনে না—গ্র্যাণ্ড ডিউক তো নয়ই।

অফিসারদের বিদায় দিলেন গ্র্যাণ্ড ডিউক।

দাঁড়ালেন নকল মাইকেল স্ট্রগফের মুখোমুখি।

খুঁটিয়ে দেখলেন রাজদূতকে।

বললেন—"জারের চিঠি এনেছেন?"

"এই নিন।"

ভাঁজ করে ছোট করা রাজকীয় সীলমোহরের ছাপ দেওয়া চিঠিখানা বাড়িয়ে দিলেন আইভান।

"চিঠি কি এইভাবেই পেয়েছিলেন?"

"না। আমীরের সৈন্যদের হাতে যাতে না পড়ে, তাই খাম ছিঁড়ে এই-ভাবে লুকিয়ে আনতে হয়েছে।"

"তাতারদের হাতে ধরা পড়েছিলেন?"

"পড়েছিলাম। সেই কারণেই ১৫ই জুলাই মস্কো থেকে বেরিয়ে এখানে এসেছি ২রা অক্টোবর। উনআশি দিন লেগেছে সবশুদ্ধ।

জারের সই চিনতে পারলেন গ্র্যাণ্ড ডিউক। ওগারেফের মুখ দেখে প্রথমে একটু অবিশ্বাস দেখা দিয়েছিল, এখন তা মিলিয়ে গেল।

বললেন—"মাইকেল স্ট্রগফ, এ চিঠিতে কি লেখা আছে জানেন ?"

"জানি। শত্রুদের হাতে চিঠি পড়ার আগেই যদি নষ্ট করে ফেলতে হয় এই ভেবে চিঠি পড়েছিলাম—পরে আপনাকে শোনানোর জন্যে।"

"আপনি জানেন সৈন্য পাঠানো হয়েছে আপনাদের সাহায্য করার জন্যে ?"

"জানি। কিন্তু তারা হেরে গেছে।"

"লড়াই হয়েছে তাহলে ?"

"বেশ কয়েকবার।"

"কোথায় ?"

"কোলিভানে, টোমস্কে···"

এতক্ষণ সত্যি বলছিল আইভান, এবার শুরু করল অতিরঞ্জন।

"শেষ লড়াই হয়েছে ক্রাসনয়আর্স্কে।"

"কি ধরনের লড়াই ?"

"বড় রকমের লড়াই।"

"কি রকম ?"

"বিশ হাজার রাশিয়ান ফৌজ বনাম দেড়লক্ষ তাতার সৈন্য। পারবে কেন রাশিয়ান ফৌজ ?"

"মিথ্যে কথা।"

"মিথ্যে নয়, ইওর হাইনেস" শীতল স্বরে জবাব দিল আইভান। "ক্রাসনয়আর্স্কের সেই যুদ্ধেই আমি বন্দী হই।"

নিজেকে সামলে নিলেন গ্র্যাণ্ড ডিউক।

বললেন—"তাতারদের সব সৈন্যই কি এখন ইরকুটস্কের চারপাশে ?"

"হ্যাঁ। সবশুদ্ধ চারলক্ষ।"

আবার বাড়িয়ে বলল আইভান।

"সাহায্য পাব বলে মনে হয় ?"

"শীতের শেষ না হলে পাবেন না।

"ছ'লক্ষ বর্বর তাতার এলেও ইরকুটস্কের পতন ঘটবে না।" একটু থেমে বললেন—"এ চিঠিতে একজন বিশ্বাসঘাতকের কথা লেখা আছে।"

"হ্যাঁ।"

"ছদ্মবেশে ইরকুটস্ক ঢুকে সে আমার প্রিয়পাত্র হয়ে বিশ্বাসঘাতকা করবে —পতন ঘটাবে ইরকুটস্কের।"

"সবই জানি, ইওর হাইনেস। জারের ভাইয়ের কাটা মুণ্ড দেখবার জন্যে

সে উঠে পড়ে লেগেছে। তাঁর আদেশে তাকে অনেক লাঞ্ছনা সইতে হয়েছে।"

"আপনার সঙ্গে তার দেখা হয়েছে ?"

"হয়েছে। ক্রাসনয়আস্কে যুদ্ধের পর। ও যদি টের পেত এই চিঠি নিয়ে আসছি আমি, তাহলে পালাতে পারতাম না।'

"কিভাবে পালালেন ?"

"ইত্রিশ নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তাতার আক্রমণ রুখবার অছিলায় দলে ভীড়ে ঢুকে পড়ি ইরকুটস্কে। তারপর আত্মপরিচয় দিয়ে এসেছি আপনার কাছে।"

"মাইকেল স্ট্রগফ আপনার সাহস আছে, দেশের জন্যে ভালবাসা আছে। বলুন কি চান আমার কাছে ?"

' কিছু না। শুধু চাই আপনার পাশে দাঁড়িয়ে লড়ে যেতে।'

"তাই হবে।'

"ছদ্মনামে যদি আইভান ওগারেফ আসে আপনার সামনে ?"

"মরবে নাউটের চাবুক খেয়ে।'

মিলিটারী স্যালুট ঠুকে বেরিয়ে গেল ওগারেফ। পরিকল্পনা মত অর্ধেক কাজ সফল হয়েছে। গ্র্যাণ্ডের প্রিয়পাত্র হতে পেরেছে। এবার বাকী গ্র্যাণ্ডের কাটা মুণ্ডুটা ফিওফার খানের পদতলে উপহার দেওয়ার। এ-কাজ সারতে হবে রাশিয়ান মুক্ত ফৌজ আসবার আগেই।

ইরকুটস্কের প্রত্যেকেরই মন জয় করে নিল ছদ্মবেশী ওগারেফ নানান গালগল্প শুনিয়ে। স্বভাব নিষ্ঠুরতার দরুন একটা কাঁচা মিথ্যে বলে মন ভেঙ্গে দিল ওয়াসিলি ফেদোরের। তার মেয়ে নাদিয়া আর নেই। তাতাররা তাকে শেষ করেছে।

হাতে সময় খুব কম। ইরকুটস্কের কোথায় কি দুর্বল পয়েন্ট, সব দেখে নিল ওগারেফ। বিশেষ করে দেখল বোলশাইয়া গেট। ঠিক করল এই গেট খুলেই ঢোকাতে হবে হানাদারদের।

একদিন সন্ধ্যে বেলায় দেখল মাটির পাঁচিলের গোড়ায় সাঁৎ করে সরে গেল একটা ছায়ামূর্তি।

সানগারে এসেছে মনিবের কাছে—জীবন বিপন্ন করেও।

এই দুদিন তাতাররা একদম চড়াও হয়নি—একটা বন্দুকও ছোঁড়েনি। আইভানের ইচ্ছাতেই তা হয়েছে। রাশিয়ান ফৌজ যেন মনে করে হেরে গিয়ে ধুঁকছে তাতার বাহিনী। গা ঢিলে দেওয়ার সুযোগ নিয়ে কয়েক

হাজার তাতারকে বোলশাইয়া গেট দিয়ে ঢুকিয়ে দেবে আইভান।

আর দেরী করা ঠিক হবে না। সব ভণ্ডুল হয়ে যাবে রাশিয়ান ফৌজ এসে গেলে। তাই একটা চিঠি লিখে ফেলে দিল পাঁচিলের ওপর থেকে।

চিঠি লুফে নিয়ে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল সান্‌গারে।

পরের দিনই রাত দুটোর সময়ে ইরকুটস্ক শহরে তাতার সৈন্য ঢুকবে—বোলশাইয়া গেট খুলে দেবে বিশ্বাসঘাতক আইভান ওগারেফ।

৩১ ॥ পাঁচুই অক্টোবর রাত্রে

খুব সাবধানে পুরো পরিকল্পনাটা ছকেছে আইভান ওগারেফ।

রাত ঠিক দুটোর সময়ে যাতে বোলশাইয়া গেট নির্বিঘ্নে খুলে দেওয়া যায় তার জন্যে সেখানে কম সৈন্য রাখা দরকার। তাই রাশিয়ানদের এমন ভাবে ধোঁকা দিতে হবে যেন মনে হয় তাতাররা নদীর দক্ষিণ পাড়ের দুদিক থেকেই শহর আক্রমণ করার চেষ্টা করছে এবং একই সাথে বাঁ পাড় থেকে নদী পেরিয়ে আসার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। রাশিয়ান ফৌজের নজর গিয়ে পড়বে এই তিন দিকে—বোলশাইয়া গেটের দিকে আর কারও নজর থাকবে না।

এই মতলব নিয়েই চিঠি পাঠিয়েছিল সে। পরের দিন সকাল হতেই দেখা গেল তাতাররা খোলাখুলি সৈন্য সমাবেশ করছে নদীর পাড় বরাবর শহরের দুপাশে—বাঁ পাড় থেকেও আয়োজন করছে নদী পেরিয়ে আসার। নদীতে ভাসমান বরফ-খণ্ডও সংখ্যায় কমে এসেছে। ফলে তাতারদের এখন পোয়াবারো।

গ্র্যাণ্ড ডিউক নিজে সব দেখলেন। আইভানের কথাও বিশ্বাস হল। মুষ্টিমেয় রাশিয়ান সৈন্যদের সেইভাবে ছড়িয়ে দিলেন তিনদিকে।

আরও নির্মম একটা প্ল্যান এঁটেছিল আইভান। তাতারদের শহরে ঢুকিয়ে দেওয়ার আগে থেকেই এমন লঙ্কাকাণ্ড এবং ধ্বংসলীলা শুরু করে দেবে শহরময় যে হৃৎকম্প উপস্থিত হবে শহরবাসীদের—নিদারুণ আতঙ্কে অস্ত্র ফেলে স্বীকার করবে বশ্যতা।

সেই কারণেই ইরকুটস্কের অসংখ্য ন্যাপথা প্রস্রবণ থেকে সংগৃহীত ন্যাপথা-চৌবাচ্চার দেওয়াল ফাটিয়ে দিয়েছিল এই দুদিনেই। চৌবাচ্চার ন্যাপথা গিয়ে মিশেছিল আঙ্গারার জলে। ভেলায় বসে সেই ন্যাপথা দেখেই ভয়ে কাঠ হয়েছিল দুই সাংবাদিক।

রাত ঠিক দুটোর সময়ে গির্জের ঘণ্টা বাজতেই তাতার শিবির যখন নিঝুম, ঠিক তখন নদীর ধারের জানলা খুলে বারুদ মাখা একগোছা পাট নদীর

জলে ফেলে দিল আইভান।

সঙ্গে সঙ্গে নীলচে আগুন ছড়িয়ে গেল নদীতে।

এই সংকেতের জন্যেই ঘাপটি মেরে ছিল তাতাররা। মার মার করে তারা ঝাঁপিয়ে পড়ল শহরের চুদিকে। ঘনঘন গর্জে উঠল কামানের পর কামান।

আগুন ততক্ষণে নদীর দুপাড় বেয়ে ছুটছে। নদীর ধারে কাঠের বাড়ী-গুলোয় আগুন লেগেছে। আগুন ছড়িয়ে পড়ছে দ্রুত। গির্জের ঘণ্টা বাজছে পাগলা-ঘণ্টির মত। লোকজন পাগলের মত ছুটছে আগুন লক্ষ্য করে—কেউ ছুটছে তাতাররা যেদিক থেকে কামান দাগছে, সেই দিকে। বোলশাইয়া গেটের দিকে কারোর নজর নেই। মুষ্টিমেয় নির্বাসিত গেট আগলাচ্ছে নিছক দেশ-প্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে।

ঘরে এসে দাঁড়াল আইভান। আগুনের আভায় ঘর এখন প্রদীপ্ত। এবার শেষ চাল দিতে হবে—গেট খুলে দিতে হবে।

পা বাড়িয়েছে আইভান, এমন সময়ে সিক্ত দেহে বিস্রস্ত বসনে ছুটতে ছুটতে ঘরে ঢুকল একটি মেয়ে।

বিস্মিত কণ্ঠে বললে আইভান—"সানগারে, তুমি!" মেয়েটি কিন্তু সান-গারে নয়—নাদিয়া।

নদীতে নীল আগুন জ্বলে উঠতেই নাদিয়াকে নিয়ে জলে ঝাঁপ দিয়েছিল মাইকেল। ডুব সাঁতার কেটে এসে উঠেছিল জেটিতে। এতদিন পরে পৌঁছে-ছিল ইরকুটস্কে।

বলেছিল হাঁপাতে হাঁপাতে—"চল গভর্ণরের প্রাসাদে!"

গভর্ণরের প্রাসাদে ঢোকার কোনো বাধা নেই। যে কেউ ঢুকতে পারে। কিন্তু সেই মুহূর্তের হট্টগোলে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল দুজনে। দুজনেরই ভিজে পোশাক। কিন্তু কেউ তা নিয়ে মাথা ঘামালো না। নাদিয়া চীৎকার করে মাইকেলকে ডাকতে ডাকতে ঢুকে গেল প্রাসাদে। একটা ঘরের দরজা খুলে ভেতরে ঢুকেই দেখল বিশ্বাসঘাতক আইভান ওগারেফকে।

চেঁচিয়ে উঠল গলা ফাটিয়ে—'আইভান ওগারেফ!"

চমকে উঠল আইভান। এ নাম এখানে কেউ শুনলেই সবশেষ। তার আগেই শেষ করা দরকার যার মুখ থেকে নামটা বেরোচ্ছে—তাকে।

ছোরা নিয়ে তেড়ে গেল আইভান।

ছোরা নিয়ে দেওয়ালে পিঠ দিয়ে আবার গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে উঠল নাদিয়া—"আইভান ওগারেফ!" সে বুঝেছে, এই ডাক কারো কানে তুলে

দিতে পারলেই সে বেঁচে যাবে এ যাত্রা, নইলে মৃত্যু অনিবার্য।

ঝাঁপিয়ে পড়ল আইভান। প্রচণ্ড রোষে নাদিয়াকে ফেলে যেই ছোরা মারতে যাবে বুকে—

কে যেন পেছন থেকে তাকে আসুরিক বলে আছাড় মারল মেঝেতে।

"মাইকেল!" গলা কেঁপে গেল নাদিয়ার।

হ্যাঁ, মাইকেলই বটে। নাদিয়ার চীৎকার শুনেই দৌড়ে এসেছে। আর একটু দেরী হলেই—

ওগারেফ উঠে দাঁড়িয়েছে। ক্রোধে ভয়ংকর মূর্তি। হাতে ছোরা।

আতংকঘন কণ্ঠে চীৎকার করে উঠল নাদিয়া মাইকেলের পেছন থেকে—"সাবধান···ও আসছে···!"

হ্যাঁ, ওগারেফ আসছে। চক্ষুষ্মানের মস্ত সুযোগ নিয়ে সে পায়ে পায়ে এগিয়ে আসছে চক্ষুহীনের বুকে ছোরা বসানোর জন্যে। ভয় কি তার? ঐ তো মাইকেলের উন্নত বক্ষদেশ···ঐখানে ছোরাটা গেঁথে দিতে পারলেই কেল্লা ফতে!···মাইকেলও দাঁড়িয়ে আছে ঠিকই···কিন্তু তার চোখে দৃষ্টি নেই···সে অন্ধ·· তাই পা টিপে টিপে নিঃশ্বাসের শব্দ পর্যন্ত গোপন করে ছোরা উঁচিয়ে এগিয়ে এল আইভান···দ্বন্দ্ব যুদ্ধের সময় এখন নেই—এখন দরকার গুপ্তহত্যার—যে ভাবেই হোক পথের কাঁটা সরিয়ে বেরিয়ে যেতে হবে আইভানকে···

মাইকেলের সামনে এসে ছোরা মারতে যেতেই খপ করে সে একহাতে আইভানের হাত মুচড়ে ধরে আরেক হাতে কেড়ে নিল ছোরাটা—ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিল তফাতে।

কুল কুল করে ঘাম জমে গেল আইভানের ললাটে। মাইকেল অন্ধ। কিন্তু এখন তার হাতে ছোরা। মাইকেল অন্ধ। কিন্তু তবুও সে কত নির্ভয়, নিষ্কম্প, নিশ্চিন্ত। অটল আত্মবিশ্বাসের জীবন্ত প্রতিমূর্তি যেন। এতটুকু নড়ছে না, ছোরা হাতে দাঁড়িয়ে রয়েছে ভয়ংকর এক চক্ষুষ্মানের প্রতীক্ষায়।

অসম যুদ্ধ সন্দেহ নেই। তা সত্ত্বেও নাদিয়ার মনে কেন এত সাহস? একবার দৌড়ে গেছিল দরজার কাছে লোক জন ডেকে জড়ো করবে বলে, কিন্তু পেছন দিক থেকে হেঁকে বলেছিল মাইকেল—"দরজা বন্ধ করে দাও, না দয়া। রাশিয়ার রাজদূত বিশ্বাসঘাতককে ডরায় না। একলাই টক্কর নিতে পারব কাপুরুষ এই কুত্তার বাচ্চার।"

নাদিয়া তাই আর কাউকে ডাকেনি। মাইকেলের ওপর বিশ্বাস তার অপরিসীম। মাইকেলের চোখ নেই—তবুও অসাধ্য সাধনে সক্ষম সে নাদিয়া।

তা জানে। কোনো অবস্থাতেই যার বুক কাঁপে না—ঈশ্বর তার সহায় হন। অসম এই যুদ্ধের একমাত্র সাক্ষী নাদিয়াও তাই মাইকেলের প্রতি অসীম বিশ্বাস নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল ঘরের এক কোণে।

আইভানের খেয়াল হল কোমরে তার তলোয়ার আছে। খাপ থেকে তরবারি টেনে নিয়ে ফের এগিয়ে এল পা টিপে টিপে নিরুদ্ধ নিঃশ্বাসে। কিন্তু কেন তবুও বুক কাঁপছে তার? কেন চিড় ধরছে পাথর প্রতিম মনোবলে? ভয় কিসের ঐ অন্ধকে? অন্ধ হলেও লোকটা হিমালয় সমান আত্মবিশ্বাস নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে বলেই কি এত দ্বন্দ্ব, এত সংশয়, এত উদ্বেগ?

বুক লক্ষ্য করে এগিয়ে তরবারি চালনা করল আইভান—ছোরার ছোট্ট আঘাতে তরবারিকে লক্ষ্যচ্যুত করল আইভান।

থেমে গেল আইভান। আবার এগিয়ে এল তরবারি নিয়ে—আবার ছোরার ঘায়ে প্রচণ্ড আঘাতকে হেলায় পাশে সরিয়ে দিল মাইকেল।

আইভান এতক্ষণে চেয়ে দেখলে মাইকেলের মুখের পানে। বিস্ফারিত অথচ মর্মভেদী নীল চক্ষুর অন্তরালে নিঃসীম ঘৃণার বর্ষণ দেখে শিউরে উঠল। কাঠ হয়ে গেল বিষম আতংকে।

পরক্ষণেই ভয়াল ভয়ংকর বিরাট চীৎকার বেরিয়ে এল ভাঙা গলা দিয়ে:

"দেখছে!...দেখছে...। দেখতে পাচ্ছে!"

বলেই ল্যাজ গুটোনো কুকুরের মত কুঁচকে গুটিয়ে পিছু হটে গেল দেওয়ালের কোণে।

লম্বা লম্বা পা ফেলে সামনে গিয়ে দাঁড়াল মাইকেল স্ট্রগফ—অন্ধ মানুষ মাইকেল স্ট্রগফ।

বললে দাঁতে দাঁত পিষে বজ্র কঠিন স্বরে—"হ্যাঁরে কুত্তার বাচ্চা! আমি দেখছি! দেখছি তোর মত কাপুরুষ বিশ্বাসঘাতককে! দেখছি তোর গালের ঐ কাটা দাগকে—নাউটের চাবুক মেরে যে দাগে আমিই দাগিয়েছি তোকে! এখন বাঁচা নিজেকে। ডুয়েল লড়! তোর তলোয়ার, আমার ছোরা—বাঁচা নিজেকে!"

অস্ফুট কণ্ঠে নাদিয়া বললে—"হে ভগবান। একী শুনছি। মাইকেল দেখতে পাচ্ছি! মাইকেল অন্ধ নয়!"

ওগারেফ বুঝল, খেল খতম। তার দিন ফুরিয়েছে। তবুও শেষ চেষ্টা করতে ছাড়ল না। তলোয়ার হাতে সমস্ত শক্তি নিয়ে লাফিয়ে পড়ল মাইকেলের ওপর। কিন্তু দুর্ধর্ব সাইবেরিয়ান ছোরার খেলা দেখা গেল

তখুনি। বিদ্যুৎবেগে আঘাত হানল তলোয়ারের ফলায়—ঝনৎকার শোনা গেল একবারই—পরক্ষণেই দেখা গেল ভেঙে দু'টুকরো হয়ে দুদিকে ঠিকরে পড়েছে বিশ্বাসঘাতকের এক মাত্র অস্ত্র। পরক্ষণেই সাইবেরিয়ান ছোরার শাণিত ফলা লকলকিয়ে উঠে আমূল ঢুকে গেল আইভানের বুকে।

নিষ্প্রাণ দেহটা ভূলুণ্ঠিত হতে না হতেই খুলে গেল দরজা। ঘরে ঢুকলেন সপারিষদ গ্র্যাণ্ড ডিউক। মাটিতে লম্বমান ছোরা বিদ্ধ দেহটা দেখেই চিনলেন রাশিয়ার রাজদূতকে।

বললেন মেঘমন্দ্র কণ্ঠে—"কে মেরেছে একে?"

"আমি." জবাব দিল মাইকেল।

সঙ্গে সঙ্গে একজন অফিসার পিস্তল ঠেকালো মাইকেলের রগে।

"আপনার নাম?" শুধোলেন গ্র্যাণ্ড ডিউক।

মাইকেল বললে—"ইওর হাইনেস, আগে বরং আপনার পায়ের কাছে যে শুয়ে, তার নামটা জিজ্ঞেস করুন।"

"উনি আমার দাদার কর্মচারী। জারের রাজদূত।"

"ইওর হাইনেস, জারের পাঠানো রাশিয়ার রাজদূত ও নয়। ওর নাম আইভান ওগারেফ।"

"আইভান ওগারেফ!" বিস্মিত হলেন গ্র্যাণ্ড ডিউক।

"হ্যাঁ, বিশ্বাসঘাতক আইভান ওগারেফ।"

"তাহলে আপনি কে?"

"মাইকেল স্ট্রগফ।"

৩২ ॥ উপসংহার

মাইকেল স্ট্রগফ কোনোদিনই অন্ধ হয়নি। মন এবং শরীরের যুগপৎ যোগ সাজসে ঠাণ্ডা মেরে গিয়েছিল গনগনে তরবারির ফলা চোখের সামনে দিয়ে যাওয়ার সময়ে।

পাঠকপাঠিকাদের নিশ্চয় মনে আছে, বাষ্পাচ্ছন্ন চোখে মায়ের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে ছিল মাইকেল স্ট্রগফ জন্মের মত দুচোখ ভরে মাকে দেখে নেওয়ার জন্যে। জল ভরা চোখের সামনে গনগনে ফলা আসতেই দারুণ উত্তাপে সেই জল বাষ্প হয়ে গিয়ে ঠাণ্ডা করে দিয়েছিল তরবারি—রক্ষে পেয়েছিল চোখ। যে ব্যক্তি অপরিষ্কার ধাতু গলায়, বাষ্পের মধ্যে হাত রেখে সেই হাত তরল ধাতুর ওপর ধরলে তার হাতও পোড়ে না এই কারণে।

মাইকেল কিন্তু সেই মুহূর্তে ঠিক করলে, জগৎ জানুক সে অন্ধ এবং প্রাণ যায় যাক—তবুও তাকে অন্ধের অভিনয়ই করে যেতে হবে। একমাত্র মায়ের কপালে চুমু খাওয়ার সময়ে কানে কানে সে বলেছিল সত্যি কথাটা—আর কাউকে বলেনি—নাদিয়াকেও না।

আইভান ওগারেফ মাইকেলকে দৃষ্টিহীন ভেবে চিঠি খুলে ধরেছিল তার চোখের সামনে—অন্তত টিপ্পুনি দিয়ে শুনিয়ে দিয়ে গিয়েছিল মর্মঘাতী কয়েকটা কথা। মাইকেল কিন্তু ঐটুকু সময়ের মধ্যেই দুচোখের দৃষ্টি দিয়ে পড়ে নিয়েছিল চিঠির বয়ান। বিশ্বাসঘাতকের পরিকল্পনা চিঠি পড়ে জানতে পেরেছিল বলেই ইরকুটস্ক পৌঁছোতে চেয়েছিল আইভানের আগেই—নইলে যে নকল রাজদূত সেজে বসবে সে।

সবশুনে চোখ কপালে উঠে গেল গ্র্যাণ্ড ডিউকের। নাদিয়াকে দেখিয়ে বললেন—"এ কে?"

"নির্বাসিত ওয়াজিলি ফেদোরের মেয়ে।"

"ইরকুটস্কে নির্বাসিত বলে আর কেউ নেই। ক্যাপ্টেন ফেদোরের মেয়েও আর কোনো নির্বাসিতের মেয়ে নয়!"

অভিভূত অন্তরে নতজানু হয়ে বসে পড়ল নাদিয়া গ্র্যাণ্ড ডিউকের সামনে। এক ঘন্টা পরে ঝাঁপিয়ে পড়ল বাবার বুকে।

মার খেয়ে তাতাররা ততক্ষণে পিছু হটে গেছে। তরল ন্যাপথাও জ্বলে জ্বলে শেষ হয়ে নিভে গেছে। আগুনের হাত থেকে রেহাই পেয়েছে বাকী শহর।

ভোরের আলো ফোটার পর দেখা গেল কাতারে কাতারে তাতার মৃতদেহ পড়ে কেল্লার প্রাচীরের তলায়। সবার ওপরে পড়ে জিপসী সানগারের দেহ। শেষ মুহূর্তেও এসেছিল আইভানের পাশে দাঁড়াতে।

এরপর দুদিন ঝিমিয়ে রইল তাতার বাহিনী। আইভানের মৃত্যু তাদের সব উৎসাহ নিভিয়ে দিয়ে গেছে। এশিয়াটিক রাশিয়া জয় করার ইন্ধন জুগিয়েছিল বিশ্বাসঘাতক আইভান ওগারেফ। খানেরা তাই উদ্যমহীন সে না থাকায়।

৭ই অক্টোবর ভোর হতেই দূর থেকে শোনা গেল কামানের আওয়াজ—আসছে রাশিয়ান মুক্তি ফৌজ।

ফিওফার খান আর রুখে দাঁড়াল না। তৎক্ষণাৎ শিবির তুলে চম্পট দিল উল্টো দিকে।

রাশিয়ান ফৌজের সঙ্গে শহরে প্রবেশ করলেন অবিচ্ছেদ্য হ্যারি ব্লাউন্ট

আর অ্যালসাইড জোলিভেট। আঙ্গারার দক্ষিণ পাড়ে নেমে তাঁরাও পালিয়ে ছিলেন অন্যান্য পলাতকের মত—ন্যাপথার আগুন ভেলায় পৌঁছনোর আগেই।

নাদিয়া আর মাইকেলকে বহাল তবিয়তে দেখে খুশীতে ডগমগ হলেন দুজনেই। ব্লাউন্ট লিখলেন নোট বইয়ে—"লাল টকটকে লোহাও চোখের স্নায়ু পেক্ষ নষ্ট করার যথেষ্ট নয়।"

তারপর দুজনেই তাতার আক্রমণের নিখুঁত রিপোর্ট লিখে পাঠিয়ে দিল যথাস্থানে।

ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল আমীরের ফৌজ। রাশিয়ান ফৌজ শহরগুলো একে একে দখল করে নেওয়ার পর কে যে কোথায় পালালো তার ঠিক নেই। রাশি-য়ার প্রচণ্ড শীত মেরে ফেলল অনেককেই—মুষ্টিমেয় হানাদার ধুঁকতে ধুঁকতে প্রায় মৃত অবস্থায় পৌঁছোলো তাতার দেশে।

উরাল পাহাড়ের রাস্তা ফের খোলাহতেই মস্কো যাওয়ার জন্যে মনটা আনচান করে উঠল গ্র্যাণ্ড ডিউক্কের। কিন্তু ছোট্ট একটা অনুষ্ঠানে হাজির থাকতেই হল তাকে।

অনুষ্ঠানটা নাদিয়া আর মাইকেলকে নিয়ে।

রাশিয়ান ফৌজ শহরে ঢোকার দিন কয়েক পরেই মাইকেল নাদিয়াকে বললে তার বাবার সামনে:

"নাদিয়া, রিগা ছেড়ে আসার আগে মা ছাড়া আর কাউকে ফেলে এসেছো সেখানে?"

"না।"

"তাহলে তোমার মন তোমায় কাছেই আছে?"

"নিশ্চয়।"

"নাদিয়া ঈশ্বরের ইচ্ছা বোধহয় তাহলে তোমার মন যেন আমি পাই। অনেক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছি দুজনে নিশ্চয় এক থাকব বলে।"

আবেগে দৌড়ে গিয়ে মাইকেলের বাহুবন্ধনে ধরা দিল নাদিয়া।

পরক্ষণেই মুখ লাল করে করে বাবার পানে ফিরে বলল—"বাবা!"

ক্যাপ্টেন ফেদোর বললেন—"তোরা দুটো আমার ছেলেমেয়ে হলে আমার সুখের শেষ থাকবে না রে।"

বিয়ে হয়ে গেল ইরকুটস্কের গির্জেতে। আশীর্বাদ করে গেল শহরের প্রত্যেকে।

বিয়ের রিপোর্ট লিখে ফেলে অ্যালসাইড বললেন ব্লাউন্টকে—"আপনি-

ও এদের অনুকরণ করুন না কেন?"

"আমার তো আপনার মত দূর সম্পর্কের বোন নেই।"

"আমার বোন তো আইবুড়ো থাকবে আমৃত্যু।"

"তাহলে চলুন চীনদেশে যাওয়া যাক—লণ্ডনের সঙ্গে চীনের নাকি বনিবনা হচ্ছে না।

"আরে আমিও তা আপনাকে বলতে যাচ্ছিলাম ঐ কথা।"

ফলে দুই বন্ধু রওনা হলেন চীনদেশ অভিমুখে।

এর দিন কয়েক পরেই ক্যাপ্টেন ফেদোরের মেয়ে জামাইকে নিয়ে দ্রুতগামী স্লেজগাড়ী চড়ে এক্সপ্রেস ট্রেনের স্পীডে সাইবেরিয়ার জমাট বরফের ওপর দিয়ে রওনা হলেন দেশের দিকে। পথে স্লেজ থামিয়ে নিকোলাসের কবরে একটা ক্রুশ লাগিয়ে শেষ প্রার্থনা জানিয়ে গেল নাদিয়া।

ওমস্কে বুড়ি মারফা দুহাতে জড়িয়ে ধরল ছেলে আর ছেলের বউকে।

মস্কো পৌঁছোতেই মাইকেল স্ট্রগফকে সেণ্ট জর্জ ক্রুশ দিয়ে বিশেষ সম্মান এবং বিশেষ পদমর্যাদা দিলেন জার।

মাইকেল স্ট্রগফ বিখ্যাত হয়ে রইল উচ্চপদের জন্যে নয়—অসামান্য পরীক্ষায় অসাধারণ সফলতার জন্যে। □

সম্পাদকীয় পুনশ্চ

অশ্রু বাষ্প হয়ে গিয়ে টকটকে লাল ইস্পাতের ফলার হাত থেকে চোখকে রক্ষা করতে পারে কিনা, এ বিষয়ে বিলক্ষণ সন্দেহ আছে। বাষ্পের মধ্যে হাত রেখে সেই হাত তরল ধাতুর ওপর ধরলে হাত পোড়ে না—ভের্নের এই ধারণাও খুব স্পষ্ট নয়। উনি হয়ত বলতে চেয়েছেন, তরল ধাতুর মধ্যে মানুষের হাত ঝট করে ডুবিয়ে নেওয়া যায় (অবিশ্যি এ ধরনের এক্সপেরিমেন্ট দক্ষ ব্যক্তির দ্বারাই অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত)—ধাতু গলানোর কারখানায় এবং ল্যাবোরেটরীতে এ ধরনের ব্যাপার হাতেনাতে দেখানো হয়েছে বহুবার।

হলিউডের ফিল্ম বিশেষজ্ঞরা কিন্তু ভের্নের কথামত এ কাণ্ড ফিল্মে দেখাতে যাননি। যতদূর জানা যায়, প্রথম ফিল্মে দৃষ্টিশক্তি ফিরে এসেছিল স্রেফ অলৌকিকভাবে—মিরাকল ঘটে গেছিল নাটকীয় মুহূর্তে। দ্বিতীয় ফিল্মে দেখানো হয়েছিল, তাতার রাজসভায় ফিওফার খানেরই এক বেগম দয়া পরবশ হয়ে জল্লাদকে টাকা খাইয়ে টকটকে লাল ইস্পাতের বদলে শুধু গরম লোহা দিয়ে ভুরু পুড়িয়ে ছেড়ে দিয়েছিল মাইকেলের। বলা বাহুল্য, এতে আইভান ওগারেফ আর ফিওফার খানের অযোগ্যতাই স্পষ্ট হয়েছে এবং ভের্নের বাষ্পীভূত অশ্রু দিয়ে চক্ষু অবরোধ অথবা দৈববলে দৃষ্টি ফিরে পাওয়ার চাইতেও এই ধরনের ব্যাখ্যা আরও অবিশ্বাস্য।